রবীন্দ্র রচনাবলী

ঊনবিংশ খণ্ড

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ঊনবিংশ খণ্ড

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা

সূচী

চিত্রসূচী

কবিতা ও গান

বীথিকা

বীথিকা

অতীতের ছায়া

মহা অতীতের সাথে আজ আমি করেছি মিতালি—
দিবালোক-অবসানে তারালোক জ্বালি
ধ্যানে যেথা বসেছে সে
রূপহীন দেশে ;
যেথা অস্তসূর্য হতে নিয়ে রক্তরাগ
গুহাচিত্রে করিছে সজাগ
তার তুলি
ম্রিয়মাণ জীবনের লুপ্ত রেখাগুলি ;
নিমীলিত বসন্তের ক্লান্তগন্ধে যেখানে সে
গাঁথিয়া অদৃশ্যমালা পরিছে নিবিড় কালোকেশে ;
যেখানে তাহার কণ্ঠহারে
দুলায়েছে সারে সারে
প্রাচীন শতাব্দীগুলি শান্ত-চিত্তদহন বেদনা
মাণিক্যের কণা।
সেথা বসে আছি কাজ ভুলে
অস্তাচলমূলে
ছায়াবীথিকায়।
রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্তপ্রায়
গোধূলিধূসর আবরণে,
অতীতের শূন্য তার স্মৃতি মেলিতেছে মোর মনে।
এ শূন্য তো মরুমাত্র নয়,
এ যে চিত্তময় ;

বর্তমান যেতে যেতে এই শূন্যে যায় ভ'রে রেখে
আপন অন্তর থেকে
অসংখ্য স্বপন ;
অতীত এ শূন্য দিয়ে করিছে বপন
বস্তুহীন সৃষ্টি যত,
নিত্যকাল-মাঝে তারি ফলশস্য ফলিছে নিয়ত।
আলোড়িত এই শূন্য যুগে যুগে উঠিয়াছে জ্বলি,
ভরিয়াছে জ্যোতির অঞ্জলি।
বসে আছি নির্নিমেষ চোখে
অতীতের সেই ধ্যানলোকে—
নিঃশব্দ তিমিরতটে জীবনের বিস্মৃত রাতির।

হে অতীত,
শান্ত তুমি নির্বাণ-বাতির
অন্ধকারে,
সুখদুঃখনিষ্কৃতির পারে।
শিল্পী তুমি, আঁধারের ভূমিকায়
নিভৃতে রচিছ সৃষ্টি নিরাসক্ত নির্মম কলায়,
স্মরণে ও বিস্মরণে বিগলিত বর্ণ দিয়া লিখা
বর্ণিতেছ আখ্যায়িকা ;
পুরাতন ছায়াপথে নূতন তারার মতো
উজ্জ্বলি উঠিছে কত,
কত তার নিভাইছ একেবারে
যুগান্তের অশান্ত ফুৎকারে।
আজ আমি তোমার দোসর,
আশ্রয় নিতেছি সেথা যেথা আছে মহা-অগোচর।
তব অধিকার আজি দিনে দিনে ব্যাপ্ত হয়ে আসে
আমার আয়ুর ইতিহাসে।
সেথা তব সৃষ্টির মন্দিরদ্বারে
আমার রচনাশালা স্থাপন করেছি একধারে

তোমারি বিহারবনে ছায়াবীথিকায়।
ঘুচিল কর্মের দায়,
ক্লান্ত হল লোকমুখে খ্যাতির আগ্রহ;
দুঃখ যত সয়েছি দুঃসহ
তাপ তার করি অপগত
মূর্তি তারে দিব নানামতো
আপনার মনে মনে।
কলকোলাহলশান্ত জনশূন্য তোমার প্রাঙ্গণে,
যেখানে মিটেছে দ্বন্দ্ব মন্দ ও ভালোয়,
তারার আলোয়
সেখানে তোমার পাশে আমার আসন পাতা—
কর্মহীন আমি সেথা বন্ধহীন সৃষ্টির বিধাতা।

৩১ জুলাই-২ অগস্ট ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

মাটি

বাঁখারির বেড়া-দেওয়া ভূমি; হেথা করি ঘোরাফেরা
সারাক্ষণ আমি-দিয়ে ঘেরা
বর্তমানে।
মন জানে
এ মাটি আমারি,
যেমন এ শালতরুসারি
বাঁধে নিজ তলবীথি শিকড়ের গভীর বিস্তারে
দূর শতাব্দীর অধিকারে।
হেথা কৃষ্ণচূড়াশাখে ঝরে শ্রাবণের বারি
সে যেন আমারি—
ভোরে ঘুমভাঙা আলো, রাত্রে তারাজ্বালা অন্ধকার,
যেন সে আমারি আপনার
এ মাটির সীমাটুকু-মাঝে।

আমার সকল খেলা, সব কাজে,
এ ভূমি জড়িত আছে শাশ্বতের যেন সে লিখন।
হঠাৎ চমক ভাঙে নিশীথে যখন
সপ্তর্ষির চিরন্তন দৃষ্টিতলে,
ধ্যানে দেখি, কালের যাত্রীর দল চলে
যুগে যুগান্তরে।
এই ভূমিখণ্ড-'পরে
তারা এল, তারা গেল কত।
তারাও আমারি মতো
এ মাটি নিয়েছে ঘেরি—
জেনেছিল, একান্ত এ তাহাদেরি।
কেহ আর্য কেহ বা অনার্য তারা,
কত জাতি নামহীন, ইতিহাসহারা।
কেহ হোমাগ্নিতে হেথা দিয়েছিল হবির অঞ্জলি,
কেহ বা দিয়েছে নরবলি।
এ মাটিতে একদিন যাহাদের সুপ্তচোখে
জাগরণ এনেছিল অরুণ-আলোকে
বিলুপ্ত তাদের ভাষা।
পরে পরে যারা বেঁধেছিল বাসা,
সুখে দুঃখে জীবনের রসধারা
মাটির পাত্রের মতো প্রতি ক্ষণে ভরেছিল যারা
এ ভূমিতে,
এরে তারা পারিল না কোনো চিহ্ন দিতে।

আসে যায়
ঋতুর পর্যায়,
আবর্তিত অন্তহীন
রাত্রি আর দিন;
মেঘরৌদ্র এর 'পরে
ছায়ার খেলেনা নিয়ে খেলা করে

আদিকাল হতে।
কালস্রোতে
আগন্তুক এসেছি হেথায়
সত্য কিম্বা দ্বাপরে ত্রেতায়
যেখানে পড়ে নি লেখা
রাজকীয় স্বাক্ষরের একটিও স্থায়ী রেখা।

হায় আমি,
হায় রে ভূস্বামী,
এখানে তুলিছ বেড়া— উপাড়িছ হেথা যেই তৃণ
এ মাটিতে সে-ই রবে লীন
পুনঃ পুনঃ বৎসরে বৎসরে। তারপরে !—
এই ধূলি রবে পড়ি আমি-শূন্য চিরকাল-তরে।

২ অগস্ট ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

দুজন

সূর্যাস্তদিগন্ত হতে বর্ণচ্ছটা উঠেছে উচ্ছ্বাসি।
দুজনে বসেছে পাশাপাশি।
সমস্ত শরীরে মনে লইতেছে টানি
আকাশের বাণী।
চোখেতে পলক নাই, মুখে নাই কথা,
স্তব্ধ চঞ্চলতা।
একদিন যুগলের যাত্রা হয়েছিল শুরু,
বক্ষ করেছিল দুরু দুরু
অনির্বচনীয় সুখে।
বর্তমান মুহূর্তের দৃষ্টির সম্মুখে
তাদের মিলনগ্রন্থি হয়েছিল বাঁধা।
সে-মুহূর্ত পরিপূর্ণ; নাহি তাহে বাধা,

দ্বন্দ্ব নাই, নাই ভয়,
নাইকো সংশয়।
সে-মুহূর্ত বাঁশির গানের মতো ;
অসীমতা তার কেন্দ্রে রয়েছে সংহত।
সে-মুহূর্ত উৎসের মতন ;
একটি সংকীর্ণ মহাক্ষণ
উচ্ছলিত দেয় ঢেলে আপনার সবকিছু দান।
সে সম্পদ দেখা দেয় লয়ে নৃত্য, লয়ে গান,
লয়ে সূর্যালোকভরা হাসি,
ফেনিল কল্লোল রাশি রাশি।
সে-মুহূর্তধারা
ক্রমে আজ হল হারা
সুদূরের মাঝে।
সে-সুদূরে বাজে
মহাসমুদ্রের গাথা।
সেইখানে আছে পাতা
বিরাটের মহাসন কালের প্রাঙ্গণে।
সর্ব দুঃখ, সর্ব সুখ মেলে সেথা প্রকাণ্ড মিলনে।
সেথা আকাশের পটে
অস্ত-উদয়ের শৈলতটে
রবিচ্ছবি আঁকিল যে অপরূপ মায়া
তারি সঙ্গে গাঁথা পড়ে রজনীর ছায়া।
সেথা আজ যাত্রী দুইজনে
শান্ত হয়ে চেয়ে আছে সুদূর গগনে।
কিছুতে বুঝিতে নাহি পারে
কেন বারে বারে
দুই চক্ষু ভরে ওঠে জলে।
ভাবনার সুগভীর তলে
ভাবনার অতীত যে-ভাষা
করিয়াছে বাসা

অকথিত কোন্ কথা
কী বারতা
কাঁপাইছে বক্ষের পঞ্জরে।
বিশ্বের বৃহৎ বাণী লেখা আছে যে মায়া-অক্ষরে,
তার মধ্যে কতটুকু শ্লোকে
ওদের মিলনলিপি, চিহ্ন তার পড়েছে কি চোখে!

২৫ জুলাই ১৯৩২
[শান্তিনিকেতন]

রাত্রিরূপিণী

হে রাত্রিরূপিণী,
আলো জ্বালো একবার ভালো করে চিনি।
দিন যার ক্লান্ত হল তারি লাগি কী এনেছ বর,
জানাক তা তব মৃদু স্বর।
তোমার নিশ্বাসে
ভাবনা ভরিল মোর সৌরভ-আভাসে।
বুঝিবা বক্ষের কাছে
ঢাকা আছে
রজনীগন্ধার ডালি!
বুঝিবা এনেছ জ্বালি
প্রচ্ছন্ন ললাটনেত্রে সন্ধ্যার সঙ্গিনীহীন তারা—
গোপন আলোক তারি, ওগো বাক্যহারা,
পড়েছে তোমার মৌন-'পরে—
এনেছে গভীর হাসি করুণ অধরে
বিষাদের মতো শান্ত স্থির।
দিবসে সুতীব্র আলো, বিক্ষিপ্ত সমীর,
নিরন্তর আন্দোলন,
অনুক্ষণ
দ্বন্দ্ব-আলোড়িত কোলাহল।

তুমি এসো অচঞ্চল,
এসো স্নিগ্ধ আবির্ভাব,
তোমারি অঞ্চলতলে লুপ্ত হোক যত ক্ষতি লাভ।
তোমার স্তব্ধতাখানি
দাও টানি
অধীর উদ্‌ভ্রান্ত মনে।
যে অনাদি নিঃশব্দতা সৃষ্টির প্রাঙ্গণে
বহ্নিদীপ্ত উদ্যমের মত্ততার জ্বর
শান্ত করি করে তারে সংযত সুন্দর,
সে গম্ভীর শান্তি আনো তব আলিঙ্গনে
ক্ষুব্ধ এ জীবনে।
তব প্রেমে
চিত্তে মোর যাক থেমে
অন্তহীন প্রয়াসের লক্ষ্যহীন চাঞ্চল্যের মোহ,
দুরাশার দুরন্ত বিদ্রোহ।
সপ্তর্ষির তপোবনে হোমহুতাশন হতে
আনো তব দীপ্ত শিখা। তাহারি আলোতে
নির্জনের উৎসব-আলোক
পুণ্য হবে, সেইক্ষণে আমাদের শুভদৃষ্টি হোক।
অপ্রমত্ত মিলনের মন্ত্র সুগম্ভীর
মন্ত্রিত করুক আজি রজনীর তিমিরমন্দির।

৭ মাঘ ১৩৩৮

ধ্যান

কাল চলে আসিয়াছি, কোনো কথা বলি নি তোমারে।
শেষ করে দিনু একেবারে
আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, ক্ষুব্ধ কামনার
দুঃসহ ধিক্কার।

বিরহের বিষণ্ণ আকাশে
সন্ধ্যা হয়ে আসে।
তোমারে নিরখি ধ্যানে সব হতে স্বতন্ত্র করিয়া
অনন্তে ধরিয়া।
নাই সৃষ্টিধারা,
নাই রবি শশী গ্রহতারা;
বায়ু স্তব্ধ আছে,
দিগন্তে একটি রেখা আঁকে নাই গাছে।
নাইকো জনতা,
নাই কানাকানি কথা।
নাই সময়ের পদধ্বনি
নিরন্ত মুহূর্ত স্থির, দণ্ড পল কিছুই না গণি।
নাই আলো, নাই অন্ধকার—
আমি নাই, গ্রন্থি নাই তোমার আমার।
নাই সুখ দুঃখ ভয়, আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হল সব—
আকাশে নিস্তব্ধ এক শান্ত অনুভব।
তোমাতে সমস্ত লীন, তুমি আছ একা—
আমি-হীন চিত্তমাঝে একান্ত তোমারে শুধু দেখা।

৩ জুলাই [১৯৩২]

কৈশোরিকা

হে কৈশোরের প্রিয়া,
ভোরবেলাকার আলোক-আঁধার-লাগা
চলেছিলে তুমি আধঘুমো-আধজাগা
মোর জীবনের ঘন বনপথ দিয়া।
ছায়ায় ছায়ায় আমি ফিরিতাম একা,
দেখি দেখি করি শুধু হয়েছিল দেখা
চকিত পায়ের চলার ইশারাখানি।

চুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে মিলে
পিছে পিছে তব বাতাসে চিহ্ন দিলে
বাসনার রেখা টানি।

প্রভাত উঠিল ফুটি ;
অরুণরাঙিমা দিগন্তে গেল ঘুচে,
শিশিরের কণা কুঁড়ি হতে গেল মুছে,
গাহিল কুঞ্জে কপোতকপোতী দুটি।
ছায়াবীথি হতে বাহিরে আসিলে ধীরে
ভরা জোয়ারের উচ্ছল নদীতীরে—
প্রাণকল্লোলে মুখর পল্লিবাটে।
আমি কহিলাম, "তোমাতে আমাতে চলো,
তরুণ রৌদ্র জলে করে ঝলোমলো—
নৌকা রয়েছে ঘাটে।"

স্রোতে চলে তরী ভাসি।
জীবনের-স্মৃতি-সঞ্চয়-করা তরী
দিনরজনীর সুখে দুখে গেছে ভরি,
আছে গানে-গাঁথা কত কান্না ও হাসি।
পেলব প্রাণের প্রথম পশরা নিয়ে
সে তরণী-'পরে পা ফেলেছ তুমি প্রিয়ে,
পাশাপাশি সেথা খেয়েছি ঢেউয়ের দোলা।
কখনো বা কথা কয়েছিলে কানে কানে,
কখনো বা মুখে ছলোছলো দুনয়ানে
চেয়েছিলে ভাষা-ভোলা।

বাতাস লাগিল পালে ;
ভাঁটার বেলায় তরী যবে যায় থেমে
অচেনা পুলিনে কবে গিয়েছিলে নেমে
মলিন ছায়ায় ধূসর গোধূলিকালে।

আবার রচিলে নব কুহকের পালা,
সাজালে ডালিতে নূতন বরণমালা,
নয়নে আনিলে নূতন চেনার হাসি।
কোন্ সাগরের অধীর জোয়ার লেগে
আবার নদীর নাড়ী নেচে ওঠে বেগে,
আবার চলিনু ভাসি।

তুমি ভেসে চল সাথে।
চিররূপখানি নবরূপে আসে প্রাণে;
নানা পরশের মাধুরীর মাঝখানে
তোমারি সে হাত মিলেছে আমার হাতে।
গোপন গভীর রহস্যে অবিরত
ঋতুতে ঋতুতে সুরের ফসল কত
ফলায়ে তুলেছ বিস্মিত মোর গীতে।
শুকতারা তব কয়েছিল যে কথারে
সন্ধ্যার আলো সোনায় গলায় তারে
সকরুণ পূরবীতে।

চিনি, নাহি চিনি তবু।
প্রতি দিবসের সংসারমাঝে তুমি
স্পর্শ করিয়া আছ যে-মর্তভূমি
তার আবরণ খসে পড়ে যদি কভু,
তখন তোমার মুরতি দীপ্তিমতী
প্রকাশ করিবে আপন অমরাবতী
সকল কালের বিরহের মহাকাশে।
তাহারি বেদনা কত কীর্তির স্তূপে
উচ্ছ্রিত হয়ে ওঠে অসংখ্য রূপে
পুরুষের ইতিহাসে।

হে কৈশোরের প্রিয়া,
এ জনমে তুমি নব জীবনের দ্বারে

কোন্ পার হতে এনে দিলে মোর পারে
অনাদি যুগের চিরমানবীর হিয়া।
দেশের কালের অতীত যে মহাদূর,
তোমার কণ্ঠে শুনেছি তাহারি সুর—
বাক্য সেথায় নত হয় পরাভবে।
অসীমের দূতী, ভরে এনেছিলে ডালা
পরাতে আমারে নন্দন-ফুলমালা
অপূর্ব গৌরবে।

৯ মাঘ ১৩৪০

সত্যরূপ

অন্ধকারে জানি না কে এল কোথা হতে—
মনে হল তুমি ;
রাতের লতা-বিতান তারার আলোতে
উঠিল কুসুমি।
সাক্ষ্য আর কিছু নাই, আছে শুধু একটি স্বাক্ষর,
প্রভাত-আলোক তলে মগ্ন হলে প্রসুপ্ত প্রহর
পড়িব তখন।
ততক্ষণ পূর্ণ করি থাক্ মোর নিস্তব্ধ অন্তর
তোমার স্মরণ।

কত লোক ভিড় করে জীবনের পথে
উড়াইয়া ধূলি ;
কত যে পতাকা ওড়ে কত রাজপথে
আকাশ আকুলি।
প্রহরে প্রহরে যাত্রী ধেয়ে চলে খেয়ার উদ্দেশে—
অতিথি আশ্রয় মাগে শ্রান্তদেহে মোর দ্বারে এসে
দিন-অবসানে,
দূরের কাহিনী বলে, তার পরে রজনীর শেষে
যায় দূরপানে।

মায়ার আবর্ত রচে আসায় যাওয়ায়
চঞ্চল সংসারে।
ছায়ার তরঙ্গ যেন ধাইছে হাওয়ায়
ভাঁটায় জোয়ারে।
ঊর্ধ্বকণ্ঠে ডাকে কেহ, স্তব্ধ কেহ ঘরে এসে বসে—
প্রত্যহের জানাশোনা, তবু তারা দিবসে দিবসে
পরিচয়হীন।
এই কুজ্ঝটিকালোকে লুপ্ত হয়ে স্বপ্নের তামসে
কাটে জীর্ণ দিন।

সন্ধ্যার নৈঃশব্দ্য উঠে সহসা শিহরি ;
না কহিয়া কথা
কখন যে আস কাছে, দাও ছিন্ন করি
মোর অস্পষ্টতা।
তখন বুঝিতে পারি, আছি আমি একান্তই আছি
মহাকালদেবতার অন্তরের অতি কাছাকাছি
মহেন্দ্রমন্দিরে ;
জাগ্রত জীবনলক্ষ্মী পরায় আপন মাল্যগাছি
উন্নমিত শিরে।

তখনি বুঝিতে পারি, বিশ্বের মহিমা
উচ্ছ্বসিয়া উঠি
রাখিল সত্তায় মোর রচি নিজ সীমা
আপন দেউটি
সৃষ্টির প্রাঙ্গণতলে চেতনার দীপশ্রেণী-মাঝে
সে দীপে জ্বলেছে শিখা উৎসবের ঘোষণার কাজে ;
সেই তো বাখানে,
অনির্বচনীয় প্রেম অন্তহীন বিস্ময়ে বিরাজে
দেহে মনে প্রাণে।

৫ শ্রাবণ ১৩৪০

প্রত্যর্পণ

কবির রচনা তব মন্দিরে
জ্বালে ছন্দের ধূপ।
সে মায়াবাষ্পে আকার লভিল
তোমার ভাবের রূপ।
লভিলে হে নারী, তনুর অতীত তনু,
পরশ-এড়ানো সে যেন ইন্দ্রধনু
নানা রশ্মিতে রাঙা;
পেলে রসধারা অমর বাণীর
অমৃতপাত্র-ভাঙা।

কামনা তোমার বহে নিয়ে যায়
কামনার পরপারে।
সুদূরে তোমার আসন রচিয়া
ফাঁকি দেয় আপনারে।
ধ্যানপ্রতিমারে স্বপ্নরেখায় আঁকে,
অপরূপ অবগুণ্ঠনে তারে ঢাকে,
অজানা করিয়া তোলে।
আবরণ তার ঘুচাতে না চায়
স্বপ্ন ভাঙিবে ব'লে।

ঐ যে মুরতি হয়েছে ভূষিত
মুগ্ধ মনের দানে,
আমার প্রাণের নিশ্বাসতাপে
ভরিয়া উঠিল প্রাণে;
এর মাঝে এল কিসের শক্তি সে যে,
দাঁড়াল সমুখে হোমহুতাশন-তেজে,
পেল সে পরশমণি।
নয়নে তাহার জাগিল কেমনে
জাদুমন্ত্রের ধ্বনি।

যে দান পেয়েছে তার বেশি দান
ফিরে দিলে সে কবিরে।
গোপনে জাগালে সুরের বেদনা
বাজে বীণা যে গভীরে।
প্রিয়-হাত হতে পর পুষ্পের হার,
দয়িতের গলে কর তুমি আরবার
দানের মাল্যদান।
নিজেরে সঁপিলে প্রিয়ের মূল্যে
করিয়া মূল্যবান।

১৯৩২ ?

আদিতম

কে আমার ভাষাহীন অন্তরে
চিত্তের মেঘলোকে সন্তরে,
বক্ষের কাছে থাকে তবুও সে রয় দূরে,
থাকে অশ্রুত সুরে।
ভাবি বসে, গাব আমি তারি গান—
চুপ করে থাকি সারা দিনমান,
অকথিত আবেগের ব্যথা সই।
মন বলে, কথা কই কথা কই!

চঞ্চল শোণিতে যে
সত্তার ক্রন্দন ধ্বনিতেছে
অর্থ কী জানি তাহা,
আদিতম আদিমের বাণী তাহা।
ভেদ করি ঝঞ্ঝার আলোড়ন
ছেদ করি বাষ্পের আবরণ
চুম্বিল ধরাতল যে আলোক,
স্বর্গের সে বালক

কানে তার বলে গেছে যে কথাটি
তারি স্মৃতি আজো ধরণীর মাটি
দিকে দিকে বিকাশিছে ঘাসে ঘাসে—
তারি পানে চেয়ে চেয়ে
সেই স্বর কানে আসে।

প্রাণের প্রথমতম কম্পন
অশথের মজ্জায় করিতেছে বিচরণ,
তারি সেই ঝংকার ধ্বনিহীন—
আকাশের বক্ষেতে কেঁপে ওঠে নিশিদিন ;
মোর শিরা তন্ত্রতে বাজে তাই ;
সুগভীর চেতনার মাঝে তাই
নর্তন জেগে ওঠে অদৃশ্য ভঙ্গীতে
অরণ্যমর্মর-সংগীতে।

ওই তরু ওই লতা ওরা সবে
মুখরিত কুসুমে ও পল্লবে—
সেই মহাবাণীময় গহন মৌনতলে
নির্বাক স্থলে জলে
শুনি আদি ওংকার,
শুনি মূক গুঞ্জন অগোচর চেতনার।
ধরণীর ধূলি হতে তারার সীমার কাছে
কথাহারা যে ভুবন ব্যাপিয়াছে
তার মাঝে নিই স্থান,
চেয়ে-থাকা দুই চোখে বাজে ধ্বনিহীন গান।

৮ বৈশাখ ১৩৪১
[শান্তিনিকেতন]

পাঠিকা

বহিছে হাওয়া উতল বেগে,
আকাশ ঢাকা সজল মেঘে,
ধ্বনিয়া উঠে কেকা।
করি নি কাজ, পরি নি বেশ,
গিয়েছে বেলা বাঁধি নি কেশ,
পড়ি তোমারি লেখা।

ওগো আমারি কবি,
তোমারে আমি জানি নে কভু,
তোমার বাণী আঁকিছে তবু
অলস মনে অজানা তব ছবি।
বাদলছায়া হায় গো মরি,
বেদনা দিয়ে তুলেছ ভরি,
নয়ন মম করিছে ছলোছলো।
হিয়ার মাঝে কী কথা তুমি বল!

কোথায় কবে আছিলে জাগি,
বিরহ তব কাহার লাগি,
কোন্ সে তব প্রিয়া!
ইন্দ্র তুমি, তোমার শচী—
জানি তাহারে তুলেছ রচি
আপন মায়া দিয়া।

ওগো আমার কবি,
ছন্দ বুকে যতই বাজে
ততই সেই মুরতিমাঝে
জানি না কেন আমারে আমি লভি।

নারীহৃদয়-যমুনাতীরে
চিরদিনের সোহাগিনীরে
চিরকালের শুনাও স্তবগান।
বিনা কারণে দুলিয়া ওঠে প্রাণ।

নাই বা তার শুনিনু নাম,
কভু তাহারে না দেখিলাম,
কিসের ক্ষতি তায়।
প্রিয়ারে তব যে নাহি জানে
জানে সে তারে তোমার গানে
আপন চেতনায়।

ওগো আমার কবি,
সুদূর তব ফাগুন-রাতি
রক্তে মোর উঠিল মাতি,
চিত্তে মোর উঠিছে পল্লবি।
জেনেছ যারে তাহারো মাঝে
অজানা যেই সে-ই বিরাজে,
আমি যে সেই অজানাদের দলে।
তোমার মালা এল আমার গলে।

বৃষ্টিভেজা যে ফুলহার
শ্রাবণসাঁঝে তব প্রিয়ার
বেণীটি ছিল ঘেরি,
গন্ধ তারি স্বপ্নসম
লাগিছে মনে, যেন সে মম
বিগত জনমেরি।

ওগো আমার কবি,
জান না, তুমি মৃদু কী তানে
আমারি এই লতাবিতানে
শুনায়েছিলে করুণ ভৈরবী।

ঘটে নি যাহা আজ কপালে
ঘটেছে যেন সে কোন্ কালে,
আপনভোলা যেন তোমার গীতি
বহিছে তারি গভীর বিস্মৃতি।

বৈশাখ ১৩৪১
[শান্তিনিকেতন]

ছায়াছবি

একটি দিন পড়িছে মনে মোর।
উষার নিল মুকুট কাড়ি
শ্রাবণ ঘনঘোর ;
বাদলবেলা বাজায়ে দিল তুরী,
প্রহরগুলি ঢাকিয়া মুখ
করিল আলো চুরি।
সকাল হতে অবিশ্রামে
ধারাপতনশব্দ নামে,
পরদা দিল টানি,
সংসারের নানা ধ্বনিরে
করিল একখানি।

প্রবল বরিষনে
পাংশু হল দিকের মুখ,
আকাশ যেন নিরুৎসুক,
নদীপারের নীলিমা ছায়
পাণ্ডু আবরণে।
কর্মদিন হারাল সীমা,
হারাল পরিমাণ,
বিনা কারণে ব্যথিত হিয়া
উঠিল গাহি গুঞ্জরিয়া

বিদ্যাপতি-রচিত সেই
ভরা-বাদর গান।

ছিলাম এই কুলায়ে বসি
আপন মন-গড়া,
হঠাৎ মনে পড়িল তবে
এখনি বুঝি সময় হবে,
ছাত্রীটিরে দিতে হবে যে পড়া।
থামায়ে গান চাহিনু পশ্চাতে;
ভীরু সে মেয়ে কখন এসে
নীরব পায়ে দুয়ার ঘেঁষে
দাঁড়িয়ে আছে খাতা ও বহি হাতে।

করিনু পাঠ শুরু।
কপোল তার ঈষৎ রাঙা,
গলাটি আজ কেমন ভাঙা,
বক্ষ বুঝি করিছে দুরু দুরু।
কেবলি যায় ভুলে,
অন্যমনে রয়েছে যেন
বইয়ের পাতা খুলে।
কহিনু তারে, আজকে পড়া থাক।
সে শুধু মুখে তুলিয়া আঁখি
চাহিল নির্বাক্।

তুচ্ছ এই ঘটনাটুকু,
ভাবি নি ফিরে তারে।
গিয়েছে তার ছায়ামুরতি
কালের খেয়াপারে।
স্তব্ধ আজি বাদলবেলা,
নদীতে নাহি ঢেউ,

অলসমনে বসিয়া আছি
ঘরেতে নেই কেউ।
হঠাৎ দেখি চিত্তপটে চেয়ে,
সেই যে ভীরু মেয়ে
মনের কোণে কখন গেছে আঁকি
অবর্ষিত অশ্রুভরা
ডাগর দুটি আঁখি।

৪ আষাঢ় ১৩৪২
[চন্দননগর]

নিমন্ত্রণ

মনে পড়ে, যেন এককালে লিখিতাম
চিঠিতে তোমারে প্রেয়সী অথবা প্রিয়ে।
একালের দিনে শুধু বুঝি লেখে নাম—
থাক সে কথায়, লিখি বিনা নাম দিয়ে।
তুমি দাবি কর কবিতা আমার কাছে
মিল মিলাইয়া দুরূহ ছন্দে লেখা,
আমার কাব্য তোমার দুয়ারে যাচে
নম্র চোখের কম্প্র কাজলরেখা।
সহজ ভাষায় কথাটা বলাই শ্রেয়—
যে-কোনো ছুতায় চলে এসো মোর ডাকে,
সময় ফুরোলে আবার ফিরিয়া যেয়ো,
বোসো মুখোমুখি যদি অবসর থাকে।
গৌরবরন তোমার চরণমূলে
ফলসাবরন শাড়িটি ঘেরিবে ভালো;
বসনপ্রান্ত সীমন্তে রেখো তুলে,
কপোলপ্রান্তে সরু পাড় ঘন কালো।

একগুছি চুল বায়ু-উচ্ছ্বাসে কাঁপা
ললাটের ধারে থাকে যেন অশাসনে।
ডাহিন অলকে একটি দোলনচাঁপা
দুলিয়া উঠুক গ্রীবাভঙ্গীর সনে।
বৈকালে গাঁথা যূথীমুকুলের মালা
কণ্ঠের তাপে ফুটিয়া উঠিবে সাঁঝে ;
দূরে থাকিতেই গোপনগন্ধ-ঢালা
সুখসংবাদ মেলিবে হৃদয়মাঝে।
এই সুযোগেতে একটুকু দিই খোঁটা—
আমারি দেওয়া সে ছোট্ট চুনির দুল,
রক্তে জমানো যেন অশ্রুর ফোঁটা,
কতদিন সেটা পরিতে করেছ ভুল।

আরেকটা কথা বলে রাখি এইখানে,
কাব্যে সে কথা হবে না মানানসই,
সুর দিয়ে সেটা গাহিব না কোনো গানে—
তুচ্ছ শোনাবে, তবু সে তুচ্ছ কই।
একালে চলে না সোনার প্রদীপ আনা,
সোনার বীণাও নহে আয়ত্তগত।
বেতের ডালায় রেশমি-রুমাল-টানা
অরুণবরন আম এনো গোটাকত।
গন্ধ জাতীয় ভোজ্যও কিছু দিয়ো,
পদ্যে তাদের মিল খুঁজে পাওয়া দায়।
তা হোক, তবুও লেখকের তারা প্রিয় ;
জেনো, বাসনার সেরা বাসা রসনায়।
ওই দেখো, ওটা আধুনিকতার ভূত
মুখেতে জোগায় স্থূলতার জয়ভাষা ;
জানি, অমরার পথহারা কোনো দূত
জঠরগুহায় নাহি করে যাওয়া-আসা।

তথাপি স্পষ্ট বলিতে নাহি তো দোষ
যে কথা কবির গভীর মনের কথা—
উদরবিভাগে দৈহিক পরিতোষ
সঙ্গী জোটায় মানসিক মধুরতা।
শোভন হাতের সন্দেশ, পানতোয়া,
মাছমাংসের পোলাও ইত্যাদিও
যবে দেখা দেয় সেবামাধুর্যে-ছোঁওয়া
তখন সে হয় কী অনির্বচনীয়!
বুঝি অনুমানে, চোখে কৌতুক ঝলে;
ভাবিছ বসিয়া সহাস-ওষ্ঠাধরা,
এ সমস্তই কবিতার কৌশলে
মৃদুসংকেতে মোটা ফরমাশ করা।
আচ্ছা, না-হয় ইঙ্গিত শুনে হেসো;
বরদানে, দেবী, না-হয় হইবে বাম;
খালি হাতে যদি আস তবে তাই এসো,
সে দুটি হাতেরও কিছু কম নহে দাম!

সেই কথা ভালো, তুমি চলে এসো একা,
বাতাসে তোমার আভাস যেন গো থাকে;
স্তব্ধ প্রহরে দুজনে বিজনে দেখা,
সন্ধ্যাতারাটি শিরীষডালের ফাঁকে।
তার পরে যদি ফিরে যাও ধীরে ধীরে
ভুলে ফেলে যেয়ো তোমার যূথীর মালা;
ইমন বাজিবে বক্ষের শিরে শিরে,
তার পরে হবে কাব্য লেখার পালা।
যত লিখে যাই ততই ভাবনা আসে,
লেফাফার 'পরে কার নাম দিতে হবে;
মনে মনে ভাবি গভীর দীর্ঘশ্বাসে,
কোন্ দূর যুগে তারিখ ইহার কবে।

১৯।৩

মনে ছবি আসে—ঝিকমিকি বেলা হল,
বাগানের ঘাটে গা ধুয়েছ তাড়াতাড়ি ;
কচি মুখখানি, বয়স তখন ষোলো ;
তনু দেহখানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ি।
কুঙ্কুমফোঁটা ভুরুসংগমে কিবা,
শ্বেতকরবীর গুচ্ছ কর্ণমূলে ;
পিছন হইতে দেখিনু কোমল গ্রীবা
লোভন হয়েছে রেশমচিকন চুলে।
তাম্রথালায় গোড়ে মালাখানি গেঁথে
সিক্ত রুমালে যত্নে রেখেছ ঢাকি ;
ছায়া-হেলা ছাদে মাদুর দিয়েছ পেতে—
কার কথা ভেবে বসে আছ জানি না কি !
আজি এই চিঠি লিখিছে তো সেই কবি ;
গোধূলির ছায়া ঘনায় বিজন ঘরে,
দেয়ালে ঝুলিছে সেদিনের ছায়াছবি—
শব্দটি নেই, ঘড়ি টিক্‌টিক্‌ করে।
ওই তো তোমার হিসাবের ছেঁড়া পাতা,
দেরাজের কোণে পড়ে আছে আধুলিটি।
কতদিন হল গিয়েছ, ভাবিব না তা,
শুধু রচি বসে নিমন্ত্রণের চিঠি।
মনে আসে, তুমি পুব-জানালার ধারে
পশমের গুটি কোলে নিয়ে আছ বসে ;
উৎসুক চোখে বুঝি আশা কর কারে,
আলগা আঁচল মাটিতে পড়েছে খসে।
অর্ধেক ছাদে রৌদ্র নেমেছে বেঁকে,
বাকি অর্ধেক ছায়াখানি দিয়ে ছাওয়া ;
পাঁচিলের গায়ে চীনের টবের থেকে
চামেলি ফুলের গন্ধ আনিছে হাওয়া।
এ চিঠির নেই জবাব দেবার দায়,
আপাতত এটা দেরাজে দিলেম রেখে।

পার যদি এসো শব্দবিহীন পায়,
চোখ টিপে ধোরো হঠাৎ পিছন থেকে।
আকাশে চুলের গন্ধটি দিয়ো পাতি,
এনো সচকিত কাঁকনের রিনিরিন,
আনিয়ো মধুর স্বপ্নসঘন রাতি,
আনিয়ো গভীর আলস্যঘন দিন।
তোমাতে আমাতে মিলিত নিবিড় একা—
স্থির আনন্দ, মৌন মাধুরী ধারা,
মুগ্ধ প্রহর ভরিয়া তোমারে দেখা,
তব করতল মোর করতলে হারা।

১৪ জুন ১৯৩৫
চন্দননগর

ছুটির লেখা

এ লেখা মোর শূন্যদ্বীপের সৈকততীর,
তাকিয়ে থাকে দৃষ্টি-অতীত পারের পানে।
উদ্দেশহীন জোয়ার-ভাঁটায় অস্থির নীর
শামুক ঝিনুক যা-খুশি তাই ভাসিয়ে আনে
এ লেখা নয় বিরাট সভার শ্রোতার লাগি,
রিক্ত ঘরে একলা এ যে দিন কাটাবার;
আটপহুরে কাপড়টা তার ধুলায় দাগি,
বড়ো ঘরের নেমন্তন্নে নয় পাঠাবার।
বয়ঃসন্ধিকালের যেন বালিকাটি,
ভাব্‌নাগুলো উড়ো-উড়ো আপনাভোলা।
অযতনের সঙ্গী তাহার ধুলোমাটি,
বাহির-পানে পথের দিকে দুয়ার খোলা।
আলস্যে তার পা ছড়ানো মেঝের উপর,
ললাটে তার রুক্ষ কেশের অবহেলা।

নাইকো খেয়াল কখন সকাল পেরোয় দুপুর
রেশমি ডানায় যায় চলে তার হালকা বেলা।
চিনতে যদি চাও তাহারে এসো তবে,
দ্বারের ফাঁকে দাঁড়িয়ে থেকো আমার পিছু।
শুধাও যদি প্রশ্ন কোনো তাকিয়ে রবে
বোকার মতন— বলার কথা নেই-যে কিছু।
ধুলোয় লোটে রাঙাপাড়ের আঁচলখানা,
দুই চোখে তার নীল আকাশের সুদূর ছুটি;
কানে কানে কে কথা কয় যায় না জানা,
মুখের 'পরে কে রাখে তার নয়নদুটি।
মর্মরিত শ্যামল বনের কাঁপন থেকে
চমকে নামে আলোর কণা আলগা চুলে;
তাকিয়ে দেখে নদীর রেখা চলছে বেঁকে—
দোয়েল-ডাকা ঝাউয়ের শাখা উঠছে দুলে।
সম্মুখে তার বাগান-কোণায় কামিনী ফুল
আনন্দিত অপব্যয়ে পাপড়ি ছড়ায়।
বেড়ার ধারে বেগনিগুচ্ছে ফুল্ল জারুল
দখিন-হাওয়ার সোহাগেতে শাখা নড়ায়।
তরুণ রৌদ্রে তপ্ত মাটির মৃদুশ্বাসে
তুলসীঝোপের গন্ধটুকু ঢুকছে ঘরে।
খামখেয়ালি একটা ভ্রমর আশে-পাশে
গুঞ্জরিয়া যায় উড়ে কোন্ বনান্তরে।
পাঠশালা সে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এড়ায়,
শেখার মতো কোনো কিছুই হয় নি শেখা;
আলোছায়ায় ছন্দ তাহার খেলিয়ে বেড়ায়
আলুথালু অবকাশের অবুঝ লেখা।
সবুজ সোনা নীলের মায়া ঘিরল তাকে;
শুকনো ঘাসের গন্ধ আসে জানলা ঘুরে;
পাতার শব্দে, জলের শব্দে, পাখির ডাকে
প্রহরটি তার আঁকাজোকা নানান সুরে।

সব নিয়ে যে দেখল তারে পায় সে দেখা
বিশ্বমাঝে ধুলার 'পরে অলজ্জিত—
নইলে সে তো মেঠো পথে নীরব একা
শিথিলবেশে অনাদরে অসজ্জিত।

৬ জুন ১৯৩৫
চন্দননগর

নাট্যশেষ

১

দূর অতীতের পানে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলাম;
হেরিতেছি যাত্রী দলে দলে। জানি সবাকার নাম,
চিনি সকলেরে। আজ বুঝিয়াছি, পশ্চিম-আলোতে
ছায়া ওরা। নটরূপে এসেছে নেপথ্যলোক হতে
দেহ-ছদ্মসাজে; সংসারের ছায়ানাট্য অন্তহীন,
সেথায় আপন পাঠ আবৃত্তি করিয়া রাত্রিদিন
কাটাইল; সূত্রধার অদৃষ্টের আভাসে আদেশে
চালাইল নিজ নিজ পালা, কভু কেঁদে কভু হেসে
নানা ভঙ্গী নানা ভাবে। শেষে অভিনয় হলে সারা,
দেহবেশ ফেলে দিয়ে নেপথ্যে অদৃশ্যে হল হারা।

যে খেলা খেলিতে এল হয়তো কোথাও তার আছে
নাট্যগত অর্থ কোনোরূপ, বিশ্বমহাকবি-কাছে
প্রকাশিত। নটনটী রঙ্গসাজে ছিল যতক্ষণ
সত্য বলে জেনেছিল প্রত্যহের হাসি ও ক্রন্দন,
উত্থানপতন বেদনার। অবশেষে যবনিকা
নেমে গেল; নিবে গেল একে একে প্রদীপের শিখা;
ম্লান হল অঙ্গরাগ; বিচিত্র চাঞ্চল্য গেল থেমে;
যে নিস্তব্ধ অন্ধকারে রঙ্গমঞ্চ হতে গেল নেমে

স্তুতি নিন্দা সেথায় সমান, ভেদহীন মন্দ ভালো,
দুঃখসুখভঙ্গী অর্থহীন, তুল্য অন্ধকার আলো,
লুপ্ত লজ্জাভয়ের ব্যঞ্জনা। যুদ্ধে উদ্ধারিয়া সীতা
পরক্ষণে প্রিয়হস্ত রচিতে বসিল তার চিতা;
সে পালার অবসানে নিঃশেষে হয়েছে নিরর্থক
সে দুঃসহ দুঃখদাহ— শুধু তারে কবির নাটক
কাব্যডোরে বাঁধিয়াছে, শুধু তারে ঘোষিতেছে গান,
শিল্পের কলায় শুধু রচে তাহা আনন্দের দান।

২

জনশূন্য ভাঙাঘাটে আজি বৃদ্ধ বটচ্ছায়াতলে
গোধূলির শেষ আলো আষাঢ়ে ধূসর নদীজলে
মগ্ন হল। ওপারের লোকালয় মরীচিকাসম
চক্ষে ভাসে। একা বসে দেখিতেছি মনে মনে, মম
দূর আপনার ছবি নাট্যের প্রথম অঙ্কভাগে
কালের লীলায়। সেদিনের সদ্য-জাগা চক্ষে জাগে
অস্পষ্ট কী প্রত্যাশার অরুণিম প্রথম উন্মেষ;
সম্মুখে সে চলেছিল, না জানিয়া শেষের উদ্দেশ,
নেপথ্যের প্রেরণায়। জানা না-জানার মধ্যসেতু
নিত্য পার হতেছিল কিছু তার না বুঝিয়া হেতু।
অকস্মাৎ পথমাঝে কে তারে ভেটিল একদিন,
দুই অজানার মাঝে দেশকাল হইল বিলীন
সীমাহীন নিমেষেই; পরিব্যাপ্ত হল জানাশোনা
জীবনের দিগন্ত পারায়ে। ছায়ায়-আলোয়-বোনা
আতপ্ত ফাল্গুনদিনে মর্মরিত চাঞ্চল্যের স্রোতে
কুঞ্জপথে মেলিল সে স্ফুরিত অঞ্চলতল হতে
কনকচাঁপার আভা। গন্ধে শিহরিয়া গেল হাওয়া
শিথিল কেশের স্পর্শে। দুজনে করিল আসাযাওয়া
অজানা অধীরতায়।

সহসা রাত্রে সে গেল চলি
যে রাত্রি হয় না কভু ভোর। অদৃষ্টের যে অঞ্জলি
এনেছিল সুধা, নিল ফিরে। সেই যুগ হল গত
চৈত্রশেষে অরণ্যের মাধবীর সুগন্ধের মতো।
তখন সেদিন ছিল সবচেয়ে সত্য এ ভুবনে,
সমস্ত বিশ্বের যন্ত্র বাঁধিত সে আপন বেদনে
আনন্দ ও বিষাদের সুরে। সেই সুখ দুঃখ তার
জোনাকির খেলা মাত্র, যারা সীমাহীন অন্ধকার
পূর্ণ করে চুমকির কাজে বিঁধে আলোকের সূচি;
সে রাত্রি অক্ষত থাকে, বিনা চিহ্নে আলো যায় ঘুচি।
সে ভাঙা যুগের 'পরে কবিতার অরণ্যলতায়
ফুটিছে ছন্দের ফুল, দোলে তারা গানের কথায়।
সেদিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজন্তাগুহাতে
অন্ধকার ভিত্তিপটে; ঐক্য তার বিশ্বশিল্প-সাথে।

[আষাঢ় ১৩৪২
চন্দননগর]

বিহ্বলতা

অপরিচিতের দেখা বিকশিত ফুলের উৎসবে
পল্লবের সমারোহে।
মনে পড়ে, সেই আর কবে
দেখেছিনু শুধু ক্ষণকাল।
খর সূর্যকরতাপে
নিষ্ঠুর বৈশাখবেলা ধরণীরে রুদ্র অভিশাপে
বন্দী করেছিল তৃষ্ণাজালে।
শুষ্ক তরু,
ম্লান বন,
অবসন্ন পিককণ্ঠ,
শীর্ণচ্ছায়া অরণ্য নির্জন।

সেই তীব্র আলোকেতে দেখিলাম দীপ্ত মূর্তি তার—
জ্বালাময় আঁখি,
বর্ণচ্ছটাহীন বেশ,
নির্বিকার
মুখচ্ছবি।
বিরলপল্লব স্তব্ধ বনবীথি-'পরে
নিঃশব্দ মধ্যাহ্নবেলা দূর হতে মুক্তকণ্ঠ স্বরে
করেছি বন্দনা।
জানি, সে না-শোনা সুর গেছে ভেসে
শূন্যতলে।
সেও ভালো, তবু সে তো তাহারি উদ্দেশে
একদা অর্পিয়াছিনু স্পষ্টবাণী, সত্য নমস্কার,
অসংকোচে পূজা-অর্ঘ্য
—সেই জানি গৌরব আমার।
আজ ক্ষুব্ধ ফাল্গুনের কলস্বরে মত্ততাহিল্লোলে
মদির আকাশ।
আজি মোর এ অশান্ত চিত্ত দোলে
উদ্‌ভ্রান্ত পবনবেগে।
আজ তারে যে বিহ্বল চোখে
হেরিলাম, সে যে হায় পুষ্পরেণু-আবিল আলোকে
মাধুর্যের ইন্দ্রজালে রাঙা।
পাই নাই শান্ত অবসর
চিনিবারে, চেনাবারে।
কোনো কথা বলা হল না যে,
মোহমুগ্ধ ব্যর্থতার সে বেদনা চিত্তে মোর বাজে।

ফাল্গুন ১৩৩৮ ?

শ্যামলা

হে শ্যামলা, চিত্তের গহনে আছ চুপ,
মুখে তব সুদূরের রূপ
পড়িয়াছে ধরা
সন্ধ্যার আকাশসম সকল-চঞ্চল চিন্তা-হরা।
আঁকা দেখি দৃষ্টিতে তোমার
সমুদ্রের পরপার,
গোধূলিপ্রান্তরপ্রান্তে ঘন কালো রেখাখানি ;
অধরে তোমার বীণাপাণি
রেখে দিয়ে বীণা তাঁর
নিশীথের রাগিণীতে দিতেছেন নিঃশব্দ ঝংকার।
অগীত সে সুর
মনে এনে দেয় কোন্ হিমাদ্রির শিখরে সুদূর
হিমঘন তপস্যায় স্তব্ধলীন
নির্ঝরের ধ্যান বাণীহীন।
জলভারনত মেঘে
তমালবনের 'পরে আছে লেগে
সকরুণ ছায়া সুগম্ভীর—
তোমার ললাট-'পরে সেই মায়া রহিয়াছে স্থির।

ক্লান্ত-অশ্রু রাধিকার বিরহের স্মৃতির গভীরে
স্বপ্নময়ী যে যমুনা বহে ধীরে
শান্তধারা
কলশব্দহারা
তাহারি বিষাদ কেন
অতল গাম্ভীর্য ল'য়ে তোমার মাঝারে হেরি যেন।

শ্রাবণে অপরাজিতা, চেয়ে দেখি তারে
আঁখি ডুবে যায় একেবারে—

ছোটো পত্রপুটে তার নীলিমা রয়েছে ভরপুর,
দিগন্তের শৈলতটে অরণ্যের সুর
বাজে তাহে, সেই দূর আকাশের বাণী
এনেছে আমার চিত্তে তোমার নির্বাক্ মুখখানি।

২৯ জুলাই ১৯৩২

পোড়োবাড়ি

সেদিন তোমার মোহ লেগে
আনন্দের বেদনায় চিত্ত ছিল জেগে ;
প্রতিদিন প্রভাতে পড়িত মনে,
তুমি আছ এ ভুবনে।
পুকুরে বাঁধানো ঘাটে স্নিগ্ধ অশথের মূলে
বসে আছ এলোচুলে,
আলোছায়া পড়েছে আঁচলে তব—
প্রতিদিন মোর কাছে এ যেন সংবাদ অভিনব।
তোমার শয়নঘরে ফুলদানি,
সকালে দিতাম আনি
নাগকেশরের পুষ্পভার
অলক্ষ্যে তোমার।
প্রতিদিন দেখা হত, তবু কোনো ছলে
চিঠি রেখে আসিতাম বালিশের তলে।
সেদিনের আকাশেতে তোমার নয়ন দুটি কালো
আলোরে করিত আরো আলো।
সেদিনের বাতাসেতে তোমার সুগন্ধ কেশপাশ
নন্দনের আনিত নিশ্বাস।

অনেক বৎসর গেল, দিন গণি নহে তার মাপ—
তারে জীর্ণ করিয়াছে ব্যর্থতার তীব্র পরিতাপ।

নির্মম ভাগ্যের হাতে লেখা
বঞ্চনায় কালো কালো রেখা
বিকৃত স্মৃতির পটে নিরর্থক করেছে ছবিরে।
আলোহীন গানহীন হৃদয়ের গহন গভীরে
সেদিনের কথাগুলি
দুর্লক্ষণ বাদুড়ের মতো আছে ঝুলি।

আজ যদি তুমি এস কোথা তব ঠাঁই,
সে তুমি তো নাই।
আজিকার দিন
তোমারে এড়ায়ে যাবে পরিচয়হীন।
তোমার সেকাল আজি ভাঙাচোরা যেন পোড়োবাড়ি
লক্ষ্মী যারে গেছে ছাড়ি;
ভূতে-পাওয়া ঘর
ভিত জুড়ে আছে যেথা দেহহীন ডর।
আগাছায় পথ রুদ্ধ, আঙিনায় মনসার ঝোপ,
তুলসীর মঞ্চখানি হয়ে গেছে লোপ।
বিনাশের গন্ধ ওঠে, দুর্গ্রহের শাপ,
দুঃস্বপ্নের নিঃশব্দ বিলাপ।

৩ অগস্ট ১৯৩২

মৌন

কেন চুপ করে আছি, কেন কথা নাই,
শুধাইছ তাই।
কথা দিয়ে ডেকে আনি যারে
দেবতারে,
বাহির দ্বারের কাছে এসে
ফিরে যায় হেসে।

মৌনের বিলপ্ত শক্তিপাশে
ধরা দিয়ে আপনি যে আসে
আসে পরিপূর্ণতায়
হৃদয়ের গভীর গুহায়।

অধীর আহ্বানে রবাহূত
প্রসাদের মূল্য হয় চ্যুত।
স্বর্গ হতে বর, সেও আনে অসম্মান
ভিক্ষার সমান।
ক্ষুব্ধ বাণী যবে শান্ত হয়ে আসে
দৈববাণী নামে সেই অবকাশে।
নীরব আমার পূজা তাই,
স্তবগান নাই;
আর্দ্র স্বরে ঊর্ধ্বপানে চেয়ে নাহি ডাকে,
স্তব্ধ হয়ে থাকে।

হিমাদ্রিশিখরে নিত্যনীরবতা তার
ব্যাপ্ত করি রহে চারি ধার;
নির্লিপ্ত সে সুদূরতা বাক্যহীন বিশাল আহ্বান
আকাশে আকাশে দেয় টান,
মেঘপুঞ্জ কোথা থেকে
অবারিত অভিষেকে
অজস্র সহস্রধারে
পুণ্য করে তারে।
না-কওয়ার না-চাওয়ার সেই সাধনায় হয়ে লীন
সার্থক শান্তিতে যাক দিন।

১৮।১।৩৪

ভুল

সহসা তুমি করেছ ভুল গানে,
বেধেছে লয় তানে,
স্খলিত পদে হয়েছে তাল ভাঙা—
শরমে তাই মলিন মুখ নত,
দাঁড়ালে থতমতো,
তাপিত দুটি কপোল হল রাঙা।
নয়নকোণ করিছে ছলোছলো
শুধালে তবু কথা কিছু না বল,
অধর থরো থরো,
আবেগভরে বুকের 'পরে মালাটি চেপে ধর।

অবমানিতা, জান না তুমি নিজে
মাধুরী এল কী যে
বেদনাভরা ত্রুটির মাঝখানে।
নিখুঁত শোভা নিরতিশয় তেজে
অপরাজেয় সে যে
পূর্ণ নিজে নিজেরই সম্মানে।
একটুখানি দোষের ফাঁক দিয়ে
হৃদয়ে আজি নিয়ে এসেছ, প্রিয়ে,
করুণ পরিচয়—
শরৎপ্রাতে আলোর সাথে ছায়ার পরিণয়।

তৃষিত হয়ে ওইটুকুরই লাগি
আছিল মন জাগি,
বুঝিতে তাহা পারি নি এতদিন।
গৌরবের গিরিশিখর-'পরে
ছিলে যে সমাদরে
তুষারসম শুভ্র সুকঠিন।

নামিলে নিয়ে অশ্রুজলধারা
ধূসর ম্লান আপন-মান-হারা
আমারো ক্ষমা চাহি—
তখনি জানি আমারি তুমি, নাহি গো দ্বিধা নাহি।

এখন আমি পেয়েছি অধিকার
তোমার বেদনার
অংশ নিতে আমার বেদনায়।
আজিকে সব ব্যাঘাত টুটে
জীবনে মোর উঠিল ফুটে
শরম তব পরম করুণায়।
অকুণ্ঠিত দিনের আলো
টেনেছে মুখে ঘোমটা কালো;
আমার সাধনাতে
এল তোমার প্রদোষবেলা সাঁঝের তারা হাতে।

৬ বৈশাখ ১৩৪১

ব্যর্থ মিলন

বুঝিলাম, এ মিলন ঝড়ের মিলন,
কাছে এনে দূরে দিল ঠেলি।
ক্ষুব্ধ মন
যতই ধরিতে চায়, বিরুদ্ধ আঘাতে
তোমারে হারায় হতাশ্বাস।
তব হাতে
দাক্ষিণ্য যে নাই, শুধু শিথিল পরশে
করিছে কৃপণ কৃপা। কর্তব্যের বশে
যে-দান করিলে তার মূল্য অপহরি
লুকায়ে রাখিলে কোথা,
আমি খুঁজে মরি

পাই নে নাগাল। শরতের মেঘ তুমি
ছায়া মাত্র দিয়ে ভেসে যাও

—মরুভূমি

শূন্য-পানে চেয়ে থাকে, পিপাসা তাহার
সমস্ত হৃদয় ব্যাপি করে হাহাকার।

ভয় করিয়ো না মোরে।

এ করুণাকণা

রেখো মনে— ভুল করে মনে করিয়ো না
দস্যু আমি, লোভেতে নিষ্ঠুর।

জেনো মোরে

প্রেমের তাপস।

সুকঠোর ব্রত ধ'রে

করিব সাধনা,

আশাহীন ক্ষোভহীন

বহ্নিতপ্ত ধ্যানাসনে রব রাত্রিদিন।
ছাড়িয়া দিলাম হাত।

যদি কভু হয়

তপস্যা সার্থক, তবে পাইব হৃদয়।
না-ও যদি ঘটে, তবে আশাচঞ্চলতা
দাহিয়া হইবে শান্ত। সেও সফলতা।

১৩৩৮?

অপরাধিনী

অপরাধ যদি ক'রে থাক
কেন ঢাক
মিথ্যা মোর কাছে।
শাসনের দণ্ড সে কি এই হাতে আছে

যে হাতে তোমার কণ্ঠে পরায়েছি বরণের হার।
শাস্তি এ আমার।
ভাগ্যেরে করেছি জয়
এ বিশ্বাসে মনে মনে ছিলাম নির্ভয়।
আলস্যে কি ভেবেছিনু তাই—
সাধনার আয়োজনে আর মোর প্রয়োজন নাই।

রুষ্ট ভাগ্য ভেঙে দিল অহংকার।
যা ঘটিল তাই আমি করিনু স্বীকার।
ক্ষমা করো মোরে।
আপনারে রেখেছিনু কারাগার ক'রে
তোমারে ঘিরিয়া,
পীড়িয়াছি ফিরিয়া ফিরিয়া
দিনে রাতে।
কখনো অজ্ঞাতে
যেখানে বেদনা তব সেখানে দিয়েছি মোর ভার।
বিষম দুঃসহ বোঝা এ ভালোবাসার
সেখানে দিয়েছি চেপে ভালোবাসা নেই যেখানেতে।
বসেছি আসন পেতে
যেখানে স্থানের টানাটানি।

হায় জানি,
কী ব্যথা কঠোর!
এ প্রেমের কারাগারে মোর
যন্ত্রণায় জাগি
সুরঙ্গ কেটেছ যদি পরিত্রাণ লাগি
দোষ দিব কারে।
শান্তি তো পেয়েছ তুমি এতদিন সেই রুদ্ধদ্বারে।
সে শান্তির হোক অবসান।
আজ হতে মোর শাস্তি শুরু হবে, বিধির বিধান।

[২ ফাল্গুন ১৩৩৮]

বিচ্ছেদ

তোমাদের দুজনের মাঝে আছে কল্পনার বাধা ;
হল না সহজ পথ বাঁধা
স্বপ্নের গহনে।
মনে মনে
ডাক দাও পরস্পরে সঙ্গহীন কত দিনে রাতে ;
তবু ঘটিল না কোন্ সামান্য ব্যাঘাতে
মুখোমুখি দেখা।
দুজনে রহিলে একা
কাছে কাছে থেকে ;
তুচ্ছ, তবু অলঙ্ঘ্য সে দোঁহারে রহিল যাহা ঢেকে।

বিচ্ছেদের অবকাশ হতে
বায়ুস্রোতে
ভেসে আসে মধুমঞ্জরীর গন্ধশ্বাস ;
চৈত্রের আকাশ
রৌদ্রে দেয় বৈরাগীর বিভাসের তান ;
আসে দোয়েলের গান ;
দিগন্তরে পথিকের বাঁশি যায় শোনা।
উভয়ের আনাগোনা
আভাসেতে দেখা যায় ক্ষণে ক্ষণে
চকিত নয়নে।
পদধ্বনি শোনা যায়
শুষ্কপত্রপরিকীর্ণ বনবীথিকায়।

তোমাদের ভাগ্য আছে চেয়ে অনুক্ষণ
কখন দোঁহার মাঝে একজন
উঠিবে সাহস ক'রে—
বলিবে, 'যে মায়াডোরে

বন্দী হয়ে দূরে ছিনু এতদিন
ছিন্ন হোক, সে তো সত্যহীন।
লও বক্ষে দুবাহু বাড়ায়ে ;
সম্মুখে যাহারে চাও পিছনেই আছে-সে দাঁড়ায়ে।'

১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০
দার্জিলিং

বিদ্রোহী

পর্বতের অন্ত প্রান্তে ঝর্ঝরিয়া ঝরে রাত্রিদিন
নির্ঝরিণী ;
এ মরুপ্রান্তের তৃষ্ণা হল শান্তিহীন
পলাতকা মাধুর্যের কলস্বরে।
শুধু ওই ধ্বনি
তৃষিত চিত্তের যেন বিদ্যুতে খচিত বজ্রমণি
বেদনায় দোলে বক্ষে।
কৌতুকচ্ছুরিত হাস্য তার
মর্মের শিরায় মোর তীব্রবেগে করিছে বিস্তার
জ্বালাময় নৃত্যস্রোত।
ওই ধ্বনি আমার স্বপন
চঞ্চলিতে চাহে তার বঞ্চনায়।
মূঢ়ের মতন
ভুলিব না তাহে কভু।
জানিব মানিব নিঃসংশয়
দুর্লভেরে মিলিবে না ;
করিব কঠোর বীর্যে জয়
ব্যর্থ দুরাশারে মোর।
চিরজন্ম দিব অভিশাপ
দয়ারিক্ত দুর্গমেরে।

আশাহারা বিচ্ছেদের তাপ ;
দুঃসহ দাহনে তার দীপ্ত করি হানিব বিদ্রোহ
অকিঞ্চন অদৃষ্টেরে।
পুষিব না ভিক্ষুকের মোহ।

৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২
চন্দননগর

আসন্ন রাতি

এল আহ্বান, ওরে তুই ত্বরা কর্।
শীতের সন্ধ্যা সাজায় বাসরঘর।
কালপুরুষের বিপুল মহাঙ্গন
বিছালো আলিম্পন,
অন্তরে তোর আসন্ন রাতি
জাগায় শঙ্খরব—
অস্তশৈলপাদমূলে তার
প্রসারিল অনুভব।

বিরহশয়ন বিছানো হেথায়,
কে যেন আসিল চোখে দেখা নাহি যায়।
অতীতদিনের বনের স্মরণ আনে
ম্রিয়মাণ মৃদু সৌরভটুকু প্রাণে।
গাঁথা হয়েছিল যে মাধবীহার
মধুপূর্ণিমারাতে
কণ্ঠ জড়ালো পরশবিহীন
নির্বাক্ বেদনাতে।

মিলনদিনের প্রদীপের মালা
পুলকিত রাতে যত হয়েছিল জ্বালা,
আজি আঁধারের অতল গহনে হারা
স্বপ্ন রচিছে তারা।

ফাল্গুনবনমর্মর-সনে
মিলিত যে কানাকানি
আজি হৃদয়ের স্পন্দনে কাঁপে
তাহার স্তব্ধ বাণী।

কী নামে ডাকিব, কোন্ কথা কব,
হে বধূ, ধেয়ানে আঁকিব কী ছবি তব।
চিরজীবনের পুঞ্জিত সুখদুখ
কেন আজি উৎসুক!
উৎসবহীন কৃষ্ণপক্ষে
আমার বক্ষোমাঝে
শুনিতেছে কে সে কার উদ্দেশে
সাহানায় বাঁশি বাজে।

আজ বুঝি তোর ঘরে, ওরে মন,
গত বসন্তরজনীর আগমন।
বিপরীত পথে উত্তর বায়ু বেয়ে
এল সে তোমারে চেয়ে।
অবগুণ্ঠিত নিরলংকার
তাহার মূর্তিখানি
হৃদয়ে ছোঁয়ালো শেষ পরশের
তুষারশীতল পাণি।

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪

গীতচ্ছবি

তুমি যবে গান কর অলৌকিক গীতমূর্তি তব
ছাড়ি তব অঙ্গসীমা আমার অন্তরে অভিনব
ধরে রূপ, যজ্ঞ হতে উঠে আসে যেন যাজ্ঞসেনী—
ললাটে সন্ধ্যার তারা, পিঠে জ্যোতির্বিজড়িত বেণী,

চোখে নন্দনের স্বপ্ন, অধরের কথাহীন ভাষা
মিলায় গগনে মৌন নীলিমায়, কী সুধাপিপাসা
অমরার মরীচিকা রচে তব তনুদেহ ঘিরে।
অনাদিবীণায় বাজে যে রাগিণী গভীরে গম্ভীরে
সৃষ্টিতে প্রস্ফুটি উঠে পুষ্পে পুষ্পে, তারায় তারায়,
উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গে, নির্ঝরের দুর্দম ধারায়,
জন্মমরণের দোলে ছন্দ দেয় হাসিক্রন্দনের,
সে অনাদি সুর নামে তব সুরে, দেহবন্ধনের
পাশ দেয় মুক্ত করি, বাধাহীন চৈতন্য এ মম
নিঃশব্দে প্রবেশ করে নিখিলের সে অন্তরতম
প্রাণের রহস্যলোকে— যেখানে বিদ্যুৎ-সূক্ষ্মছায়া
করিছে রূপের খেলা, পরিতেছে ক্ষণিকের কায়া,
আবার ত্যজিয়া দেহ ধরিতেছে মানসী আকৃতি—
সেই তো কবির কাব্য, সেই তো তোমার কণ্ঠে গীতি।

৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২
চন্দননগর

ছবি

একলা বসে, হেরো, তোমার ছবি
এঁকেছি আজ বসন্তী রঙ দিয়া—
খোঁপার ফুলে একটি মধুলোভী
মৌমাছি ওই গুঞ্জরে বন্দিয়া।
সমুখ-পানে বালুতটের তলে
শীর্ণ নদী শান্ত ধারায় চলে,
বেণুচ্ছায়া তোমার চেলাঞ্চলে
উঠিছে স্পন্দিয়া।

মগ্ন তোমার স্নিগ্ধ নয়ন দুটি
ছায়ায় ছন্ন অরণ্য-অঙ্গনে

প্রজাপতির দল যেখানে জুটি
রঙ ছড়ালো প্রফুল্ল রঙ্গনে।
তপ্ত হাওয়ায় শিথিলমঞ্জরি
গোলকচাঁপা একটি দুটি করি
পায়ের কাছে পড়ছে ঝরি ঝরি
তোমারে নন্দিয়া।
ঘাটের ধারে কম্পিত ঝাউশাখে
দোয়েল দোলে সংগীতে চঞ্চলি—
আকাশ ঢালে পাতার ফাঁকে ফাঁকে
তোমার কোলে সুবর্ণ-অঞ্জলি।
বনের পথে কে যায় চলি দূরে,
বাঁশির ব্যথা পিছন-ফেরা সুরে
তোমায় ঘিরে হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে
ফিরিছে ক্রন্দিয়া।

১৭ বৈশাখ ১৩৩৮

প্রণতি

প্রণাম আমি পাঠানু গানে
উদয়গিরিশিখর-পানে
অস্তমহাসাগরতট হতে—
নবজীবনযাত্রাকালে
সেখান হতে লেগেছে ভালে
আশিসখানি অরুণ-আলোস্রোতে।
প্রথম সেই প্রভাত-দিনে
পড়েছি বাঁধা ধরার ঋণে,
কিছু কি তার দিয়েছি শোধ করি?
চিররাতের তোরণে থেকে
বিদায়বাণী গেলেম রেখে
নানা রঙের বাষ্পলিপি ভরি।

বেসেছি ভালো এই ধরারে,
মুগ্ধ চোখে দেখেছি তারে
ফুলের দিনে দিয়েছি রচি গান ;
সে গানে মোর জড়ানো প্রীতি,
সে গানে মোর রহুক স্মৃতি,
আর যা আছে হউক অবসান।
রোদের বেলা ছায়ার বেলা
করেছি সুখদুখের খেলা,
সে খেলাঘর মিলাবে মায়াসম ;
অনেক তৃষা, অনেক ক্ষুধা,
তাহারি মাঝে পেয়েছি সুধা—
উদয়গিরি প্রণাম লহো মম।

বরষ আসে বরষশেষে,
প্রবাহে তারি যায় রে ভেসে
বাঁধিতে যারে চেয়েছি চিরতরে।
বারে বারেই ঋতুর ডালি
পূর্ণ হয়ে হয়েছে খালি
মমতাহীন সৃষ্টিলীলাভরে।
এ মোর দেহ-পেয়ালাখানা
উঠেছে ভরি কানায় কানা
রঙিন রসধারায় অনুপম।
একটুকুও দয়া না মানি
ফেলায়ে দেবে, জানি তা জানি,
উদয়গিরি তবুও নমোনম।

কখনো তার গিয়েছে ছিঁড়ে,
কখনো নানা সুরের ভিড়ে
রাগিণী মোর পড়েছে আধো চাপা।

ফাল্গুনের আমন্ত্রণে
জেগেছে কুঁড়ি গভীর বনে,
পড়েছে ঝরি চৈত্রবায়ে-কাঁপা।
অনেক দিনে অনেক দিয়ে
ভেঙেছে কত গড়িতে গিয়ে,
ভাঙন হল চরম প্রিয়তম ;
সাজাতে পূজা করি নি ত্রুটি,
ব্যর্থ হলে নিলেম ছুটি—
উদয়গিরি, প্রণাম লহো মম।

[৭-১০ এপ্রিল ১৯৩৪]

উদাসীন

তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে
তখনো আমের বনে গন্ধ ছিল।
জানি না কী লাগি ছিলে অন্যমনে,
তোমার দুয়ার কেন বন্ধ ছিল।
একদিন শাখা ভরি এল ফলগুচ্ছ,
ভরা অঞ্জলি মোর করি গেলে তুচ্ছ,
পূর্ণতা-পানে আঁখি অন্ধ ছিল।

বৈশাখে অকরুণ দারুণ ঝড়ে
সোনার বরন ফল খসিয়া পড়ে।
কহিনু, 'ধুলায় লোটে মোর যত অর্ঘ্য,
তব করতলে যেন পায় তার স্বর্গ।'
হায় রে, তখনো মনে দ্বন্দ্ব ছিল।

তোমার সন্ধ্যা ছিল প্রদীপহীনা,
আঁধারে দুয়ারে তব বাজানু বীণা।

তারার আলোক-সাথে মিলি মোর চিত্ত
ঝংকৃত তারে তারে করেছিল নৃত্য,
তোমার হৃদয় নিষ্পন্দ ছিল।

তন্দ্রাবিহীন নীড়ে ব্যাকুল পাখি
হারায়ে কাহারে বৃথা মরিল ডাকি।
প্রহর অতীত হল, কেটে গেল লগ্ন,
একা ঘরে তুমি ঔদাস্যে নিমগ্ন,
তখনো দিগঞ্চলে চন্দ্র ছিল।

কে বোঝে কাহার মন! অবোধ হিয়া
দিতে চেয়েছিল বাণী নিঃশেষিয়া।
আশা ছিল, কিছু বুঝি আছে অতিরিক্ত
অতীতের স্মৃতিখানি অশ্রুতে সিক্ত—
বুঝিবা নূপুরে কিছু ছন্দ ছিল।

উষার চরণতলে মলিন শশী
রজনীর হার হতে পড়িল খসি।
বীণার বিলাপ কিছু দিয়েছে কি সঙ্গ,
নিদ্রার তটতলে তুলেছে তরঙ্গ,
স্বপ্নেও কিছু কি আনন্দ ছিল।

৯ শ্রাবণ ১৩৪১
শান্তিনিকেতন

দানমহিমা

নির্ঝরিণী অকারণ অবারণ সুখে
নীরসেরে ঠেলা দিয়ে চলে তৃষিতের অভিমুখে—
নিত্য অফুরান
আপনারে করে দান।

সরোবর প্রশান্ত নিশ্চল—
বাহিরেতে নিস্তরঙ্গ, অন্তরেতে নিস্তব্ধ নিস্তল।
চির-অতিথির মতো মহাবট আছে তীরে;
ভূরিপায়ী মূল তার অদৃশ্য গভীরে
অনিঃশেষ রস করে পান,
অজস্র পল্লবে তার করে স্তবগান।

তোমারে তেমনি দেখি নির্বিকল
অপ্রমত্ত পূর্ণতায়, হে প্রেয়সী, আছ অচঞ্চল।
তুমি কর বরদান দেবীসম ধীর আবির্ভাবে
নিরাসক্ত দাক্ষিণ্যের গম্ভীর প্রভাবে।
তোমার সামীপ্য সেই
নিত্য চারি দিকে আকাশেই
প্রকাশিত আত্মমহিমায়
প্রশান্ত প্রভায়।
তুমি আছ কাছে,
সে আত্মবিস্মৃত কৃপা— চিত্ত তাহে পরিতৃপ্ত আছে।
ঐশ্বর্যরহস্য যাহা তোমাতে বিরাজে
একই কালে ধন সেই, দান সেই— ভেদ নেই মাঝে।

৪ অগস্ট ১৯৩২

ঈষৎ দয়া

চক্ষে তোমার কিছু বা করুণা ভাসে,
ওষ্ঠ তোমার কিছু কৌতুকে হাসে,
মৌনে তোমার কিছু লাগে মৃদু সুর।
আলো-আঁধারের বন্ধনে আমি বাঁধা,
আশানিরাশায় হৃদয়ে নিত্য ধাঁধা,
সঙ্গ যা পাই তারি মাঝে রহে দূর।

নির্মম হতে কুণ্ঠিত হও মনে ;
অনুকম্পার কিঞ্চিৎ কম্পনে
ক্ষণিকের তরে ছলকে কণিক সুধা।
ভাণ্ডার হতে কিছু এনে দাও খুঁজি,
অন্তরে তাহা ফিরাইয়া লও বুঝি,
বাহিরের ভোজে হৃদয়ে গুমরে ক্ষুধা।

ওগো মল্লিকা, তব ফাল্গুনরাতি
অজস্র দানে আপনি উঠে যে মাতি,
সে দাক্ষিণ্য দক্ষিণবায়ু-তরে।
তার সম্পদ সারা অরণ্য ভরি—
গন্ধের ভারে মন্থর উত্তরী
কুঞ্জে কুঞ্জে লুণ্ঠিত ধূলি-'পরে।

উত্তরবায়ু আমি ভিক্ষুকসম
হিমনিশ্বাসে জানাই মিনতি মম
শুষ্ক শাখার বীথিকারে চঞ্চলি।
অকিঞ্চনের রোদনে ধেয়ান টুটে,
কৃপণ দয়ায় ক্বচিৎ একটি ফুটে
অবগুণ্ঠিত অকাল পুষ্পকলি।

যত মনে ভাবি, রাখি তারে সঞ্চিয়া,
ছিঁড়িয়া কাড়িয়া লয় মোরে বঞ্চিয়া
প্রলয়প্রবাহে ঝ'রে-পড়া যত পাতা।
বিস্ময় লাগে আশাতীত সেই দানে,
ক্ষীণ সৌরভে ক্ষণগৌরব আনে—
বরণমালা হয় না তাহাতে গাঁথা।

১০।১।৩৪

ক্ষণিক

চৈত্রের রাতে যে মাধবীমঞ্জরী
ঝরে গেল, তারে কেন লও সাজি ভরি।
সে শুধিছে তার ধুলার চরম দেনা,
আজ বাদে কাল যাবে না তো তারে চেনা।
মরুপথে যেতে পিপাসার সম্বল
গাগরি হইতে চলকিয়া পড়ে জল,
সে জলে বালুতে ফল কি ফলাতে পার ?
সে জলে কি তাপ মিটিবে কখনো কারো ?
যাহা দেওয়া নহে, যাহা শুধু অপচয়,
তারে নিতে গেলে নেওয়া অনর্থ হয়।
ক্ষতির ধনেরে ক্ষয় হতে দেওয়া ভালো,
কুডাতে কুড়াতে শুকায়ে সে হয় কালো।
হায় গো ভাগ্য, ক্ষণিক করুণাভরে
যে হাসি যে ভাষা ছড়ায়েছ অনাদরে,
বক্ষে তাহারে সঞ্চয় করে রাখি —
ধুলা ছাড়া তার কিছুই রয় না বাকি।
নিমেষে নিমেষে ফুরায় যাহার দিন
চিরকাল কেন বহিব তাহার ঋণ ?
যাহা ভুলিবার তাহা নহে তুলিবার,
স্বপ্নের ফুলে কে গাঁথে গলার হার !
প্রতি পলকের নানা দেনাপাওনায়
চলতি মেঘের রঙ বুলাইয়া যায়
জীবনের স্রোতে ; চলতরঙ্গতলে
ছায়ার লেখন আঁকিয়া মুছিয়া চলে
শিল্পের মায়া— নির্মম তার তুলি
আপনার ধন আপনি সে যায় ভুলি :
বিস্মৃতিপটে চিরবিচিত্র ছবি
লিখিয়া চলেছে ছায়া-আলোকের কবি।

হাসিকান্নার নিত্য ভাসান-খেলা
বহিয়া চলেছে বিধাতার অবহেলা।
নহে সে কৃপণ, রাখিতে যতন নাই,
খেলাপথে তার বিঘ্ন জমে না তাই।
মানো সেই লীলা, যাহা যায় যাহা আসে
পথ ছাড়ো তারে অকাতরে অনায়াসে।
আছে তবু নাই, তাই নাহি তার ভার ;
ছেড়ে যেতে হবে, তাই তো মূল্য তার।
স্বর্গ হইতে যে সুধা নিত্য ঝরে
সে শুধু পথের, নহে সে ঘরের তরে।
তুমি ভরি লবে ক্ষণিকের অঞ্জলি,
স্রোতের প্রবাহ চিরদিন যাবে চলি।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯:৪

রূপকার

ওরা কি কিছু বোঝে
যাহারা আনাগোনার পথে
ফেরে কত কী খোঁজে ?
হেলায় ওরা দেখিয়া যায় এসে বাহির দ্বারে ;
জীবনপ্রতিমারে
জীবন দিয়ে গড়িছে গুণী, স্বপন দিয়ে নহে।
ওরা তো কথা কহে,
সে-সব কথা মূল্যবান জানি,
তবু সে নহে বাণী।

রাতের পরে কেটেছে দুখরাত,
দিনের পরে দিন,
দারুণ তাপে করেছে তনু ক্ষীণ।

সৃষ্টিকারী বজ্রপাণি যে বিধি নির্মম,
বহ্নিতূলিসম
কল্পনা সে দখিন হাতে যার,
সব-খোয়ানো দীক্ষা তারি নিঠুর সাধনার
নিয়েছে ও যে প্রাণে ;
নিজেরে ও কি বাঁচাতে কভু জানে ?

হায় রে রূপকার,
নাহয় কারো করো নি উপকার—
আপন দায়ে করেছ তুমি নিজেরে অবসান,
সে লাগি কভু চেয়ো না প্রতিদান।
পাঁজরভাঙা কঠিন বেদনার
অংশ নেবে শকতি হেন, বাসনা হেন কার !
বিধাতা যবে এসেছে দ্বারে গিয়েছে কর হানি,
জাগে নি তবু, শোনে নি ডাক যারা,
সে প্রেম তারা কেমনে দিবে আনি
যে প্রেম সবহারা—
করুণ চোখে যে প্রেম দেখে ভুল,
সকল ত্রুটি জানে,
তবু যে অনুকূল,
শ্রদ্ধা যার তবু না হার মানে।
কখনো যারা দেয় নি হাতে হাত,
মর্মমাঝে করে নি আঁখিপাত,
প্রবল প্রেরণায়
দিল না আপনায়,
তাহারা কহে কথা,
ছড়ায় পথে বাধা ও বিফলতা,
করে না ক্ষমা কভু—
তুমি তাদের ক্ষমা করিয়ো তবু।

হায় গো রূপকার,
ভরিয়া দিয়ো জীবন-উপহার।
চুকিয়ে দিয়ো তোমার দেয়,
রিক্ত হাতে চলিয়া যেয়ো,
কোয়ো না দাবি ফলের অধিকার।
জানিয়ো মনে চিরজীবন সহায়হীন কাজে
একটি সাথি আছেন হিয়ামাঝে;
তাপস তিনি, তিনিও সদা একা,
তাঁহার কাজ ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে দেখা।

১০ এপ্রিল ১৯৩৪

মেঘমালা

আসে অবগুণ্ঠিতা প্রভাতের অরুণ দুকূলে
শৈলতটমূলে,
আত্মদান অর্ঘ্য আনে পায়।
তপস্বীর ধ্যান ভেঙে যায়,
গিরিরাজ কঠোরতা যায় ভুলি,
চরণের প্রান্ত হতে বক্ষে লয় তুলি
সজল তরুণ মেঘমালা।
কল্যাণে ভরিয়া উঠে মিলনের পালা।
অচলে চঞ্চলে লীলা,
সুকঠিন শিলা
মত্ত হয় রসে।
উদার দাক্ষিণ্য তার বিগলিত নির্ঝরে বরষে,
গায় কলোচ্ছল গান।
সে দাক্ষিণ্য গোপনের দান
এ মেঘমালারই।

এ বর্ষণ তারি
পর্বতের বাণী হয়ে উঠে জেগে—
নৃত্যবন্যাবেগে
বাধাবিঘ্ন চূর্ণ ক'রে
তরঙ্গের নৃত্যসাথে যুক্ত হয় অনন্ত সাগরে।
নির্মমের তপস্যা টুটিয়া
চলিল ছুটিয়া
দেশে দেশে প্রাণের প্রবাহ,
জয়ের উৎসাহ—
শ্যামলের মঙ্গল-উৎসবে
আকাশে বাজিল বীণা অনাহত রবে।
লঘুসুকুমার স্পর্শ ধীরে ধীরে
রুদ্রসন্ন্যাসীর স্তব্ধ নিরুদ্ধ শক্তিরে
দিল ছাড়া; সৌন্দর্যের বীর্যবলে
স্বর্গেরে করিয়া জয় মুক্ত করি দিল ধরাতলে।

৫ অগস্ট ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

প্রাণের ডাক

সুদূর আকাশে ওড়ে চিল,
উড়ে ফেরে কাক,
বারে বারে ভোরের কোকিল
ঘন দেয় ডাক।
জলাশয় কোন্ গ্রামপারে,
বক উড়ে যায় তারি ধারে,
ডাকাডাকি করে শালিখেরা।
প্রয়োজন থাক্ নাই থাক্
যে যাহারে খুশি দেয় ডাক,
যেথাসেথা করে চলাফেরা।

উছল প্রাণের চঞ্চলতা
আপনারে নিয়ে।
অস্তিত্বের আনন্দ ও ব্যথা
উঠিছে ফেনিয়ে।
জোয়ার লেগেছে জাগরণে—
কলোল্লাস তাই অকারণে,
মুখরতা তাই দিকে দিকে।
ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায়
কী মদিরা গোপনে মাতায়,
অধীরা করেছে ধরণীকে।

নিভৃতে পৃথক কোরো নাকো
তুমি আপনারে।
ভাবনার বেড়া বেঁধে রাখ
কেন চারি ধারে।
প্রাণের উল্লাস অহেতুক
রক্তে তব হোক-না উৎসুক,
খুলে রাখো অনিমেষ চোখ ;
ফেলো জাল চারি দিক ঘিরে,
যাহা পাও টেনে লও তীরে
ঝিনুক শামুক যাই হোক।

হয়তো বা কোনো কাজ নাই,
ওঠো তবু ওঠো ;
বৃথা হোক তবুও বৃথাই
পথ-পানে ছোটো।
মাটির হৃদয়খানি ব্যেপে
প্রাণের কাঁপন ওঠে কেঁপে,
কেবল পরশ তার লহো।

আজি এই চৈত্রের প্রভাতে
আছ তুমি সকলের সাথে,
এ কথাটি মনে প্রাণে কহো।

৭ এপ্রিল ১৯৩৪
জোড়াসাঁকো

দেবদারু

দেবদারু, তুমি মহাবাণী
দিয়েছ মৌনের বক্ষে প্রাণমন্ত্র আনি—
যে প্রাণ নিস্তব্ধ ছিল মরুদুর্গতলে
প্রস্তরশৃঙ্খলে
কোটি কোটি যুগযুগান্তরে।
যে প্রথম যুগে তুমি দেখা দিলে নির্জন প্রান্তরে,
রুদ্ধ অগ্নিতেজের উচ্ছ্বাস
উদ্‌ঘাটন করি দিল ভবিষ্যের ইতিহাস—
জীবের কঠিন দ্বন্দ্ব অন্তহীন,
দুঃখে সুখে যুদ্ধ রাত্রিদিন,
জেলে ক্ষোভহুতাশন
অন্তরবিবরে যাহা সর্পসম করে আন্দোলন
শিখার রসনা
অশান্ত বাসনা।
স্নিগ্ধ স্তব্ধ রূপে
শ্যামল শান্তিতে তুমি চুপে চুপে
ধরণীর রঙ্গভূমে রচি দিলে কী ভূমিকা—
তারি মাঝে প্রাণীর হৃদয়রক্তে লিখা
মহানাট্য জীবনমৃত্যুর,
কঠিন নিষ্ঠুর
দুর্গম পথের দুঃসাহস।

যে পতাকা ঊর্ধ্ব-পানে তুলেছিলে নিরলস,
বলো কে জানিত, তাহা নিরন্তর যুদ্ধের পতাকা,
সৌম্যকান্তি-দিয়ে-ঢাকা!
কে জানিত, আজ আমি এ-জন্মের জীবন মন্থিয়া
যে বাণী উদ্ধার করি চলেছি গ্রন্থিয়া
দিনে দিনে আমার আয়ুতে
সে যুগের বসন্তবায়ুতে
প্রথম নীরব মন্ত্র তারি
ভাষাহারা মর্মরেতে দিয়েছ বিস্তারি
তুমি, বনস্পতি,
মোর জ্যোতিবন্দনায় জন্মপূর্ব প্রথম প্রণতি!

২৬ চৈত্র ১৩৩৯

কবি

এতদিনে বুঝিলাম, এ হৃদয় মরু না,
ঋতুপতি তার প্রতি আজো করে করুণা।
মাঘ মাসে শুরু হল অনুকূল করদান,
অন্তরে কোন্ মায়ামন্তরে বরদান।
ফাল্গুনে কুসুমিতা কী মাধুরী তরুণা,
পলাশবীথিকা কার অনুরাগে অরুণা।

নীরবে করবী যবে আশা দিল হতাশে
ভুলেও তোলে নি মোর বয়সের কথা সে।
ওই দেখো অশোকের শ্যামঘন আঙিনায়
কৃপণতা কিছু নাই কুসুমের রাঙিমায়।
সৌরভগরবিনী তারামণি লতা সে
আমার ললাট-'পরে কেন অবনতা সে।

চম্পকতরু মোরে প্রিয়সখা জানে যে,
গন্ধের ইঙ্গিতে কাছে তাই টানে যে।
মধুকরবন্দিত নন্দিত সহকার
মুকুলিত নতশাখে মুখে চাহে কহো কার।
ছায়াতলে মোর সাথে কথা কানে কানে যে,
দোয়েল মিলায় তান সে আমারি গানে যে।

পিকরবে সাড়া যবে দেয় পিকবনিতা
কবির ভাষায় সে যে চায় তারি ভণিতা।
বোবা দক্ষিণ-হাওয়া ফেরে হেথাসেথা হায়,
আমি না রহিলে, বলো, কথা দেবে কে তাহায়
পুষ্পচয়িনী বধূ কিংকিণীক্বণিতা,
অকথিতা বাণী তার কার সুরে ধ্বনিতা।

৮ কার্তিক ১৩৩৮
[দার্জিলিং]

ছন্দোমাধুরী

পাষাণে-বাঁধা কঠোর পথ
চলেছে তাহে কালের রথ,
ঘুরিছে তার মমতাহীন চাকা
বিরোধ উঠে ঘর্ঘরিয়া,
বাতাস উঠে জর্জরিয়া
তৃষ্ণাভরা তপ্তবালু-ঢাকা।
নিঠুর লোভ জগৎ ব্যেপে
দুর্বলেরে মারিছে চেপে,
মথিয়া তুলে হিংসাহলাহল।
অর্থহীন কিসের তরে
এ কাড়াকাড়ি ধুলার 'পরে
লজ্জাহীন বেসুর কোলাহল!

হতাশ হয়ে যেদিকে চাহি
কোথাও কোনো উপায় নাহি,
মানুষরূপে দাঁড়ায় বিভীষিকা।
করুণাহীন দারুণ ঝড়ে
দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে
অন্যায়ের প্রলয়ানলশিখা।

সহসা দেখি, সুন্দর হে,
কে দূতী তব বারতা বহে
ব্যাঘাত-মাঝে অকালে অস্থানে।
ছুটিয়া আসে গহন হতে
আত্মহারা উছল স্রোতে
রসের ধারা মরুভূমির পানে।
ছন্দভাঙা হাটের মাঝে
তরল তালে নূপুর বাজে,
বাতাসে যেন আকাশবাণী ফুটে।
কর্কশেরে নৃত্য হানি
ছন্দোময়ী মূর্তিখানি
ঘূর্ণিবেগে আবর্তিয়া উঠে।
ভরিয়া ঘট অমৃত আনে,
সে কথা সে কি আপনি জানে—
এনেছে বহি সীমাহীনের ভাষা।
প্রবল এই মিথ্যারাশি,
তারেও ঠেলি উঠেছে হাসি
অবলারূপে চিরকালের আশা।

১১ চৈত্র ১৩৩৮

বিরোধ

এ সংসারে আছে বহু অপরাধ,
হেন অপবাদ
যখন ঘোষণা কর উচ্চ হতে উষ্ণ উচ্চারণে,
ভাবি মনে মনে,
ক্রোধের উত্তাপ তার
তোমার আপন অহংকার।
মন্দ ও ভালোর দ্বন্দ্ব, কে না জানে চিরকাল আছে
সৃষ্টির মর্মের কাছে।
না যদি সে রহে বিশ্ব ঘেরি
বিরুদ্ধ নির্ঘাতবেগে বাজে না শ্রেষ্ঠের জয়ভেরী।

বিধাতার 'পরে মিথ্যা আনিয়ো না অভিযোগ
মৃত্যুদুঃখ কর যবে ভোগ;
মনে জেনো, মৃত্যুর মূল্যেই করি ক্রয়
এ জীবনে দুর্মূল্য যা, অমর্ত যা, যা-কিছু অক্ষয়।
ভাঙনের আক্রমণ
সৃষ্টিকর্তা মানুষেরে আহ্বান করিছে অনুক্ষণ।
দুর্গমের বক্ষে থাকে দয়াহীন শ্রেয়,
রুদ্রতীর্থযাত্রীর পাথেয়।

বহুভাগ্য সেই
জন্মিয়াছি এমন বিশ্বেই
নির্দোষ যা নয়।
দুঃখ লজ্জা ভয়
ছিন্ন সূত্রে জটিল গ্রন্থিতে
রচনার সামঞ্জস্য পদে পদে রয়েছে খণ্ডিতে।

এই ত্রুটি দেখেছি যখন
শুনি নি কি সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী গভীর ক্রন্দন
যুগে যুগে উচ্ছ্বসিতে থাকে ;
দেখি নি কি আর্তচিত্ত উদ্‌বোধিয়া রাখে
মানুষের ইতিবৃত্ত বেদনার নিত্য আন্দোলনে ।

উৎপীড়িত সেই জাগরণে
তন্দ্রাহীন যে-মহিমা যাত্রা করে রাত্রির আঁধারে
নমস্কার জানাই তাহারে ।
নানা নামে আসিছে সে নানা অস্ত্র হাতে
কণ্টকিত অসম্মান অবাধে দলিয়া পদপাতে—
মরণেরে হানি—
প্রলয়ের পান্থ সেই, রক্তে মোর তাহারে আহ্বানি ।

শ্রাবণ ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

রাতের দান

পথের শেষে নিবিয়া আসে আলো,
গানের বেলা আজ ফুরালো
কী নিয়ে তবে কাটিবে তব সন্ধ্যা ।

রাত্রি নহে বন্ধ্যা,
অন্ধকারে না-দেখা ফুল ফুটায়ে তোলে সে যে—
দিনের অতি নিঠুর খর তেজে
যে-ফুল ফুটিল না,
যাহার মধুকণা
বনভূমির প্রত্যাশাতে গোপনে ছিল বলে
গিয়েছে কবে আকাশপথে চলে
তোমার উপবনের মৌমাছি
কৃপণ বনবীথিকাতলে বৃথা করুণা যাচি ।

আঁধারে-ফোটা সে-ফুল নহে ঘরেতে আনিবার,
সে-ফুলদলে গাঁথিবে না তো হার ;
সে শুধু বুকে আনে
গন্ধে ঢাকা নিভৃত অনুমানে
দিনের ঘন জনতামাঝে হারানো আঁখিখানি,
মৌনে-ডোবা বাণী ;
সে শুধু আনে পাই নি যারে তাহারি পরিচিতি,
ঘটে নি যাহা ব্যাকুল তারি স্মৃতি।

স্বপনে-ঘেরা সুদূর তারা নিশার ডালি-ভরা
দিয়েছে দেখা, দেয় নি তবু ধরা ;
রাতের ফুল দূরের ধ্যানে তেমনি কথা কবে,
অনধিগত সার্থকতা বুঝাবে অনুভবে,
না-জানা সেই না-ছোঁওয়া সেই পথের শেষ দান
বিদায়বেলা ভরিবে তব প্রাণ।

১৯ আষাঢ় ১৩৪১

নব পরিচয়

জন্ম মোর বহি যবে
খেয়ার তরী এল ভবে
যে-আমি এল সে-তরীখানি বেয়ে,
ভাবিয়াছিনু বারে বারে
প্রথম হতে জানি তারে,
পরিচিত সে পুরানো সবচেয়ে।

হঠাৎ যবে হেনকালে
আবেশকুহেলিকাজালে
অরুণরেখা ছিদ্র দেয় আনি

আমার নব পরিচয়
চমকি উঠে মনোময়—
নূতন সে যে, নূতন তারে জানি।

বসন্তের ভরাস্রোতে
এসেছিল সে কোথা হতে
বহিয়া চিরযৌবনেরি ডালি।
অনন্তের হোমানলে
যে-যজ্ঞের শিখা জ্বলে,
সে-শিখা হতে এনেছে দীপ জ্বালি।

মিলিয়া যায় তারি সাথে
আশ্বিনেরি নবপ্রাতে
শিউলিবনে আলোটি যাহা পড়ে,
শব্দহীন কলরোলে
সে-নাচ তারি বুকে দোলে
যে-নাচ লাগে বৈশাখের ঝড়ে।

এ-সংসারে সব সীমা
ছাড়ায়ে গেছে যে-মহিমা
ব্যাপিয়া আছে অতীতে অনাগতে,
মরণ করি অভিভব
আছেন চির যে-মানব
নিজেরে দেখি সে-পথিকের পথে।

সংসারের ঢেউখেলা
সহজে করি অবহেলা
রাজহংস চলেছে যেন ভেসে—
সিক্ত নাহি করে তারে,
মুক্ত রাখে পাখাটারে,
ঊর্ধ্বশিরে পড়িছে আলো এসে।

আনন্দিত মন আজি
কী সংগীতে উঠে বাজি,
বিশ্ববীণা পেয়েছি যেন বুকে।
সকল লাভ, সব ক্ষতি,
তুচ্ছ আজি হল অতি
দুঃখ সুখ ভুলে যাওয়ার সুখে।

২৯ এপ্রিল ১৯৩৪
শান্তিনিকেতন

মরণমাতা

মরণমাতা, এই যে কচি প্রাণ,
বুকের এ যে দুলাল তব, তোমারি এ যে দান।
ধুলায় যবে নয়ন আঁধা,
জড়ের স্তূপে বিপুল বাধা,
তখন দেখি তোমারি কোলে নবীন শোভমান।

নবদিনের জাগরণের ধন,
গোপনে তারে লালন করে তিমির-আবরণ।
পরদাঢাকা তোমার রথে
বহিয়া আন প্রকাশপথে
নূতন আশা, নূতন ভাষা, নূতন আয়োজন।

চলে যে যায় চাহে না আর পিছু,
তোমারি হাতে সঁপিয়া যায় যা ছিল তার কিছু।
তাহাই লয়ে মন্ত্র পড়ি
নূতন যুগ তোল যে গড়ি—
নূতন ভালোমন্দ কত, নূতন উঁচুনিচু।

রোধিয়া পথ আমি না রব থামি;
প্রাণের স্রোত অবাধে চলে তোমারি অনুগামী।

নিখিলধারা সে স্রোত বাহি
ভাঙিয়া সীমা চলিতে চাহি,
অচলরূপে রব না বাঁধা অবিচলিত আমি।

সহজে আমি মানিব অবসান,
ভাবী শিশুর জনমমাঝে নিজেরে দিব দান।
আজি রাতের যে-ফুলগুলি
জীবনে মম উঠিল দুলি
ঝরুক তারা কালি প্রাতের ফুলেরে দিতে প্রাণ।

৪ মাঘ ১৩৩৮

মাতা

কুয়াশার জাল
আবরি রেখেছে প্রাতঃকাল—
সেইমতো ছিনু আমি কতদিন
আত্মপরিচয়হীন।
অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো করেছিনু অনুভব
কুমারীচাঞ্চল্যতলে আছিল যে সঞ্চিত গৌরব,
যে নিরুদ্ধ আলোকের মুক্তির আভাস,
অনাগত দেবতার আসন্ন আশ্বাস,
পুষ্পকোরকের বক্ষে অগোচর ফলের মতন।
তুই কোলে এলি যবে অমূল্য রতন,
অপূর্ব প্রভাতরবি,
আশার অতীত যেন প্রত্যাশার ছবি—
লভিলাম আপনার পূর্ণতারে
কাঙাল সংসারে।

প্রাণের রহস্য সুগভীর
অন্তরগুহায় ছিল স্থির,

সে আজ বাহির হল দেহ লয়ে উন্মুক্ত আলোতে
অন্ধকার হতে ;
সুদীর্ঘকালের পথে
চলিল সুদূর ভবিষ্যতে।
যে আনন্দ আজি মোর শিরায় শিরায় বহে
গৃহের কোণের তাহা নহে।
আমার হৃদয় আজি পান্থশালা,
প্রাঙ্গণে হয়েছে দীপ জ্বালা।
হেথা কারে ডেকে আনিলাম
অনাদিকালের পান্থ কিছুকাল করিবে বিশ্রাম।
এ বিশ্বের যাত্রী যারা চলে অসীমের পানে
আকাশে আকাশে নৃত্যগানে—
আমার শিশুর মুখে কলকোলাহলে
সে-যাত্রীর গান আমি শুনিব এ বক্ষতলে।
অতিশয় নিকটের, দূরের তবু এ—
আপন অন্তরে এল, আপনার নহে তো কভু এ।
বন্ধনে দিয়েছে ধরা শুধু ছিন্ন করিতে বন্ধন ;
আনন্দের ছন্দ টুটে উচ্ছ্বসিছে এ মোর ক্রন্দন।
জননীর
এ বেদনা, বিশ্বধরণীর
সে যে আপনার ধন—
না পারে রাখিতে নিজে, নিখিলেরে করে নিবেদন।

৮ অগস্ট ১৯৩২
বরানগর

কাঠবিড়ালি

কাঠবিড়ালির ছানাদুটি
আঁচলতলায় ঢাকা,
পায় সে কোমল করুণ হাতে
পরশ সুধামাখা।

এই দেখাটি দেখে এলেম
ক্ষণকালের মাঝে,
সেই থেকে আজ আমার মনে
সুরের মতো বাজে।
চাঁপাগাছের আড়াল থেকে
একলা সাঁঝের তারা
একটুখানি ক্ষীণ মাধুরী
জাগায় যেমনধারা,
তরল কলধ্বনি যেমন
বাজে জলের পাকে
গ্রামের ধারে বিজন ঘাটে
ছোটো নদীর বাঁকে,
লেবুর ডালে খুশি যেমন
প্রথম জেগে ওঠে
একটু যখন গন্ধ নিয়ে
একটি কুঁড়ি ফোটে,
দুপুর বেলায় পাখি যেমন—
দেখতে না পাই যাকে—
ঘন ছায়ায় সমস্ত দিন
মৃদুল সুরে ডাকে,
তেমনিতরো ঐ ছবিটির
মধুরসের কণা
ক্ষণকালের তরে আমায়
করেছে আনমনা।
দুঃখসুখের বোঝা নিয়ে
চলি আপন মনে,
তখন জীবন-পথের ধারে
গোপন কোণে কোণে
হঠাৎ দেখি চিরাভ্যাসের
অন্তরালের কাছে

লক্ষ্মীদেবীর মালার থেকে
ছিন্ন পড়ে আছে
ধূলির সঙ্গে মিলিয়ে গিয়ে
টুকরো রতন কত—
আজকে আমার এই দেখাটি
দেখি তারির মতো।

২২ আষাঢ় ১৩৪১
শান্তিনিকেতন

সাঁওতাল মেয়ে

যায় আসে সাঁওতাল মেয়ে
শিমুলগাছের তলে কাঁকরবিছানো পথ বেয়ে।
মোটা শাড়ি আঁট করে ঘিরে আছে তনু কালো দেহ।
বিধাতার ভোলা-মন কারিগর কেহ
কোন্ কালো পাখিটিরে গড়িতে গড়িতে
শ্রাবণের মেঘে ও তড়িতে
উপাদান খুঁজি
ওই নারী রচিয়াছে বুঝি।
ওর দুটি পাখা
ভিতরে অদৃশ্য আছে ঢাকা,
লঘু পায়ে মিলে গেছে চলা আর ওড়া।
নিটোল দু হাতে তার সাদারাঙা কয় জোড়া
গালা-ঢালা চুড়ি,
মাথায় মাটিতে-ভরা ঝুড়ি,
যাওয়া-আসা করে বারবার।
আঁচলের প্রান্ত তার
লাল রেখা দুলাইয়া
পলাশের স্পর্শমায়া আকাশেতে দেয় বুলাইয়া।

পউষের পালা হল শেষ,
উত্তর বাতাসে লাগে দক্ষিণের ক্বচিৎ আবেশ।
হিমঝুরি শাখা-'পরে
চিকন চঞ্চল পাতা ঝলমল করে
শীতের রোদ্দুরে।
পাণ্ডুনীল আকাশেতে চিল উড়ে যায় বহুদূরে।
আমলকীতলা ছেয়ে খসে পড়ে ফল,
জোটে সেথা ছেলেদের দল।
আঁকাবাঁকা বনপথে আলোছায়া-গাঁথা,
অকস্মাৎ ঘুরে ঘুরে ওড়ে ঝরা পাতা
সচকিত হাওয়ার খেয়ালে।
ঝোপের আড়ালে
গলাফোলা গিরগিটি স্তব্ধ আছে ঘাসে।
ঝুড়ি নিয়ে বারবার সাঁওতাল মেয়ে যায় আসে।

আমার মাটির ঘরখানা
আরম্ভ হয়েছে গড়া, মজুর জুটেছে তার নানা।
ধীরে ধীরে ভিত তোলে গেঁথে
রৌদ্রে পিঠ পেতে।

মাঝে মাঝে
সুদূরে রেলের বাঁশি বাজে;
প্রহর চলিয়া যায়, বেলা পড়ে আসে,
ঢং ঢং ঘণ্টাধ্বনি জেগে ওঠে দিগন্ত-আকাশে।
আমি দেখি চেয়ে,
ঈষৎ সংকোচে ভাবি— এ কিশোরী মেয়ে
পল্লীকোণে যে ঘরের তরে
করিয়াছে প্রস্ফুটিত দেহে ও অন্তরে
নারীর সহজ শক্তি আত্মনিবেদনপরা
শুশ্রূষায় স্নিগ্ধসুধা-ভরা,

আমি তারে লাগিয়েছি কেনা কাজে করিতে মজুরি—
মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি
পয়সার দিয়ে সিঁধকাঠি।
সাঁওতাল মেয়ে ওই ঝুড়ি ভরে নিয়ে আসে মাটি।

৪ মাঘ ১৩৪১
শান্তিনিকেতন

মিলনযাত্রা

চন্দনধূপের গন্ধ ঠাকুরদালান হতে আসে,
শান-বাঁধা আঙিনার একপাশে
শিউলির তল
আচ্ছন্ন হতেছে অবিরল
ফুলের সর্বস্বনিবেদনে।
গৃহিণীর মৃতদেহ বাহির-প্রাঙ্গণে
আনিয়াছে বহি;
বিলাপের গুঞ্জরণ স্ফীত হয়ে ওঠে রহি রহি;
শরতের সোনালি প্রভাতে
যে আলোছায়াতে
খচিত হয়েছে ফুলবন
মৃতদেহ-আবরণ
আশ্বিনের সেই ছায়া-আলো
অসংকোচে সহজে সাজালো।

জয়লক্ষ্মী এ ঘরের বিধবা ঘরনী
আসন্ন মরণকালে দুহিতারে কহিলেন, 'মণি,
আগুনের সিংহদ্বারে চলেছি যে দেশে
যাব সেথা বিবাহের বেশে।
আমারে পরায়ে দিয়ো লাল চেলিখানি,
সীমন্তে সিঁদুর দিয়ো টানি।'

যে উজ্জ্বল সাজে
একদিন নববধূ এসেছিল এ গৃহের মাঝে,
পার হয়েছিল যে দুয়ার,
উত্তীর্ণ হল সে আরবার
সেই দ্বার সেই বেশে
ষাট বৎসরের শেষে।
এই দ্বার দিয়ে আর কভু
এ সংসারে ফিরিবে না সংসারের একচ্ছত্র প্রভু।
অক্ষুণ্ণ শাসনদণ্ড ন্যস্ত হল তার,
ধনে জনে আছিল যে অবারিত অধিকার
আজি তার অর্থ কী যে!
যে আসনে বসিত সে তারো চেয়ে মিথ্যা হল নিজে।
প্রিয়মিলনের মনোরথে
পরলোক-অভিসার-পথে
রমণীর এই চিরপ্রস্থানের ক্ষণে
পড়িছে আরেক দিন মনে।

আশ্বিনের শেষভাগে চলেছে পূজার আয়োজন;
দাসদাসী-কলকণ্ঠ-মুখরিত এ ভবন
উৎসবের উচ্ছল জোয়ারে
ক্ষুব্ধ চারি ধারে।
এ বাড়ির ছোটো ছেলে অনুকূল পড়ে এম. এ. ক্লাসে,
এসেছে পূজার অবকাশে।
শোভনদর্শন যুবা, সবচেয়ে প্রিয় জননীর,
বউদিদিমণ্ডলীর
প্রশ্রয়ভাজন।
পূজার উদ্‌যোগে মেশে তারো লাগি পূজার সাজন।

একদা বাড়ির কর্তা স্নেহভরে
পিতৃমাতৃহীন মেয়ে প্রমিতারে এনেছিল ঘরে

বন্ধুঘর হতে; তখন বয়স তার ছিল ছয়,
এ বাড়িতে পেল সে আশ্রয়
আত্মীয়ের মতো।
অনুদাদা কতদিন তারে কত
কাঁদায়েছে অত্যাচারে।
বালক-রাজারে
যত সে জোগাত অর্ঘ্য ততই দৌরাত্ম্য যেত বেড়ে;
সত্তবাঁধা খোঁপাখানি নেড়ে
হঠাৎ এলায়ে দিত চুল
অনুকূল;
চুরি করে খাতা খুলে
পেন্সিলের দাগ দিয়ে লজ্জা দিত বানানের ভুলে।
গৃহিণী হাসিত দেখি দুজনের এ ছেলেমানুষি—
কভু রাগ, কভু খুশি,
কভু ঘোর অভিমানে পরস্পর এড়াইয়া চলা,
দীর্ঘকাল বন্ধ কথা বলা।

বহুদিন গেল তার পর।
প্রমির বয়স আজ আঠারো বছর।

হেনকালে একদা প্রভাতে
গৃহিণীর হাতে
চুপি চুপি ভৃত্য দিল আনি
রঙিন কাগজে লেখা পত্র একখানি।
অনুকূল লিখেছিল প্রমিতারে
বিবাহপ্রস্তাব করি তারে।
বলেছিল, 'মায়ের সম্মতি
অসম্ভব অতি।
জাতের অমিল নিয়ে এ সংসারে
ঠেকিবে আচারে।

কথা যদি দাও, প্রমি, চুপি চুপি তবে
মোদের মিলন হবে
আইনের বলে।'

দুর্বিষহ ক্রোধানলে
জয়লক্ষ্মী তীব্র উঠে দহি।
দেওয়ানকে দিল কহি,
'এ মুহূর্তে প্রমিতারে
দূর করি দাও একেবারে।'

ছুটিয়া মাতারে এসে বলে অনুকূল,
'করিয়ো না ভুল;
অপরাধ নাই প্রমিতার,
সম্মতি পাই নি আজো তার।
কর্ত্রী তুমি এ সংসারে;
তাই বলে অবিচারে
নিরাশ্রয় করি দিবে অনাথারে, হেন অধিকার
নাই নাই, নাইকো তোমার।
এই ঘরে ঠাঁই দিল পিতা ওরে,
তারি জোরে
হেথা ওর স্থান
তোমারি সমান।
বিনা অপরাধে
কী স্বত্বে তাড়াবে ওরে মিথ্যা পরিবাদে।'

ঈর্ষাবিদ্বেষের বহ্নি দিল মাতৃমন ছেয়ে—
ওইটুকু মেয়ে
আমার সোনার ছেলে পর করে,
আগুন লাগিয়ে দেয় কচি হাতে এ প্রাচীন ঘরে!
অপরাধ! অনুকূল ওরে ভালোবাসে এই ঢের,
সীমা নেই এ অপরাধের।

যত তর্ক কর তুমি, যে যুক্তি দাও-না
ইহার পাওনা
ওই মেয়েটাকে হবে মেটাতে সত্বর।
আমারি এ ঘর,
আমারি এ ধনজন
আমারি শাসন,
আর কারো নয়,
আজই আমি দেব তার পরিচয়।

প্রমিতা যাবার বেলা ঘরে দিয়ে দ্বার
খুলে দিল সব অলংকার।
পরিল মিলের শাড়ি মোটাসুতা-বোনা।
কানে ছিল সোনা,
কোনো জন্মদিনে তার
স্বর্গীয় কর্তার উপহার,
বাক্সে তুলি রাখিল শয্যায়।
ঘোমটায় সারামুখ ঢাকিল লজ্জায়।

যবে, হতে গেল পার
সদরের দ্বার,
কোথা হতে অকস্মাৎ
অনুকূল পাশে এসে ধরিল তাহার হাত
কৌতূহলী দাসদাসী সবলে ঠেলিয়া সবাকারে ;
কহিল সে, 'এই দ্বারে
এতদিনে মুক্ত হল এইবার
মিলনযাত্রার পথ প্রমিতার।
যে শুনিতে চাও শোনো,
মোরা দোঁহে ফিরিব না এ দ্বারে কখনো।'

৫ ভাদ্র ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

অন্তরতম

আপন মনে যে কামনার চলেছি পিছুপিছু
নহে সে বেশি কিছু।
মরুভূমিতে করেছি আনাগোনা—
তৃষিত হিয়া চেয়েছে যাহা নহে সে হীরা সোনা,
পর্ণপুটে একটু শুধু জল,
উৎসতটে খেজুরবনে ক্ষণিক ছায়াতল।
সেইটুকুতে বিরোধ ঘোচে জীবন মরণের,
বিরাম জোটে শ্রান্ত চরণের।
হাটের হাওয়া ধুলায় ভরপুর,
তাহার কোলাহলের তলে একটুখানি সুর
সকল হতে দুর্লভ তা তবু সে নহে বেশি;
বৈশাখের তাপের শেষাশেষি
আকাশ-চাওয়া শুষ্ক মাটি-'পরে
হঠাৎ-ভেসে-আসা মেঘের ক্ষণকালের তরে
এক পশলা বৃষ্টিবরিষন,
দুঃস্বপন বক্ষে যবে শ্বাস নিরোধ করে
জাগিয়ে-দেওয়া করুণ পরশন;
এইটুকুরই অভাব গুরুভার,
না জেনে তবু ইহারই লাগি হৃদয়ে হাহাকার।
অনেক দুরাশারে
সাধনা করে পেয়েছি তবু ফেলিয়া গেছি তারে।
যে পাওয়া শুধু রক্তে নাচে, স্বপ্নে যাহা গাঁথা,
ছন্দে যার হল আসন পাতা,
খ্যাতিস্মৃতির পাষাণপটে রাখে না যাহা রেখা,
ফাল্গুনের সাঁঝতারায় কাহিনী যার লেখা,
সে ভাষা মোর বাঁশিই শুধু জানে—
এই যা দান গিয়েছে মিশে গভীরতম প্রাণে,

করি নি যার আশা,
যাহার লাগি বাঁধি নি কোনো বাসা,
বাহিরে যার নাইকো ভার, যায় না দেখা যারে,
বেদনা তারি ব্যাপিয়া মোর নিখিল আপনারে।

৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪
শান্তিনিকেতন

বনস্পতি

কোথা হতে পেলে তুমি অতি পুরাতন
এ যৌবন,
হে তরু প্রবীণ,
প্রতিদিন
জরাকে ঝরাও তুমি কী নিগূঢ় তেজে—
প্রতিদিন আস তুমি সেজে
সদ্য জীবনের মহিমায়।
প্রাচীনের সমুদ্রসীমায়
নবীন প্রভাত তার অক্লান্ত কিরণে
তোমাতে জাগায় লীলা নিরন্তর শ্যামলে হিরণে।
দিনে দিনে পথিকের দল
ক্লিষ্টপদতল
তব ছায়াবীথি দিয়ে রাত্রি-পানে ধায় নিরুদ্দেশ;
আর তো ফেরে না তারা, যাত্রা করে শেষ।
তোমার নিশ্চল যাত্রা নব নব পল্লব-উদ্গমে,
ঋতুর গতির ভঙ্গে পুষ্পের উদ্যমে।
প্রাণের নির্ঝরলীলা স্তব্ধ রূপান্তরে
দিগন্তেরে পুলকিত করে।
তপোবনবালকের মতো
আবৃত্তি করিছ তুমি ফিরে ফিরে অবিরত
সঞ্জীবন-সামমন্ত্র-গাথা।

তোমার পুরানো পাতা
মাটিরে করিছে প্রত্যর্পণ
মাটির যা মর্তধন ;
মৃত্যুভার সঁপিছে মৃত্যুরে
মর্মরিত আনন্দের সুরে ।
সেইক্ষণে নবকিশলয়
রবিকর হতে করে জয়
প্রচ্ছন্ন আলোক,
অমর অশোক
সৃষ্টির প্রথম বাণী ;
বায়ু হতে লয় টানি
চিরপ্রবাহিত
নৃত্যের অমৃত ।

২ অগস্ট ১৯৩২

ভীষণ

বনস্পতি, তুমি যে ভীষণ,
ক্ষণে ক্ষণে আজিও তা মানে মোর মন ।
প্রকাণ্ড মাহাত্ম্যবলে জিনেছিলে ধরা একদিন
যে আদি অরণ্যযুগে, আজি তাহা ক্ষীণ ।
মানুষের-বশ-মানা এই-যে তোমায় আজ দেখি,
তোমার আপন রূপ এ কি ?
আমার বিধান দিয়ে বেঁধেছি তোমারে
আমার বাসার চারি ধারে ।
ছায়া তব রেখেছি সংযমে ।
দাঁড়ায়ে রয়েছ স্তব্ধ জনতাসংগমে
হাটের পথের ধারে ।
নম্র পত্রভারে
কিংকরের মতো
আছ মোর বিলাসের অনুগত ।

লীলাকাননের মাপে
তোমারে করেছি খর্ব। মৃদু কলালাপে
কর চিত্তবিনোদন,
এ ভাষা কি তোমার আপন ?

একদিন এসেছিলে আদিবনভূমে ;
জীবলোক মগ্ন ঘুমে—
তখনো মেলে নি চোখ,
দেখে নি আলোক।
সমুদ্রের তীরে তীরে শাখায় মিলায়ে শাখা
ধরার কঙ্কাল দিলে ঢাকা।
ছায়ায় বুনিয়া ছায়া স্তরে স্তরে
সবুজ মেঘের মতো ব্যাপ্ত হলে দিকে দিগন্তরে।
লতায় গুল্মেতে ঘন, মৃতগাছ-শুষ্কপাতা-ভরা,
আলোহীন পথহীন ধরা।
অরণ্যের আর্দ্রগন্ধে নিবিড় বাতাস
যেন রুদ্ধশ্বাস
চলিতে না পারে।
সিন্ধুর তরঙ্গধ্বনি অন্ধকারে
গুমরিয়া উঠিতেছে জনশূন্য বিশ্বের বিলাপে।
ভূমিকম্পে বনস্থলী কাঁপে ;
প্রচণ্ড নির্ঘোষে
বহু তরুভার বহি বহুদূর মাটি যায় ধ্বসে
গভীর পঙ্কের তলে।
সেদিনের অন্ধ যুগে পীড়িত সে জলে স্থলে
তুমি তুলেছিলে মাথা।
বলিতে বঙ্কলে তব গাঁথা
সে ভীষণ যুগের আভাস।

যেথা তব আদিবাস
সে অরণ্যে একদিন মানুষ পশিল যবে
দেখা দিয়েছিলে তুমি ভীতিরূপে তার অনুভবে।
হে তুমি অমিত-আয়ু, তোমার উদ্দেশে
স্তবগান করেছে সে।
বাঁকাচোরা শাখা তব কত কী সংকেতে
অন্ধকারে শঙ্কা রেখেছিল পেতে।
বিকৃত বিরূপ মূর্তি মনে মনে দেখেছিল তারা
তোমার দুর্গমে দিশাহারা।

আদিম সে আরণ্যক ভয়
রক্তে নিয়ে এসেছিনু আজিও সে কথা মনে হয়।
বটের জটিল মূল আঁকাবাঁকা নেমে গেছে জলে—
মসীকৃষ্ণ ছায়াতলে
দৃষ্টি মোর চলে যেত ভয়ের কৌতুকে,
দুরুদুরু বুকে
ফিরাতেম নয়ন তখনি।
যে মূর্তি দেখেছি সেথা শুনেছি যে ধ্বনি
সে তো নহে আজিকার।
বহু লক্ষ বর্ষ আগে সৃষ্টি সে তোমার।
হে ভীষণ বনস্পতি,
সেদিন যে নতি
মন্ত্র পড়ি দিয়েছি তোমারে,
আমার চৈতন্যতলে আজিও তা আছে এক ধারে।

২ অগস্ট ১৯৩২

সন্ন্যাসী

হে সন্ন্যাসী, হে গম্ভীর, মহেশ্বর,
মন্দাকিনী প্রসারিল কত-না নির্ঝর
তোমারে বেষ্টন করি নৃত্যজালে।

তব উচ্চভালে
উৎক্ষিপ্ত শীকরবাষ্পে বাঁকা ইন্দ্রধনু
রহে তব শুভ্রতনু
বর্ণে বর্ণে বিচিত্র করিয়া।
কলহাস্যে মুখরিয়া
উদ্ধত নন্দীর রুষ্ট তর্জনীরে করে পরিহাস,
ক্ষণে ক্ষণে করে তব তপোনাশ;
নাহি মনে ভয়,
দূরে নাহি রয়,
দুর্বার দুরন্ত তারা শাসন না মানে,
তোমারে আপন সাথি জানে।
সকল নিয়মবন্ধহারা
আপন অধীর ছন্দে তোমারে নাচাতে চায় তারা
বাহু তব ধরি।
তুমি মনে মনে হাসো ভৃঙ্গীর ভ্রূকুটি লক্ষ করি।
এদের প্রশ্রয় দিলে, তাই যত দুর্দামের দল
চরাচর ঘেরি ঘেরি করিছে উন্মত্ত কোলাহল
সমুদ্রতরঙ্গতালে, অরণ্যের দোলে,
যৌবনের উদ্‌বেল কল্লোলে।
আনে চাঞ্চল্যের অর্ঘ্য নিরন্তর তব শান্তি নাশি—
এই তো তোমার পূজা জানো তাহা হে ধীর সন্ন্যাসী।

৩ অগস্ট ১৯৩২

হরিণী

হে হরিণী,
আকাশ লইবে জিনি
কেন তব এ অধ্যবসায়?
সুদূরের অভ্রপটে অগম্যেরে দেখা যায়,
কালো চোখে পড়ে তার স্বপ্নরূপ লিখা;

এ কি মরীচিকা,
পিপাসার স্বরচিত মোহ,
এ কি আপনার সাথে আপন বিদ্রোহ ?
নিজের দুঃসহ সঙ্গ হতে
ছুটে যেতে চাও কোনো নূতন আলোতে—
নিকটের সংকীর্ণতা করি ছেদ,
দিগন্তের নব নব যবনিকা করি দিয়া ভেদ।
আছ বিচ্ছেদের পারে ;
যারে তুমি জান নাই, রক্তে তুমি চিনিয়াছ যারে,
সে যে ডাক দিয়ে গেছে যুগে যুগে যত হরিণীরে
বনে মাঠে গিরিতটে নদীতীরে—
জানায়েছে অপূর্ব বারতা
কত শত বসন্তের আত্মবিহ্বলতা।
তারি লাগি বিশ্বভোলা মহা-অভিসার
হয়েছে দুর্বার,
অদৃশ্যেরে সন্ধানের তরে
দাঁড়ায়েছ স্পর্ধাভরে,
একান্ত উৎসুক তব প্রাণ
আকাশেরে করে ঘ্রাণ—
কর্ণ করিয়াছে খাড়া,
বাতাসে বাতাসে আজি অশ্রুত বাণীর পায় সাড়া।

১ অগস্ট ১৯৩২

গোধূলি

প্রাসাদভবনে নীচের তলায়
সারাদিন কতমতো
গৃহের সেবায় নিয়ত রয়েছ রত।
সেথা তুমি তব গৃহসীমানায়
বহু মানুষের সনে
শত গাঁঠে বাঁধা কর্মের বন্ধনে।

দিনশেষে আসে গোধূলির বেলা
ধূসর রক্তরাগে
ঘরের কোণায় দীপ জ্বালাবার আগে ;
নীড়ে-ফেরা কাক দিয়ে শেষ ডাক
উড়িল আকাশতলে,
শেষ-আলো-আভা মিলায় নদীর জলে।
হাওয়া থেমে যায় বনের শাখায়
আঁধার জড়ায়ে ধরে ;
নির্জন ছায়া কাঁপে ঝিল্লির স্বরে।

তখন একাকী সব কাজ রাখি
প্রাসাদ-ছাদের ধারে
দাঁড়াও যখন নীরব অন্ধকারে
জানি না তখন কী যে নাম তব,
চেনা তুমি নহ আর,
কোনো বন্ধনে নহ তুমি বাঁধিবার।
সেই ক্ষণকাল তব সঙ্গিনী
সুদূর সন্ধ্যাতারা,
সেই ক্ষণকাল তুমি পরিচয়হারা।
দিবসরাত্রির সীমা মিলে যায় ;
নেমে এস তারপরে,
ঘরের প্রদীপ আবার জ্বালাও ঘরে।

১৪ মাঘ [১৩৩৮]

বাধা

পূর্ণ করি নারী তার জীবনের থালি
প্রিয়ের চরণে প্রেম নিঃশেষিয়া দিতে গেল ঢালি,
ব্যর্থ হল পথ-খোঁজা—
কহিল, 'হে ভগবান, নিষ্ঠুর যে এ অর্ঘ্যের বোঝা ;

আমার দিবস রাত্রি অসহ্য পেষণে
একান্ত পীড়িত আর্ত ; তাই সান্ত্বনার অন্বেষণে
এসেছি তোমার দ্বারে— এ প্রেম তুমিই লও প্রভু !'
'লও লও' বারবার ডেকে বলে, তবু
দিতে পারে না যে তাকে
কৃপণের ধন-সম শিরা আঁকড়িয়া থাকে।

যেমন তুষাররাশি গিরিশিরে লগ্ন রহে,
কিছুতে স্রোত না বহে,
আপন নিষ্ফল কঠিনতা
দেয় তারে ব্যথা,
তেমনি সে নারী
নিশ্চল-হৃদয়ভারে-ভারী
কেঁদে বলে, 'কী ধনে আমার প্রেম দামী
সে যদি না বুঝেছিল, তুমি অন্তর্যামী,
তুমিও কি এরে চিনিবে না ?
মানবজন্মের সব দেনা
শোধ করি লও, প্রভু, আমার সর্বস্ব রত্ন নিয়ে।
তুমি যে প্রেমের লোভী মিথ্যা কথা কি এ !'

'লও লও' যত বলে খোলে না যে তার
হৃদয়ের দ্বার।
সারাদিন মন্দিরা বাজায়ে করে গান,
'লও তুমি লও ভগবান !'

৩ অগস্ট ১৯৩২

দুই সখী

দুজন সখীরে
দূর হতে দেখেছিনু অজানার তীরে।

জানি নে কাদের ঘর ; দ্বার খোলা আকাশের পানে,
দিনান্তে কহিতেছিল কী কথা কে জানে।
এক নিমিষেতে
অপরিচয়ের দেখা চলে যেতে যেতে
উপরের দিকে চেয়ে।
দুটি মেয়ে
যেন দুটি আলোকণা
আমার মনের পথে ছায়াতলে করিল রচনা
ক্ষণতরে আকাশের বাণী,
অর্থ তার নাহি জানি।

যাহারা ওদের চেনে,
নাম জানে, কাছে লয় টেনে,
একসাথে দিন যাপে,
প্রত্যহের বিচিত্র আলাপে
ওদের বেঁধেছে তারা ছোটো করে
পরিচয়ডোরে।

সত্য নয়
ঘরের ভিত্তিতে ঘেরা সেই পরিচয়।
যাবে দিন,
সে জানা কোথায় হবে লীন
বন্ধহীন অনন্তের বক্ষতলে উঠিয়াছে জেগে
কী নিশ্বাসবেগে
যুগলতরঙ্গসম।
অসীম কালের মাঝে ওরা অনুপম,
ওরা অনুদ্দেশ,
কোথায় ওদের শেষ
ঘরের মানুষ জানে সে কি ?
নিত্যের চিত্তের পটে ক্ষণিকের চিত্র গেনু দেখি—

আশ্চর্য সে লেখা,
সে তুলির রেখা
যুগযুগান্তর-মাঝে একবার দেখা দিল নিজে—
জানি নে তাহার পরে কী যে।

[১৩৩৯]

পথিক

তুমি আছ বসি তোমার ঘরের দ্বারে
ছোটো তব সংসারে।
মনখানি যবে ধায় বাহিরের পানে
ভিতরে আবার টানে।
বাঁধনবিহীন দূর
বাজাইয়া যায় সুর,
বেদনার ছায়া পড়ে তব আঁখি'পরে—
নিশ্বাস ফেলি মন্দগমন ফিরে চলে যাও ঘরে।

আমি-যে পথিক চলিয়াছি পথ বেয়ে
দূরের আকাশে চেয়ে ;
তোমার ঘরের ছায়া পড়ে পথপাশে,
সে ছায়া হৃদয়ে আসে।
যত দূরে পথ যাক
শুনি বাঁধনের ডাক,
ক্ষণেকের তরে পিছনে আমায় টানে—
নিশ্বাস ফেলি ত্বরিতগমন চলি সম্মুখপানে।

উদার আকাশে আমার মুক্তি দেখি
মন তব কাঁদিছে কি ?
এ মুক্তিপথে তুমি পেতে চাও ছাড়া,
দুয়ারে লেগেছে নাড়া।

বাঁধনে বাঁধনে টানি
রচিলে আসনখানি,
দেখিনু তোমার আপন সৃষ্টি তাই—
শূন্যতা ছাড়ি সুন্দরে তব আমার মুক্তি চাই।

৩ অগস্ট ১৯৩২

অপ্রকাশ

মুক্ত হও হে সুন্দরী!
ছিন্ন করো রঙিন কুয়াশা,
অবনত দৃষ্টির আবেশ,
এই অবরুদ্ধ ভাষা,
এই অবগুণ্ঠিত প্রকাশ।
সযত্ন লজ্জার ছায়া
তোমারে বেষ্টন করি জড়ায়েছে অস্পষ্টের মায়া
শতপাকে,
মোহ দিয়ে সৌন্দর্যেরে করেছে আবিল;
অপ্রকাশে হয়েছ অশুচি।
তাই তোমারে নিখিল
রেখেছে সরায়ে কোণে।
ব্যক্ত করিবার দীনতায়
নিজেরে হারালে তুমি,
প্রদোষের জ্যোতিঃক্ষীণতায়
দেখিতে পেলে না আজো আপনারে উদার আলোকে—
বিশ্বেরে দেখ নি, ভীরু, কোনোদিন বাধাহীন চোখে
উচ্চশির করি।
স্বরচিত সংকোচে কাটাও দিন,
আত্ম-অপমানে চিত্ত দীপ্তিহীন, তাই পুণ্যহীন।
বিকশিত স্থলপদ্ম পবিত্র সে, মুক্ত তার হাসি,
পূজায় পেয়েছে স্থান আপনারে সম্পূর্ণ বিকাশি।

ছায়াচ্ছন্ন যে লজ্জায় প্রকাশের দীপ্তি ফেলে মুছি,
সত্তার ঘোষণাবাণী স্তব্ধ করে,
জেনো সে অশুচি।
ঊর্ধ্বশাখা বনস্পতি যে ছায়ারে দিয়েছে আশ্রয়
তার সাথে আলোর মিত্রতা,
সমুন্নত সে বিনয়।
মাটিতে লুটিয়ে গুল্ম সর্ব অঙ্গ ছায়াপুঞ্জ করি,
তলে গুপ্ত গহ্বরেতে কীটের নিবাস।
হে সুন্দরী,
মুক্ত করো অসম্মান, তব অপ্রকাশ আবরণ।
হে বন্দিনী, বন্ধনেরে কোরো না কৃত্রিম আভরণ।
সজ্জিত লজ্জার খাঁচা, সেথায় আত্মার অবসাদ
অর্ধেক বাধায় সেথা ভোগের বাড়ায়ে দিতে স্বাদ
ভোগীর বাড়াতে গর্ব খর্ব করিয়ো না আপনারে
খণ্ডিত জীবন লয়ে আচ্ছন্ন চিত্তের অন্ধকারে।

৬ মাঘ [১৩৩৮]

দুর্ভাগিনী

তোমার সম্মুখে এসে, দুর্ভাগিনী, দাঁড়াই যখন
নত হয় মন।
যেন ভয় লাগে
প্রলয়ের আরম্ভেতে স্তব্ধতার আগে।
এ কী দুঃখভার,
কী বিপুল বিষাদের স্তম্ভিত নীরন্ধ্র অন্ধকার
ব্যাপ্ত করে আছে তব সমস্ত জগৎ
তব ভূত ভবিষ্যৎ!
প্রকাণ্ড এ নিষ্ফলতা,
অভ্রভেদী ব্যথা
দাবদগ্ধ পর্বতের মতো

খররৌদ্রে রয়েছে উন্নত
লয়ে নগ্ন কালো কালো শিলাস্তূপ
ভীষণ বিরূপ।

সব সান্ত্বনার শেষে সব পথ একেবারে
মিলেছে শূন্যের অন্ধকারে ;
ফিরিছ বিশ্রামহারা ঘুরে ঘুরে,
খুঁজিছ কাছের বিশ্ব মুহূর্তে যা চলে গেল দূরে ;
খুঁজিছ বুকের ধন, সে আর তো নেই,
বুকের পাথর হল মুহূর্তেই।
চিরচেনা ছিল চোখে চোখে,
অকস্মাৎ মিলাল অপরিচিত লোকে।
দেবতা যেখানে ছিল সেথা জ্বালাইতে গেলে ধূপ,
সেখানে বিদ্রূপ।

সর্বশূন্যতার ধারে
জীবনের পোড়ো ঘরে অবরুদ্ধ দ্বারে
দাও নাড়া ;
ভিতরে কে দিবে সাড়া ?
মূর্ছাতুর আঁধারের উঠিছে নিশ্বাস।
ভাঙা বিশ্বে পড়ে আছে ভেঙে-পড়া বিপুল বিশ্বাস।
তার কাছে নত হয় শির
চরম বেদনাশৈলে ঊর্ধ্বচূড় যাহার মন্দির।

মনে হয়, বেদনার মহেশ্বরী
তোমার জীবন ভরি
দুষ্করতপস্যামগ্ন, মহাবিরহিণী
মহাদুঃখে করিছেন ঋণী
চিরদয়িতেরে।
তোমারে সরালো শত ফেরে
বিশ্ব হতে বৈরাগ্যের অন্তরাল।

দেশকাল
রয়েছে বাহিরে।
তুমি স্থির সীমাহীন নৈরাশ্যের তীরে
নির্বাক অপার নির্বাসনে।
অশ্রুহীন তোমার নয়নে
অবিশ্রাম প্রশ্ন জাগে যেন—
কেন, ওগো কেন!

৬ অগস্ট ১৯৩২
[জোড়াসাঁকো]

গরবিনী

কে গো তুমি গরবিনী, সাবধানে থাকো দূরে দূরে,
মর্তধূলি'পরে ঘৃণা বাজে তব নূপুরে নূপুরে।
তুমি যে অসাধারণ, তীব্র একা তুমি,
আকাশকুসুমসম অসংসক্ত রয়েছ কুসুমি।
বাহিরের প্রসাধনে যত্নে তুমি শুচি;
অকলঙ্ক তোমার কৃত্রিম রুচি;
সর্বদা সংশয়ে থাকো পাছে কোথা হতে
হতভাগ্য কালো কীট পড়ে তব দীপের আলোতে
স্ফটিকেতে-ঢাকা।
অসামান্য সমাদরে আঁকা
তোমার জীবন
কৃপণের-কক্ষে-রাখা ছবির মতন
বহুমূল্য যবনিকা-অন্তরালে;
ওগো অভাগিনী নারী, এই ছিল তোমার কপালে—
আপন প্রহরী তুমি, নিজে তুমি আপন বন্ধন।

আমি সাধারণ।

এ ধরাতলের
নির্বিচার স্পর্শ সকলের
দেহে মোর বহে যায়, লাগে মোর মনে—
সেই বলে বলী আমি, স্বত্ব মোর সকল ভুবনে।
মুক্ত আমি ধূলিতলে,
মুক্ত আমি অনাদৃত মলিনের দলে।
যত চিহ্ন লাগে দেহে, অশঙ্কিত প্রাণের শক্তিতে
শুদ্ধ হয়ে যায় সে চকিতে।

সম্মুখে আমার দেখো শালবন,
সে যে সাধারণ।
সবার একান্ত কাছে
আপনাবিস্মৃত হয়ে আছে।
মধ্যাহ্নবাতাসে
শুষ্ক পাতা ঘুরাইয়া ধূলির আবর্ত ছুটে আসে—
শাখা তার অনায়াসে দেয় নাড়া,
পাতায় পাতায় তার কৌতুকের পড়ে সাড়া।
তবু সে অম্লান শুচি, নির্মল নিশ্বাসে
চৈত্রের আকাশে
বাতাস পবিত্র করে সুগন্ধবীজনে।
অসংকোচ ছায়া তার প্রসারিত সর্বসাধারণে।
সহজে নির্মল সে যে
দ্বিধাহীন জীবনের তেজে।

আমি সাধারণ।
তরুর মতন আমি, নদীর মতন।
মাটির বুকের কাছে থাকি ;
আলোরে ললাটে লই ডাকি
যে আলোক উচ্চনীচ ইতরের—
বাহিরের ভিতরের।

সমস্ত পৃথিবী তুমি অবজ্ঞায় করেছ অশুচি,
গরবিনী, তাই সেই শক্তি গেছে ঘুচি
আপনার অন্তরে রহিতে অমলিনা—
হায়, তুমি নিখিলের আশীর্বাদহীনা।

৪ অগস্ট ১৯৩২

প্রলয়

আকাশের দূরত্ব যে, চোখে তারে দূর বলে জানি,
মনে তারে দূর নাহি মানি।
কালের দূরত্ব সেও যত কেন হোক-না নিষ্ঠুর
তবু সে দুঃসহ নহে দূর।
আঁধারের দূরত্বই কাছে থেকে রচে ব্যবধান,
চেতনা আবিষ্ট করে, তার হাতে নাই পরিত্রাণ
শুধু এই মাত্র নয়—
সে-যে সৃষ্টি করে নিত্য ভয়।
ছায়া দিয়ে রচি তুলে আঁকাবাঁকা দীর্ঘ উপছায়া,
জানারে অজানা করে— ঘেরে তারে অর্থহীনা মায়া।
পথ লুপ্ত করে দিয়ে যে পথের করে সে নির্দেশ
নাই তার শেষ।
সে পথ ভুলায়ে লয় দিনে দিনে দূর হতে দূরে
ধ্রুবতারাহীন অন্ধপুরে।

অগ্নিবন্যা বিস্তারিয়া যে প্রলয় আনে মহাকাল,
চন্দ্রসূর্য লুপ্ত করে আবর্তে-ঘূর্ণিত জটাজাল,
দিব্য দীপ্তিচ্ছটায় সে সাজে,
বজ্রের ঝঞ্ঝনামন্ত্রে বক্ষে তার রুদ্রবীণা বাজে।
যে বিশ্বে বেদনা হানে তাহারি দাহনে করে তার
পবিত্র সৎকার।
জীর্ণ জগতের ভস্ম যুগান্তের প্রচণ্ড নিশ্বাসে
লুপ্ত হয় ঝঞ্ঝার বাতাসে।

অবশেষে তপস্বীর তপস্যাবহ্নির শিখা হতে
নবসৃষ্টি উঠে আসে নিরঞ্জন নবীন আলোতে।

দানব বিলুপ্তি আনে, আঁধারের পঙ্কিল বুদ্‌বুদে
নিখিলের সৃষ্টি দেয় মুদে ;
কণ্ঠ দেয় রুদ্ধ করি, বাণী হতে ছিন্ন করে সুর,
ভাষা হতে অর্থ করে দূর ;
উদয়দিগন্তমুখে চাপা দেয় ঘন কালো আঁধি,
প্রেমেরে সে ফেলে বাঁধি
সংশয়ের ডোরে ;
ভক্তিপাত্র শূন্য করি শ্রদ্ধার অমৃত লয় হরে।
মূক অন্ধ মৃত্তিকার স্তর,
জগদ্দল শিলা দিয়ে রচে সেথা মুক্তির কবর।

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

কলুষিত

শ্যামল প্রাণের উৎস হতে
অবারিত পুণ্যস্রোতে
ধৌত হয় এ বিশ্বধরণী
দিবসরজনী।
হে নগরী, আপনারে বঞ্চিত করেছ সেই স্নানে,
রচিয়াছ আবরণ কঠিন পাষাণে।
আছ নিত্য মলিন অশুচি,
তোমার ললাট হতে গেছে ঘুচি
প্রকৃতির স্বহস্তের লিখা
আশীর্বাদটিকা।
উষা দিব্যদীপ্তিহারা
তোমার দিগন্তে এসে। রজনীর তারা
তোমার আকাশচ্যুত জাতিচ্যুত, নষ্ট মন্ত্র তার,
বিক্ষুব্ধ নিদ্রার

আলোড়নে ধ্যান তার অস্বচ্ছ আবিল,
হারালো সে মিল
পূজাগন্ধী নন্দনের পারিজাত-সাথে
শান্তিহীন রাতে।

হেথা সুন্দরের কোলে
স্বর্গের বীণার সুর ভ্রষ্ট হল বলে
উদ্ধত হয়েছে ঊর্ধ্বে বীভৎসের কোলাহল,
কৃত্রিমের কারাগারে বন্দীদল
গর্বভরে
শৃঙ্খলের পূজা করে।
দ্বেষ ঈর্ষা কুৎসার কলুষে
আলোহীন অন্তরের গুহাতলে হেথা রাখে পুষে
ইতরের অহংকার—
গোপন দংশন তার ;
অশ্লীল তাহার ক্লিন্ন ভাষা
সৌজন্যসংযমনাশা।
দুর্গন্ধ পঙ্কের দিয়ে দাগা
মুখোশের অন্তরালে করে শ্লাঘা ;
সুরঙ্গ খনন করে,
ব্যাপি দেয় নিন্দা ক্ষতি প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে ;
এই নিয়ে হাটে বাটে বাঁকা কটাক্ষের
ব্যঙ্গভঙ্গী, চতুর বাক্যের
কুটিল উল্লাস,
ক্রূর পরিহাস।

এর চেয়ে আরণ্যক তীব্র হিংসা সেও
শতগুণে শ্রেয়।
ছদ্মবেশ-অপগত
শক্তির সরল তেজে সমুদ্ধত দাবাগ্নির মতো

প্রচণ্ডনির্ঘোষ ;
নির্মল তাহার রোষ,
তার নির্দয়তা
বীরত্বের মাহাত্ম্যে উন্নতা।
প্রাণশক্তি তার মাঝে
অক্ষুন্ন বিরাজে।
স্বাস্থ্যহীন বীর্যহীন যে হীনতা ধ্বংসের বাহন
গর্তখোদা ক্রিমিগণ
তারি অনুচর,
অতি ক্ষুদ্র তাই তারা অতি ভয়ংকর ;
অগোচরে আনে মহামারী,
শনির কলির দন্ত সর্বনাশ তারি।

মন মোর কেঁদে আজ উঠে জাগি
প্রবল মৃত্যুর লাগি।
রুদ্র, জটাবন্ধ হতে করো মুক্ত বিরাট প্লাবন,
নীচতার ক্লেদপঙ্ক করো রক্ষা ভীষণ ! পাবন !
তাণ্ডবনৃত্যের ভরে
দুর্বলের যে গ্লানিরে চূর্ণ কর যুগে যুগান্তরে,
কাপুরুষ নির্জীবের সে নির্লজ্জ অপমানগুলি
বিলুপ্ত করিয়া দিক উৎক্ষিপ্ত তোমার পদধূলি।

১৪ ভাদ্র ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

অভ্যুদয়

শত শত লোক চলে
শত শত পথে।
তারি মাঝে কোথা কোন্ রথে
সে আসিছে যার আজি নব অভ্যুদয়

দিক্‌লক্ষ্মী গাহিল না জয় ;
আজো রাজটিকা
ললাটে হল না তার লিখা।
নাই অস্ত্র, নাই সৈন্যদল,
অস্ফুট তাহার বাণী, কণ্ঠে নাহি বল।
সে কি নিজে জানে
আসিছে সে কী লাগিয়া,
আসে কোনখানে!
যুগের প্রচ্ছন্ন আশা করিছে রচনা
তার অভ্যর্থনা
কোন্ ভবিষ্যতে—
কোন্ অলক্ষিত পথে
আসিতেছে অর্ঘ্যভার!
আকাশে ধ্বনিছে বারম্বার—
'মুখ তোলো,
আবরণ খোলো
হে বিজয়ী, হে নির্ভীক,
হে মহাপথিক—
তোমার চরণক্ষেপ পথে পথে দিকে দিকে
মুক্তির সংকেতচিহ্ন
যাক লিখে লিখে।'

বর্ষশেষ ১৩৩৯

প্রতীক্ষা

গান

আজি বরষনমুখরিত
শ্রাবণরাতি।
স্মৃতিবেদনার মালা
একেলা গাঁথি।

আজি কোন্ ভুলে ভুলি
আঁধার ঘরেতে রাখি
দুয়ার খুলি—
মনে হয়, বুঝি আসিবে সে
মোর দুখরজনীর
মরমসাথি।

আসিছে সে ধারাজলে সুর লাগায়ে,
নীপবনে পুলক জাগায়ে।
যদিও বা নাহি আসে
তবু বৃথা আশ্বাসে
মিলন-আসনখানি
রয়েছি পাতি।

২১ শ্রাবণ ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

নুটু

রমাদেবীর মৃত্যু উপলক্ষে

ফাল্গুনের পূর্ণিমার আমন্ত্রণ পল্লবে পল্লবে
এখনি মুখর হল অধীর মর্মরকলরবে।
বৎসে, তুমি বৎসরে বৎসরে
সাড়া তারি দিতে মধুস্বরে,
আমাদের দূত হয়ে তোমার কণ্ঠের কলগান
উৎসবের পুষ্পাসনে বসন্তেরে করেছে আহ্বান।

নিষ্ঠুর শীতের দিনে গেলে তুমি রুগ্ন তনু বয়ে
আমাদের সকলের উৎকণ্ঠিত আশীর্বাদ লয়ে।
আশা করেছিনু মনে মনে—
নববসন্তের আগমনে
ফিরিয়া আসিবে যবে লবে আপনার চিরস্থান,
কাননলক্ষ্মীরে তুমি করিবে আনন্দ-অর্ঘ্যদান।

এবার দক্ষিণবায়ু দুঃখের নিশ্বাস এল বহে ;
তুমি তো এলে না ফিরে ; এ আশ্রম তোমার বিরহে
বীথিকার ছায়ায় আলোকে
সুগভীর পরিব্যাপ্ত শোকে
কহিছে নির্বাক্‌বাণী বৈরাগ্যকরুণ ক্লান্ত সুরে,
তাহারি রণনধ্বনি প্রান্তরে বাজিছে দূরে দূরে।

শিশুকাল হতে হেথা সুখে-দুঃখে-ভরা দিন-রাত
করেছে তোমার প্রাণে বিচিত্র বর্ণের রেখাপাত।
কাশের মঞ্জরী -শুভ্র দিশা,
নিস্তব্ধ মালতী-ঝরা নিশা,
প্রশান্ত শিউলি-ফোটা প্রভাত শিশিরে-ছলোছলো,
দিগন্ত-চমক-দেওয়া সূর্যাস্তের রশ্মি জলোজলো।

এখনো তেমনি হেথা আসিবে দিনের পরে দিন,
তবুও সে আজ হতে চিরকাল রবে তুমি-হীন।
বসে আমাদের মাঝখানে
কভু যে তোমার গানে গানে
ভরিবে না সুখসন্ধ্যা, মনে হয়, অসম্ভব অতি—
বর্ষে বর্ষে দিনে দিনে প্রমাণ করিবে সেই ক্ষতি।

বারে বারে নিতে তুমি গীতিস্রোতে কবি-আশীর্বাণী,
তাহারে আপন পাত্রে প্রণামে ফিরায়ে দিতে আনি।
জীবনের দেওয়া-নেওয়া সেই
ঘুচিল অন্তিম নিমেষেই—
স্নেহোজ্জ্বল কল্যাণের সে সম্বন্ধ তোমার আমার
গানের নির্মাল্য -সাথে নিয়ে গেলে মরণের পার।

হায় হায়, এত প্রিয়, এতই দুর্লভ যে সঞ্চয়
একদিনে অকস্মাৎ তারো যে ঘটিতে পারে লয়!
হে অসীম, তব বক্ষোমাঝে
তার ব্যথা কিছুই না বাজে,

সৃষ্টির নেপথ্যে সেও আছে তব দৃষ্টির ছায়ায়—
স্তব্ধবীণা রঙ্গগৃহে মোরা বৃথা করি 'হায় হায়'।

হে বৎসে, যা দিয়েছিলে আমাদের আনন্দভাণ্ডারে
তারি স্মৃতিরূপে তুমি বিরাজ করিবে চারিধারে।
আমাদের আশ্রম-উৎসব
যখনি জাগাবে গীতরব
তখনি তাহার মাঝে অশ্রুত তোমার কণ্ঠস্বর
অশ্রুর আভাস দিয়ে অভিষিক্ত করিবে অন্তর।

১৮ মাঘ ১৩৪১
[শান্তিনিকেতন]

বাদলসন্ধ্যা

গান

জানি জানি, তুমি এসেছ এ পথে
মনের ভুলে।
তাই হোক তবে, তাই হোক, দ্বার
দিলেম খুলে।
এসেছ তুমি তো বিনা আভরণে,
মুখর নূপুর বাজে না চরণে,
তাই হোক তবে, তাই হোক, এসো
সহজ মনে।

ঐ তো মালতী ঝরে পড়ে যায়
মোর আঙিনায়,
শিথিল কবরী সাজাতে তোমার
লও-না তুলে।
নাহয় সহসা এসেছ এ পথে
মনের ভুলে।

কোনো আয়োজন নাই একেবারে,
সুর বাঁধা নাই এ বীণার তারে,
তাই হোক তবে, এসো হৃদয়ের
মৌনপারে।

ঝর ঝর বারি ঝরে বনমাঝে,
আমারি মনের সুর ঐ বাজে,
উতলা হাওয়ার তালে তালে মন
উঠিছে দুলে।
নাহয় সহসা এসেছ এ পথে
মনের ভুলে।

২৩ শ্রাবণ ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

জয়ী

রূপহীন, বর্ণহীন, চিরস্তব্ধ, নাই শব্দ সুর,
মহাতৃষ্ণা মরুতলে মেলিয়াছে আসন মৃত্যুর;
সে মহানৈঃশব্দ্য-মাঝে বেজে ওঠে মানবের বাণী
'বাধা নাহি মানি'।

আস্ফালিছে লক্ষ লোল ফেনজিহ্বা নিষ্ঠুর নীলিমা—
তরঙ্গতাণ্ডবী মৃত্যু, কোথা তার নাহি হেরি সীমা;
সে রুদ্র সমুদ্রতটে ধ্বনিতেছে মানবের বাণী
'বাধা নাহি মানি'।

আদিতম যুগ হতে অন্তহীন অন্ধকারপথে
আবর্তিছে বহ্নিচক্র কোটি কোটি নক্ষত্রের রথে;
দুর্গম রহস্য ভেদি সেথা উঠে মানবের বাণী
'বাধা নাহি মানি'।

অণুতম অণুকণা আকাশে আকাশে নিত্যকাল
বর্ষিয়া বিদ্যুৎবিন্দু রচিছে রূপের ইন্দ্রজাল ;
নিরুদ্ধ প্রবেশদ্বারে উঠে সেথা মানবের বাণী
'বাধা নাহি মানি'।

চিত্তের গহনে যেথা দুরন্ত কামনা লোভ ক্রোধ
আত্মঘাতী মত্ততায় করিছে মুক্তির দ্বার রোধ
অন্ধতার অন্ধকারে উঠে সেথা মানবের বাণী
'বাধা নাহি মানি'।

বাদলরাত্রি

গান

কী বেদনা মোর জান সে কি তুমি, জান,
ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা—
আজি এ নিবিড় তিমিরযামিনী
বিদ্যুৎ-সচকিতা।
বাদল বাতাস ব্যেপে
হৃদয় উঠিছে কেঁপে,
ওগো, সে কি তুমি জান!
উৎসুক এই দুখজাগরণ,
এ কি হবে হায় বৃথা!

ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা,
আমার ভবনদ্বারে
রোপণ করিলে যারে
সজল হাওয়ার করুণ পরশে
সে মালতী বিকশিতা—
ওগো, সে কি তুমি জান!

তুমি যার সুর দিয়েছিলে বাঁধি
মোর কোলে আজ উঠিছে সে কাঁদি,
ওগো, সে কি তুমি জান !
সেই যে তোমার বীণা সে কি বিস্মৃতা,
ওগো মিতা, মোর অনেক দূরের মিতা !

২৮ শ্রাবণ ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

পত্র

অবকাশ ঘোরতর অল্প,
অতএব কবে লিখি গল্প !
সময়টা বিনা কাজে ন্যস্ত,
তা নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত।
তাই ছেড়ে দিতে হল শেষটা
কলমের ব্যবহার-চেষ্টা।
সারাবেলা চেয়ে থাকি শূন্যে,
বুঝি গতজন্মের পুণ্যে
পায় মোর উদাসীন চিত্ত
রূপে রূপে অরূপের বিত্ত।
নাই তার সঞ্চয়তৃষ্ণা,
নষ্ট করাতে তার নিষ্ঠা।
মৌমাছি-স্বভাবটা পায় নাই,
ভবিষ্যতের কোনো দায় নাই।
ভ্রমর যেমন মধু নিচ্ছে
যখন যেমন তার ইচ্ছে।
অকিঞ্চনের মতো কুঞ্জে
নিত্য আলসরস ভুঞ্জে।
মৌচাক রচে না কী জন্যে—
ব্যর্থ বলিয়া তারে অন্যে

গাল দিক, খেদ নাই তা নিয়ে।
জীবনটা চলেছে সে বানিয়ে
আলোতে বাতাসে আর গন্ধে
আপন পাখা-নাড়ার ছন্দে।
জগতের উপকার করতে
চায় না সে প্রাণপণে মরতে,
কিম্বা সে নিজের শ্রীবৃদ্ধির
টিকি দেখিল না আজো সিদ্ধির।
কভু যার পায় নাই তত্ত্ব
তারি গুণগান নিয়ে মত্ত।
যাহা-কিছু হয় নাই পষ্ট,
যা দিয়েছে না-পাওয়ার কষ্ট,
যা রয়েছে অভ্যাসের বস্তু,
তারেই সে বলিয়াছে 'অস্তু'।
যাহা নহে গণনায় গণ্য
তারি রসে হয়েছে সে ধন্য।
তবে কেন চাও তারে আনতে
পাব্‌লিশরের চক্রান্তে।
যে রবি চলেছে আজ অস্তে
দেবে সমালোচকের হস্তে?
বসে আছি, প্রলয়ের পথ-কার
কবে করিবেন তার সংকার।
নিশীথিনী নেবে তারে বাহুতে,
তার আগে খাবে কেন রাহুতে?
কলমটা তবে আজ তোলা থাক,
স্তুতিনিন্দার দোলে দোলা থাক।

আজি শুধু ধরণীর স্পর্শ
এনে দিক অন্তিম হর্ষ।
বোবা তরুলতিকার বাক্য
দিক তারে অসীমের সাক্ষ্য।

অভ্যাগত

গান

মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম
অন্তবিহীন পথ
আসিতে তোমার দ্বারে,
মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম পারে।
পথ হতে আমি গাঁথিয়া এনেছি
সিক্ত যূথীর মালা
সকরুণ নিবেদনের গন্ধ -ঢালা,
লজ্জা দিয়ো না তারে।

সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে
বনে বনে,
পথ-হারানোর বাজিছে বেদনা
সমীরণে।
দূর হতে আমি দেখেছি তোমার
ঐ বাতায়নতলে
নিভৃতে প্রদীপ জ্বলে—
আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি
ঝড়ের অন্ধকারে।

২১ শ্রাবণ ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

মাটিতে-আলোতে

আরবার কোলে এল শরতের
শুভ্র দেবশিশু, মরতের
সবুজ কুটীরে। আরবার বুঝিতেছি মনে—
বৈকুণ্ঠের সুর যবে বেজে ওঠে মর্তের গগনে

মাটির বাঁশিতে, চিরন্তন রচে খেলাঘর
অনিত্যের প্রাঙ্গণের 'পর,
তখন সে সম্মিলিত লীলারস তারি
ভরে নিই যতটুকু পারি
আমার বাণীর পাত্রে, ছন্দের আনন্দে তারে
বহে নিই চেতনার শেষ পারে,
বাক্য আর বাক্যহীন
সত্যে আর স্বপ্নে হয় লীন।

দ্যুলোকে ভূলোকে মিলে শ্যামলে সোনায়
মন্ত্র রেখে দিয়ে গেছে বর্ণে বর্ণে আঁখির কোণায় ;
তাই প্রিয়মুখে
চক্ষু যে পরশটুকু পায়, তার দুঃখে সুখে
লাগে সুধা, লাগে সুর ;
তার মাঝে সে রহস্য সুমধুর
অনুভব করি
যাহা সুগভীর আছে ভরি
কচি ধানখেতে—
রিক্ত প্রান্তরের শেষে অরণ্যের নীলিম সংকেতে,
আমলকীপল্লবের পেলব উল্লাসে,
মঞ্জরিত কাশে,
অপরাহ্ণকাল
তুলিয়া গেরুয়াবর্ণ পাল
পাণ্ডুপীত বালুতট বেয়ে বেয়ে
যায় ধেয়ে
তন্বী তরী গতির বিদ্যুতে
হেলে পড়ে যে রহস্য সে ভঙ্গীটুকুতে,
চটুল দোয়েল পাখি সবুজেতে চমক ঘটায়
কালো আর সাদার ছটায়

অকস্মাৎ ধায় দ্রুত শিরীষের উচ্চ শাখা-পানে
চকিত সে ওড়াটিতে যে রহস্য বিজড়িত গানে।

হে প্রেয়সী, এ জীবনে
তোমারে হেরিয়াছিনু যে নয়নে
সে নহে কেবলমাত্র দেখার ইন্দ্রিয়,
সেখানে জ্বেলেছে দীপ বিশ্বের অন্তরতম প্রিয়।
আঁখিতারা সুন্দরের পরশমণির মায়া -ভরা,
দৃষ্টি মোর সে তো সৃষ্টি-করা।
তোমার যে সত্তাখানি প্রকাশিলে মোর বেদনায়
কিছু জানা কিছু না-জানায়,
যারে লয়ে আলো আর মাটিতে মিতালি,
আমার ছন্দের ডালি
উৎসর্গ করেছি তারে বারে বারে—
সেই উপহারে
পেয়েছে আপন অর্ঘ্য ধরণীর সকল সুন্দর।
আমার অন্তর
রচিয়াছে নিভৃত কুলায়
স্বর্গের-সোহাগে-ধন্য পবিত্র ধুলায়।

২৫ অগস্ট ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

মুক্তি

জয় করেছিনু মন তাহা বুঝি নাই,
চলে গেনু তাই
নতশিরে।
মনে ক্ষীণ আশা ছিল ডাকিবে সে ফিরে।
মানিল না হায়,
আমারে করিল অস্বীকার।

বাহিরে রহিনু খাড়া
কিছুকাল, না পেলেম সাড়া।
তোরণদ্বারের কাছে
চাঁপাগাছে
দক্ষিণ বাতাসে থরথরি
অন্ধকারে পাতাগুলি উঠিল মর্মরি।
দাঁড়ালেম পথপাশে,
ঊর্ধ্বে বাতায়ন-পানে তাকালেম ব্যর্থ কী আশ্বাসে।
দেখিনু নিবানো বাতি—
আত্মগুপ্ত অহংকৃত রাতি
কক্ষ হতে পথিকেরে হানিছে ভ্রূকুটি।
এ কথা ভাবি নি মনে, অন্ধকারে ভূমিতলে লুটি
হয়তো সে করিতেছে খান খান
তীব্রঘাতে আপনার অভিমান।
দূর হতে দূরে গেনু সরে
প্রত্যাখ্যানলাঞ্ছনার বোঝা বক্ষে ধরে।
চরের বালুতে ঠেকা
পরিত্যক্ত তরীসম রহিল সে একা।

আশ্বিনের ভোরবেলা চেয়ে দেখি পথে যেতে যেতে
ক্ষীণ কুয়াশায় ঢাকা কচিধানখেতে
দাঁড়িয়ে রয়েছে বক,
দিগন্তে মেঘের গুচ্ছে দুলিয়াছে উষার অলক।
সহসা উঠিল বলি হৃদয় আমার,
দেখিলাম যাহা দেখিবার
নির্মল আলোকে
মোহমুক্ত চোখে।
কামনার যে পিঞ্জরে শান্তিহীন
অবরুদ্ধ ছিনু এতদিন

নিষ্ঠুর আঘাতে তার
ভেঙে গেছে দ্বার—
নিরন্তর আকাঙ্ক্ষার এসেছি বাহিরে
সীমাহীন বৈরাগ্যের তীরে।
আপনারে শীর্ণ করি
দিবসশর্বরী
ছিনু জাগি
মুষ্টিভিক্ষা লাগি।
উন্মুক্ত বাতাসে
খাঁচার পাখির গান ছাড়া আজি পেয়েছে আকাশে।

সহসা দেখিনু প্রাতে
যে আমারে মুক্তি দিল আপনার হাতে
সে আজো রয়েছে পড়ি
আমারি সে ভেঙে-পড়া পিঞ্জর আঁকড়ি।

২০ ভাদ্র ১৩৪২
[শান্তিনিকেতন]

দুঃখী

দুঃখী তুমি একা,
যেতে যেতে কটাক্ষেতে পেলে দেখা—
হোথা দুটি নরনারী নববসন্তের কুঞ্জবনে
দক্ষিণ পবনে।
বুঝি মনে হল, যেন চারিধার
সঙ্গীহীন তোমারেই দিতেছে ধিক্কার।
মনে হল, রোমাঞ্চিত অরণ্যের কিশলয়
এ তোমার নয়।
ঘনপুঞ্জ অশোকমঞ্জরী
বাতাসের আন্দোলনে ঝরি ঝরি

প্রহরে প্রহরে
যে নৃত্যের তরে
বিছাইছে আস্তরণ বনবীথিময়,
সে তোমার নয়।
ফাল্গুনের এই ছন্দ, এই গান,
এই মাধুর্যের দান,
যুগে যুগান্তরে
শুধু মধুরের তরে
কমলার আশীর্বাদ করিছে সঞ্চয়,
সে তোমার নয়।
অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্যের মাঝখান দিয়া
অকিঞ্চনহিয়া
চলিয়াছ দিনরাতি,
নাই সাথি,
পাথেয় সম্বল নাই প্রাণে,
শুধু কানে
চারি দিক হতে সবে কয়—
'এ তোমার নয়'।

তবু মনে রেখো, হে পথিক,
দুর্ভাগ্য তোমার চেয়ে অনেক অধিক
আছে ভবে।
দুই জনে পাশাপাশি যবে
রহে একা তার চেয়ে একা কিছু নাই এ ভুবনে।
দুজনার অসংলগ্ন মনে
ছিদ্রময় যৌবনের তরী
অশ্রুর তরঙ্গে ওঠে ভরি—
বসন্তের রসরাশি সেও হয় দারুণ দুর্বহ,
যুগলের নিঃসঙ্গতা নিষ্ঠুর বিরহ।

তুমি একা, রিক্ত তব চিত্তাকাশে কোনো বিঘ্ন নাই ;
সেথা পায় ঠাঁই
পান্থ মেঘদল—
লয়ে রবিরশ্মি লয়ে অশ্রুজল
ক্ষণিকের স্বপ্নস্বর্গ করিয়া রচনা
অস্তসমুদ্রের পারে ভেসে তারা যায় অন্যমনা।
চেয়ে দেখো, দোঁহে যারা হোথা আছে
কাছে-কাছে
তবু যাহাদের মাঝে
অন্তহীন বিচ্ছেদ বিরাজে—
কুসুমিত এ বসন্ত, এ আকাশ, এই বন,
খাঁচার মতন
রুদ্ধদ্বার, নাহি কহে কথা—
তারাও ওদের কাছে হারালো অপূর্ব অসীমতা।
দুজনের জীবনের মিলিত অঞ্জলি,
তাহারি শিথিল ফাঁকে দুজনের বিশ্ব পড়ে গলি।

৬ আষাঢ় ১৩৪০
দার্জিলিং

মূল্য

আমি এ পথের ধারে
একা রই—
যেতে যেতে যাহা-কিছু ফেলে রেখে গেছ মোর দ্বারে
মূল্য তার হোক না যতই
তাহে মোর দেনা
পরিশোধ কখনো হবে না।

দেব ব'লে যাহা কভু দেওয়া নাহি যায়,
চেয়ে যাহা কেহ নাহি পায়,

যে ধনের ভাণ্ডারের চাবি আছে
অন্তর্যামী কোন্ গুপ্ত দেবতার কাছে
কেহ নাহি জানে—
আগন্তুক, অকস্মাৎ সে দুর্লভ দানে
ভরিল তোমার হাত অন্যমনে পথে যাতায়াতে।

পড়ে ছিল গাছের তলাতে
দৈবাৎ বাতাসে ফল,
ক্ষুধার সম্বল।
অযাচিত সে সুযোগে খুশি হয়ে একটুকু হেসো ;
তার বেশি দিতে যদি এসো,
তবে জেনো মূল্য নেই
মূল্য তার সেই।

দূরে যাও, ভুলে যাও ভালো সেও—
তাহারে কোরো না হেয়
দানস্বীকারের ছলে
দাতার উদ্দেশে কিছু রেখে ধূলিতলে।

৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫
[শান্তিনিকেতন]

ঋতু-অবসান

একদা বসন্তে মোর বনশাখে যবে
মুকুলে পল্লবে
উদ্‌বারিত আনন্দের আমন্ত্রণ
গন্ধে বর্ণে দিল ব্যাপি ফাল্গুনের পবন গগন,
সেদিন এসেছে যারা বীথিকায়—
কেহ এল কুণ্ঠিত দ্বিধায় ;
চটুল চরণ কারো তৃণে তৃণে বাঁকিয়া বাঁকিয়া
নির্দয় দলনচিহ্ন গিয়েছে আঁকিয়া

অসংকোচ নূপুরঝংকারে,
কটাক্ষের খরধারে
উচ্চহাস্য করেছে শাণিত ;
কেহ বা করেছে ম্লান অমানিত
অকারণ সংশয়েতে আপনারে
অবগুণ্ঠনের অন্ধকারে ;
কেহ তারা নিয়েছিল তুলি
গোপনে ছায়ায় ফিরি তরুতলে ঝরা ফুলগুলি ;
কেহ ছিন্ন করি
তুলেছিল মাধবীমঞ্জরী,
কিছু তার পথে পথে ফেলেছে ছড়ায়ে,
কিছু তার বেণীতে জড়ায়ে
অন্যমনে গেছে চলে গুন্‌গুন্‌ গানে।

আজি এ ঋতুর অবসানে
ছায়াঘন বীথি মোর নিস্তব্ধ নির্জন ;
মৌমাছির মধু-আহরণ
হল সারা ;
সমীরণ গন্ধহারা
তৃণে তৃণে ফেলিছে নিশ্বাস।
পাতার আড়াল ভরি একে একে পেতেছে প্রকাশ
অচঞ্চল ফলগুচ্ছ যত,
শাখা অবনত।
নিয়ে সাজি
কোথা তারা গেল আজি—
গোধূলিছায়াতে হল লীন
যারা এসেছিল একদিন
কলরবে কান্না ও হাসিতে
দিতে আর নিতে।

আজি লয়ে মোর দানভার
ভরিয়াছি নিভৃত অন্তর আপনার—
অপ্রগল্‌ভ গূঢ় সার্থকতা
নাহি জানে কথা।
নিশীথ যেমন স্তব্ধ নিষুপ্ত ভুবনে
আপনার মনে
আপনার তারাগুলি
কোন্‌ বিরাটের পায়ে ধরিয়াছে তুলি
নাহি জানে আপনি সে—
সুদূর প্রভাত-পানে চাহিয়া রয়েছে নির্নিমেষে।

১৯ ভাদ্র ১৩৪২
[শান্তিনিকেতন]

নমস্কার

প্রভু,
সৃষ্টিতে তব আনন্দ আছে
মমত্ব নাই তবু,
ভাঙায় গড়ায় সমান তোমার লীলা।
তব নির্ঝরধারা
যে বারতা বহি সাগরের পানে
চলেছে আত্মহারা
প্রতিবাদ তারি করিছে তোমার শিলা।
দোঁহার এ দুই বাণী,
ওগো উদাসীন, আপনার মনে
সমান নিতেছ মানি—
সকল বিরোধ তাই তো তোমায়
চরমে হারায় বাণী।

বর্তমানের ছবি
দেখি যবে, দেখি, নাচে তার বুকে
ভৈরব ভৈরবী।
তুমি কী দেখিছ তুমিই তা জানো
নিত্যকালের কবি—
কোন্ কালিমার সমুদ্রকূলে
উদয়াচলের রবি।

বুঝিছে মন্দ ভালো।
তোমার অসীম দৃষ্টিক্ষেত্রে
কালো সে রয় না কালো।
অঙ্গার সে তো তোমার চক্ষে
ছদ্মবেশের আলো।

দুঃখ লজ্জা ভয়
ব্যাপিয়া চলেছে উগ্র যাতনা
মানববিশ্বময়;
সেই বেদনায় লভিছে জন্ম
বীরের বিপুল জয়।
হে কঠোর, তুমি সম্মান দাও,
দাও না তো প্রশ্রয়।

তপ্ত পাত্র ভরি
প্রসাদ তোমার রুদ্র জ্বালায়
দিয়েছ অগ্রসরি—
যে আছে দীপ্ত তেজের পিপাসু
নিক তাহা পান করি।

নিঠুর পীড়নে যাঁর
তন্দ্রাবিহীন কঠিন দণ্ডে
মথিছে অন্ধকার,

তুলিছে আলোড়ি অমৃতজ্যোতি,
তাঁহারে নমস্কার।

৩ অগস্ট ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

আশ্বিনে

আকাশ আজিকে নির্মলতম নীল,
উজ্জ্বল আজি চাঁপার বরন আলো ;
সবুজে সোনায় ভূলোকে দ্যুলোকে মিল
দূরে-চাওয়া মোর নয়নে লেগেছে ভালো।
ঘাসে ঝ'রে-পড়া শিউলির সৌরভে
মন-কেমনের বেদনা বাতাসে লাগে।
মালতীবিতানে শালিকের কলরবে
কাজ-ছাড়া-পাওয়া ছুটির আভাস জাগে।
এমনি শরতে ছেলেবেলাকার দেশে
রূপকথাটির নবীন রাজার ছেলে
বাহিরে ছুটিতে কী জানি কী উদ্দেশে
এপারের চিরপরিচিত ঘর ফেলে।
আজি মোর মনে সে রূপকথার মায়া
ঘনায়ে উঠিছে চাহিয়া আকাশ-পানে ;
তেপান্তরের সুদূর আলোকছায়া
ছড়ায়ে পড়িল ঘরছাড়া মোর প্রাণে।
মন বলে, 'ওগো অজানা বন্ধু, তব
সন্ধানে আমি সমুদ্রে দিব পাড়ি।
ব্যথিত হৃদয়ে পরশরতন লব
চিরসঞ্চিত দৈন্যের বোঝা ছাড়ি।
দিন গেছে মোর, বৃথা বয়ে গেছে রাতি,
বসন্ত গেছে দ্বারে দিয়ে মিছে নাড়া ;
খুঁজে পাই নাই শূন্য ঘরের সাথি—
বকুলগন্ধে দিয়েছিল বুঝি সাড়া।

আজি আশ্বিনে প্রিয়-ইঙ্গিত-সম
নেমে আসে বাণী করুণকিরণ-ঢালা—
চিরজীবনের হারানো বন্ধু মম,
এবার এসেছে তোমারে খোঁজার পালা।'

৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

নিঃস্ব

কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা উৎসবের দল।
অশোকতরুতল
অতিথি লাগি রাখে নি আয়োজন।
হায় সে নির্ধন
শুকানো গাছে আকাশে শাখা তুলি
কাঙালসম মেলেছে অঙ্গুলি;
সুরসভার অপ্সরার চরণঘাত মাগি
রয়েছে বৃথা জাগি।

আরেকদিন এসেছ যবে সেদিন ফুলে ফুলে
যৌবনের তুফান দিল তুলে।
দখিনবায়ে তরুণ ফাল্গুনে
শ্যামল বনবল্লভের পায়ের ধ্বনি শুনে
পল্লবের আসন দিল পাতি;
মর্মরিত প্রলাপবাণী কহিল সারারাতি।

যেয়ো না ফিরে, একটু তবু বোসো,
নিভৃত তার প্রাঙ্গণেতে এসেছ যদি— বোসো।
ব্যাকুলতার নীরব আবেদনে
যে দিন গেছে সে দিনখানি জাগায়ে তোলো মনে।
যে দান মৃদু হেসে
কিশোর করে নিয়েছ তুলি, পরেছ কালো কেশে,

তাহারি ছবি স্মরিয়ো মোর শুকানো শাখা-আগে
প্রভাতবেলা নবীনারুণরাগে।
সেদিনকার গানের থেকে চয়ন করি কথা
ভরিয়া তোলো আজি এ নীরবতা।

২৭ ভাদ্র ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

দেবতা

দেবতা মানবলোকে ধরা দিতে চায়
মানবের অনিত্য লীলায়।
মাঝে মাঝে দেখি তাই—
আমি যেন নাই,
ঝংকৃত বীণার তন্তুসম দেহখানা
হয় যেন অদৃশ্য অজানা;
আকাশের অতিদূর সূক্ষ্ম নীলিমায়
সংগীতে হারায়ে যায়;
নিবিড় আনন্দরূপে
পল্লবের স্তূপে
আমলকীবীথিকার গাছে গাছে
ব্যাপ্ত হয় শরতের আলোকের নাচে।
প্রেয়সীর প্রেমে
প্রত্যহের ধূলি-আবরণ যায় নেমে
দৃষ্টি হতে, শ্রুতি হতে;
স্বর্গসুধাস্রোতে
ধৌত হয় নিখিলগগন—
যাহা দেখি যাহা শুনি তাহা যে একান্ত অতুলন।
মর্তের অমৃতরসে দেবতার রুচি
পাই যেন আপনাতে, সীমা হতে সীমা যায় ঘুচি।

দেবসেনাপতি
নিয়ে আসে আপনার দিব্যজ্যোতি
যখন মরণপণে হানি অমঙ্গল।
ত্যাগের বিপুল বল
কোথা হতে বক্ষে আসে;
অনায়াসে
দাঁড়াই উপেক্ষা করি প্রচণ্ড অন্যায়ে
অকুণ্ঠিত সর্বস্বের ব্যয়ে।
তখন মৃত্যুর বক্ষ হতে
দেবতা বাহিরি আসে অমৃত-আলোতে;
তখন তাহার পরিচয়
মর্তলোকে অমর্তেরে করি তোলে অক্ষুন্ন অক্ষয়

২৬ শ্রাবণ ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

শেষ

বহি লয়ে অতীতের সকল বেদনা,
ক্লান্তি লয়ে, গ্লানি লয়ে, লয়ে মুহূর্তের আবর্জনা,
লয়ে প্রীতি,
লয়ে সুখস্মৃতি,
আলিঙ্গন ধীরে ধীরে শিথিল করিয়া
এই দেহ যেতেছে সরিয়া
মোর কাছ হতে।
সেই রিক্ত অবকাশ যে আলোতে
পূর্ণ হয়ে আসে
অনাসক্ত আনন্দ-উল্লাসে
নির্মল পরশ তার
খুলি দিল গত রজনীর দ্বার।

নবজীবনের রেখা
আলোরূপে প্রথম দিতেছে দেখা ;
কোনো চিহ্ন পড়ে নাই তাহে,
কোনো ভার ; ভাসিতেছে সত্তার প্রবাহে
সৃষ্টির আদিমতারা-সম
এ চৈতন্য মম।
ক্ষোভ তার নাই দুঃখে সুখে ;
যাত্রার আরম্ভ তার নাহি জানি কোন্ লক্ষ্যমুখে।
পিছনের ডাক
আসিতেছে শীর্ণ হয়ে ; সম্মুখেতে নিস্তব্ধ নির্বাক্
ভবিষ্যৎ জ্যোতির্ময়
অশোক অভয়,
স্বাক্ষর লিখিল তাহে সূর্য অস্তগামী।
যে মন্ত্র উদাত্ত সুরে উঠে শূন্যে সেই মন্ত্র— 'আমি'।

৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

জাগরণ

দেহে মনে সুপ্তি যবে করে ভর
সহসা চৈতন্যলোকে আনে কল্পান্তর,
জাগ্রত জগৎ চলে যায়
মিথ্যার কোঠায়।
তখন নিদ্রার শূন্য ভরি
স্বপ্নসৃষ্টি শুরু হয়, ধ্রুব সত্য তারে মনে করি।
সেও ভেঙে যায় যবে
পুনর্বার জেগে উঠি অন্য এক ভবে ;
তখনি তাহারে সত্য বলি,
নিশ্চিত স্বপ্নের রূপ অনিশ্চিতে কোথা যায় চলি।

তাই ভাবি মনে,
যদি এ জীবন মোর গাঁথা থাকে মায়ার স্বপনে,
মৃত্যুর আঘাতে জেগে উঠে
আজিকার এ জগৎ অকস্মাৎ যায় টুটে,
সবকিছু অন্য-এক অর্থে দেখি—
চিত্ত মোর চমকিয়া সত্য বলি তারে জানিবে কি ?
সহসা কি উদিবে স্মরণে
ইহাই জাগ্রত সত্য অন্যকালে ছিল তার মনে ?

২৯ ভাদ্র ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

নাটক ও প্রহসন

শেষরক্ষা

নাটকের পাত্রগণ

চন্দ্রকান্ত	ক্ষান্তমণি
বিনোদ	ইন্দু
গদাই	কমল
নিবারণ	বুড়ি
শিব	ঠাকুরদাসী
ভৃত্য	
নলিনাক্ষ	
শ্রীপতি	
ভূপতি	
দরজি	
ললিত	

শেষরক্ষা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নিবারণবাবুর বাসা

ক্ষান্তমণি ও ইন্দু

ক্ষান্তমণি। কী আর বলব আমি তোকে, আমার তো হাড় জ্বালাতন। আমার ঘরে যতগুলো লোক জোটে সব চেয়ে লক্ষ্মীছাড়া হচ্ছে ঐ বিনোদ।

ইন্দু। সেইজন্যেই লক্ষ্মীদের মহলে সব চেয়ে তার পসার ভারী— লক্ষ্মী যে ছাড়ে লক্ষ্মী তারই পিছনে পিছনে ছোটে।

ক্ষান্তমণি। কেন ভাই, তোর ওকে পছন্দ নাকি?

ইন্দু। আরেকটু হলেই হতে পারত। কিন্তু সে ফাঁড়া কেটে গেছে।

ক্ষান্তমণি। কী ক'রে কাটল?

ইন্দু। দিদি আগেই তাকে পছন্দ করে বসে আছে। আমাকে আর সময় দিলে না।

ক্ষান্তমণি। বলিস কী! কমল নাকি? সে ওকে দেখলে কখন?

ইন্দু। দেখে নি। সেইটেই তো বিপদ। শব্দভেদী বাণের কথা রামায়ণে শোন নি?

ক্ষান্তমণি। শুনেছি।

ইন্দু। সব চেয়ে শক্ত বাণ হল সেইটে। শব্দের রাস্তা বেয়ে কখন এসে বুকে বেঁধে, কেউ দেখতেই পায় না।

ক্ষান্তমণি। একটু ভাই, বুঝিয়ে বল্। তোদের মতো আমার অত পড়াশুনো নেই।

ইন্দু। সেইটেতেই তোমার রক্ষে। নইলে কেবল পড়াশোনার জোরেই মরণ হতে পারত, দেখাশোনার দরকার হত না। তোমার বিনোদবাবু যে কবি তা জান না!

ক্ষান্তমণি। তা হোক-না কবি, হয়েছে কী?

ইন্দু। কমলদিদি ওর বই লুকিয়ে পড়ে। সেইটেই খারাপ লক্ষণ। বিনোদ-বাবুর 'আঙুরলতা' বইখানা ওর বালিশের নীচে থাকে। আর তাঁর 'কাননকুসুমিকা' রেখেছে ধোবার বাড়ির হিসেবের খাতার তলায়।

ক্ষান্তমণি। কিন্তু ওর মুখে তো বিনোদবাবুর নামও শুনি নি।

ইন্দু। নামটা বুকের মধ্যে বাসা করেছে, তাই মুখে বের হতে চায় না।

ক্ষান্তমণি। কী যে বলিস, বুঝতে পারি নে— ওর লেখায় এমন কী মন্ত্র আছে বল্ তো। আমাকে একটু নমুনা দে দেখি।

ইন্দু। তবে শোনো—

রসনায় ভাষা নাই, থাকি চুপে চুপে,
অন্তরে জোগায় সে যে বাণী।
সময় পায় না আঁখি মজিবারে রূপে,
গোপনে স্বপনে তারে জানি।

ক্ষান্তমণি। হায় রে, কী শব্দভেদী বাণেরই নমুনা!

ইন্দু। কমলদিদি খাতায় লিখে রেখেছে, এই ওর জপের মন্ত্র। শব্দভেদী বাণের যে জোর কত তা প্রত্যক্ষ দেখতে চাও?

ক্ষান্তমণি। চাই বৈকি, জেনে রাখা ভালো।

ইন্দু। (নেপথ্যে চাহিয়া) দিদি! দিদি!

সেলাই হাতে কমলের প্রবেশ

কমল। কেন? হয়েছে কী?

ইন্দু। এখনো বিশেষ কিছু হয় নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ? বিধাতা আমাদের চেয়েও পর্দানশীন, আড়ালে বসে বসে তোমার সাধের স্বপ্নকে মূর্তি দিচ্ছেন।

কমল। সে খবর দেবার জন্যে তোমায় ডাকাডাকি করতে হবে না।

ইন্দু। তা জানি ভাই, খবর পাকা হলে বিধাতা আপনিই দূত পাঠিয়ে দেবেন। আমি সেজন্যে ভাবিও নি। সখীপরিষদে আমাকে গান গাইতে ধরেছে। স্বরলিপি থেকে তুমি যে নতুন গানটি শিখেছ আমাকে শিখিয়ে দাও। ক্ষান্তদিদিও সেইজন্যে বসে আছেন— আমি জানি, তোমার গান উনি চন্দ্রবাবুর চটি জুতোর আওয়াজের প্রায় সমতুল্য বলেই জানেন।

ক্ষান্তমণি। ইন্দুর কথা শোনো একবার! এ আবার আমি কবে বললুম!

ইন্দু। তা হলে সমতুল্য বলাটা ভুল হয়েছে, তার চেয়ে নাহয় কিছু নীরসই হল। সে তর্ক পরে হবে, তুমি গান গাও।

কমল। গান

ডাকিল মোরে জাগার সাথি।
প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে,
প্রভাত হল আঁধার রাতি।
বাজায় বাঁশি তন্দ্রাভাঙা,
ছড়ায় তারি বসন রাঙা,
ফুলের বাসে এই বাতাসে
কী মায়াখানি দিয়েছে গাঁথি।
গোপনতম অন্তরে কী
লেখনরেখা দিয়েছে লেখি!
মন তো তারি নাম জানে না,
রূপ আজিও নয় যে চেনা,
বেদনা মম বিছায়ে দিয়ে
রেখেছি তারি আসন পাতি।

ইন্দু। ক্ষান্তদিদি, ঐ চেয়ে দেখো, বাণ পৌঁচেছে!

ক্ষান্তমণি। কোথায়?

ইন্দু। আমাদের এই গলির আকাশ পার হয়ে, ঠেকেছে গিয়ে তোমাদের বাড়ির ঐ দরজাতে।

ক্ষান্তমণি। ইন্দু, তুই স্বপ্ন দেখছিস নাকি?

ইন্দু। ঐ দেখো-না, তোমাদের বন্ধ দরজার খড়্‌খড়ে খুলে গেছে।

ক্ষান্তমণি। তা তো দেখছি।

ইন্দু। কমলদিদি, বুঝতে পেরেছ?

কমল। আঃ, কী যে বকিস তার ঠিক নেই।

ইন্দু। ঐ খোলা খড়্‌খড়ির ফাঁক দিয়ে কবিকুঞ্জবনের দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত। ঐ খড়্‌খড়ির পিছনে একটা ধড়্‌ফড়ানি দেখতে পাচ্ছ?

কমল। কিসের ধড়্‌ফড়ানি?

ইন্দু। সেই খবরটাই তো চোখের আড়ালে রয়ে গেল।

গান

হায় রে,

ওরে যায় না কি জানা !

নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায়,

পায় না ঠিকানা।

অলখ পথেই যাওয়া-আসা,

শুনি চরণধ্বনির ভাষা,

গন্ধে শুধু হাওয়ায় হাওয়ায়

রইল নিশানা।

কেমন ক'রে জানাই তারে,

বসে আছি পথের ধারে।

প্রাণে এল সন্ধ্যাবেলা

আলোয় ছায়ায় রঙিন খেলা,

ঝ'রে-পড়া বকুলদলে

বিছায় বিছানা।

ক্ষান্তমণি। ওলো ইন্দু, দেখ দেখ খড়্‌খড়ে আরো ফাঁক হয়ে উঠল যে !

ইন্দু। এবার তুমি যদি গান ধর তা হলে দেয়ালসুদ্ধ ফাঁক হয়ে যাবে !

ক্ষান্তমণি। আর ঠাট্টা করতে হবে না, যাঃ। তোর কথা শুনে ভেবেছিলুম, একা কমলই বুঝি শব্দভেদী বাণের তীরন্দাজ। বিধাতা কি তোদের সকলেরই গলায় বাণ বোঝাই করেছেন ! হাতের কাছে এত বিপদ জমা হয়ে আছে, এ তো জানতুম না।

ইন্দু। সৃষ্টিকর্তা সংকল্প করেছেন পুরুষমেধ যজ্ঞ করতে— তারি সহায়তায় নারীদের ডাক পড়েছে। সবাই ছুটে আসছে, কেউ কণ্ঠ নিয়ে, কেউ কটাক্ষ নিয়ে ; কারো বা কুটিল হাস্য, কারো বা কুঞ্চিত কেশকলাপ ; কারো বা সর্ষের তেল ও লঙ্কার বাটনা -যোগে বুক-জ্বালানি রান্না।

ক্ষান্তমণি। কিন্তু তোদের সব বাণই কি ঐ একটা খড়্‌খড়ে দিয়ে গলবে নাকি ?

ইন্দু। কবির হৃদয়টা দরাজ, বড়ো বোনের পাকা হাত আর ছোটো বোনের কাঁচা হাত কারো লক্ষ্যই ফসকায় না।

ক্ষান্তমণি। তা যেন হল, তার পরে অংশ নিয়ে তোদের মামলা বাধবে না ?

ইন্দু। তাই তো বলে রেখেছি, আমি দাবি করব না।

কমল। এত নিঃস্বার্থ হবার দরকার কী ?

ইন্দু। কমলদিদি, জীবনের অঙ্কশাস্ত্রে পুরুষরা আছে গুণের কোঠায়, মেয়েরা ভাগের কোঠায়। ওদের বেলায় দুইয়ের দ্বারা হয় দ্বিগুণ, আমাদের বেলায় দুইয়ের দ্বারা হয় দুভাগ। তাই তোমাকে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছি— নইলে দুই বোনে মিলে ঐ খড়্‌খড়েটার কব্‌জা এতদিনে ঝর্‌ঝরে করে দিতুম।

কমল। কেন, রাস্তা কি আমি ছাড়তে জানি নে?

ইন্দু। আমি ওঁর কবিতাবিছানো রাস্তায় এক পা চলতে পারব না। মানেই বুঝতে পারি নে— হুঁচট খেয়ে মরব।

ক্ষান্তমণি। তোরা দুজনে মিলে রফানিস্পত্তি করে নে, আমার কাজ আছে, যাই।

ইন্দু। বেলা গিয়েছে, এখন আবার তোমার কাজ?

ক্ষান্তমণি। যত বেকারের দল, কখন কী খেয়াল যায় ঠিক নেই। হয়তো হঠাৎ হুকুম হবে, তপ্‌সি মাছ ভাজা চাই; নয়তো কড়াইশুটির কচুরি, নয়তো হাঁসের ডিমের বড়া।

ইন্দু। একটু দাঁড়াও, আমরাও যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে কর্মবিভাগ করে নেব। আমরা লাগব চেখে দেখবার কঠিন কাজে। কমলদিদি, ঐ দেখো, খড়্‌খড়েটা লুব্ধ চকোরের চঞ্চুর মতো এখনো হাঁ করে রয়েছে। দেখে দুঃখ হচ্ছে।

কমল। এত দয়া যদি তো সুধা তুমিই ঢালো-না। আমি চললুম।

ইন্দু। না, দিদি।

গান

যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও বলে,
কোন্‌খানে যে মন লুকানো দাও বলে।
চপল লীলা ছলনাভরে
বেদনখানি আড়াল করে,
যে বাণী তব হয় নি বলা নাও বলে।

হাসির বাণে হেনেছ কত শ্লেষকথা,
নয়নজলে ভরো গো আজি শেষকথা।
হায় রে অভিমানিনী নারী,
বিরহ হল দ্বিগুণ ভারী
দানের ডালি ফিরায়ে নিতে চাও বলে।

আচ্ছা ভাই, ক্ষান্তদিদি, ঐ খড়্‌খড়ের পিছনে কোন্ মানুষটি বসে আছে আন্দাজ করো দেখি। চন্দরবাবু?

ক্ষান্তমণি। না, ভাই, তার আর যাই দোষ থাক, তোদের শব্দভেদী বাণ তাকে পৌঁছয় না, সে আমি খুব দেখে নিয়েছি।

ইন্দু। অর্থাৎ, আমাদের চন্দ্রের যা কলঙ্ক সেটা কেবল মুখের উপরে, তার জ্যোৎস্নায় কোনো দাগ পড়ে না। তোমাদের লক্ষ্মীছাড়া দলে আর কে আছে নাম করো দেখি।

ক্ষান্তমণি। আর-একজন আছে, তার নাম গদাই।

ইন্দু। আরে, ছি ছি, ছি ছি! অমন নাম যার তার খড়্‌খড়ে চিরদিন যেন বোজা থাকে।

ক্ষান্তমণি। নাম শুনেই যে তোর—

ইন্দু। নামের দাম কম নয় দিদি। ভেবে দেখো তো, দৈবদুর্যোগে গদাই যদি 'কাননকুসুমিকা'র কবি হত তা হলে কবির নাম জপ করবার সময় দিদি কী মুশকিলেই পড়ত। ভক্তি হত না, সুতরাং মুক্তিও পেত না।

কমল। দিদির মুক্তির জন্যে তোমাকে অত ভাবতে হবে না। এখন নিজের কথা চিন্তা করবার সময় হয়েছে।

ইন্দু। সেইজন্যেই তো নাম বাছাই করতে লেগে গেছি। সময় নষ্ট করতে চাই নে। আমার স্বয়ম্বরসভায় নিমন্ত্রণের ফর্দ থেকে গদাই নামটা কাটা পড়ল।

কমল। তা হলে এইবেলা তোমার পছন্দসই নামের একটা ফর্দ করা যাক। কুমুদ কিরকম?

ইন্দু। চলে যায়।

কমল। নিকুঞ্জ?

ইন্দু। চলতেও পারে, কিন্তু উপবাসের মুখে, অর্থাৎ দ্বাদশী তিথিতে।

কমল। পরিমল?

ইন্দু। মালাবদলের সময় নাম-বদল করতে হবে, সে হবে ইন্দু আমি হব পরিমল। যা হোক এগুলো চলতেও পারে— কিন্তু গদাই? নৈব নৈব চ।

ক্ষান্ত। কী যে পাগলামি করছিস ইন্দু! চল্‌, আমার কাজ আছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রবাবুর বাসা

চন্দ্র। ভাই বিন্দা, তোমাকে দেখে বোধ হচ্ছে, আজ তোমার ভালোমন্দ একটা-কিছু হল বলে, কিম্বা হয়েই বসেছে।

বিনোদ। তাই নাকি?

চন্দ্রকান্ত। আজ তোমার দৃষ্টিটা ছুটেছে যেন কোন্ মায়ামৃগীর পিছু পিছু। গেছে তার পথ হারিয়ে! ওহে, আজকের হাওয়ায় তোমার গায়ে কারো ছোঁয়াচ লাগছে নাকি?

বিনোদ। কিসে ঠাওরালে?

চন্দ্রকান্ত। মুখের ভাবে।

বিনোদ। ভাবটা কিরকম দেখছ?

চন্দ্রকান্ত। যেন ইন্দ্রধনু উঠেছে আকাশে, আর তারই ছায়াটা শিউরে উঠছে নদীর ঢেউয়ে।

বিনোদ। বলে যাও।

চন্দ্রকান্ত। যেন আষাঢ়-সন্ধ্যাবেলায় জুঁইগাছের গাঁঠে গাঁঠে কুঁড়ি ধরল বলে, আর দেরি নেই।

বিনোদ। আরো কিছু আছে?

চন্দ্রকান্ত। যেন—

নব জলধরে বিজুরী-রেহা
দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

বিনোদ। থামলে কেন, বলে যাও।

চন্দ্রকান্ত। যেন বাঁশিটি আজ ঠেকেছে এসে গুণীর অধরে। সত্যি করে বল্ ভাই, লুকোস্ নে আমার কাছে।

বিনোদ। তা হতে পারে। একটা কোন্ ইশারা আজ গোধূলিতে উড়ে বেড়াচ্ছে, তাকে কিছুতে ধরতে পারছি নে।

চন্দ্রকান্ত। ইশারা উড়ে বেড়াচ্ছে। সেটা প্রজাপতির ডানায় নাকি?

বিনোদ। যেন অন্ধ মৌমাছির কাছে রজনীগন্ধার গন্ধের ইশারা।

চন্দ্রকান্ত। হায় হায়, হাওয়াটা কোন্ দিক থেকে বইছে, তার ঠিকানাই পেলে না?

বিনোদ। পোস্ট-আপিসের ঠিকানাটা পাওয়া শক্ত নয় চন্দরদা! কিন্তু স্বর্ণরেণু কোথায় আছে লুকিয়ে সেই ঠিকানাটাই—

চন্দ্রকান্ত। সর্বনাশ করলে! এরই মধ্যে স্বর্ণের কথাটা মনে এসেছে? সাদা ভাষায় ওর মানে হচ্ছে পণের টাকা— তোমার রজনীগন্ধার গন্ধটা তা হলে ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটের দিক থেকেই এল বুঝি?

বিনোদ। ছি ছি চন্দ্র, এমন কথাটাও তোমার মুখ দিয়ে বেরোল। আমি তুচ্ছ টাকার কথাই কি ভাবছি?

চন্দ্রকান্ত। আজকালকার দিনে কোন্‌টা তুচ্ছ, কন্যাটা না পণটা, তার হিসেব করা শক্ত নয়। যুবকরা তো সোনার মৃগ দেখেই ছোটে, সীতা পড়ে থাকেন পশ্চাতে।

বিনোদ। যুবক যে কে, সে কি তার বয়স গুণে বের করতে হবে, আর সোনার রেণু যে কাকে বলে সে কি বুঝবে তার ভরি ওজন করে?

চন্দ্রকান্ত। এটা বেশ বলেছ, তোমার কবিতায় লিখে ফেলো হে, কথাটা আজ বাদে কাল হারিয়ে না যায়। আমার একটা লাইন মনে এল, তুমি কবি, তার পাদপূরণ করে দাও দেখি—

ও ভোলা মন, বল্ দেখি ভাই,
কোন্ সোনা তোর সোনা।

বিনোদ। কেনাবেচার দেনালেনায়
যায় না তারে গোনা।

চন্দ্রকান্ত। ভ্যালা মোর দাদা! আচ্ছা, আর-এক লাইন—

ও ভোলা মন, বল্ সে সোনা
কেমন করে গলে।

বিনোদ। গলে বুকের দুখের তাপে,
গলে চোখের জলে।

চন্দ্রকান্ত। বহুৎ আচ্ছা! আর-এক লাইন—

ও ভোলা মন, সেই সোনা তোর
কোন্ খনিতে পাই?

বিনোদ। সেই বিধাতার খেয়ালে যার
ঠিক-ঠিকানা নাই।

চন্দ্রকান্ত। ক্যা বাৎ। আচ্ছা, আর-এক লাইন—

ও ভোলা মন, সোনার সে ধন
রাখবি কেমন করে?

বিনোদ। রাখব তারে ধ্যানের মাঝে
মনের মধ্যে ভরে।

চন্দ্রকান্ত। বাস্, আর দরকার নেই, ফুল্ মার্ক পেয়েছ— পাস্‌ড্ উইথ্ অনার্স। আর ভয় নেই, সন্ধানে বেরিয়ে পড়া যাক—

সোনার স্বপন ধরুক-না রূপ
অপরূপের হাটে।

সোনার বাঁশি বাজাও, রসিক,
রসের নবীন নাটে।

বিনোদ। চন্দরদা, কে বলে তুমি কবি নও?

চন্দ্রকান্ত। ছায়ায় পড়ে গেছি ভাই, চন্দ্রগ্রহণ লেগেছে— তোমরা না থাকলে আমিও কবি বলে চলে যেতে পারতুম, কবিসম্রাট নাও যদি হতুম অন্তত কবি-তালুকদার হওয়া অসম্ভব ছিল না। দেখেছি, প্রাণের ভিতরটাতে মাঝে মাঝে রস উছলে ওঠে, কিন্তু তার ধারাটা মাসিকপত্র পর্যন্ত পৌঁছয় না।

বিনোদ। ঘরে আছে রসসমুদ্র, সেইখানেই লুপ্ত হয়ে যায়!

চন্দ্রকান্ত। এক্‌সেলেণ্ট্‌। কবি না হলে এই গূঢ় খবর আন্দাজ করতে পারত কে বলো। ঐ যে আসছে আমাদের মেডিকাল্‌ স্টুডেণ্ট্‌।

গদাইয়ের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। এই যে, গদাই! শরীরতত্ত্ব ছেড়ে হঠাৎ কবির দরবারে যে? তোমার বাবা জানলে যে শিউরে উঠবেন।

গদাই। না ভাই, প্যাথলজি স্টাডি করবার পক্ষে তোদের সংসর্গটা একেবারেই ব্যর্থ নয়। তোদের হৃদয়টা যে সর্বদাই আইঢাই করছে, সেটা অজীর্ণ রোগের একটি নামান্তর তা জানিস? বেশ ভালো করে আহারটি করলে এবং সেটি হজম করতে পারলে কবিত্বরোগ কাছে ঘেঁষতে পারে না। আধ-পেটা করে খাও, অম্বলের ব্যামোটি বাধাও, আর অমনি কোথায় আকাশের চাঁদ, কোথায় দক্ষিণের বাতাস, কোথায় কোকিলপক্ষীর ডাক, এই নিয়ে প্রাণ আনচান করতে থাকে; জানলার কাছে বসে বসে মনে হয় কী যেন চাও, যা চাও সেটি যে বাই-কার্বোনেট্‌-অফ-সোডা তা কিছুতেই বুঝতে পার না।

চন্দ্রকান্ত। হৃদ্‌যন্ত্রটির বাসা পাকযন্ত্রের ঠিক উপরেই, এ কথা কবিরা মানে না, কিন্তু কবিরাজরা মানে।

গদাই। ঐ যে যাকে ভালোবাসা বল সেটা যে শুদ্ধ একটা স্নায়ুর ব্যামো, তার আর সন্দেহ নাই। আমার বিশ্বাস অন্যান্য ব্যামোর মতো তারও একটা ওষুধ বের হবে।

চন্দ্রকান্ত। হবে বৈকি। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোবে— 'হৃদয়-বেদনার জন্য অতি উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ! বিরহনিবারণী বটিকা; রাত্রে একটি সকালে একটি সেবন করিলে বিরহভার একেবারে নিঃশেষে অবসান।'

আচ্ছা, ভাই বিনু, এক কথায় বলে দে দেখি কিরকম মেয়ে তোর পছন্দ।

বিনোদ। আমি কিরকম চাই জান? যাকে কিছু বোঝবার জো নেই। যাকে ধরতে গেলে পালিয়ে যায়, পালাতে গেলে যে ধরে টেনে নিয়ে আসে।

চন্দ্রকান্ত। বুঝেছি। যে কোনো কালেই পুরোনো হবে না। মনের কথা টেনে বলেছ ভাই! পাওয়া শক্ত। আমরা ভুক্তভোগী, জানি কিনা, বিয়ে করলেই মেয়েগুলো দুদিনেই বহুকেলে পড়া পুঁথির মতো হয়ে আসে; মলাটটা আধখানা ছিঁড়ে চল্ চল্ করছে, পাতাগুলো দাগি হয়ে খুলে আসছে, কোথায় সে আঁটসাঁট বাঁধুনি, কোথায় সে সোনার জলের ছাপ! আচ্ছা, সে যেন হল, আর চেহারা কেমন?

বিনোদ। ছিপ্ছিপে, মাটির সঙ্গে অতি অল্পই সম্পর্ক, যেন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।

চন্দ্রকান্ত। আর বেশি বলতে হবে না, বুঝে নিয়েছি। তুমি চাও পদ্যের মতো চোদ্দটি অক্ষরে বাঁধাছাঁদা, চলতে ফিরতে ছন্দটি রেখে চলে; এ দিকে মল্লিনাথ, ভরত শিরোমণি, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তার টিকে-ভাষ্য করে থই পায় না। বুঝেছ বিন্দা, চাইলেই তো পাওয়া যায় না—

বিনোদ। কেন, তোমার কপালে তো মন্দ জোটে নি।

চন্দ্রকান্ত। মন্দ বলতে সাহস করি নে, কিন্তু ভাই, সে গদ্য, তাতে ছাঁদ নেই, ঢিল কলমে লেখা।

গদাই। আর ছাঁদে কাজ নেই ভাই! আবার তোমার কিরকম ছাঁদ সেটাও তো দেখতে হবে।

চন্দ্রকান্ত। তোরা বুঝবি নে, গদাই, ভিতরে গীতগোবিন্দের অল্প একটু আমেজ আছে; সুযোগ ঘটলে ললিতলবঙ্গলতার সঙ্গে ছন্দের মিল হতেও পারত। চাঁদের আলোয় মুখের দিকে চেয়ে বেলফুলের মালা হাতে প্রেয়সী যদি বলত—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল

নেহাত অসহ্য হত না। প্রেয়সী সর্বদা এসেও থাকেন, কিছুই যে বলেন না এত বড়ো বদনাম দিতে পারব না। কিন্তু বাক্যগুলো, বিশেষত তার সুরটা এমনটি হয় না—

গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

গদাই। দেখো চন্দরদা, বিয়ে করবার প্রসঙ্গে পছন্দ করার কথাটা একেবারেই খাটে না। বিয়েটা হল মনোথিইজ্‌ম্ আর পছন্দটা হল পলিথিইজ্‌ম্। দুটোর থিওলজি একেবারে উল্টো। বিয়ের ডেফিনিশনই হচ্ছে জন্মের মতো পছন্দ-বায়ুটাকে

খতম করে দেওয়া। তেত্রিশ কোটিকে একের মধ্যে নিঃশেষে বিসর্জন করা।

[পাশের বাড়ি হইতে গানের শব্দ

বিনোদ। ঐ শোনো, গান।

গদাই। কার গান হে?

চন্দ্রকান্ত। চুপ করে খানিকটা শোনোই-না। পরে পরিচয় দেব।

নেপথ্যে গান

কাছে যবে ছিল, পাশে
হল না যাওয়া।
চলে যবে গেল, তারি
লাগিল হাওয়া।
যবে ঘাটে ছিল নেয়ে
তারে দেখি নাই চেয়ে,
দূর হতে শুনি স্রোতে
তরণী বাওয়া।

যেখানে হল না খেলা
সে খেলাঘরে
আজি নিশিদিন মন
কেমন করে।
হারানো দিনের ভাষা
স্বপ্নে আজি বাঁধে বাসা,
আজ শুধু আঁখিজলে
পিছনে চাওয়া।

চন্দ্রকান্ত। বিন্দা, আজকাল রাধিকার দলই বাঁশি বাজাতে শিখেছে, কলির কৃষ্ণগুলোকে বাসা থেকে পথে বের করবে। দেখো-না নাড়ীটা বেশ একটু দ্রুত চলছে।

বিনোদ। চন্দ্র, আজ কী করব ভাবছিলুম, একটা মতলব মাথায় এসেছে।

চন্দ্রকান্ত। কী বলো দেখি।

বিনোদ। চলো, যে মেয়েটি গান গায় ওর সঙ্গে আজই আমার বিয়ের সম্বন্ধ করে আসি গে।

চন্দ্রকান্ত। বল কী!

বিনোদ। আর তো বসে বসে ভালো লাগছে না।

চন্দ্রকান্ত। কিন্তু দেখাশুনা তো করবে, আলাপ-পরিচয় তো করতে হবে? আমরা বিয়ে করেছিলুম চোখ বুজে বড়ি গেলার মতো, মুখে স্বাদ পেলুম না, পেটের মধ্যে পৌঁছে খুব কষে ক্রিয়া করতে লাগল, কিন্তু তোদের তা তো চলবে না।

বিনোদ। না, তাকে দেখতে চাই নে। আমি ঐ গানরূপটিকে বরণ করব।

চন্দ্রকান্ত। বিনু, এ কথাটা তোর মুখেও একটু বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে। তার চেয়ে একটা গ্রামোফোন কেন্-না? এ যে ভাই মানুষ, দেখেশুনে নেওয়া ভালো।

বিনোদ। মানুষকে কি চোখ চাইলেই দেখা যায়? তুমিও যেমন! রাখো জীবনটা বাজি, চোখ বুজে দান তুলে নাও, তার পরে হয় রাজা নয় ফকির; একেই তো বলে খেলা।

চন্দ্রকান্ত। উঃ! কী সাহস! তোমার কথা শুনলে আমার মরচে-পড়া বুকেও ঝলক মারে, ফের আর-একটা বিয়ে করতে ইচ্ছে করে। না দেখে বিয়ে তো আমরাও করেছি, কিন্তু এমনতরো মরিয়া করে তোলে নি।

গদাই। তা বলি, যদি বিয়ে করতে হয় নিজে না দেখে বিয়ে করাই ভালো। ডাক্তারের পক্ষে নিজের চিকিৎসা করাটা কিছু নয়। মেয়েটি কে বলো তো হে চন্দরদা।

চন্দ্রকান্ত। আমাদের নিবারণবাবুর বাড়িতে থাকেন, নাম কমলমুখী। আদিত্য-বাবু আর নিবারণবাবু পরম বন্ধু ছিলেন। আদিত্য মরবার সময় মেয়েটিকে নিবারণ-বাবুর হাতে সমর্পণ করে দিয়ে গেছেন।

গদাই। তুমি তোমার প্রতিবেশিনীকে আগে থাকতেই দেখ নি তো?

চন্দ্রকান্ত। আমার কি আর আশে পাশে দৃষ্টি দেবার জো আছে! আমার এ দুটি চক্ষুই একেবারে দস্তখতি সীলমোহর করা, অন্ হার্ ম্যাজিস্টিস্ সার্ভিস্। তবে শুনেছি বটে, দেখতে ভালো এবং স্বভাবটিও ভালো।

গদাই। আচ্ছা, এখন তা হলে আমরা কেউ দেখব না, একেবারে সেই বিবাহের রাত্রে চমক লাগবে।

চন্দ্রকান্ত। তোমরা একটু বোসো ভাই, আমি অমনি চট করে চাদরটা পরে আসি। এই পাশের ঘরেই।

[প্রস্থান

পাশের ঘরে

চন্দ্রকান্ত ও ক্ষান্তমণি

চন্দ্রকান্ত। বড়োবউ, ও বড়োবউ! চাবিটা দাও দেখি।

ক্ষান্তমণি। কেন জীবনসর্বস্ব নয়নমণি, দাসীকে কেন মনে পড়ল?

চন্দ্রকান্ত। ও আবার কি! যাত্রার দল খুলবে নাকি? আপাতত একটা সাফ দেখে চাদর বের করে দাও দেখি, এখনি বেরোতে হবে—

ক্ষান্তমণি। (অগ্রসর হইয়া) আদর চাই! প্রিয়তম, তা আদর করছি।

চন্দ্রকান্ত। (পশ্চাতে হঠিয়া) আরে, ছি ছি ছি! ও কী ও!

ক্ষান্তমণি। নাথ, বেলফুলের মালা গেঁথে রেখেছি, এখন কেবল চাঁদ উঠলেই হয়—

চন্দ্রকান্ত। ও! গুণবর্ণনা আড়াল থেকে সমস্ত শোনা হয়েছে দেখছি। বড়ো-বউ, কাজটা ভালো হয় নি। ওটা বিধাতার অভিপ্রায় নয়। তিনি মানুষের শ্রবণশক্তির একটা সীমা ঠিক করে দিয়েছেন, তার কারণই হচ্ছে পাছে অসাক্ষাতে যে কথাগুলো হয় তাও মানুষ শুনতে পায়; তা হলে পৃথিবীতে বন্ধুত্ব বল, আত্মীয়তা বল, কিছুই টিকতে পারে না।

ক্ষান্তমণি। ঢের হয়েছে গোঁসাইঠাকুর, আর ধর্মোপদেশ দিতে হবে না। আমাকে তোমার পছন্দ হয় না, না?

চন্দ্রকান্ত। কে বললে পছন্দ হয় না?

ক্ষান্তমণি। আমি গদ্য, আমি পদ্য নই, আমি শোলোক পড়ি নে, আমি বেলফুলের মালা পরাই নে—

চন্দ্রকান্ত। আমি গললগ্নীকৃতবস্ত্র হয়ে বলছি, দোহাই তোমার, তুমি শোলোক পোড়ো না, তুমি মালা পরিয়ো না, ওগুলো সবাইকে মানায় না—

ক্ষান্তমণি। কী বললে?

চন্দ্রকান্ত। আমি বললুম যে, বেলফুলের মালা আমাকে মানায় না, তার চেয়ে সাফ চাদরে ঢের বেশি শোভা হয়— পরীক্ষা করে দেখো।

ক্ষান্তমণি। যাও যাও, আর ঠাট্টা ভালো লাগে না।

চন্দ্রকান্ত। (নিকটে আসিয়া) কথাটা বুঝলে না ভাই? কেবল রাগই করলে! শোনো, বুঝিয়ে দিচ্ছি—

ভালোবাসার থার্মোমিটারে তিন মাত্রার উত্তাপ আছে। মানুষ যখন বলে 'ভালো-বাসি নে' সেটা হল ৯৫ ডিগ্রি, যাকে বলে সাবনর্মাল। যখন বলে 'ভালোবাসি' সেটা হল

নাইন্টিএইট পয়েন্ট ফোর, ডাক্তাররা তাকে বলে নর্মাল, তাতে একেবারে কোনো বিপদ নেই। কিন্তু প্রেমজ্বর যখন ১০৫ ছাড়িয়ে গেছে তখন রুগি আদর করে বলতে শুরু করেছে 'পোড়ারমুখি', তখন চন্দ্রবদনীটা একেবারে সাফ ছেড়ে দিয়েছে। যারা প্রবীণ ডাক্তার তারা বলে এইটেই হল মরণের লক্ষণ। বড়োবউ, নিশ্চয় জেনো, বন্ধুমহলে আমিও যখন প্রলাপ বকি, তোমাকে যা না বলবার তাই বলি, তখন সেটা প্রণয়ের ডিলিরিয়ম, তখন বাঁধা আদরের ভাষায় একেবারে কুলোয় না; গাল দিতে না পারলে ভালোবাসার ইস্টিমের চাপে বুক ফেটে যায়, বিশ্রী রকমের অ্যাক্‌সিডেণ্ট হতে পারে। নাড়ী রসস্থ হলে তাতে ভাষা যে কিরকম এলোমেলো হয়ে ওঠে, তা সেই ডাক্তারই বোঝে রসবোধের যে একেবারে এম্. ডি.।

ক্ষান্তমণি। রক্ষে করো, আমার অত ডাক্তারি জানা নেই।

চন্দ্রকান্ত। সে তো ব্যবহারেই বুঝতে পারি নইলে লয়াল্‌টিকে সিডিশন বলে সন্দেহ করবে কেন। কিন্তু নিশ্চয় রুগির দশা তোমাকেও মাঝে মাঝে ধরে। আচ্ছা, কলতলায় দাঁড়িয়ে তুমি কখনো পদ্মঠাকুরঝিকে বলো নি— আমার এমনি কপাল যে বিয়ে করে ইস্তিক সুখ কাকে বলে একদিনের তরে জানলুম না? আমার কানে যদি সে কথা আসত তা হলে আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।

ক্ষান্তমণি। আমি পদ্মঠাকুরঝিকে কখ্‌খনো অমন কথা বলি নি।

চন্দ্রকান্ত। আচ্ছা, তা হলে সাফ চাদরটা এনে দাও।

ক্ষান্তমণি। (চাদর আনিয়া দিয়া) তুমি বাইরে বেরোচ্ছ যদি, চুলগুলো কাগের বাসার মতো করে বেরিয়ো না। একটু বোসো, তোমার চুল ঠিক করে দিই।

[চিরুনি ব্রুস লইয়া আঁচড়াইতে প্রবৃত্ত

চন্দ্রকান্ত। হয়েছে, হয়েছে।

ক্ষান্তমণি। না হয় নি, একদণ্ড মাথা স্থির করে রাখো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। তোমার সামনে আমার মাথার ঠিক থাকে না, দেখতে দেখতে ঘুরে যায়—

ক্ষান্তমণি। অত ঠাট্টায় কাজ কী! নাহয় আমার রূপ নেই, গুণ নেই— একটা ললিতলবঙ্গলতা খোঁজ করে আনো গে, আমি চললুম।

[চিরুনি ব্রুস ফেলিয়া দ্রুত প্রস্থান

চন্দ্রকান্ত। এখন আর সময় নেই, ফিরে এসে রাগ ভাঙাতে হবে।

বিনোদ (নেপথ্য হইতে)। ওহে, আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে? তোমাদের প্রেমাভিনয় সাঙ্গ হল কি?

চন্দ্রকান্ত। এইমাত্র যবনিকাপতন হয়ে গেল। হৃদয়বিদারক ট্রাজেডি। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

নিবারণের বাড়ি

নিবারণ ও শিবচরণ

নিবারণ। তবে তাই ঠিক রইল? এখন আমার ইন্দুমতীকে তোমার গদাইয়ের পছন্দ হলে হয়।

শিবচরণ। সে বেটার আবার পছন্দ কী! বিয়েটা তো আগে হয়ে যাক্, তার পর পছন্দ সময়মতো পরে করলেই হবে।

নিবারণ। না ভাই, কালের যেরকম গতি সেই অনুসারেই চলতে হয়।

শিবচরণ। তা হোক-না কালের গতি, অসম্ভব কখনো সম্ভব হতে পারে না। একটু ভেবেই দেখো-না, যে ছোঁড়া পূর্বে একবারও বিবাহ করে নি সে স্ত্রী চিনবে কী করে? পাট না চিনলে পাটের দালালি করা যায় না, আর স্ত্রীলোক কি পাটের চেয়ে সিধে জিনিস? আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর হল আমি গদাইয়ের মাকে বিবাহ করেছি, তার থেকে পাঁচটা বৎসর বাদ দাও, তিনি গত হয়েছেন সে আজ বছর পাঁচেকের কথা হবে, যা হোক তিরিশটা বৎসর তাঁকে নিয়ে চালিয়ে এসেছি, আমি আমার ছেলের বউ পছন্দ করতে পারব না আর সে ছোঁড়া ভূমিষ্ঠ হয়েই আমার চেয়ে পেকে উঠল? তবে যদি তোমার মেয়ের কোনো ধনুর্ভঙ্গ পণ থাকে, আমার গদাইকে যাচিয়ে নিতে চান, সে আলাদা কথা।

নিবারণ। নাঃ, আমার মেয়ে কোনো আপত্তিই করবে না, তাকে যা বলব সে তাই শুনবে। আর-একটি কথা তোমাকে বলা উচিত। আমার মেয়েটির কিছু বয়স হয়েছে।

শিবচরণ। আমিও তাই চাই। ঘরে যদি গিন্নি থাকতেন তা হলে বউমা ছোটো হলে ক্ষতি ছিল না। এখন এই বুড়োটাকে যত্ন করে আর ছেলেটাকে কড়া শাসনে রাখতে পারে, এমন একটি মেয়ে না হলে সংসারটি গেল।

নিবারণ। তা হলে তোমার একটি অভিভাবকের নিতান্ত দরকার দেখছি।

শিবচরণ। হাঁ ভাই, মা ইন্দুকে বোলো আমার গদাইয়ের ঘরে এলে এই বুড়ো নাবালকটিকে প্রতিপালনের ভার তাঁকেই নিতে হবে। তখন দেখব তিনি কেমন মা।

নিবারণ। তা ইন্দুর সে অভ্যাস আছে। বহুকাল একটি আস্ত বুড়ো বাপ তারই

হাতে পড়েছে। দেখতেই তো পাচ্ছ, ভাই, খাইয়েদাইয়ে বেশ একরকম ভালো অবস্থাতেই রেখেছে।

শিবচরণ। তাই তো। তাঁর হাতের কাজটিকে দেখে তারিফ করতে হয়। যা হোক, আজ তবে আসি। গুটিদুয়েক রোগী এখনো মরতে বাকি আছে।

[প্রস্থান

ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দু। ও বুড়োটি কে এসেছিল বাবা?

নিবারণ। কেন মা 'বুড়ো বুড়ো' করছিস— তোর বাবাও তো বুড়ো।

ইন্দু। (নিবারণের পাকা চুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া) তুমি তো আমাদের আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো, তোমার সঙ্গে কার তুলনা? কিন্তু ওকে তো কখনো দেখি নি।

নিবারণ। ওর সঙ্গে ক্রমে খুবই পরিচয় হবে—

ইন্দু। আমি খুব পরিচয় করতে চাই নে।

নিবারণ। তোর এ বাবা পুরোনো ঝর্‌ঝরে হয়ে এসেছে, একবার বাবা বদল করে দেখবি নে ইন্দু?

ইন্দু। তবে আমি চললুম।

নিবারণ। না না, শোন্‌-না। তোরই যেন বাবার দরকার নেই, আমার একটি বাপের পদ খালি আছে— তাই আমি একটি সন্ধান করে বের করেছি মা।

ইন্দু। তুমি কী বকছ বুঝতে পারছি নে।

নিবারণ। নাঃ, তুমি আমার তেমনি হাবা মেয়ে কিনা। সব বুঝতে পেরেছিস, কেবল দুষ্টুমি!

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। তিনটি বাবু এসেছে দেখা করতে।

ইন্দু। তাদের যেতে বলে দে। সকাল থেকে কেবলই বাবু আসছে।

নিবারণ। না না, ভদ্রলোক এসেছে, দেখা করা চাই।

ইন্দু। তোমার যে নাবার সময় হয়েছে।

নিবারণ। একবার শুনে নিই কী জন্যে এসেছেন, বেশি দেরি হবে না।

ইন্দু। তুমি একবার গল্প পেলে আর উঠতে চাইবে না, আবার কালকের মতো খেতে দেরি করবে। আচ্ছা, আমি ঐ পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে রইলুম, পাঁচ মিনিট বাদে ডেকে পাঠাব।

নিবারণ। তোর শাসনের জ্বালায় আমি আর বাঁচি নে। চাণক্যের শ্লোক জানিস তো? প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ। তা আমার কি সে বয়স পেরোয় নি?

[ইন্দুর প্রস্থান

নিবারণ। (ভৃত্যের প্রতি) বাবুদের ডেকে নিয়ে আয়।

চন্দ্রকান্ত বিনোদবিহারী ও গদাইয়ের প্রবেশ

নিবারণ। এই যে চন্দ্রবাবু! আসতে আজ্ঞা হোক। আপনারা সকলে বসুন। ওরে, তামাক দিয়ে যা।

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে না, তামাক থাক্।

নিবারণ। তা, ভালো আছেন চন্দ্রবাবু?

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্বাদে একরকম আছি ভালো।

নিবারণ। আপনাদের কোথায় থাকা হয়?

বিনোদ। আমরা কলকাতাতেই থাকি।

চন্দ্রকান্ত। মহাশয়ের কাছে আমাদের একটি প্রস্তাব আছে।

নিবারণ। (শশব্যস্ত হইয়া) কী বলুন।

চন্দ্রকান্ত। মহাশয়ের ঘরে আদিত্যবাবুর যে অবিবাহিত কন্যাটি আছেন তাঁর জন্যে একটি সৎপাত্র পাওয়া গেছে। যদি অভিপ্রায় করেন—

নিবারণ। অতি উত্তম কথা। পাত্রটি কে?

চন্দ্রকান্ত। বিনোদবিহারীবাবুর নাম শুনেছেন বোধ করি।

নিবারণ। বিলক্ষণ! তা আর শুনি নি! তিনি আমাদের দেশের একজন প্রধান লেখক। 'জ্ঞানরত্নাকর' তো তাঁরি লেখা?

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে না। সে বৈকুণ্ঠ বসাক বলে একটি লোকের লেখা।

নিবারণ। তাই বটে। আমার ভুল হয়েছে। তবে 'প্রবোধলহরী'? আমি ঐ দুটোতে বরাবর ভুল করে থাকি।

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে না। 'প্রবোধলহরী' তাঁর লেখা নয়। সেটা কার বলতে পারি নে।

নিবারণ। তবে তাঁর একখানা বইয়ের নাম করুন দেখি।

চন্দ্রকান্ত। 'কাননকুসুমিকা' দেখেছেন কী?

নিবারণ। 'কাননকুসুমিকা'! না, দেখি নি। নামটি অতি সুললিত। বাংলা

বই কবে সেই বাল্যকালে পড়তেম। তখন অবশ্যই 'কাননকুসুমিকা' পড়ে থাকব, স্মরণ হচ্ছে না। তা বিনোদবাবুর পুত্রের বয়স কত হবে, ক'টি পাস করেছেন তিনি ?

চন্দ্রকান্ত। মশায় ভুল করছেন। বিনোদবাবুর বয়স অতি অল্প। তিনি এম. এ. পাস করে সম্প্রতি বি. এল. উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিবাহ হয় নি। তাঁরই কথা মহাশয়কে বলছিলুম। তা আপনার কাছে প্রকাশ করে বলাই ভালো, এই এঁর নাম বিনোদবাবু।

নিবারণ। আপনি বিনোদবাবু! আজ আমার কী সৌভাগ্য! আমি মেয়েদের কাছে শুনেছি আপনি দিব্যি লিখতে পারেন।

চন্দ্রকান্ত। তা এঁর সঙ্গে আপনার ভাইঝির বিবাহ দিতে যদি আপত্তি না থাকে—

নিবারণ। আপত্তি! আমার পরম সৌভাগ্য।

চন্দ্রকান্ত। তা হলে এ সম্বন্ধে যা যা স্থির করবার আছে কাল এসে মহাশয়ের সঙ্গে কথা হবে।

নিবারণ। যে আজ্ঞে। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি— মেয়েটির বাপ টাকাকড়ি কিছু রেখে যেতে পারেন নি। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি, এমন লক্ষ্মী মেয়ে আর পাবেন না।

চন্দ্রকান্ত। তবে অনুমতি হয় তো এখন আসি।

নিবারণ। এত শীঘ্র যাবেন ? বলেন কী! আর-একটু বসুন-না।

চন্দ্রকান্ত। আপনার এখনো নাওয়া খাওয়া হয় নি—

নিবারণ। সে এখন ঢের সময় আছে। বেলা তো সবে—

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে বেলা নিতান্ত কম হয় নি। এখন যদি আজ্ঞা করেন তো উঠি।

নিবারণ। তবে আসুন। দেখুন চন্দরবাবু, মতি হালদারের ঐ যে কুসুমকানন না কী বইখানা বললেন ওটা লিখে দিয়ে যাবেন তো।

চন্দ্রকান্ত। কাননকুসুমিকা ? বইখানা পাঠিয়ে দেব, কিন্তু সেটা মতি হালদারের নয়।

নিবারণ। তবে থাক। বরঞ্চ বিনোদবাবুর একখানা প্রবোধলহরী যদি থাকে তো একবার—

চন্দ্রকান্ত প্রবোধলহরী তো—

বিনোদ। আঃ, থামো-না! তা, যে আজ্ঞে, আমিই পাঠিয়ে দেব। আমার প্রবোধলহরী, বারবেলাকথন, তিথিদোষখণ্ডন, প্রায়শ্চিত্তবিধি এবং নূতন পঞ্জিকা আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

নিবারণ। দেখুন, বিনোদবাবুর একখানি ফোটোগ্রাফ পাওয়া যায় কি ? তা হলে কমলকে একবার—

চন্দ্রকান্ত। ফোটোগ্রাফ সঙ্গেই এনেছি, কিন্তু এতে আমাদের তিন জনেরই ছবি আছে।

নিবারণ। তা হোক, ছবিটি দিব্যি উঠেছে, এতেই কাজ চলবে।

চন্দ্রকান্ত। তা হলে আজ্ঞা হয় তো আসি।

[প্রস্থান

নিবারণ। নাঃ, লোকটার বিদ্যে আছে। বাঁচা গেল, একটি মনের মতো সৎপাত্র পাওয়া গেল। কমলের জন্য আমার বড়ো ভাবনা ছিল।

ইন্দুর প্রবেশ

ইন্দু। বাবা, তোমার হল?

নিবারণ। ও ইন্দু, তুই তো দেখলি নে— তোরা সেই যে বিনোদবাবুর লেখার এত প্রশংসা করিস, তিনি আজ এসেছিলেন।

ইন্দু। আমার তো খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই, তোমার এখানে যত রাজ্যির অকেজো লোক এসে জোটে আর আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের দেখি! আচ্ছা বাবা, চন্দ্রবাবু বিনোদবাবু ছাড়া আর একটি যে লোক এসেছিল— বদ্-চেহারা লক্ষ্মীছাড়ার মতো দেখতে, চোখে চশমা-পরা, সে কে?

নিবারণ। তুই যে বলছিলি আড়াল থেকে দেখিস নে? বদ্-চেহারা আবার কার দেখলি? বাবুটি তো দিব্যি ফুটফুটে কার্তিকের মতো দেখতে। তাঁর নামটি কী জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

ইন্দু। তাকে আবার ভালো দেখতে হল? দিনে দিনে তোমার কী যে পছন্দ হচ্ছে বাবা! এখন নাইতে চলো।—

[নিবারণের প্রস্থান

নাঃ, ওঁর নামটা জানতে হচ্ছে। নিশ্চয় ক্ষান্তদিদি বলতে পারবেন।— বাবা, শোনো শোনো।

[নিবারণের পুনঃপ্রবেশ

ওরা তোমাকে বিনোদবাবুর একটা ফোটোগ্রাফ দিয়ে গেল না?

নিবারণ। হাঁ, এতে তিন বন্ধুরই ছবি আছে।

ইন্দু। তাতে ক্ষতি নেই। ওটা আমাকে দাও-না, আমি দিদিকে দেখাব।

নিবারণ। ভেবেছিলুম, আমি নিজে দেখাব।

ইন্দু। না বাবা, আমি দেখাব, বেশ মজা হবে।

নিবারণ। এই নে মা, কিন্তু ওকে নিয়ে বেশি ঠাট্টা করিস নে।

ইন্দু। বাবা, আমার সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা বাস করছে, আর যাই হোক ঠাট্টায় ওর আর বিপদের আশঙ্কা নেই।

[নিবারণের প্রস্থান

ইন্দু। কমলদিদি, কমলদিদি।

কমলের প্রবেশ

কমল। কী ইন্দু?

ইন্দু। আর দেরি কোরো না।

কমল। কেন, কী করতে হবে বল্‌-না।

ইন্দু। এখন কাব্যশাস্ত্রমতে কমলকে বিকশিত হয়ে উঠতে হবে।

কমল। কেন বল্‌ তো।

ইন্দু। খড়্‌খড়ের ফাঁক দিয়ে যাঁর অরুণরেখার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল সেই দিনমণি উঠে পড়েছেন তোমার ভাগ্যগগনে।

কমল। তুই খবর পেলি কোথা থেকে?

ইন্দু। স্বয়ং দিনমণির কাছ থেকে।

কমল। একটু স্পষ্ট ভাষায় কথা ক।

ইন্দু। আমার চেয়ে ঢের বেশি অস্পষ্ট ভাষায় যিনি কাব্য রচনা করেন সেই কবি স্বয়ং এই ঘরে পরিদৃশ্যমান হয়েছিলেন।

কমল। কী কারণে?

ইন্দু। তোমার উপর করক্ষেপ করবার দাবি জানিয়ে যেতে। এতদিন যিনি ছিলেন তোমার কানের শোনা, এখন তিনি হবেন তোমার নয়নের মণি, বাবার কাছে স্বয়ং দরবার জানিয়ে গেছেন। তোমার মনের মানুষ এখন থেকে তোমারই কোণের মানুষ হবার উমেদার, কথাবার্তা ঠিকঠাক হয়ে গেছে। সুখবর কিনা বলো, দিদি!

কমল। এখনো বলবার সময় হয় নি।

ইন্দু। বলিস কী ভাই! কাব্যের চেয়ে কবির দাম বেশি নয়?

কমল। দামের তুলনা করব কী করে? দুটো জিনিস এক জাতের নয়, যেমন মধু আর মধুকর।

ইন্দু। সে কথা মানি, যেমন বাঁশ আর বাঁশি। বাঁশি যেরকম করে বাজে বাঁশ ঠিক তার বিপরীত ভাবে অন্তরে বাহিরে বাজতে পারে। তা হলে কী করা কর্তব্য এই-বেলা বলো। এখনো সময় আছে। নাহয় বাবাকে বলে আসি যে, কাব্যের মধ্যে

শুধু কথার মিল চাই, সেটাতে ভুল হলেও চলে ; কিন্তু কবির মধ্যে চাই প্রাণের মিল, সেটাতে ভুল হলে সাংঘাতিক। কাজ নেই দিদি, স্বয়ং দেখে শুনে পছন্দ করে নাও। ছবিটা দেখে তার ভূমিকা করতে পারো।

কমল। এর মধ্যে তো একজন দেখছি চন্দরবাবু।

ইন্দু। বাকি দুজনের মধ্যে কে বিনোদবাবু আন্দাজ কর্ দেখি। এর মধ্যে কেই বা কোকিল কেই বা কাক, কেই বা কবি কেই বা অকবি বল্ দেখি।

কমল। তোর মতন এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি আমার নেই ভাই!

ইন্দু। আচ্ছা এই নে, তোর ডেস্কের উপর রাখ্, চেয়ে দেখতে দেখতে ভক্তের ধ্যানদৃষ্টিতে সত্য আপনি প্রকাশিত হবে। দময়ন্তী ছজনের মধ্যে নলকে চিনে নিয়েছিলেন, তোর তো কেবল দুজন।

কমল। অত চিন্তায় অত ধ্যানে আমার দরকার নেই।

ইন্দু। বলিস কী দিদি ?

কমল। আমি তো স্বয়ম্বরা হতে যাচ্ছি নে বোন! তা আমার আবার পছন্দ! দুটো-একটা কাপড়চোপড় ছাড়া জীবনের ক'টা জিনিসই বা নিজের পছন্দ অনুসারে পাওয়া গেছে ? আপনাকেই আপনি পছন্দ করে নিতে পারি নি।

ইন্দু। তুই ভাই, কথায় কথায় বড়ো বেশি গম্ভীর হয়ে পড়িস। বিনোদের কাছে যদি অমনি করে থাকিস তা হলে সে তোর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে সাহস করবে না।

কমল। সেজন্য নাহয় তুই নিযুক্ত থাকিস।

ইন্দু। তা হলে যে তোর গাম্ভীর্য আরো সাতগুণ বেড়ে যাবে। দেখ্ ভাই, তুই তো একটা পোষা কবি হাতে পেলি, এবার তাকে দিয়ে তোর নিজের নামে কবিতা লিখিয়ে নিস, যতক্ষণ পছন্দ না হয় ছাড়িস নে। নিজের নামে কবিতা দেখলে কিরকম লাগে, কে জানে।

কমল। মনে হয়, আমার নাম করে আর কাকে লিখছে। তোর যদি শখ থাকে আমি তোর নামে একটা লিখিয়ে নেব।

ইন্দু। তুই কেন, সে আমি নিজে করে নেব। আমাদের যে সম্পর্ক আমি যে কান ধরে লিখিয়ে নিতে পারি। তুমি তো তা পারবে না। আপাতত ছবিটা তোর কাছে রাখ্।

কমল। ছবিতে আমার দরকার নেই।

ইন্দু। নেই দরকার ? তবে ওটা আমার রইল ? সর্বস্বত্ব ত্যাগ করলে ?

কমল। কেন বল্ দেখি। এত উৎসাহ কেন তোর ?

ইন্দু। সেদিন নাম খুঁজছিলুম, রূপও তো খুঁজতে হবে। এই ছবির মধ্যে যদি নামে রূপে মিল হয়ে যায়?

কমল। অর্থাৎ?

ইন্দু। অর্থাৎ (গদাইয়ের ছবি দেখাইয়া) এর নাম যদি গদাই না হয়, যদি কুমুদ কিম্বা পরিমল, কিম্বা কিশলয়, কিম্বা কোকনদ, কিম্বা কপিঞ্জল হয়ে দাঁড়ায়?

কমল। তা হলেই চুকে যাবে?

ইন্দু। একেবারে চুকে না যাক, মিউজিয়মে একটা প্রথম স্পেসিমেন্‌ পাওয়া যাবে তো?

কমল। আচ্ছা, তোর স্পেসিমেন্‌ জমা কর্‌— আপাতত তোর চুল বেঁধে দিই গে চল্‌।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চন্দ্রের অন্তঃপুর

ক্ষান্তমণি ও ইন্দুমতী

ইন্দু। তোমার স্বামী আদর করেই ঠাট্টা করে, সে কি আর সত্যি!

ক্ষান্তমণি। না ভাই, ঠাট্টা কি সত্যি ঠিক বুঝতে পারি নে। আর সত্যি হবারই বা আটক কী? নিজে তো জানি নিজের গুণ কত।

ইন্দু। তোমার স্বামীর আবার তেমনি সব বন্ধু জুটেছে, তারাই পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে তাঁর মন উতলা করে দেয়। বিশেষ সেদিন বিনোদবাবু আর তোমার স্বামীর সঙ্গে আর-একটি কে বাবু আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল, তাকে দেখে আমার আদবে ভালো লাগল না। লোকটা কে ভাই?

ক্ষান্তমণি। কী জানি ভাই! বন্ধু একটি-আধটি তো নয়, সবগুলোকে আবার চিনিও নে।

ইন্দু। এই দেখ্‌-না তার ছবি। (কাপড় খুঁজিয়া) এ কী হল! এই যাঃ, কোথায় ফেললুম!

ক্ষান্তমণি। কী ফেললি ?

ইন্দু। ফোটোগ্রাফ।

ক্ষান্তমণি। কার ?

ইন্দু। বিনোদবাবুর। নিশ্চয় তোমাদের এই গলি পার হয়ে আসবার সময় রাস্তায় পড়ে গেছে। আমি যাই খুঁজে আনি গে।

ক্ষান্তমণি। ছি ছি, রাস্তার মাঝে ছবি খুঁজতে গিয়ে লোক দাঁড় করিয়ে দিবি যে ! সে ছবির এতই কিসের কদর ?

ইন্দু। হায় হায়, দিদি যদি কেঁদে-কেটে অনর্থপাত করে ?

ক্ষান্তমণি। তোর দিদি ? কমল ?

ইন্দু। হাঁ গো, তার হৃদয় তো পাষাণ নয়, সে যে বড়ো কোমল, কী জানি, আজ থেকে যদি সে হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু করে ?

ক্ষান্তমণি। সে আবার কী ?

ইন্দু। যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলে প্রায়োপবেশন।

ক্ষান্তমণি। আর জ্বালাস নে, বাংলা ভাষায় কী বলে তাই বল্-না।

ইন্দু। তাকে বলে উপোস ক'রে মরা।

ক্ষান্তমণি। আমি যেন কমলকে জানি নে— তুই হলেও বা সম্ভব হত। কেন ভাই, আসল জিনিস্ যখন ধরা দিয়েছে তখন ছবিটার এত খোঁজ কেন ?

ইন্দু। আসল জিনিসকে ডেস্কে বসিয়ে রাখা যায় না, দেরাজে বন্ধ করা চলে না। আসল জিনিসের মেজাজের ঠিক নেই— বেশি খিদে পেলে ভালোবাসার কথা তার মনে থাকে না, বেশি ভালোবাসা পেলে অস্থির করে তোলে— কিন্তু—

ক্ষান্তমণি। আচ্ছা আচ্ছা, তোর সেই 'কিন্তু' এত বেশি দুর্লভ নয়।

ইন্দু। ক্ষান্তদিদি, তোমার সেই বন্ধু তিনটির মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিটি কে বলো-না।

ক্ষান্তমণি। খুব সম্ভব গদাই। সে ওদের সঙ্গে প্রায়ই থাকে বটে।

ইন্দু। বাজি রাখতে পারি, সে গদাই নয়। তার নাম যদি গদাই হয় তা হলে আমার নাম মাতঙ্গিনী।

ক্ষান্তমণি। তা হলে ললিত।

ইন্দু। এই এতক্ষণে নামটা পাওয়া গেল। ললিত তার আর সন্দেহ নেই।

ক্ষান্তমণি। চেহারাটা সুন্দর তো ?

ইন্দু। সুন্দর বৈকি।

ক্ষান্তমণি। পাতলা, চোখে চশমা আছে ?

ইন্দু। হাঁ হাঁ, চশমা আছে। আর, সব কথাতেই মুচকে মুচকে হাসে।

ক্ষান্তমণি। তবে আমাদের ললিত চাটুজ্জে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

ইন্দু। ললিত চাটুজ্জে না হয়ে যায় না। বাজি রাখতে পারি।

ক্ষান্তমণি। কলুটোলার নৃত্যকালী চাটুজ্জের ছেলে। ছোকরাটি কিন্তু মন্দ নয় ভাই। এম. এ. পাস করে জলপানি পাচ্ছে।

ইন্দু। জলপানি পাবার মতোই চেহারা বটে। তা ওদের ঘরে স্ত্রী পুত্র পরিবার কেউ নেই নাকি? লক্ষ্মীছাড়ার মতো টো টো করে বেড়ায় কেন?

ক্ষান্তমণি। স্ত্রী পুত্র থেকেই বা কী হয়? ওর তো তবু নেই। বলে যে, রোজগার না ক'রে বিয়ে করবে না।

ইন্দু। জানিস, ক্ষান্তদিদি, ওদের তিন জনের ছবিতে যেন তিন কাল মূর্তিমান। চন্দ্রবাবু অতীত, বিনোদবাবু বর্তমান, আর ললিতবাবু ভাবী।

ক্ষান্তমণি। ভাবী? কার ভাবী লো?

ইন্দু। সে কথাটা রইল ভবিষ্যতের গর্ভে।

ক্ষান্তমণি। দেখ্ ভাই ইন্দু, তোকে সত্যি করে বলি। তোরা তো আমাকে বঙ্কিম-বাবুর বইগুলো পড়ালি, ভেবেছিলুম একটুও বুঝতে পারব না— কিন্তু বেশ লাগছে।

ইন্দু। এই দেখ্, মুশকিলে ফেললি তো। তোর মনটা এখন আয়েষা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ওজনমতো জগৎসিংহ পাবি কোথা?

ক্ষান্তমণি। তা বলিস নে ইন্দু। আমি যেরকম মাপের আয়েষা সেরকম মাপের জগৎসিংহও ঘরে মজুদ আছে। কিন্তু—

ইন্দু। চাল-চলনটা দোরস্ত হয় নি। মনে মনে আয়েষা হয়েছ, ব্যবহারে আয়েষা-গিরি করে উঠতে পারছ না।

ক্ষান্তমণি। কতকটা তাই বটে।

ইন্দু। প্র্যাক্‌টিকাল্ এডুকেশন্‌টা হয় নি আর-কি। কিছু দিন প্র্যাক্‌টিস্ চাই।

ক্ষান্তমণি। তোর ইংরিজি আমি বুঝতে পারি নে, ভাই।

ইন্দু। আমার বক্তব্য হচ্ছে, বঙ্কিমের কাছে মন্ত্র পেয়েছ, আমার কাছ থেকে তার সাধনা পেতে হবে।

ক্ষান্তমণি। তোমার কাছ থেকে?

ইন্দু। আমার কাছ থেকে হলেই নিরাপদ হবে। মনুসংহিতার সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর মিল রক্ষা করেই আমি তোমাকে শিক্ষা দেব। আজ এখনি হোক হাতে-খড়ি। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। মনে করো, আমি চন্দ্রবাবু, আপিস থেকে ফিরে এসেছি, খিদেয় প্রাণ

বেরিয়ে যাচ্ছে— তার পর তুমি কী করবে বলো দেখি। রোসো ভাই, চন্দ্রবাবুর ঐ চাপকান আর শামলাটা পরে নিই, নইলে আমাকে চন্দ্রবাবু মনে হবে না।

[আপিসের বেশ পরিধান ও ক্ষান্তর উচ্চহাস্য

ক্ষান্তমণি, স্বামীর প্রতি পরিহাস অত্যন্ত গর্হিত কার্য। পতিব্রতা রমণী কদাপি উচ্চহাস্য করেন না। কোনো কারণে হাস্য অনিবার্য হইলে সাধ্বী স্ত্রী প্রথমে স্বামীর অনুমতি লইয়া পরে বদনে অঞ্চল দিয়া নয়ন নত করিয়া ঈষৎ স্মিতহাস্য হাসিতে পারেন। এই গেল মনুসংহিতা, এবার এসো নবীন কবির গীতিকাব্যে। আমি আপিস থেকে ফিরে এসেছি, এখন তোমার কী কর্তব্য বলো।

ক্ষান্তমণি। প্রথমে তোমার চাপকানটি এবং শামলাটি খুলে দিই, তার পরে জলখাবার—

ইন্দু। নাঃ, তোমার কিছু শিক্ষা হয় নি। আচ্ছা, তুমি তবে চন্দ্রবাবু সাজো, আমি তোমার স্ত্রী সাজছি—

ক্ষান্তমণি। না ভাই, সে আমি পারব না—

ইন্দু। আচ্ছা, তবে আর-একবার চেষ্টা করো। বড়োবউ, চাপকানটা খুলে আমার ধুতি-চাদরটা এনে দাও তো।

ক্ষান্তমণি। (উঠিয়া) এই দিচ্ছি।

ইন্দু। ও কী করছ! তুমি ওইখানে হাতের উপর মাথা রেখে বসে থাকো— বলো, 'নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কী সুন্দর বাতাস দিচ্ছে! আজ আর কিছুতে মন লাগছে না, ইচ্ছে করছে পাখি হয়ে উড়ে যাই।'

ক্ষান্তমণি। (যথাশিক্ষিত) নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কী সুন্দর বাতাস দিচ্ছে! আজ আর কিছুতে মন লাগছে না, ইচ্ছে করছে পাখি হয়ে উড়ে যাই।

ইন্দু। কোথায় উড়ে যাবে? তার আগে আমায় লুচি দিয়ে যাও, ভারি খিদে পেয়েছে—

ক্ষান্তমণি। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) এই দিচ্ছি—

ইন্দু। এই দেখো, সব মাটি করলে। অস্থানে মনুসংহিতা এসে পড়ে। তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকো, বলো, 'লুচি? কই, লুচি তো আজ ভাজি নি। মনে ছিল না। আচ্ছা, লুচি কাল হবে এখন। আজ, এসো, এখানে এই মধুর বাতাসে বসে—'

চন্দ্র (নেপথ্য হইতে)। বড়োবউ!

ইন্দু। ঐ চন্দ্রবাবু আসছেন! আমাকে দেখতে পেয়েছেন বোধ হল। তুমি বোলো তো ভাই, বাগবাজারের চৌধুরীদের কাদম্বিনী। আমার পরিচয় দিয়ো না, লক্ষ্মীটি, মাথা খাও।

[পলায়ন

পাশের ঘর

গদাই আসীন। চাপকান-শামলাপরা ইন্দুর ছুটিয়া প্রবেশ

গদাই। একি!

ইন্দু। ও মা, এ যে সেই ললিতবাবু! আর তো পালাবার পথ নেই। (সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে চাপকান-শামলা খুলিয়া গদাইয়ের প্রতি) তোমার বাবুর এই শামলা আর এই চাপকান। সাবধান করে রেখো, হারিয়ো না। আর শীগগির দেখে এসো দেখি, বাগবাজারের চৌধুরীবাবুদের বাড়ি থেকে পালকি এসেছে কিনা।

গদাই। (হাসিয়া) যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান

ইন্দু। ছি ছি! ললিতবাবু কী মনে করলেন! যা হোক, আমাকে তো চেনেন না। ভাগ্যিস, হঠাৎ বুদ্ধি জোগালো, বাগবাজারের চৌধুরীদের নাম করে দিলুম। চন্দ্রবাবুর এ বাসাটিও হয়েছে তেমনি। অন্দর বাহির সব এক। এখন আমি কোন্ দিক দিয়ে পালাই? ওই আবার আসছে। মানুষটি তো ভালো নয়।

গদাইয়ের প্রবেশ

গদাই। ঠাকরুন, পালকি তো আসে নি। এখন কী আজ্ঞা করেন?

ইন্দু। এখন তুমি তোমার কাজে যেতে পারো। না, না, এ যে তোমার মনিব এ দিকে আসছেন। ওঁকে আমার খবর দেবার কোনো দরকার নেই, আমার পালকি নিশ্চয় এসেছে। [প্রস্থান

গদাই। কী চমৎকার! আর কী উপস্থিত বুদ্ধি! বা বা! আমাকে হঠাৎ একদম চাকর বানিয়ে দিয়ে গেল— সেও আমার পরম ভাগ্যি। বাঙালির ছেলে চাকরি করতেই জন্মেছি, কিন্তু এমন মনিব কি অদৃষ্টে জুটবে? নির্লজ্জতাও ওকে কেমন শোভা পেয়েছে! আহা, এই শামলা আর এই চাপকান চন্দরকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। বাগবাজারের চৌধুরী! সন্ধান নিতে হচ্ছে।

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। তুমি এ ঘরে ছিলে নাকি? তবে তো দেখেছ?

গদাই। চক্ষু থাকলেই দেখতে হয়— কিন্তু কে বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে কাদম্বিনী। আমার স্ত্রীর একটি বন্ধু।

গদাই। ওর স্বামী বোধ করি স্বাধীনতাওয়ালা?

চন্দ্রকান্ত। ওঁর আবার স্বামী কোথায়?

গদাই। মরেছে বুঝি? আপদ গেছে। কিন্তু বিধবার মতো বেশ তো—

চন্দ্রকান্ত। বিধবা নয় হে— কুমারী। যদি হঠাৎ স্নায়ুর ব্যামো ঘটে থাকে তো বলো, ঘটকালি করি।

গদাই। তেমন স্নায়ু হলে এতদিনে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।

চন্দ্রকান্ত। তা হলে চলো, একবার বিনোদকে দেখে আসা যাক। তার বিশ্বাস, সে ভারি একটা অসমসাহসিক কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, তাই একেবারে সপ্তমে চড়ে রয়েছে— যেন তার পূর্বে বঙ্গদেশে বাপ-পিতামহর আমল থেকে বিবাহ কেউ করে নি!

গদাই। মেয়েমানুষকে বিয়ে করতে হবে, তার আবার ভয় কিসের?

চন্দ্রকান্ত। বলো কী গদাই? বিধাতার আশীর্বাদে জন্মালুম পুরুষ হয়ে, কী জানি কার শাপে বিয়ে করতে গেলুম মেয়েমানুষকে, এ কি কম সাহসের কথা? গদাই, যেয়ো না হে! তোমাকে দরকার আছে, এখনি আসছি। [প্রস্থান

গদাই। (পকেট হইতে নোটবুক ও পেন্সিল বাহির করিয়া) আর তো পারছি নে। মাথার ভিতরটা যেরকম ঘুলিয়ে গেছে, আজ বোধ হয় একটা দুষ্কর্ম করব। কবিতা লিখে ফেলব। বুদ্ধি পরিষ্কার থাকলে কবিতার ব্যাক্‌টিরিয়া জন্মাতেই পারে না। চিত্তের অবস্থাটা খুব অস্বাস্থ্যকর হওয়া চাই। আজ আমার মগজের ভিতরে ঐ কীটাণুগুলি কেবলই চোদ্দ অক্ষর খুঁজে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। [লিখিতে প্রবৃত্ত

কাদম্বিনী যেমনি আমায় প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে।

ভাবটা নতুন রকমের হয়েছে, কিন্তু হতভাগা ছন্দটাকে বাগাতে পারছি নে। (গণনা করিয়া) প্রথম লাইনটা হয়েছে ষোলো, দ্বিতীয়টা হয়েছে পনেরো। কিন্তু কাকে ফেলে কাকে রাখি। (চিন্তা) 'আমায়'-কে 'আমা' বললে কেমন শোনায়? কাদম্বিনী যেমনি আমা প্রথম দেখিলে— কানে তো নেহাত খারাপ ঠেকছে না। তবুও একটা অক্ষর বেশি থাকে। কাদম্বিনীর 'নী'টা কেটে যদি সংক্ষেপ করে দেওয়া যায়? পুরো নামের চেয়ে সে তো আরো আদরের শুনতে হবে। কাদম্বি— না, ঠিক শোনাচ্ছে না। কদম্ব— ঠিক হয়েছে—

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে।

উ হুঁ, ও হচ্ছে না। 'কেমন করে' কথাটাকে তো কমাবার জো নেই। 'কেমন করিয়া'— তাতে আরো একটা অক্ষর বেড়ে যায়। 'তখনি চিনিলে'র জায়গায়

'তৎক্ষণাৎ চিনিলে' বসিয়ে দিতে পারি, কিন্তু সুবিধে হয় না। দূর হোক গে! ছন্দে লেখাটা বর্বরতা। যে সময় পুরুষমানুষ কানে কুণ্ডল, হাতে অঙ্গদ পরত, পদ্য জিনিসটা সেই যুগের; ডিমক্রাটিক যুগের জন্যে গদ্য। হওয়া উচিত ছিল— 'বলি ও কাদম্বিনী, যেমনি আমার উপর নজর পড়ল অমনি আমাকে গোলাম বলে চিনে নিলে কেমন করে খুলে বলো তো।' এর মধ্যে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার সীলমোহরের ছাপ নেই— একেবারে খাস শ্রীযুক্ত গদাইচন্দ্রের গোমুখী-বিনির্গত।

শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। কী হচ্ছে গদাই?

গদাই। আজ্ঞে, ফিজিয়লজির নোটগুলো একবার দেখে নিচ্ছি।

শিবচরণ। ফিজিয়লজির কোন্ জায়গাটাতে আছ?

গদাই। হার্টের ফাংশন্ নিয়ে।

শিবচরণ। দেখি তোমার নোটবইটা। আমি তোমাকে হয়তো কিছু—

গদাই। আজ্ঞে, এ একেবারে লেটেস্ট্ থিওরি নিয়ে— বোধ হয় মাসখানেক হল এর ডিস্কভারি হয়েছে। এখনো সকলে জানে না।

শিবচরণ। সত্যি নাকি? আমি আবার চশমাটা আনি নি। সব্জেক্ট্টা ইন্টারেস্টিং, পরে শুনে নেব তোর কাছ থেকে। কিন্তু, এখানে করছিস কী?

গদাই। একজামিনটা খুব কাছে এসেছে— চন্দ্রবাবুর বাসাটা নিরিবিলি আছে, তাই এখানে—

শিবচরণ। দেখো বাপু, একটা কথা আছে। তোমার বয়স হয়েছে, তাই আমি তোমার জন্যে একটি কন্যা ঠিক করেছি।

গদাই। (স্বগত) কী সর্বনাশ!

শিবচরণ। নিবারণবাবুকে জান বোধ করি—

গদাই। আজ্ঞে হাঁ, জানি।

শিবচরণ। তাঁরই কন্যা ইন্দুমতী। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভালো, বয়সেও তোমার যোগ্য। দিনও একরকম স্থির।

গদাই। একেবারে স্থির করেছেন? কিন্তু এখন তো হতে পারে না।

শিবচরণ। কেন বাপু?

গদাই। একজামিন কাছে এসেছে—

শিবচরণ। তা হোক-না একজামিন। বউমাকে বাপের বাড়ি রেখে দেব, একজামিন হয়ে গেলে ঘরে আনা যাবে।

গদাই। ডাক্তারিটা পাস না করেই কি—

শিবচরণ। কেন বাপু, তোমার সঙ্গে তো একটা শক্ত ব্যায়রামের বিয়ে দিচ্ছি নে। মানুষ ডাক্তারি না জেনেও বিয়ে করে। কিন্তু, আপত্তিটা কিসের জন্যে ?

গদাই। উপার্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করাটা—

শিবচরণ। উপার্জন ? আমি কি তোমাকে আমার বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছি ? তুমি কি সাহেব হয়েছ যে, বিয়ে করেই স্বাধীন ঘরকন্না করতে যাবে ?

[গদাই নিরুত্তর

তোমার হল কী ! বিয়ে করবে, তার আবার এত ভাবনা কী ! আমি কি তোমার ফাঁসির হুকুম দিলুম !

গদাই। বাবা, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে এখন বিয়ে করতে অনুরোধ করবেন না।

শিবচরণ। (সরোষে) অনুরোধ কী বেটা ! হুকুম করব। আমি বলছি, তোকে বিয়ে করতেই হবে।

গদাই। আমাকে মাপ করুন, আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।

শিবচরণ। (উচ্চস্বরে) কেন পারবি নে ! তোর বাপ পিতামহ, তোর চৌদ্দপুরুষ বরাবর বিয়ে করে এসেছে, আর তুই বেটা দু পাতা ইংরিজি উলটে আর বিয়ে করতে পারবি নে !

গদাই। আমি মিনতি করে বলছি বাবা, একেবারে মর্মান্তিক অনিচ্ছে না থাকলে আমি কখনোই এ প্রস্তাবে—

শিবচরণ। তুমি বেটা আমার বংশে জন্মগ্রহণ করে হঠাৎ একদিনে এত বড়ো বৈরাগী হয়ে উঠলে কোথা থেকে। এমন সৃষ্টিছাড়া অনিচ্ছেটা হল কেন, সেটা তো শোনা আবশ্যক।

গদাই। আচ্ছা, আমি মাসিমাকে সব কথা বলব, আপনি তাঁর কাছে জানতে পারবেন।

শিবচরণ। আচ্ছা। [প্রস্থান

গদাই। আমার ছন্দ মিল ভাব সমস্ত ঘুলিয়ে গেল ; এখন যে আর এক লাইনও মাথায় আসবে এমন সম্ভাবনা দেখি নে।

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। আজ বিনোদের বিয়ে, মনে আছে তো গদাই ?

গদাই। তাই তো, ভুলে গিয়েছিলুম বটে।

চন্দ্রকান্ত। তোমার স্মরণশক্তির যেরকম অবস্থা দেখছি, একৃজামিনের পক্ষে সুবিধে নয়। এইখানে বৈঠক হবে, চলো ওদের ধরে নিয়ে আসিগে।

গদাই। আজ শরীরটা তেমন ভালো ঠেকছে না, আজ থাক্—

চন্দ্রকান্ত। বিনোদের বিয়েটা তো বছরের মধ্যে সদাসর্বদা হবে না গদাই! যা হবার আজই চুকে যাবে। অতএব আজ তোমাকে ছাড়ছি নে, চলো।

গদাই। চলো। [প্রস্থান

ক্ষান্তমণি ও ইন্দুর প্রবেশ

ইন্দু। বর তো তোমাদের এখান থেকেই বেরোবেন? তাঁর তিন কুলে আর কেউ নেই নাকি?

ক্ষান্তমণি। বাপ-মা নেই বটে, কিন্তু শুনেছি দেশে পিসি-মাসি সব আছে— তাদের খবরও দেয় নি। বলে যে, বিয়ে করছি, হাট বসাচ্ছি নে তো। আবার বলে কী, এ তো আর শুম্ভ-নিশুম্ভর যুদ্ধ না, কেবল দুটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে, এত শোর-শরাবং লোক-লস্করের দরকার কী?

ইন্দু। একবার আমাদের হাতে পড়ুক-না, দুটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে যে কিরকম ধুন্দুমার ব্যাপার, তা তাঁকে একরকম মোটামুটি বুঝিয়ে দেব।— আজ যে তুমি বাইরের ঘরে?

ক্ষান্তমণি। এই ঘরে সব বরযাত্রী জুটবে। দেখ-না ভাই, ঘরের অবস্থাখানা। তারা আসবার আগে একটুখানি গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় আছি।

ইন্দু। তোমার একলার কর্ম নয়, এসো ভাই, দুজনে এ জঞ্জাল সাফ করা যাক্। এগুলো দরকারি নাকি?

ক্ষান্তমণি। কিচ্ছু না। যত রাজ্যির পুরোনো খবরের কাগজ জুটেছে। কাগজগুলো যেখানে পড়া হয়ে যায় সেইখানেই পড়ে থাকে।

ইন্দু। এগুলো?

ক্ষান্তমণি। এগুলো মকদ্দমার কাগজ— হারাতে পারলে বাঁচেন বোধ হয়। কেন যে হারায় না তাও তো বুঝতে পারি নে। কতকগুলো গদির নীচে গোঁজা, কতক আলমারির মাথায়, কতক ময়লা চাপকানের পকেটে। যখন কোনোটার দরকার পড়ে বাড়ি মাথায় করে বেড়ান, আঁস্তাকুড় থেকে আর বাড়ির ছাত পর্যন্ত এমন জায়গা নেই যেখানে না খুঁজতে হয়।

ইন্দু। এর সঙ্গে যে ইংরেজি নভেলও আছে— তারও আবার পাতা ছেঁড়া! কতকগুলো চিঠি— এ কি দরকারি!

ক্ষান্তমণি। ওর মধ্যে দরকারি আছে অ-দরকারিও আছে, কিচ্ছু বলবার জো নেই। খুব গোপনীয়ও আছে, সেগুলো চারি দিকে ছড়ানো। খুব বেশি দরকারি চিঠি সাবধান করে রাখবার জন্যে বইয়ের মধ্যে গুঁজে রাখা হয়, সে আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইন্দু। এ-সব কী। কতকগুলো লেখা, কতকগুলো প্রুফ, খালি দেশালাইয়ের বাক্স, কাননকুসুমিকা, কাগজের পুঁটুলির মধ্যে ছাতাধরা মসলা, একখানা তোয়ালে, গোটাকতক দাবার ঘুঁটি, একটি ইস্কাবনের গোলাম, ছাতার বাঁট— এ চাবির গোছা ফেলে দিলে বোধ হয় চলবে না ?

ক্ষান্তমণি। এই দেখো ! এই চাবির মধ্যে ওঁর যথাসর্বস্ব। আজ সকালে একবার খোঁজ পড়েছিল, কোথাও সন্ধান না পেয়ে শেষে উমাপতিদের বাড়ি থেকে সতেরোটা টাকা ধার করে নিয়ে এলেন। দাও তো ভাই, এ চাবি ওঁকে সহজে দেওয়া হবে না। ওই ভাই, ওরা আসছে, চলো ও ঘরে পালাই। [প্রস্থান

বিনোদ চন্দ্রকান্ত গদাই নলিনাক্ষ শ্রীপতি ভূপতির প্রবেশ

বিনোদ। (টোপর পরিয়া) সঙ তো সাজলাম, এখন তোমরা পাঁচ জনে মিলে হাততালি দাও— উৎসাহ হোক, মনটা দমে যাচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। এরই মধ্যে ? এখনো তো রঙ্গমঞ্চে চড় নি ?

বিনোদ। আচ্ছা চন্দর, অভিনয়ে আমার পার্ট কী হবে বুঝিয়ে দাও দেখি।

চন্দ্রকান্ত। মহারানীর বিদূষক।

বিনোদ। সাজটিও যথোপযুক্ত হয়েছে। ইংরেজ রাজাদের যে ফুল্‌গুলো ছিল তাদেরও টুপিটা এই টোপরের মতো।

চন্দ্রকান্ত। সেজের বাতি নিবিয়ে দেবার ঠোঙাগুলোরও ওইরকম চেহারা। এই পঁচিশটা বৎসরের যত-কিছু শিক্ষাদীক্ষা, যত-কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা— ভারতের ঐক্য, বাণিজ্যের উন্নতি, সমাজের সংস্কার, সাহেবের ছেলে পিটোনো প্রভৃতি যে-সকল উঁচু উঁচু ভাবের পলতে মগজের ঘি খেয়ে খুব উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছিল সেগুলো ওই টোপর চাপা পড়ে একদম নিবে যাবে।

শ্রীপতি। চন্দরদা, তুমি তো বিয়ে করেছ, বলো-না কী করতে হবে। হাঁ করে সবাই মিলে দাঁড়িয়ে থাকলে কি 'বিয়ে-বিয়ে' মনে হয় ?

চন্দ্রকান্ত। সে তো ভাই, স্টোন্‌-এজ্‌, আইস্‌-এজের কথা। সে যুগে না ছিল পূর্বরাগের কোমলতা, না ছিল অপূর্ব অনুরাগের উত্তাপ। কেবল বিবাহের যিনি আদ্যাশক্তি সেই মহামায়াই আজও আছেন অন্তরে-বাহিরে, আর সমস্তই ভুলেছি।

ভূপতি। শ্যালীর হাতের কানমলা?

চন্দ্রকান্ত। হায় পোড়াকপাল! শ্যালী থাকলে তবু বিবাহের সংকীর্ণতা অনেকটা কাটে, ওরই মধ্যে একটুখানি পাশ ফেরবার জায়গা পাওয়া যায়— শ্বশুরমশায় একেবারে কড়ায় গণ্ডায় ওজন করে দিয়েছেন, সিকি পয়সার ফাউ দেন নি।

বিনোদ। বাস্তবিক বর পছন্দ করবার সময় যেমন জিজ্ঞাসা করে কটি পাস আছে, কনে পছন্দ করবার সময় তেমনি খোঁজ নেওয়া উচিত কটি ভগিনী আছে।

চন্দ্রকান্ত। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। ঠিক বিয়ের দিনটিতে বুঝি চৈতন্য হল? নিতান্ত বঞ্চিত হবে না; তোমার কপালে একটি আছে, নামটি হচ্ছে ইন্দুমতী।

গদাই। (স্বগত) যাঁকে আমার স্কন্ধের উপর উদ্যত করা হয়েছে— সর্বনাশ আর-কি।

শ্রীপতি। বিনোদ, একটুখানি বোসো।

বিনোদ। না ভাই, তা হলে আর উঠতে পারব না, মনটা দেহের উপর যেন পাথরের কাগজচাপা হয়ে চেপে রাখবে।

ভূপতি। এসো তবে, বর কনের উদ্দেশে থ্রী চিয়ারস্ দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। হিপ্ হিপ্ হুরে—

চন্দ্রকান্ত। দেখো, আমার প্রিয়বন্ধুর বিয়েতে আমি কখনোই এরকম অনাচার হতে দেব না; শুভকর্মে অমন বিদেশী শেয়াল-ডাক ডেকো না। তার চেয়ে সবাই মিলে উলু দেবার চেষ্টা করো-না।

নলিনাক্ষ। এই তবে আমাদের অবিবাহিত বন্ধুত্বের শেষ মিলন। জীবনস্রোতে তুমি এক দিকে যাবে, আমি এক দিকে যাব। প্রার্থনা করি তুমি সুখে থাকো। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে ভেবে দেখো বিনু, এই মরুময় জগতে তুমি কোথায় যাচ্ছ—

চন্দ্রকান্ত। বিনু, তুই বল্, মা, আমি তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি। তা হলে কনকাঞ্জলিটা হয়ে যায়।

শ্রীপতি। এইবার তবে উলু আরম্ভ হোক। [সকলে উলুর চেষ্টা ও প্রস্থান

ইন্দু ও ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। শুনলি তো ভাই, আমার কর্তাটির মধুর কথাগুলি?

ইন্দু। কেন ভাই, আমার তো মন্দ লাগে নি।

ক্ষান্তমণি। তোর মন্দ লাগবে কেন? তোর তো আর বাজে নি। যার বেজেছে সেই জানে—

ইন্দু। তুমি যে একেবারে ঠাট্টা সইতে পার না। তোমার স্বামী কিন্তু ভাই তোমাকে সত্যি ভালোবাসে। দিনকতক বাপের বাড়ি গিয়ে বরং পরীক্ষা করে দেখো-না—

ক্ষান্তমণি। তাই একবার ইচ্ছা করে, কিন্তু জানি থাকতে পারব না। তা যা হোক, এখন তোদের ওখানে যাই। ওরা তো বউবাজারের রাস্তা ঘুরে যাবে, সে এখনো ঢের দেরি আছে।

ইন্দু। তুমি এগোও ভাই, তোমার স্বামীর এই বইগুলি গুছিয়ে দিয়ে যাই।

[ক্ষান্তর প্রস্থান

ললিতবাবু তাঁর এই খাতাটা ফেলে গেছেন। এটা না দেখে আমি যাচ্ছি নে। (খাতা খুলিয়া) ওমা! এ যে কবিতা। কাদম্বিনীর প্রতি। আ মরণ। সে পোড়ারমুখি আবার কে।

জল দিবে অথবা বজ্র, ওগো কাদম্বিনী,
হতভাগ্য চাতক তাই ভাবিছে দিনরজনী।

ভারি যে অবস্থা খারাপ! জলও না, বজ্রও না, হতভাগ্য চাতকের জন্যে কবিরাজের তেলের দরকার।

আর কিছু দাও বা না-দাও, অয়ি অবলে সরলে,
বাঁচি সেই হাসিভরা মুখ আর-একবার দেখিলে।

আহাহাহা! অবলে সরলে! পুরুষগুলো ভারি বোকা। মনে করলে, ওঁর প্রতি ভারি অনুগ্রহ করে সে হেসে গেল। হাসতে না কি সিকি পয়সা খরচ হয়। কই আমাদের কাছে তো কোনো কাদম্বিনী সাত পুরুষে এমন করে হাসতে আসে না! অবলে সরলে! সত্যি বাপু, মেয়ে জাতটাই ভালো নয়। এত ছলও জানে। ছি ছি! এ কবিতাও তেমনি। আমি যদি কাদম্বিনী হতুম তো এমন পুরুষের মুখ দেখতুম না। যে লোক চোদ্দটা অক্ষর সামলে চলতে পারে না তার সঙ্গে আবার প্রণয়! এ খাতা আমি ছিঁড়ে ফেলব; পৃথিবীর একটা উপকার করব; কাদম্বিনীর দেমাক বাড়তে দেব না।

পুরুষের বেশে হরিলে পুরুষের মন,
এবার নারীবেশে কেড়ে নিয়ে যাও জীবন মরণ।

এর মানে কী!

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে!

ওমা! ওমা! ওমা! এ যে আমারই কথা। এইবার বুঝেছি, পোড়ারমুখি

কাদম্বিনী কে! (হাস্য) তাই বলি, এমন করে কাকে লিখলেন! ওমা, কত কথাই বলেছেন। আর-একবার ভালো করে সমস্তটা পড়ি। কিন্তু কী চমৎকার হাতের অক্ষর! একেবারে যেন মুক্তো বসিয়ে গেছে। [নীরবে পাঠ

পশ্চাৎ হইতে খাতা অন্বেষণে গদাইয়ের প্রবেশ

কিন্তু ছন্দ থাক্ না-থাক্ পড়তে তো কিছুই খারাপ হয় নি। সত্যি, ছন্দ নেই বলে আরো মনের সরল ভাবটা ঠিক যেন প্রকাশ হয়েছে। আমার বেশ লাগছে। আমার বোধ হয় ছেলেদের প্রথম ভাঙা কথা যেমন মিষ্টি লাগে কবিদের প্রথম ভাঙা ছন্দ তেমনি মিষ্টি। (খাতা বুকে চাপিয়া) এ খাতা আমি নিয়ে যাব। এ তো আমাকেই লিখেছেন। আমার এমনি আনন্দ হচ্ছে। (প্রস্থানোদ্যম। পশ্চাতে ফিরিয়া গদাইকে দেখিয়া) ওমা! (মুখ আচ্ছাদন)

গদাই। ঠাকরুন, আমি একখানা খাতা খুঁজতে এসেছিলুম।

[ইন্দুমতীর দ্রুত পলায়ন

জন্ম জন্ম কেবলই আমার খাতাই হারাক। কবিতার বদলে যা পেয়েছি কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব শকুন্তলা বাঁধা রেখে এমন জিনিস পায় না!

[মহা উল্লাসে প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাগবাজারের রাস্তা

গদাই। আহা, এই বাড়িটা আমার শরীর থেকে আমার মনটুকুকে যেন শুষে নিচ্ছে, ব্লটিং যেমন কাগজ থেকে কালি শুষে নেয়। কিন্তু কোন্ দিকে সে থাকে এ পর্যন্ত কিছুই সন্ধান করতে পারলুম না। ঐ যে পশ্চিমের জানলার ভিতর দিয়ে একটা সাদা কাপড়ের মতন যেন দেখা গেল না? না, ও তো নয়, ও তো একজন দাসী দেখছি। ও কী করছে? একটা ভিজে শাড়ি শুকুতে দিচ্ছে। বোধ হয় তাঁরই শাড়ি। আহা, নাগাল পেলে একবার স্পর্শ করে নিতুম। তা হলে এতক্ষণে তাঁর স্নান হল। পিঠের উপরে ভিজে চুল ফেলে সাফ কাপড়টি পরে এখন কী করছেন!

[এই বাড়ির চৌকাঠ পার হইতে হুঁচট খাইয়া একজন বুড়ির কক্ষ হইতে তরকারির ঝুড়ি পড়িয়া গেল।]

গদাই। (ছুটিয়া নিকটে গিয়া ধরিয়া উঠাইয়া) আহাহাহা, কী তোমার নাম গো?

বুড়ি। আমার নাম ঠাকুরদাসী, এই বাড়ির ঝি।

গদাই। এই বাড়ির ঝি! আহা, লাগে নি তো?

বুড়ি। না, কিছু লাগে নি।

গদাই। আলুগুলো সব যে ছড়িয়ে পড়েছে। রোসো, কুড়িয়ে দিচ্ছি। তুমি বুঝি এই বাড়ির ঝি!

বুড়ি। হাঁ বাবু।

গদাই। চৌধুরীদের বাড়ির ঝি?

বুড়ি। হাঁ গো, গঙ্গামাধব চৌধুরী।

গদাই। আহাহা, ভাঁড়টা উলটে গিয়ে তেল যে সব গড়িয়ে গেছে। তোমার দিদি-ঠাকরুন হয়তো রাগ করবেন।

বুড়ি। না, দিদিঠাকরুন কথাটি কবেন না, কিন্তু গিন্নি মা—

গদাই। কথাটি কবেন না। আহা! (দীর্ঘনিশ্বাস) তা এক কাজ করো। এই টাকাটি দিচ্ছি, নাহয় বাজার থেকে তেল কিনে আনো, আমি ততক্ষণ তোমার তরকারি আগলাচ্ছি। তোমার দিদিঠাকরুন বুঝি কথাটি কবেন না, অ্যাঁ ঠাকুরদাসী?

বুড়ি। তিনি বড়ো লক্ষ্মী।

গদাই। লক্ষ্মী! আহা, তা তোমার দিদিঠাকরুন কী খেতে ভালোবাসেন বলো দেখি।

বুড়ি। ছাতাওয়ালা গলির মোড়ে ভক্ষু ফুলুরিওয়ালা গরম গরম বেগ্‌নি ভেজে দেয়, তাই দিয়ে আমের আচার দিয়ে খেতে তাঁর খুব শখ।

গদাই। বটে! তা এই নাও, ঠাকুরদাসী, একটাকার বেগ্‌নি কিনে আনো তো।

বুড়ি। একটাকার বেগ্‌নি! সে যে অনেক হবে।

গদাই। তা হোক, নাহয় কিছু বেশিই হল।

বুড়ি। তা আমি কিনে নাহয় আনব পরে, তুমি এই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ।

গদাই। তাতে ক্ষতি নেই, ওটা আমার একটা শখ।

বুড়ি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা!

গদাই। না, না, ঐ যে তোমার বেগ্‌নি— ঐ যে তুমি বললে না—

বুড়ি। নাহয় দিদিঠাকরুনকে বেগ্‌নি খাওয়াব, তাই ব'লে কি—

গদাই। আমি এইরকম খাওয়াতে বড়ো ভালোবাসি, ওটা আমার একটা বাতিক বললেই হয়। বিশেষত গরম গরম বেগ্‌নি। বেগ্‌নির ঝুড়ি চক্ষে দেখে তবে নড়ব।

বুড়ি। তা হলে দাঁড়াও, দেরি করব না। [প্রস্থান

মোড়ক হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ

ঐ ব্যক্তি। সরকারমশায় বুঝি ?

গদাই। কেন বলো তো।

ঐ ব্যক্তি। এই বাড়ির কোন্ মাঠাকরুন সাত জোড়া সিল্কের মোজা রিফু করতে আমাদের দোকানে পাঠিয়েছিলেন, সেগুলি এনেছি।

গদাই। অ্যাঃ, পায়ের মোজা ! ঐ জন্যেই তো এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। দাও দাও।

দরজি। দামটা নগদ চুকিয়ে দিতে হবে।

গদাই। কত ?

দরজি। আড়াই টাকা।

গদাই। এই নিয়ে যাও। তোমার রেট তো খুব শস্তা হে ! [দরজির প্রস্থান হায় হায়, আজ কী শুভক্ষণেই বেরিয়েছিলুম ! (বুকের কাছে চাপিয়া) সেই পা দুখানির অদৃশ্য চলন দিয়ে দলন দিয়ে এই মোজার ফাঁকগুলি ভরা। আহাহা, গা শিউরে উঠছে, কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে—

ওগো শূন্য মোজা—

মেলানো বড়ো শক্ত। এই সময়ে থাকত বিন্‌দা !—

আমার শূন্য হৃদয়ের মতো, ওগো শূন্য মোজা,
অনুপস্থিত কোন্ দুটি চরণ
সদাই করিতেছ খোঁজা।

কথা আসছে। কিন্তু ঘুলিয়ে যাচ্ছে—

বিনা পায়েই প্রাণের ভিতরে
চলে গিয়েছ সোজা।

আইডিয়াটা ওরিজিনাল্।

তিনটে লাইন হল, সাত জোড়া মোজা আছে ; ঠিক সপ্তপদীর নম্বর। আরো চারটে লাইন চাই। (উপরতলার বারান্দার দিকে চাহিয়া) অন্তুদ্দেশকে উদ্দেশ করে এই লাইনগুলি আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করছে— য়ুরোপের ট্রুবেডোরদের মতো।

(আপন মনে) আমার শূন্য হৃদয়ের মতো, ওগো শূন্য মোজা,
অনুপস্থিত কোন্ দুটি চরণ সদাই করিছ খোঁজা ?

কিন্তু আর তো মিল দেখছি নে, এক আছে 'মুসলমানের রোজা'— মোজাকে বললে দোষ নেই যে ঈদের দিনে প্রতিপদের চাঁদ। না না, ওতে আমার লেখার ক্লাসিক্যাল গ্রেসটা চলে যাবে। তা ছাড়া দিন খারাপ, হয়তো সামান্য মোজার জন্যে শান্তিভঙ্গ হতেও পারে— ওটা থাক্।

নেপথ্যে। হিঁয়া রোখো।

শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। বেটার তব্ হুঁশ নেই। দেখো-না, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখো-না। যেন খিদে পেয়েছে, এই বাড়ির ইঁটকাঠগুলো গিলে খাবে। ছোঁড়ার হল কী! খাঁচার পাখির দিকে বেড়াল যেমন তাকিয়ে থাকে তেমনি করে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। হতভাগা কালেজে যাবার নাম করে রোজ বাগবাজারে এসে ঘুর ঘুর করে। (নিকটে আসিয়া) বাপু, মেডিকেল কালেজটা কোন্‌দিকে একবার দেখিয়ে দাও দেখি!

গদাই। কী সর্বনাশ! এ যে বাবা!

শিবচরণ। শুনছ? কালেজ কোন্-দিকে? তোমার অ্যানাটমির নোট কি ঐ দেয়ালের গায়ে লেখা আছে? তোমার সমস্ত ডাক্তারিশাস্ত্র কি ঐ জানলায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে? [গদাই নিরুত্তর

মুখে কথা নেই যে! লক্ষ্মীছাড়া, এই তোর এক্‌জামিন! এইখানে তোর মেডিকেল কালেজ!

গদাই। খেয়েই কালেজে গেলে আমার অসুখ করে, তাই একটুখানি বেড়িয়ে নিয়ে—

শিবচরণ। বাগবাজারে তুমি হাওয়া খেতে এস? শহরে আর কোথাও বিশুদ্ধ বায়ু নেই! এ তোমার দার্জিলিং সিমলে পাহাড়! বাগবাজারের হাওয়া খেয়ে খেয়ে আজকাল যে চেহারা বেরিয়েছে, একবার আয়নাতে দেখা হয় কি? আমি বলি ছোঁড়াটা এক্‌জামিনের তাড়াতেই শুকিয়ে যাচ্ছে, তোমাকে যে ভূতে তাড়া করে বাগবাজারে ঘোরাচ্ছে তা তো জানতুম না!

গদাই। আজকাল বেশি পড়তে হয় বলে রোজ খানিকটা করে এক্সেসাইজ্ করে নিই—

শিবচরণ। রাস্তার ধারে কাঠের পুতুলের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার এক্সেসাইজ্‌ হয়, বাড়িতে তোমার দাঁড়াবারও জায়গা নেই!

গদাই। অনেকটা চলে এসে শ্রান্ত হয়েছিলুম, তাই একটু বিশ্রাম করা যাচ্ছিল।

শিবচরণ। শ্রান্ত হয়েছিস, তবে ওঠ্‌ আমার গাড়িতে। যা, এখনি কালেজে যা। গেরস্তর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শ্রান্তি দূর করতে হবে না।

গদাই। সে কী কথা! আপনি কী করে যাবেন?

শিবচরণ। আমি যেমন করে হোক যাব, তুই এখন গাড়িতে ওঠ্‌। ওঠ্‌ বলছি।

গদাই। অনেকটা জিরিয়ে নিয়েছি, এখন আমি অনায়াসে হেঁটে যেতে পারব।

শিবচরণ। না, সে হবে না— তুই ওঠ্‌, আমি দেখে যাই—

গদাই। আপনার যে ভারি কষ্ট হবে।

শিবচরণ। সেজন্য তোকে কিছু ভাবতে হবে না, তুই ওঠ্‌ গাড়িতে। এ ঝুড়িটা কিসের। তুই কি বাগবাজারে তরকারি ফেরি করে বেড়াস নাকি?

গদাই। তাই তো, ওটা তরকারিই তো বটে। কী আশ্চর্য! কেমন করে এল! এ তো মুলো দেখছি, নটেশাকও আছে। এক কাজ করি বাবা— গেরস্তর জিনিস, ঘরের ভিতরে পৌঁছে দিয়ে আসি-না।

শিবচরণ। আর তোমার পরোপকার করতে হবে না। এ ঝুড়ির কিনারা আমি করে দিচ্ছি, তুই এখন গাড়িতে ওঠ।

গদাই। (স্বগত) সর্বনাশ! বুড়িটা এর মধ্যে বেগ্‌নি নিয়ে উপস্থিত না হলে বাঁচি। আজ সকাল বেলাটা বেশ জমে আসছিল, মাটি করে দিলে। সাত জোড়া মোজা নিয়ে করি কী! কাল দোকানদার সেজে ফিরিয়ে দিতে হবে।

শিবচরণ। তোর হাতে ওটা কিসের মোড়ক রে?

গদাই। আজ্ঞে ওটা—

শিবচরণ। দেখি না। (হাত টানিয়া লইয়া) এ কী ব্যাপার!

গদাই। আজ্ঞে, উপহার দেবার জন্যে।

শিবচরণ। কাকে উপহার দিবি?

গদাই। আমার একটি ক্লাস-ফ্রেণ্ড্‌—

শিবচরণ। ক্লাস্‌-ফ্রেণ্ড্‌কে মেয়েদের মোজা দিবি!

গদাই। তার বিয়ে হচ্ছে কিনা, তাই—

শিবচরণ। তাই, কার অনেক দিনের পরা পুরোনো ময়লা মোজা তাকে দিবি? তাও আবার সাত জোড়া!

গদাই। সেকেণ্ড্হ্যাণ্ড্ নিলেম থেকে শস্তায় কিনেছি, আপনার কাছে থেকে টাকা চাইতে ভয় করে।

শিবচরণ। চাইলেই পেতিস কিনা! ফিরিয়ে দে। ছি ছি! ঐ নোংরা মোজাগুলো নিয়ে বেড়াচ্ছিস। কী জানি কোন্ ব্যামোর ছোঁয়াচ আছে ওর মধ্যে—

গদাই। আমারও সে ভয় আছে বাবা, ছোঁয়াচ যে কোথায় কী থাকে কিছু বলবার জো নেই। এখনো ফিরিয়ে দিতে পারব, কালই না হয়—

শিবচরণ। সেই ভালো। এই নে, তোকে দেড় টাকা দিচ্ছি— পাকপ্রণালী দু খণ্ড কিনে তাকে দিস। এখন গাড়িতে ওঠ্। (সহিসের প্রতি) দেখ্, একেবারে সেই পটলডাঙার কালেজে নিয়ে যাবি, কোথাও থামাবি নে।

গদাই। (জনান্তিকে সহিসের প্রতি) মির্জাপুর চন্দ্রবাবুর বাসায় চল্, তোদের এক টাকা বকশিশ দেব, ছুটে চল্। [প্রস্থান

শিবচরণ। আজ আর রুগি দেখা হল না। আমার সকাল বেলাটা মাটি করে দিলে। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রকান্তের বাসা

চন্দ্রকান্ত। নাঃ, এ আগাগোড়া কেবল ছেলেমানুষি করা হয়েছে। আমার এমন অনুতাপ হচ্ছে! মনে হচ্ছে যেন আমিই এ সমস্ত কাণ্ডটি ঘটিয়েছি। ইদিকে এত কল্পনা, এত কবিত্ব, এত মাতামাতি, আর বিয়ের দু দিন না যেতে যেতেই কিছু আর মনে ধরছে না।

গদাইয়ের প্রবেশ

গদাই। কী হচ্ছে চন্দরদা?

চন্দ্রকান্ত। না গদাই, তোরা আর বিয়েথাওয়া করিস নে।

গদাই। কেন বলো দেখি। তোমার ঘাড়ে ম্যাল্‌থসের ভূত চাপল নাকি?

চন্দ্রকান্ত। এখনকার ছেলেরা তোরা মেয়েমানুষকে বিয়ে করবার যোগ্য নোস। তোরা কেবল লম্বাচওড়া কথা কবি আর কবিতা লিখবি, তাতে যে পৃথিবীর কী উপকার হবে ভগবান জানেন।

গদাই। কবিতা লিখে পৃথিবীর কী উপকার হয় বলা শক্ত, কিন্তু এক-এক সময় নিজের কাজে লেগে যায় সন্দেহ নেই। যা হোক, এত রাগ কেন ?

চন্দ্রকান্ত। শুনেছ তো সমস্তই ! আমাদের বিনুর তাঁর স্ত্রীকে পছন্দ হচ্ছে না।

গদাই। বাস্তবিক, এরকম গুরুতর ব্যাপার নিয়ে খেলা করাটা ভালো হয় নি।

চন্দ্রকান্ত। বিনুটা যে এত অপদার্থ তা কি জানতুম! একটা স্ত্রীলোককে ভালোবাসার ক্ষমতাটুকুও নেই।

গদাই। আমি জানি, কবিতা লেখার চেয়েও সেটা সহজ কাজ।

চন্দ্রকান্ত। আমি ওর মুখদর্শন করছি নে।

গদাই। তুমি তাকে ছাড়লে সে যে নেহাত অধঃপাতে যাবে।

চন্দ্রকান্ত। না, তার সঙ্গে কিছুতেই মিশছি নে, পায়ে এসে ধরে পড়লেও না। তুমি ঠিক বলেছিলে গদাই, আজকাল সবাই যাকে ভালোবাসা বলে সেটা একটা স্নায়ুর ব্যামো — হঠাৎ চিড়িক মেরে আসে, তার পরে ছেড়ে যেতেও তর সয় না।

গদাই। সে-সব বিজ্ঞানশাস্ত্রের কথা পরে হবে, আপাতত আমার একটা কাজ করে দিতে হচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। যে কাজ বল তাতেই রাজি আছি, কিন্তু ঘটকালি আর করছি নে।

গদাই। ঐ ঘটকালিই করতে হবে।

চন্দ্রকান্ত। (ব্যগ্রভাবে) কী রকম শুনি।

গদাই। বাগবাজারের চৌধুরীদের বাড়ির কাদম্বিনী, তার সঙ্গে আমার –

চন্দ্রকান্ত। (উচ্চস্বরে) গদাই, তোমারও কবিত্ব। তবে তোমারও স্নায়ু বলে একটা বালাই আছে।

গদাই। তা আছে ভাই। বোধ হয়, একটু বেশি পরিমাণেই আছে। অবস্থা এমনি হয়েছে যে শিগগির আমার একটা সদ্গতি না করলে -

চন্দ্রকান্ত। বুঝেছি। কিন্তু গদাই, আর স্ত্রীহত্যার পাতকে আমাকে লিপ্ত করিস নে।

গদাই। কিছু ভেবো না ভাই। পাপ করেছে বিনোদ, তার রিডেম্প্‌শন্ আমার দ্বারা।

চন্দ্রকান্ত। ভ্যালা মোর দাদা ! আমি এক্‌খনি যাচ্ছি। চাদরখানা নিয়ে আসি। অমনি বড়োবউয়ের পরামর্শ টাও জানা ভালো। [প্রস্থান

অনতিবিলম্বে ছুটিয়া আসিয়া

চন্দ্রকান্ত। বড়োবউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। তোদের সংসর্গ

লাভ করতে আসি, আর হারাই আমার স্ত্রীর সংসর্গ— আমার ঘটল মুক্তার বদলে শুক্তা।

বিনোদের প্রবেশ

বিনোদ। চন্দরদা, তুমি আমার উপর রাগ করে চলে এলে ভাই! আমি আর থাকতে পারলুম না।

চন্দ্রকান্ত। না ভাই, তোদের উপর কি রাগ করতে পারি? তবে দুঃখ হয়েছিল তা স্বীকার করি।

বিনোদ। কী করব চন্দরদা! আমি এত চেষ্টা করছি কিছুতেই পেরে উঠছি নে—

চন্দ্রকান্ত। কেন বল্ দেখি। ওর মধ্যে শক্তটা কী? মেয়েমানুষকে ভালোবাসতে পারিস নে।

বিনোদ। চন্দরদা, কী জানি ভাই বিয়ে না করাটাই মুখস্থ হয়ে গেছে।

চন্দ্রকান্ত। তোর পায়ে পড়ি বিনু, তুই আমার গা ছুঁয়ে বল্, নিদেন আমার খাতিরে তোর স্ত্রীকে ভালোবাসবি। মনে কর্, তুই আমার বোনকে বিয়ে করেছিস।

বিনোদ। চন্দরদা, যাকেই হোক, বিয়ে যে করেছি সেটা বুঝতে তো বাকি নেই। মুশকিল হয়েছে সেটা কিছু অধিক পরিমাণেই বুঝতে পারছি। তার প্রধান কারণ টাকার টানাটানি। যতদিন একলা রাজত্ব করেছিলেম অমর্যাদা ছিল না। আর-একটিকে পাশে বসাবামাত্র দেখি, ভাঙা সিংহাসন মড়্ মড়্ করে উঠছে। আজ অভাবগুলো চার দিক থেকে বড়ো বেআব্রু হয়ে দেখা দিল— সেটা কি ভালো লাগে?

গদাই। তুমি বলতে চাও, তোমার ভালোবাসার অভাব নেই, অভাব কেবল টাকার?

বিনোদ। ভালোবাসা আছে বলেই তো বুঝতে পারছি, যথেষ্ট টাকা নেই। পাত্র যে ফুটো সেটা ধরা পড়ল যখন তাতে সুধা ঢালা গেল। ঝাঁঝরি দিয়ে মধু খেতে গিয়ে সমস্ত গা যে যায় ভেসে। হালকা ছিলুম, দারিদ্র্যের উপর দিয়ে সাঁতার কেটে গেছি, আর-একজনকে কাঁধে নেবামাত্র তার তলার দিকে তলাচ্ছি— যেখানটাতে পাঁক।

গদাই। বিনোদ, তোমার কবিতা যেমন তোমার ব্যবহারটাও তেমনি, একেবারে দুর্বোধ।

বিনোদ। রেগেছ বলেই সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না। ভেবে দেখো-না, আমার ছিল এক মামুলি ছাতা, রোদবৃষ্টির দুঃখ ভোগ করতে হয় নি, এমন সময় হিসেবের ভুলে

ডেকে আনলুম ছাতার আর-এক শরিক— আজ আমার কাঁধেও জল পড়ছে, তার কাঁধেও। জিনিসটা ঘোরতর অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে।

গদাই। কিন্তু ভুলটা তো তোমারই।

বিনোদ। ভুলটা হচ্ছে ভুল, আর অ-ভুলটা হচ্ছে অ-ভুল, তা সে আমারই হোক আর তোমারই হোক। মোজাটা হচ্ছে মোজা, পাগড়িটা হচ্ছে পাগড়ি। ভুল করে মোজাটাকে যদি পাগড়ি করেই পরি তা হলে আমি ভুল করেছি বলেই মোজাটা কি পাগড়ি হয়ে উঠবে।

গদাই। (স্বগত) সর্বনাশ! এ আবার হঠাৎ মোজার কথা তোলে কেন? খবর পেয়েছে নাকি? সেদিন যখন মোজাজোড়া মাথায় জড়িয়ে বসেছিলুম হয়তো কোথা দিয়ে দেখে থাকবে। (প্রকাশ্যে) ওহে মোজা নিয়ে ভুল করলেও তাতে মোজার বুক ফাটে না, বড়োজোর সেলাই ফেঁসে যেতে পারে। কিন্তু মানুষকে নিয়ে ভুল করে তার পরে ঐ যাঃ বলে সরে দাঁড়ালে তো চলে না।

চন্দ্রকান্ত। বকাবকি করে লাভ কী গদাই? এখন বলো বিনোদ, কর্তব্য কী।

বিনোদ। আমি তাঁকে তাঁর বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্রকান্ত। তুমি নিজে চেষ্টা করে? না তিনি রাগ করে গেছেন?

বিনোদ। না, আমি তাঁকে একরকম বুঝিয়ে দিলুম—

চন্দ্রকান্ত। যে, এখানে তিনি টিকতে পারবেন না। তুমি সব পার বিনু। আজ আমার মনটা কিছু অস্থির আছে, আজ আর থাকতে পারছি নে। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

নিবারণের বাসা

ইন্দু ও কমল

কমল। না ভাই ইন্দু, ওরকম করে তুই বলিস নে।

ইন্দু। কিরকম করে বলতে হবে? বলতে হবে, স্ত্রীর ভরটুকুও সইতে পারেন না, বিনোদবিহারী এত বড়োই শৌখিন কবি! তাঁর বড়োজোর সহ্য হয় ফিকে চাঁদের আলো, কিম্বা ঝরা ফুলের গন্ধ। আমি ভাবছি তোর মতো মেয়েকেও সইতে পারল না ওর রুচিটি এতই ফিন্‌ফিনে, আর তুই যে ওর মতো পুরুষকেও সহ্য করতে পারছিস তোর রুচিকে বাহাদুরি দিই।

কমল। তুই বুঝিস নে ইন্দু, ওরা যে পুরুষমানুষ। আমাদের এক ভাব, ওদের আর-এক ভাব। মেয়েমানুষের ভালোবাসা সবুর করতে পারে না, বিধাতা তার হাতে সে অবসর দেন নি। পুরুষ অনেক ঠেকে, অনেক ঘা খেয়ে, তার পরে ভালোবাসতে শেখে; ততদিন পৃথিবী সবুর করে থাকে, কাজের ব্যাঘাত হয় না।

ইন্দু। ইস! কী সব নবাব! আচ্ছা দিদি, তুই কি বলিস গদাই গয়লার সঙ্গে আজই যদি আমার বিয়ে হয় অমনি কাল ভোর থেকেই তাড়াতাড়ি তার চরণদুটো ধরে সেবা করতে বসে যাব— মনে করব, ইনি আমার চিরকালের গয়লা, পূর্বজন্মের গয়লা, বিধাতা একে এবং এর অন্য গোরুগুলিকে গোয়ালসুদ্ধ আমারই হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন।

কমল। ইন্দু, তুই কী যে বকিস আমি তোর সঙ্গে পেরে উঠি নে। গদাই গয়লাকে তুই বিয়ে করতে যাবি কেন, সে একে গয়লা, তাতে আবার তার দুই বিয়ে।

ইন্দু। আচ্ছা না হয় গদাই গয়লা না হল— পৃথিবীতে গদাইচন্দ্রের তো অভাব নেই।

কমল। তা তোর অদৃষ্টে যদি কোনো গদাই থাকে তা হলে অবিশ্যি তাকে ভালোবাসবি—

ইন্দু। কক্‌খনো বাসব না। আচ্ছা, তুমি দেখো। বিয়ে করেছি বলেই যে অমনি তার পরদিন থেকে গদাই গদাই করে গদগদ হয়ে বেড়াব, আমাকে তেমন মেয়ে পাও নি। আমি দিদি, তোর মতন না ভাই!

কমল। আসল জানিস, ইন্দু? ওদের না হলে আমাদের চলতে পারে, কিন্তু আমাদের না হলে পুরুষমানুষের চলে না, সেইজন্যে ওদের আমরা ভালোবাসি।

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। মা, তোমাকে দেখলে আমি চোখের জল রাখতে পারি নে। আমার মার কাছে আমি অপরাধী। তোমার কাছে আমার দাঁড়ানো উচিত হয় না।

কমল। কাকা, আপনি অমন করে বলবেন না, আমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়েছে—

ইন্দু। বাবা, আসলে যার অপরাধ তাকে কিছু না বলে তার অপরাধ তোমরা পাঁচজনে কেন ভাগ করে নিচ্ছ, আমি তো বুঝতে পারি নে।

নিবারণ। থাক্‌ মা, সে সব আলোচনা থাক্‌— এখন একটা কাজের কথা বলি। কমল মন দিয়ে শোনো। তোমাকে এতদিন গরিবের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে এসেছি,

সে কথাটা ঠিক নয়। তোমার বাপের সম্পত্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না, আমারই হাতে সে-সমস্ত আছে। ইতিমধ্যে অনেক টাকা জমেছে এবং সুদেও বেড়েছে; তোমার কুড়ি বছর বয়স হলে তবে তোমার পাবার কথা। সময় হয়েছে, এখন নাও তোমার বিষয়। সেই টানে হয়তো স্বামীও এসে পড়বে।

কমল। কাকা, তাঁকে আপনি এ সংবাদ দেবেন না। কথাটা যাতে কেউ টের না পায়, আপনাকে তাই করতে হবে।

নিবারণ। কেন বলো দেখি মা?

কমল। একটু কারণ আছে। সমস্তটা ভেবে আপনাকে পরে বলব।

নিবারণ। আচ্ছা। [প্রস্থান

ইন্দু। তোর মতলবটা কী আমাকে বল্ তো।

কমল। আমি আর-একটা বাড়ি নিয়ে ছদ্মবেশে ওঁর কাছে অন্য স্ত্রীলোক বলে পরিচয় দেব।

ইন্দু। সে তো বেশ হবে ভাই! ওরা ঠিক নিজের স্ত্রীকে ভালোবেসে সুখ পায় না। কিন্তু বরাবর রাখতে পারবি তো?

কমল। বরাবর রাখবার ইচ্ছে তো আমার নেই, বোন—

ইন্দু। ফের আবার একদিন স্বামী-স্ত্রী সাজতে হবে নাকি?

কমল। হাঁ, ভাই, যতদিন যবনিকাপতন না হয়। ওই শিবচরণবাবু বোধ হয় আসছেন, চলো পালাই। [উভয়ের প্রস্থান

গদাই ও শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। দেখ্, নিবারণকে আজ শেষ কথা বলব বলেই এখানে এসেছি। এখন তোর মনের কথাটা স্পষ্ট করেই বল্।

গদাই। আমি তো সব কথাই স্পষ্ট করেই বলেছি। বিয়ে করবার কথায় এখন মন দিতেই পারছি নে।

শিবচরণ। এই বুড়ো বয়সে তুই যে একটা সামান্য বিষয়ে আমাকে এত দুঃখ দিবি, তা কে জানত!

গদাই। বাবা, এটা কি সামান্য বিষয় হল!

শিবচরণ। আরে বাপু, সামান্য না তো কী? বিয়ে করা বৈ তো নয়! রাস্তার মুটে-মজুরগুলোও যে বিয়ে করছে। ওতে তো খুব বেশি বুদ্ধি খরচ করতে হয় না, বরঞ্চ কিছু টাকা খরচ আছে, তা সেও বাপমায়ে জোগায়। তুই এমন বুদ্ধিমান ছেলে, এতগুলো পাস করে শেষকালে এইখানে এসে ঠেকল!

গদাই। আপনি তো সব শুনেছেন, আমি তো বিয়ে করতে অসম্মত নই—

শিবচরণ। আরে তাতেই তো আমার বুঝতে আরো গোল বেধেছে। যদি বিয়ে করতেই আপত্তি না থাকে, তবে না-হয় একটাকে না করে আর-একটাকেই করলি। নিবারণকে কথা দিয়েছি, আমি তার কাছে মুখ দেখাই কী করে?

গদাই। নিবারণবাবুকে ভালো করে বুঝিয়ে বললেই সব—

শিবচরণ। আরে, আমি নিজে বুঝতে পারি নে, নিবারণকে বোঝাব কী? আমি যদি তোর মাকে বিয়ে না ক'রে তোর মাসিকে বিয়ে করবার প্রস্তাব মুখে আনতুম, তা হলে তোর ঠাকুরদাদা কি আমার দুখানা হাড় একত্র রাখত? পড়েছিস ভালো মানুষের হাতে—

গদাই। শুনেছি, আমার ঠাকুরদামশায়ের মেজাজ ভালো ছিল না—

শিবচরণ। কী বলিস বেটা! মেজাজ ভালো ছিল না! তোর বাবার চেয়ে তিনশো গুণে ভালো ছিল। কিছু বলি নে ব'লে, বটে! সে যা হোক, এখন যা হয় একটা কথা ঠিক করেই বল্।

গদাই। আমি তো বরাবর এক কথাই বলে আসছি।

শিবচরণ। (সরোষে) তুই তো বলছিস এক কথা! আমিই কি এক কথার বেশি বলছি? মাঝের থেকে কথা যে আপনিই দুটো হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন নিবারণকে বলি কী! তা সে যা হোক, তুই তা হলে নিবারণের মেয়ে ইন্দুমতীকে কিছুতেই বিয়ে করবি নে? যা বলবি এক কথা বল্।

গদাই। কিছুতেই না, বাবা।

শিবচরণ। একমাত্র বাগবাজারের কাদম্বিনীকেই বিয়ে করবি? ঠিক করে বলিস। এক কথা!

গদাই। সেইরকমই স্থির করেছি—

শিবচরণ। বড়ো উত্তম কাজ করেছ— এখন আমি নিবারণকে কী বলব?

গদাই। বলবেন, আপনার অবাধ্য ছেলে তাঁর কন্যা ইন্দুমতীর যোগ্য নয়।

শিবচরণ। কোথাকার নির্লজ্জ! আমাকে আর তোর শেখাতে হবে না। কী বলতে হবে তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবে ওর আর কিছুতেই নড়চড় হবে না? এক কথা—

গদাই। না বাবা, সেজন্যে আপনি ভাবেন না।

শিবচরণ। আরে মলো! আমি সেইজন্যেই ভেবে মরছি আর-কী! আমি ভাবছি নিবারণকে বলি কী।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুসজ্জিত গৃহ

বিনোদ। এরা বেছে বেছে এত দেশ থাকতে আমাকে উকিল পাকড়ালে কী ক'রে আমি তাই ভাবছি। আমার অদৃষ্ট ভালো বলতে হবে। এখন টিকতে পারলে হয়।

ঘোমটা পরিয়া কমলের প্রবেশ

বিনোদ। (স্বগত) আহা, মুখটি দেখতে পেলে বেশ হত ! (প্রকাশ্যে) আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ?

কমল। হাঁ। আপনি বোধ হয় আমার অবস্থা সবই জানেন।

বিনোদ। কিছু-কিছু শুনেছি। (স্বগত) গলাটা যে তারই মতন শোনাচ্ছে। সব মেয়েরই গলা প্রায় একরকম দেখছি। কিন্তু তার চেয়ে কত মিষ্টি !

কমল। সে কথা থাক্‌। আমার যা-কিছু সমস্তর কর্তৃত্বভার আপনাকে নিতে হবে।

বিনোদ। আপনি যে আমাকে এত বড়ো বিশ্বাসের যোগ্য মনে করলেন, এতেই আমাকে যোগ্যতা দেবে। আপনার বিশ্বাসই আমাকে মানুষ করে তুলবে।

কমল। আপনাকে আর বেশিক্ষণ আবদ্ধ করে রাখতে চাই নে, আপনার বোধ করি অনেক কাজ আছে—

বিনোদ। না না, সেজন্যে আপনি ভাববেন না। আমার সহস্র কাজ থাকলেও সমস্ত পরিত্যাগ করে আমি—

কমল। কাল পয়লা তারিখ, কাল থেকে তা হলে আমার কর্মচারীদের কাছ থেকে আপনি বুঝে-পড়ে নিন। নিবারণবাবু এখনি আসবেন, তিনি এলে তাঁর কাছ থেকেও অনেকটা জেনেশুনে নিতে পারবেন।

বিনোদ। নিবারণবাবু !

কমল। আপনি তাঁকে চেনেন বোধ হয়, কারণ, তিনিই প্রথমে আপনার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ করে দিয়েছেন।

বিনোদ। (স্বগত) ছি ছি ছি, বড়ো লজ্জা বোধ হচ্ছে। আমি কালই আমার স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে আসব। এখন তো আমার কোনো অভাব নেই।

কমল। আপনি বরঞ্চ নীচের ঘরে একটু অপেক্ষা করুন, নিবারণবাবু এলেই খবর পাঠিয়ে দেব। আর-একটা কথা, আমি যে কাল আপনাকে চিঠিতে জানিয়েছি, আপনার বন্ধু ললিত চাটুজ্জেকে একবার এখানে আনতে, সেটার কিছু ব্যবস্থা হয়েছে?

বিনোদ। সব ঠিক আছে। তিনি এলেন ব'লে, আর দেরি নেই।

কমল। তবে আমি আসি।

[প্রস্থান

বিনোদ। হায় হায়, এতটাই যখন বিশ্বাস করলেন তখন কেবল আর তিন ইঞ্চি পরিমাণ বিশ্বাস ক'রে ঘোমটা খুললে বাঁচা যেত, তা হলেই চোখদুটি দেখতে পেতুম। কিন্তু নিবারণবাবুকে নিয়ে কী করা যায়। [প্রস্থান

নিবারণ ও কমলমুখীর প্রবেশ

কমল। আমার জন্যে আপনি আর কিছু ভাববেন না। এখন ইন্দুর এই গোলটা চুকে গেলেই বাঁচা যায়।

নিবারণ। তাই তো মা, আমাকে ভারি ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। আমি এ দিকে শিবু ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা একরকম স্থির করে বসে আছি, এখন তাকেই বা কী বলি, ললিত চাটুজ্জেকেই বা কোথায় পাওয়া যায়, আর সে বিয়ে করতে রাজি হয় কি না তাই বা কে জানে।

কমল। সেজন্যে ভাববেন না কাকা! আমাদের ইন্দুকে চোখে দেখলে বিয়ে করতে নারাজ হবে, এমন ছেলে কেউ জন্মায় নি।

নিবারণ। ওদের দেখাশোনা হয় কী করে?

কমল। সে আমি সব ঠিক করেছি।

নিবারণ। তুমি কী করে ঠিক করলে মা?

কমল। আমি ওঁকে বলে দিয়েছি, ওঁর বন্ধু ললিতবাবুকে এখানে নিয়ে আসবেন। তার পর একটা উপায় করা যাবে।

নিবারণ। তা সব যেন হল, আমি ভাবছি শিবুকে কী বলব।

কমল। ওই উনি আসছেন। আমি তবে যাই। [প্রস্থান

বিনোদের প্রবেশ

বিনোদ। এই যে, আমি আপনার কথাই ভাবছিলুম।

নিবারণ। কেন বাপু, আমি তো তোমার মক্কেল নই।

বিনোদ। আজ্ঞে, আমাকে লজ্জা দেবেন না— আপনি বুঝতেই পারছেন—

নিবারণ। না বাপু, আমি কিছুই বুঝতে পারি নে। আমরা সেকালের লোক।

বিনোদ। আমার স্ত্রী আপনার ওখানে আছেন—

নিবারণ। তা অবশ্য— তাকে তো আমরা ত্যাগ করতে পারি নে।

বিনোদ। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাঁকে যদি আমার ওখানে পাঠিয়ে দেন—

নিবারণ। বাপু, আবার কেন পালকি-ভাড়াটা লাগাবে?

বিনোদ। আপনারা আমাকে কিছু ভুল বুঝছেন। আমার অবস্থা খারাপ ছিল বলেই আমার স্ত্রীকে—তা যাই হোক—তাঁকে ত্যাগ করবার অভিপ্রায় ছিল না। এখন আপনারই অনুগ্রহে তো— তা এখন তো অনায়াসে—

নিবারণ। বাপু, এ তো তোমার পোষা পাখি নয়। সে যে সহজে তোমার ওখানে যেতে রাজি হবে, এমন আমার বোধ হয় না।

বিনোদ। আপনি অনুমতি দিলে আমি নিজে গিয়ে তাঁকে অনুনয় বিনয় করে নিয়ে আসতে পারি।

নিবারণ। আচ্ছা, সে বিষয় বিবেচনা করে পরে বলব। [প্রস্থান

বিনোদ। বুড়োও তো কম একগুঁয়ে নয় দেখছি। যা হোক এ পর্যন্ত রানীকে কিছু বলে নি বোধ হয়।

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

বিনোদ। কী হে চন্দর! তুমি এখানে যে!

চন্দ্রকান্ত। নিবারণবাবু এই বাড়িতে কী কাজে এসেছেন শুনলুম। আজ তাঁরই ওখানে আমার খাওয়ার পালা পড়েছে, বুড়ো ভুলে গেছেন কি না খবর নিতে এসেছি। খিদে পেয়েছে। তুমিও বুঝি নিবারণবাবুর খোঁজে এখানে এসেছ?

বিনোদ। সে কথা পরে হবে। কিন্তু, তুমি পালা করে খাচ্ছ, তার মানে তো বুঝতে পারছি নে চন্দরদা!

চন্দ্রকান্ত। আর ভাই, মহা বিপদে পড়েছি।

বিনোদ। কেন, কী হয়েছে?

চন্দ্রকান্ত। কী জানি ভাই, কখন তোদের সাক্ষাতে কথায় কথায় কী কতকগুলো মিছে কথা বলেছিলুম, তাই শুনে ব্রাহ্মণী বাপের বাড়ি এমনি গা-ঢাকা হয়েছেন যে, কিছুতেই তাঁর আর নাগাল পাচ্ছি নে।

বিনোদ। বলো কী দাদা! তোমার বাড়িতে তো এ দণ্ডবিধি পূর্বে প্রচলিত ছিল না।

চন্দ্রকান্ত। না ভাই, কালক্রমে কতই যে হচ্ছে, কিছু বুঝতে পারছি নে।

বিনোদ। এখন তা হলে তোমার ছুটি চলছে বলো। জীবনে এই বোধ হয় ডোমেস্‌টিক সার্ভিসে তোমার প্রথম ফার্লো।

চন্দ্রকান্ত। হাঁ রে, কিন্তু উইদাউট পে। বিনু, আমার দুঃখ তোরা বুঝতেই পারবি নে। তুই সেদিন বলছিলি, বিয়ে না করাটাই তোর মুখস্থ হয়ে গেছে। আমার ঠিক তার উলটো। ওই স্ত্রীটিকে এমনই বিশ্রী অভ্যেস করে ফেলেছি যে, হঠাৎ বুকের হাড়-কখানা খসে গেলে যেমন একদম খালি ঠেকে, ওই স্ত্রীটি আড়াল হলেই তেমনি জগৎটা যেন ফাটা বেলুনের মতো চুপসে যায়।

বিনোদ। এখন উপায় কী?

চন্দ্রকান্ত। মনে করছি, আমি উলটে রাগ করব। আমিও ঘর ছেড়ে তোর এখানেই থাকব। আমার বন্ধুদের মধ্যে তোকেই সে সবচেয়ে বেশি ভয় করে। তার বিশ্বাস, তুই আমার মাথাটি খেয়েছিস!

বিনোদ। তা বেশ কথা। কিন্তু আমাকে যে আবার শ্বশুরবাড়ি যেতে হচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। কার শ্বশুরবাড়ি?

বিনোদ। আমার নিজের, আবার কার।

চন্দ্রকান্ত। (সানন্দে বিনুর পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া) সত্যি বলছিস বিনু?

বিনোদ। স্ত্রীকে আনতে চলেছি, নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়ার মতো থাকতে আর ইচ্ছে করছে না।

চন্দ্রকান্ত। কিন্তু, এতদিন তোর এ আক্কেল ছিল কোথায়? যতকাল আমার সংসর্গে ছিলি এমন সব সৎসংকল্পের প্রসঙ্গ তো শুনতে পাই নি, দুদিন আমার দেখা পাস নি আর তোর ধর্মবুদ্ধি এতদূর পরিষ্কার হয়ে এল?

বিনোদ। কিন্তু, চন্দরদা, বিপদ কী হয়েছে জান? নিবারণবাবুর যে-রকম মেজাজ দেখলুম, সহজে কমলকে আমার কাছে পাঠাতে রাজি হবেন না। তুমি তো তাঁর ওখানে খেতে যাচ্ছ, আমার হয়ে একটু ওকালতি করতে হবে।

চন্দ্রকান্ত। নিশ্চয় করব। কিন্তু, ওরা যে বললে নিবারণবাবু এখানে এসেছেন।

বিনোদ। এই খানিকক্ষণ হল তিনি চলে গেছেন, তুমি আর দেরি কোরো না।

[প্রস্থান

ইন্দু ও কমলের প্রবেশ

কমল। তোর জ্বালায় তো আর বাঁচি নে ইন্দু! তুই আবার এ কী জটা পাকিয়ে বসে আছিস! ললিতবাবুর কাছে তোকে কাদম্বিনী বলে উল্লেখ করতে হবে নাকি?

ইন্দু। তা কী করব দিদি! কাদম্বিনী না বললে যদি সে না চিনতে পারে তা হলে ইন্দু বলে পরিচয় দিয়ে লাভটা কী?

কমল। ইতিমধ্যে তুই এত কাণ্ড কখন করে তুললি, তা তো জানি নে। একটা যে আস্ত নাটক বানিয়ে বসেছিস!

ইন্দু। তোমার বিনোদবাবুকে বোলো, তিনি লিখে ফেলবেন এখন, তার পর মেট্রপলিটান থিয়েটারে অভিনয় দেখতে যাব। ওই ভাই, তোমার বিনোদবাবু আসছেন, আমি পালাই। [প্রস্থান

বিনোদের প্রবেশ

বিনোদ। মহারানী, আমার বন্ধু এলে কোথায় তাঁকে বসাব?

কমল। এই ঘরেই বসাবেন।

বিনোদ। ললিতের সঙ্গে আপনার যে বন্ধুর বিবাহ স্থির করতে হবে তাঁর নামটি কী?

কমল। কাদম্বিনী— বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে।

বিনোদ। আপনি যখন আদেশ করছেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু ললিতের কথা আমি কিছুই বলতে পারি নে। সে যে এ-সব প্রস্তাবে আমাদের কারো কথায় কর্ণপাত করবে, এমন বোধ হয় না।

কমল। আপনাকে সেজন্যে বোধ হয় বেশি চেষ্টা করতেও হবে না— কাদম্বিনীর নাম শুনলেই তিনি আর বড়ো আপত্তি করবেন না।

বিনোদ। তা হলে তো আর কথাই নেই।

কমল। মাপ করেন যদি, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

বিনোদ। এখনি। (স্বগত) স্ত্রীর কথা না তুললে বাঁচি।

কমল। আপনার স্ত্রী নেই কি?

বিনোদ। কেন বলুন দেখি? স্ত্রীর কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন?

কমল। আপনি তো অনুগ্রহ করে এই বাড়িতেই বাস করছেন, তা, আপনার স্ত্রীকে আমি আমার সঙ্গিনীর মতো করে রাখতে চাই। অবিশ্যি, যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে।

বিনোদ। আপত্তি! কোনো আপত্তিই থাকতে পারে না। এ তো আমার সৌভাগ্যের কথা!

কমল। আজ সন্ধ্যার সময় তাঁকে আনতে পারেন না?

বিনোদ। আমি বিশেষ চেষ্টা করব। [কমলের প্রস্থান

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। একটি সাহেব বাবু এসেছেন।

বিনোদ। এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

সাহেবি বেশে ললিতের প্রবেশ

ললিত। (শেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া) Well! How goes the world? ভালো তো?

বিনোদ। একরকম ভালোয়-মন্দয়। তোমার কীরকম চলছে?

ললিত। Pretty well! জানো? I am going in for studentship next year.

বিনোদ। ওহে, আর কতদিন এক্‌জামিন দিয়ে মরবে? বিয়েথাওয়া করতে হবে না নাকি? এ দিকে যৌবনটা যে ভাঁটিয়ে গেল।

ললিত। Hallo! You seem to have queer ideas on the subject. কেবল যৌবনটুকু নিয়ে one can't marry. I suppose first of all you must get a girl whom you—

বিনোদ। আহা, তা তো বটেই। আমি কি বলছি, তুমি তোমার নিজের হাত-পাগুলোকে বিয়ে করবে। অবিশ্যি, মেয়ে একটি আছে।

ললিত। I know that! একটি কেন? মেয়ে there is enough and to spare! কিন্তু তা নিয়ে তো কথা হচ্ছে না।

বিনোদ। আহা, তোমাকে নিয়ে তো ভালো বিপদে পড়া গেল। পৃথিবীর সমস্ত কন্যাদায় তোমাকে হরণ করতে হবে না। কিন্তু যদি একটি বেশ সুন্দরী সুশিক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে তোমাকে দেওয়া যায়, তা হলে কী বলো?

ললিত। I admire your cheek বিনু! তুমি wife select করবে আর আমি marry করব! I don't see any rhyme or reason in such co-operation. পোলিটিক্যাল ইকনমিতে division of labour আছে, কিন্তু there is no such thing in marriage.

বিনোদ। তা বেশ তো, তুমি দেখো, তার পরে পছন্দ না হয় বিয়ে কোরো না।

ললিত। My dear fellow, you are very kind, কিন্তু আমি বলি কী, you need not bother yourself about my happiness, আমার বিশ্বাস, আমি যদি কখনো কোনো girl কে love করি, I will love her without your help এবং তার পরে যখন বিয়ে করব you'll get your invitation in due form.

বিনোদ। আচ্ছা ললিত, যদি সে মেয়েটির নাম শুনলেই তোমার পছন্দ হয়?

ললিত। The idea! নাম শুনে পছন্দ! যদি মেয়েটিকে বাদ দিয়ে simply নামটিকে বিয়ে করতে বল, that's a safe proposition.

বিনোদ। আগে শোনো, তার পর যা বলতে হয় বোলো— মেয়েটির নাম— কাদম্বিনী।

ললিত। কাদম্বিনী! She may be all that is nice and good, কিন্তু I must confess, তার নাম নিয়ে তাকে congratulate করা যায় না। যদি তার নামটাই তার best qualification হয় তা হলে I should try my luck in some other quarter.

বিনোদ। (স্বগত) এর মানে কী! তবে যে রানী বললেন, কাদম্বিনীর নাম শুনলেই লাফিয়ে উঠবে! দূর হোক গে। একে খাওয়ানোটাই বাজে খরচ হল— আবার এই ম্লেচ্ছটার সঙ্গে আরো আমাকে নিদেন দু ঘণ্টা কাটাতে হবে দেখছি।

ললিত। I say, it's infernally hot here—চলো না বারান্দায় গিয়ে বসা যাক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কমলমুখীর অন্তঃপুর

কমল ও ইন্দু

ইন্দু। দিদি, আর বলিস নে দিদি, আর বলিস নে। পুরুষমানুষকে আমি চিনেছি। তুই বাবাকে বলিস, আমি কাউকে বিয়ে করব না।

কমল। তুই ললিতবাবু থেকে সব পুরুষ চিনলি কী করে ইন্দু?

ইন্দু। আমি জানি, ওরা কেবল কবিতায় ভালোবাসে, তা ছন্দ মিলুক আর না মিলুক।

ছি ছি! ছি ছি দিদি, আমার এমনি লজ্জা করছে! ইচ্ছে করছে মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে যাই। কাদম্বিনীকে সে চেনে না? মিথ্যেবাদী! কাদম্বিনীর নামে কবিতা লিখেছে, সে খাতা এখনো আমার কাছে আছে।

কমল। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে আর কী করবি? এখন কাকা যাকে বলছেন, তাকে বিয়ে কর। [ইন্দুমতীর প্রস্থান

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। কী করি বলো তো মা। ললিত চাটুজ্জে যা বলেছে সে তো সব শুনেছ। সে বিনোদকে কেবল মারতে বাকি রেখেছে। অপমান যা হবার তা হয়েছে—

কমল। না কাকা, তার কাছে ইন্দুর নাম করা হয় নি। আপনার মেয়ের কথা হচ্ছে, তাও সে জানে না।

নিবারণ। ইদিকে আবার শিবুকে কথা দিয়েছি, তাকেই বা কী বলি। তুমি মা, ইন্দুকে ব'লে ক'য়ে ওদের দুজনের দেখা করিয়ে দিতে পার তো ভালো হয়।

কমল। গদাইয়ের মনের ইচ্ছে কী সেটাও তো জানতে হবে কাকা। আবার কি এইরকম একটি কাণ্ড বাধানো ভালো?

নিবারণ। সে আমি তার বাপের কাছে শুনেছি। সে বলে আমি উপার্জন না করে বিয়ে করব না। সে তো আমার মেয়েকে কখনো চক্ষে দেখে নি। একবার দেখলে ওসব কথা ছেড়ে দেবে।

কমল। তা, ইন্দুকে আমি সম্মত করাতে পারব। [নিবারণের প্রস্থান

ইন্দুর প্রবেশ

কমল। লক্ষ্মী দিদি আমার, আমার একটি অনুরোধ তোর রাখতে হবে।

ইন্দু। কী, বল্‌-না ভাই!

কমল। একবার গদাইবাবুর সঙ্গে তুই দেখা কর্‌।

ইন্দু। কেন দিদি, তাতে আমার কী প্রায়শ্চিত্তটা হবে?

কমল। তোর যখন যা ইচ্ছে তাই করেছিস ইন্দু, কাকা তাতে বাধা দেন নি। আজ কাকার একটি অনুরোধ রাখবি নে?

ইন্দু। রাখব ভাই, তিনি যা বলবেন তাই শুনব।

কমল। তবে চল্‌, তোর চুলটা একটু ভালো করে দিই। নিজের উপরে এতটা অযত্ন করিস্‌ নে। [প্রস্থান

গদাইয়ের প্রবেশ

গদাই। চন্দর যখন পীড়াপীড়ি করছে তা নাহয় একবার ইন্দুমতীর সঙ্গে দেখা করাই যাক। শুনেছি তিনি বেশ বুদ্ধিমতী সুশিক্ষিতা মেয়ে— তাঁকে আমার অবস্থা বুঝিয়ে বললে তিনি নিজেই আমাকে বিবাহ করতে অসম্মত হবেন। তা হলে আমার ঘাড় থেকে দায়টা যাবে— বাবাও আর পীড়াপীড়ি করবেন না।

মুখে ঘোমটা টানিয়া ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দু। (স্বগত) বাবা যখন বলছেন তখন দেখা করতেই হবে, কিন্তু কারো অনুরোধে তো পছন্দ হয় না। বাবা কখনোই আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেবেন না।

গদাই। (নতশিরে ইন্দুর প্রতি) আমাদের মা-বাপ আমাদের পরস্পরের বিবাহের জন্যে পীড়াপীড়ি করছেন, কিন্তু আপনি যদি ক্ষমা করেন তো আপনাকে একটি কথা বলি—

ইন্দু। একি! এ যে ললিতবাবু! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ললিতবাবু, আপনাকে বিবাহের জন্যে যাঁরা পীড়াপীড়ি করছেন তাঁদের আপনি জানাবেন, বিবাহ এক পক্ষের সম্মতিতে হয় না। আমাকে আপনার বিবাহের কথা বলে কেন অপমান করছেন?

গদাই। একি! এ যে কাদম্বিনী! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি এখানে আমি তা জানতুম না। আমি মনে করেছিলুম, নিবারণবাবুর কন্যা ইন্দুমতীর সঙ্গে আমি কথা কচ্ছি— কিন্তু আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে—

ইন্দু। ললিতবাবু, আপনার সৌভাগ্য আপনি মনে মনে রেখে দেবেন, সে কথা আমার কাছে প্রচার করবার দরকার দেখি নে।

গদাই। আপনি কাকে ললিতবাবু বলছেন? ললিতবাবু বারান্দায় বিনোদের সঙ্গে গল্প করছেন— যদি আবশ্যক থাকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি।

ইন্দু। না না, তাঁকে ডাকতে হবে না। আপনি তা হলে কে!

গদাই। এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? চন্দ্রবাবুর বাসায় আপনি নিজে আমাকে চাকরি দিয়েছেন, আমি তৎক্ষণাৎ তা মাথায় করে নিয়েছি— ইতিমধ্যে বরখাস্ত হবার মতো কোনো অপরাধ করি নি তো।

ইন্দু। আপনার নাম কি ললিতবাবু নয়?

গদাই। যদি পছন্দ করেন তো ওই নামই শিরোধার্য করে নিতে পারি, কিন্তু বাপ-মায়ে আদর করে আমার নাম রেখেছিলেন গদাই।

ইন্দু। গদাই!— ছি ছি, এ কথা আমি আগে জানতে পারলুম না কেন!

গদাই। তা হলে কি চাকরি দিতেন না? এখন কী আদেশ করেন?

ইন্দু। আমি আদেশ করছি, ভবিষ্যতে যখন কবিতা লিখবেন কাদম্বিনীর পরিবর্তে ইন্দুমতী নামটি ব্যবহার করবেন আর ছন্দ মিলিয়ে লিখবেন।

গদাই। দুটোই যে আমার পক্ষে সমান অসাধ্য।

ইন্দু। আচ্ছা, ছন্দ মেলাবার ভার আমি নিজেই নেব এখন, নামটা আপনি বদলে নেবেন—

গদাই। এমন নিষ্ঠুর আদেশ কেন করছেন? চোদ্দটা অক্ষরের জায়গায় সতেরোটা বসানো কি এমনি গুরুতর অপরাধ যে সেজন্যে ভৃত্যকে একেবারে—

ইন্দু। না, সে অপরাধ আমি সহস্রবার মার্জনা করতে পারি, কিন্তু ইন্দুমতীকে কাদম্বিনী বলে ভুল করলে আমার সহ্য হবে না—

গদাই। আপনার নাম তবে—

ইন্দু। ইন্দুমতী।

গদাই। হায় হায়, এতদিন কী ভুলটাই করেছি! বাগবাজারের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি, বাবা আমাকে উঠতে বসতে দু-বেলা বাপান্ত করেছেন, তার উপরে কাদম্বিনী নামটা ছন্দের ভিতর পুরতে মাথা-ভাঙাভাঙি করতে হয়েছে।—

(মৃদুস্বরে) যেমনি আমায় ইন্দু প্রথম দেখিলে
কেমন করে চকোর বলে তখনি চিনিলে—

কিম্বা

কেমন করে চাকর বলে তখনি চিনিলে—

আহা, সে কেমন হত!

ইন্দু। তবে এখন ভ্রমসংশোধন করুন—এই নিন আপনার খাতা। আমি চললুম। [প্রস্থান

গদাই। (উচ্চস্বরে) শুনে যান, আপনারও বোধ হচ্ছে যেন একটা ভ্রম হয়েছিল—সেটাও অনুগ্রহ করে সংশোধন করে নেবেন— সুবিধে আছে, আপনাকে সেইসঙ্গে ছন্দ বদলাতে হবে না।— হায় রে, সেই মোজার কবিতাটা যে অপরাধের বোঝা হয়ে আমার অ্যানাটমির নোট-বইটা চেপে রইল। মেজর অপারেশন করলেও যে ওটাকে ছাঁটা যাবে না। আর সেই রিফু-করা মোজা ক-জোড়া। আজও যে প্রাণ ধরে সেগুলো ফিরিয়ে দিতে পারি নি। তার উপরে সেদিন থেকে ভক্ত ফুলুরিওয়ালার তেলে-ভাজা বেগ্‌নি খেয়ে খেয়ে অম্লশূল হবার জো হল। ঠাকুরদাসীকে খুঁজে বের করতে হবে। সে বুড়িটাকে— ইচ্ছে করছে— থাক্‌, সে আর বলে কাজ নেই।

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। দেখো বাপু, শিবু আমার বাল্যকালের বন্ধু— আমার বড়ো ইচ্ছে, তাঁর সঙ্গে আমার একটা পারিবারিক বন্ধন হয়। এখন তোমাদের ইচ্ছের উপরেই সমস্ত নির্ভর করছে।

গদাই। আমার ইচ্ছের জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না, আপনার আদেশ পেলেই আমি কৃতার্থ হই।

নিবারণ। (স্বগত) যা মনে করেছিলুম তাই। বুড়ো বাপ মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে যা করতে না পারলে, একবার ইন্দুকে দেখবামাত্র সমস্ত ঠিক হয়ে গেল। বুড়োরাই শাস্ত্র মেনে চলে, যুবাদের শাস্ত্রই এক আলাদা। (প্রকাশ্যে) তা বাপু, তোমার কথা শুনে বড়ো আনন্দ হল। তা হলে একবার আমার মেয়েকে তার মতটা জিজ্ঞাসা করে আসি। তোমরা শিক্ষিত লোক, বুঝতেই পার, বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে, তার সম্মতি না নিয়ে তাকে বিবাহ দেওয়া যায় না।

গদাই। তা অবশ্য।

নিবারণ। তা হলে আমি একবার আসি। চন্দ্রবাবুদের এই ঘরে ডেকে দিয়ে যাই। [প্রস্থান

শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। তুই এখানে বসে রয়েছিস, আমি তোকে পৃথিবী-সুদ্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছি।

গদাই। কেন বাবা?

শিবচরণ। তোকে যে আজ তারা দেখতে আসবে।

গদাই। কারা?

শিবচরণ। বাগবাজারের চৌধুরীরা।

গদাই। কেন!

শিবচরণ। কেন! না দেখে-শুনে অমনি ফস করে বিয়ে হয়ে যাবে? তোর বুঝি আর সবুর সইছে না?

গদাই। বিয়ে কার সঙ্গে হবে?

শিবচরণ। ভয় নেই রে বাপু, তুই যাকে চাস তারই সঙ্গে হবে। আমার ছেলে হয়ে তুই যে এত টাকা চিনেছিস, তা তো জানতুম না। তা সেই বাগবাজারের ট্যাকশালের সঙ্গেই তোর বিয়ে স্থির করে এসেছি।

গদাই। সে কী বাবা! আপনার মতের বিরুদ্ধে আমি বিয়ে করতে চাই নে— বিশেষ আপনি নিবারণবাবুকে কথা দিয়েছেন—

শিবচরণ। (অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া গদাইয়ের মুখের দিকে নিরীক্ষণ) তুই খেপেছিস না আমি খেপেছি, আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে! কথাটা একটু পরিষ্কার করে বল্, আমি ভালো করে বুঝি।

গদাই। আমি সে চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করব না।

শিবচরণ। চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করবি নে! তবে কাকে করবি?

গদাই। নিবারণবাবুর মেয়ে ইন্দুমতীকে।

শিবচরণ। (উচ্চস্বরে) কী! হতভাগা পাজি লক্ষ্মীছাড়া বেটা! যখন ইন্দুমতীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি তখন বলিস কাদম্বিনীকে বিয়ে করবি আবার যখন কাদম্বিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি তখন বলিস ইন্দুমতীকে বিয়ে করবি— তুই তোর বুড়ো বাপকে একবার বাগবাজার একবার মির্জাপুর খেপিয়ে নিয়ে, নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে চাস!

গদাই। আমাকে মাপ করো বাবা, আমার একটা মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিল—

শিবচরণ। ভুল কী রে বেটা, তোর সেই বাগবাজারে বিয়ে করতেই হবে। তাদের কোনো পুরুষে চিনি নে, আমি নিজে গিয়ে তাদের স্তুতি মিনতি করে এলুম যেন আমারই কন্যাদায় হয়েছে। তার পরে যখন সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেল, আজ তারা আশীর্বাদ করতে আসবে, তখন বলে কি না 'বিয়ে করব না'! আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী?

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। (গদাইয়ের প্রতি) সমস্ত শুনলুম। ভালো একটি গোল বাধিয়েছ যাহোক।— এই যে ডাক্তারবাবু, ভালো আছেন তো?

শিবচরণ। ভালো আর থাকতে দিলে কই। এই দেখো-না চন্দর, ওর নিজেরই কথামত একটি পাত্রী স্থির করলুম, যখন সমস্ত ঠিক হয়ে গেল তখন বলে কি না 'তাকে বিয়ে করব না'। আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী?

গদাই। বাবা, তুমি তাদের একটু বুঝিয়ে বললেই—

শিবচরণ। তোমার মাথা! তাদের বোঝাতে হবে, আমার ভীমরতি ধরেছে আর আমার ছেলেটি আস্ত খেপা— তা তাদের বুঝতে বিলম্ব হবে না।

চন্দ্রকান্ত। আপনি কিছু ভাববেন না। সে মেয়েটির আর একটি পাত্র জুটিয়ে দিলেই হবে।

শিবচরণ। সে তেমন মেয়েই নয়। তার টাকা আছে ঢের, কিন্তু চেহারা দেখে পাত্র এগোয় না। আমার বংশের এই অকাল কুষ্মাণ্ডের মতো এত বড়ো বাঁদর দ্বিতীয় আর কোথায় পাবে যে তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে।

চন্দ্রকান্ত। সে আমার উপর ভার রইল। আমি সমস্ত ঠিকঠাক করে দেব। এখন নিশ্চিন্ত মনে নিবারণবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ স্থির করুন।

শিবচরণ। যদি পার চন্দর, তো বড়ো উপকার হয়। এই বাগবাজারের হাত থেকে মানে মানে নিস্তার পেলে বাঁচি। এ দিকে আমি নিবারণের কাছে মুখ দেখাতে পারছি নে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

চন্দ্রকান্ত। সেজন্যে কোনো ভাবনা নেই। আমি প্রায় অর্ধেক কাজ গুছিয়ে এসে তবে আপনাকে বলছি। এখন বাকিটুকু সেরে আসি। [প্রস্থান

নিবারণের প্রবেশ

শিবচরণ। আরে এসো ভাই, এসো।

নিবারণ। ভালো আছ ভাই? যা হোক শিবু, কথা তো স্থির?

শিবচরণ। সে তো বরাবরই স্থির আছে, এখন তোমার মরজি হলেই হয়।

নিবারণ। আমারও তো সমস্ত ঠিক হয়ে আছে, এখন হয়ে গেলেই চুকে যায়।

শিবচরণ। তবে আর কি, দিনক্ষণ দেখে—

নিবারণ। সে-সব কথা পরে হবে— এখন কিছু মিষ্টিমুখ করবে চলো।

শিবচরণ। না ভাই, আমার অভ্যাস নেই, এখন থাক্— অসময়ে খেয়েছি কি আর আমার মাথা ধরেছে—

নিবারণ। না না, সে হবে না, কিছু খেতে হচ্ছে। বাপু, তুমিও এসো।

[প্রস্থান

কমল ও ইন্দুর প্রবেশ

কমল। ছি ছি, ইন্দু, তুই কী কাণ্ডটাই করলি বল্ দেখি?

ইন্দু। তা বেশ করেছি। ভাই, পরে গোল বাধার চেয়ে আগে গোল চুকে যাওয়া ভালো।

কমল। এখন পুরুষ জাতটাকে কী রকম লাগছে।

ইন্দু। মন্দ না ভাই, একরকম চলনসই।

কমল। তুই যে বলেছিলি ইন্দু, গদাই গয়লাকে তুই কক্‌খনো বিয়ে করবি নে!

ইন্দু। না ভাই, গদাই নামটি খারাপ নয়, তা তোমরা যাই বল। তোমার

কল্লোলকুমার, লাবণ্যকিশোর, কাকলীকণ্ঠ, স্মিতমোহনের চেয়ে সহস্র গুণে ভালো। গদাই নামটি খুব আদরের নাম, অথচ পুরুষমানুষকে বেশ মানায়। রাগ করিস নে দিদি, তোর বিনোদের চেয়ে ঢের ভালো—

কমল। কী হিসেবে ভালো শুনি।

ইন্দু। বিনোদবিহারী নামটা বাণভট্টের কাদম্বরীতেই চলে, আঠারো-গজি সমাসের মধ্যে। গদাই বেশ সাদাসিধে, ওর মধ্যে বোপদেবের হস্তক্ষেপ করবার জো নেই। আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি, মা দুর্গা কার্তিকের চেয়ে গণেশকেই বেশি ভালোবাসেন। গদাই নামটি আমার গদাইগণেশ, তোমার বিনোদকার্তিকের চেয়ে ভালো।

কমল। কিন্তু যখন বই ছাপাবে, বইয়ে ও নাম তো মানাবে না।

ইন্দু। আমি তো ছাপতে দেব না, খাতাখানি আগে আটক করে রাখব। আমার ততটুকু বুদ্ধি আছে দিদি!

কমল। তা, যে নমুনা দেখিয়েছিলি! তোর সেটুকু বুদ্ধি আছে জানি, কিন্তু শুনেছি বিয়ে করলে স্বামীর লেখা সম্বন্ধে মত বদলাতে হয়।

ইন্দু। আমার তো তার দরকার হবে না। আমার কবি কেবল আমারই কবি, পৃথিবীতে তাঁর কেবল একটিমাত্র পাঠক।

কমল। ছাপবার খরচ বেঁচে যাবে—

ইন্দু। সবাই তাঁর কবিত্বের প্রশংসা করলে আমার প্রশংসার মূল্য থাকবে না।

কমল। সবাই প্রশংসা করবে, ওই আশঙ্কাটা তোকে করতে হবে না। যা হোক, তোর গয়লাটিকে তোর পছন্দ হয়েছে, তা নিয়ে তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই নে। তাকে নিয়ে তুই চিরকাল সুখে থাক বোন! তোর গোয়াল দিনে দিনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

ইন্দু। ওই বিনোদবাবু আসছেন। মুখটা ভারি বিমর্ষ দেখছি।

[ইন্দুর প্রস্থান

বিনোদের প্রবেশ

কমল। তাঁকে এনেছেন?

বিনোদ। তিনি তাঁর বাপের বাড়ি গেছেন, তাঁকে আনবার তেমন সুবিধে হচ্ছে না।

কমল। আমার বোধ হচ্ছে, তিনি যে আমার সঙ্গিনীভাবে এখানে থাকেন সেটা আপনার আন্তরিক ইচ্ছে নয়।

বিনোদ। আপনাকে আমি বলতে পারি নে, তিনি এখানে আপনার কাছে থাকলে আমি কত সুখী হই। আপনার দৃষ্টান্তে তাঁর কত শিক্ষা হয়।

কমল। আমার দৃষ্টান্ত হয়তো তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শুনেছি আপনি তাঁকে অল্পদিন হল বিবাহ করেছেন, হয়তো তাঁকে ভালো করে জানেন না।

বিনোদ। তা বটে। কিন্তু যদিও তিনি আমার স্ত্রী তবু এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আপনার সঙ্গে তাঁর তুলনা হতে পারে না।

কমল। ও কথা বলবেন না। আপনি হয়তো জানেন না, আমি তাঁকে বাল্যকাল হতে চিনি। তাঁর চেয়ে আমি যে কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ এমন বোধ হয় না।

বিনোদ। আপনি তাঁকে চেনেন?

কমল। খুব ভালোরকম চিনি।

বিনোদ। আমার সম্বন্ধে তিনি আপনার কাছে কোনো কথা বলেছেন?

কমল। কিছু না। কেবল বলেছেন, তিনি আপনার ভালোবাসার যোগ্য নন। আপনাকে সুখী করতে না পেরে এবং আপনার ভালোবাসা না পেয়ে তাঁর সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হয়ে আছে।

বিনোদ। এ তাঁর ভারি ভ্রম। তবে আপনার কাছে স্পষ্ট স্বীকার করি, আমিই তাঁর ভালোবাসার যোগ্য নই। আমি তাঁর প্রতি বড়ো অন্যায় করেছি, কিন্তু সে তাঁকে ভালোবাসি নে ব'লে নয়।

কমল। তবে আর-একটি সংবাদ আপনাকে দিই। আপনার স্ত্রীকে আমি এখানে আনিয়ে রেখেছি।

বিনোদ। (আগ্রহে) কোথায় আছেন তিনি, আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিন।

কমল। তিনি ভয় করছেন পাছে আপনি তাঁকে ক্ষমা না করেন—যদি অভয় দেন—

বিনোদ। বলেন কী, আমি তাঁকে ক্ষমা করব! তিনি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন—

কমল। তিনি কোনোকালেই আপনাকে অপরাধী করেন নি, সেজন্যে আপনি ভাববেন না—

বিনোদ। তবে এত মিনতি করছি, তিনি আমাকে দেখা দিচ্ছেন না কেন?

কমল। আপনি সত্যিই যে তাঁর দেখা চান, এ জানতে পারলে তিনি একমুহূর্ত গোপনে থাকতেন না। তবে নিতান্ত যদি সেই পোড়ার মুখ দেখতে চান তো দেখুন।

[মুখ উদ্‌ঘাটন

বিনোদ। আপনি! তুমি! কমল! আমাকে মাপ করলে!

ইন্দুর প্রবেশ

ইন্দু। মাপ করিস নে দিদি! আগে উপযুক্ত শাস্তি হোক, তার পরে মাপ।

বিনোদ। তা হলে অপরাধীকে আর-একবার বাসরঘরে আপনার হাতে সমর্পণ করতে হয়।

ইন্দু। দেখেছিস ভাই, কত বড়ো নির্লজ্জ! এরই মধ্যে মুখে কথা ফুটেছে। ওঁদের একটু আদর দিয়েছিস কি, আর ওঁদের সামলে রাখবার জো নেই। মেয়েমানুষের হাতে পড়েই ওঁদের উপযুক্ত শাসন হয় না। যদি নিজের জাতের সঙ্গে ঘরকন্না করতে হত তা হলে দেখতুম ওঁদের এত আদর থাকত কোথায়!

বিনোদ। তা হলে ভূ-ভার-হরণের জন্যে মাঝে মাঝে অবতারের আবশ্যক হত না; পরস্পরকে কেটেকুটে সংসারটা অনেকটা সংক্ষেপ করে আনতে পারতুম।

ইন্দু। গান

এবার মিলন-হাওয়ায় হাওয়ায় হেলতে হবে।
ধরা দেবার খেলা এবার খেলতে হবে।
ওগো পথিক, পথের টানে
চলেছিলে মরণ-পানে—
আঙিনাতে আসন এবার মেলতে হবে।

মাধবিকার কুঁড়িগুলি আনো তুলে,
মালতিকার মালা গাঁথো নবীন ফুলে।
স্বপ্নস্রোতে ভিড়বি পারে,
বাঁধবি দুজন দুই জনারে—
সেই মায়াজাল হৃদয় ঘিরে ফেলতে হবে।

ইন্দু। এখন কবিসম্রাট, এর একটা জবাব দিতে হবে তোমাকে।

বিনোদ। এখনি? হাতে হাতে?

ইন্দু। হাঁ, এখুনি।

বিনোদ। আচ্ছা, দুটো মিনিট সময় দাও। [নোটবই লইয়া লিখিতে প্রবৃত্ত

কমল। এ আবার তুই কী খেলা বের করলি ইন্দু!

ইন্দু। কমলদিদি, তুমি যে-খেলা খেলে নিলে এ তার চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ। উনি বাঁধছেন কাব্য, তুমি বেঁধেছ কবিকে।

কমল। ওগো শিকারী, তুমি আর কথা কোয়ো না। তোমার নিজের কবিটির কাহিনী ভুলে গেছ বুঝি? একবার তাকে হল অস্বীকার, আবার হল স্বীকার— মানুষটাকে কি কম নাকাল করা হয়েছে!

ইন্দু। আমার অকবিটিকে আমি কবি বানিয়েছি, এর বেশি কিছু না— কিন্তু তোমার মানুষটি আদিতে ছিলেন কবি, মধ্যে হলেন অকবি, আবার অন্তে উলটো রথে ফিরছেন কবিত্বে, এ কী কম কথা! আমাদের কমল অধিকারীর এই পালাটির নাম দিয়েছি কবি-জগন্নাথের রথযাত্রা। মন্দির থেকে বেরোনো, আবার মন্দিরে ফিরিয়ে আনা। দু দিন বাদেই দেখবি, থিয়েটার-ওয়ালারা ঝুলোঝুলি করবে এটা অভিনয় করবার জন্যে।— লেখা হল কবিবর?

বিনোদ। হয়েছে। [ইন্দু ও কমলে মিলিয়া নোটবই লইয়া মনে মনে পাঠ

ইন্দু। পাকা আম নিঙড়োলে রসের সঙ্গে আঁটি বেরিয়ে আসে, এও যে তাই।

বিনোদ। অর্থাৎ?

ইন্দু। অর্থাৎ, এ তো শুধু কাব্যরস নয়, এ যে রসতত্ত্ব। দিদি, তোমার এ কবিটি যে-সে কবি নয়— কাব্যকুঞ্জবনে এই মানুষটি নারিকেলজাতীয়। তোমার ভাগ্যে শাঁসও জুটবে, রসও জুটবে!

কমল। আর তোর ভাগ্যে ইন্দু?

ইন্দু। শুধু ছোবড়া।

বিনোদ। ছি ছি ভাই, আমার মধ্যে এমন রসের সংকীর্ণতা দেখলে কোথায়?

ইন্দু। কবিবর, সংকীর্ণতার দর বেশি, ঔদার্যেই সস্তা করে। হীরের টুকরো সংকীর্ণ, পাথরের চাঁই মস্ত। আমরা চাই, তুমি একলা আমার দিদির কণ্ঠহারে একটিমাত্র মধ্যমণি হয়ে থাকো— সরকারি হোটেলের রান্নাঘরে মস্ত শিলনোড়ার কাজে বিশ্বজনীন হয়ে না ওঠো।

বিনোদ। তাই সই, কিন্তু ওই যে গানটা তৈরি করলেম ওটাকে সুরের হারে গেঁথে একলা তোমার কণ্ঠে কি স্থান দেবে না?

ইন্দু। আচ্ছা, আজ তোমার গুড কন্‌ডাক্টের প্রাইজ স্বরূপে এই অনুগ্রহ করতে রাজি আছি। কোন্ সুর তোমার পছন্দ বলো।

বিনোদ। তোমার পছন্দেই আমার পছন্দ।

ইন্দু। আচ্ছা, সখা, তবে শ্রবণ করো।

গান

লুকালে বলেই খুঁজে বাহির-করা।
ধরা যদি দিতে তবে যেত না ধরা।

পাওয়া ধন আনমনে
হারাই যে অযতনে,
হারাধন পেলে সে যে হৃদয়-ভরা।

আপনি যে কাছে এল দূরে সে আছে,
কাছে যে টানিয়া আনে সে আসে কাছে।
দূরে বারি যায় চ'লে,
লুকায় মেঘের কোলে,
তাই সে ধরায় ফেরে পিপাসাহরা।

কমল। ওই ক্ষান্তদিদি আসছেন। (বিনোদের প্রতি) তোমার সাক্ষাতে উনি বেরোবেন না।

[বিনোদের প্রস্থান

ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। তা বেশ হয়েছে ভাই, বেশ হয়েছে। এই বুঝি তোর নতুন বাড়ি। এ যে রাজার ঐশ্বর্য! তা বেশ হয়েছে। এখন তোর স্বামী ধরা দিলেই আর কোনো খেদ থাকে না।

ইন্দু। সে বুঝি আর বাকি আছে? স্বামী রত্নটিকে আগে-ভাগে ভাঁড়ারে পুরেছেন।

ক্ষান্তমণি। আহা, তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। কমলের মতো এমন লক্ষ্মীমেয়ে কি কখনো অসুখী হতে পারে?

ইন্দু। ক্ষান্তদিদি, তুমি যে ভর-সন্ধের সময় ঘরকন্না ফেলে এখানে ছুটে এসেছ?

ক্ষান্তমণি। আর ভাই, ঘরকন্না! আমি দু দিন বাপের বাড়ি গিয়েছিলুম, এই ওঁর আর সহ্য হল না। রাগ ক'রে ঘর ছেড়ে, শুনলুম, তোদের এই বাড়িতে এসে রয়েছেন। তা, ভাই, বিয়ে করেছি বলেই কি বাপ মা একেবারে পর হয়ে গেছে? দু দিন সেখানে থাকতে পাব না? যা হোক, খবরটা পেয়ে চলে আসতে হল।

ইন্দু। আবার তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বুঝি?

ক্ষান্তমণি। তা, ভাই, একলা তো আর ঘরকন্না হয় না। ওদের যে চাই, ওদের যে নইলে নয়। নইলে আমার কি সাধ ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখি?

ইন্দু। ওই যে ওঁরা আসছেন। এসো এই পাশের ঘরে। [প্রস্থান

শিবচরণ গদাই নিবারণ ও চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে।

শিবচরণ। কী হল বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। ললিতের সঙ্গে কাদম্বিনীর বিবাহ স্থির হয়ে গেল।

শিবচরণ। সে কী! সে যে বিবাহ করবে না শুনলুম?

চন্দ্রকান্ত। সহধর্মিণীকে না। বিয়ে করছে টাকা-কল্পলতিকাকে; সে ওকে সাতপাকে ঘিরে বিলেত যাবার পাথেয়-পুষ্পবৃষ্টি করবে। যা হোক, এখন আর-একবার আমাদের গদাইবাবুর মত নেওয়া উচিত— ইতিমধ্যে যদি আবার বদল হয়ে থাকে।

শিবচরণ। (ব্যস্তভাবে) না না, আর মত বদলাতে সময় দেওয়া হবে না। তার পূর্বেই আমরা পাঁচজনে প'ড়ে চেপেচুপে ধ'রে কোনো গতিকে ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে হচ্ছে। চলো গদাই, অনেক আয়োজন করবার আছে।

(নিবারণের প্রতি) তবে চললেম ভাই!

নিবারণ। এসো।— [গদাই ও শিবচরণের প্রস্থান

চন্দরবাবু, আপনার তো খাওয়া হল না, কেবল ঘুরে ঘুরেই অস্থির হলেন— একটু বসুন, আপনার জন্যে জলখাবারের আয়োজন করে আসি গে। [প্রস্থান

ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। এখন বাড়ি যেতে হবে না কী?

চন্দ্রকান্ত। (দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া) নাঃ, আমি এখানে বেশ আছি।

ক্ষান্তমণি। তা তো দেখতে পাচ্ছি। তা চিরকাল এইখানেই কাটাবে নাকি?

চন্দ্রকান্ত। বিনুর সঙ্গে আমার তো সেইরকমই কথা হয়েছে।

ক্ষান্তমণি। বিনু তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কিনা! বিনুর সঙ্গে কথা হয়েছে! এখন ঢের হয়েছে, চলো।

চন্দ্রকান্ত। (জিব কাটিয়া, মাথা নাড়িয়া) সে কি হয়। বন্ধুমানুষকে কথা দিয়েছি, এখন কি সে ভাঙতে পারি।

ক্ষান্তমণি। আমার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো তুমি। আমি আর কখনো বাপের বাড়ি গিয়ে থাকব না। তা তোমার তো অযত্ন হয় নি— আমি তো সেখান থেকে সমস্ত রেঁধে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্রকান্ত। বড়োবউ, আমি কি তোমার রান্নার জন্যে তোমাকে বিয়ে করেছিলুম?

যে-বৎসর তোমার সঙ্গে অভাগার শুভবিবাহ হয় সে-বৎসর কলকাতা শহরে কি রাঁধুনি বামুনের মড়ক হয়েছিল ?

ক্ষান্তমণি। আমি বলছি, আমার একশোবার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো, আমি আর কখনো এমন কাজ করব না। এখন তুমি ঘরে চলো।

চন্দ্রকান্ত। তবে একটু বোসো। নিবারণবাবু আমার জলখাবারের ব্যবস্থা করতে গেছেন— উপস্থিত ত্যাগ করে যাওয়াটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

ক্ষান্তমণি। আমি সেখানে সব ঠিক করে রেখেছি, তুমি এখনি চলো।

চন্দ্রকান্ত। বলো কী, নিবারণবাবু—

বন্ধুগণ। (নেপথ্য হইতে)। চন্দরদা !

ক্ষান্তমণি। ওই রে, আবার ওরা আসছে ! ওদের হাতে পড়লে আর তোমার রক্ষে নেই।

চন্দ্রকান্ত। ওদের হাতে তুমি আমি দু জনে পড়ার চেয়ে একজন পড়া ভালো। শাস্ত্রে লিখছে : সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ, অতএব এ স্থলে অর্ধাঙ্গের সরাই ভালো।

ক্ষান্তমণি। তোমার ওই বন্ধুগুলোর জ্বালায় আমি কি মাথামোড় খুঁড়ে মরব।

[প্রস্থান

বিনোদ গদাই ও নলিনাক্ষের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। কেমন মনে হচ্ছে বিনু ?

বিনোদ। সে আর কী বলব, দাদা !

চন্দ্রকান্ত। গদাই, তোর স্নায়ুরোগের বর্তমান লক্ষণটা কী বল্ দেখি।

গদাই। অত্যন্ত সাংঘাতিক। ইচ্ছে করছে, দিগ্‌বিদিকে নেচে বেড়াই।

চন্দ্রকান্ত। ভাই, নাচতে হয় তো দিকে নেচো, আর বিদিকে নেচো না। পূর্বে তোমার যেরকম দিগ্‌ভ্রম হয়েছিল, কোথায় মির্জাপুর— কোথায় বাগবাজার !

গদাই। এখন ঠিক পথেই চলেছি, যাচ্ছি বাসরঘরের দিকে ; এই যে সামনেই।

[প্রস্থান

চন্দ্রকান্ত। সদ্‌দৃষ্টান্ত দেখে আমারও ঠিক পথে যাবার ইচ্ছে প্রবল হল। এখানেও আহার তৈরি, ঘরেও আহার প্রস্তুত— কিন্তু ঘরের দিকে ডবল টান পড়েছে।

বিনোদ। ওহে চন্দরদা, চুপ চুপ !

চন্দ্রকান্ত। কেন হে ?

বিনোদ। ওই-যে সুর বেজে উঠল বাসরঘর থেকে।

চন্দ্রকান্ত। তাই তো, বিপদ কাছে আসছে। ছিল গলির ও পারে, এখন এল পাশের ঘরে— ক্রমে আরো কাছে আসবে।

বিনোদ। চন্দরদা, বেরসিকের মতো কথা বোলো না, বিপদ আরো বেশি ছিল যখন সেটা গলির ও পারে ছিল— যতই কাছে আসছে ততই হৃদয় ভেঙে যাবার আশঙ্কা কমছে।

নেপথ্যে গান

মুখ-পানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে,
ফিরেছ কি ফের নাই বুঝিব কেমনে
আসন দিয়েছি পাতি, মালিকা রেখেছি গাঁথি,
বিফল হল কি তাহা ভাবি খনে খনে।

গোধূলিলগনে পাখি ফিরে আসে নীড়ে,
ধানে-ভরা তরীখানি ঘাটে এসে ভিড়ে।
আজো কি খোঁজার শেষে
ফেরো নি আপন দেশে,
বিরামবিহীন তৃষা জলে কি নয়নে?

চন্দ্রকান্ত। ওরে বিনু, এখনো মামলা চোকে নি, প্রিভিকৌন্সিলে নালিশ চলছে। তোর তরফের কৌঁসুলির কোনো জবাব তৈরি আছে? 'প্লীড্ গিল্‌টি' নাকি।

বিনোদ। একরকম তাই। কিন্তু দাদা, আমাদের মোটা কণ্ঠে কথা জোটে তো সুর জোটে না।

চন্দ্র। তা হোক, হার মানতে পারব না। আচ্ছা, দে দেখি কথাটা; কোনোমতে সবাই মিলে চেঁচামেচি করে চালিয়ে দিতে পারব।

বিনোদ। এই যে, আমার বইয়ে ছাপানো আছে।

চন্দ্রকান্ত। ধন্য কবি, ধন্য— নিদেন কালের উপযুক্ত সকল রকম বটিকা আগে থাকতেই তৈরি করে রেখেছ! কাফি সুরে ঠিক লাগবে—

গান

জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম, হায় রে!

আশার আলোয় তবুও ভরসা পায় না,
মুখে হাসি তবু চোখে জল না শুকায় রে!
বিরহের দাহ আজি হল যদি সারা,
ঝরিল মিলনরসের শ্রাবণধারা,
তবুও এমন গোপন বেদনতাপে
অকারণ দুখে পরান কেন দুখায় রে?

যদি বা ভেঙেছে ক্ষণিক মোহের ভুল
এখনো প্রাণে কি যাবে না মানের মূল?
যাহা খুঁজিবার সাঙ্গ হল তো খোঁজা,
যাহা বুঝিবার শেষ হয়ে গেল বোঝা,
তবু কেন হেন সংশয়ঘনছায়ে
মনের কথাটি নীরব মনে লুকায় রে?

তৃতীয় দৃশ্য

বাসরঘরের বাহিরে

লোকারণ্য। শঙ্খ। হুলুধ্বনি। সানাই

নিবারণ ও শিবচরণ

নিবারণ। কানাই! ও কানাই! কী করি বলো দেখি! কানাই গেল কোথায়?

শিবচরণ। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না ভাই! এ ব্যস্ত হবার কাজ নয়। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি পাত পাড়া হল কি না দেখে এসো দেখি।

ভৃত্য। বাবু, আসন এসে পৌঁচেছে, সেগুলো রাখি কোথায়?

নিবারণ। এসেছে! বাঁচা গেছে। তা সেগুলো ছাতে—

শিবচরণ। ব্যস্ত হচ্ছ কেন দাদা! কী হয়েছে বলো দেখি। কী রে বেটা, তুই হাঁ করিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? কাজকর্ম কিছু হাতে নেই নাকি?

ভৃত্য। আসন এসেছে, সেগুলো রাখি কোথায় তাই জিজ্ঞাসা করছি।

শিবচরণ। আমার মাথায়! একটু গুছিয়েগাছিয়ে নিজের বুদ্ধিতে কাজ করা, তা তোদের দ্বারা হবে না। চল্, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ওরে বাতিগুলো যে এখনো

জ্বালালে না। এখানে কোনো কাজেরই একটা বিলিব্যবস্থা নেই— সমস্ত বেবন্দোবস্ত। নিবারণ, ভাই, তুমি একটু ঠাণ্ডা হয়ে বোসো দেখি— ব্যস্ত হয়ে বেড়ালে কোনো কাজই হয় না। আঃ, বেটাদের কেবল ফাঁকি! বেহারা বেটারা সব পালিয়েছে দেখছি, আচ্ছা করে তাদের কানমলা না দিলে—

নিবারণ। পালিয়েছে নাকি! কী করা যায়?

শিবচরণ। ব্যস্ত হোয়ো না ভাই— সব ঠিক হয়ে যাবে। বড়ো বড়ো ক্রিয়া-কর্মের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা ভারি দরকার। কিন্তু এই রেধো বেটার সঙ্গে তো আর পারি নে! আমি তাকে পইপই করে বললুম 'তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লুচি ভাজিয়ো', কিন্তু কাল থেকে হতভাগা বেটার চুলের টিকি দেখবার জো নেই! লুচি যেন কিছু কম পড়েছে বোধ হচ্ছে।

নিবারণ। বলো কী শিবু! তা হলে তো সর্বনাশ!

শিবচরণ। ভয় কী দাদা! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সে আমি করে নিচ্ছি। একবার রাধুর দেখা পেলে হয়, আচ্ছা করে শুনিয়ে দিতে হবে।

চন্দ্রকান্ত বিনোদ প্রভৃতির প্রবেশ

নিবারণ। আহার প্রস্তুত চন্দ্রবাবু, কিছু খাবেন চলুন।

চন্দ্রকান্ত। আমাদের পরে হবে, আগে সকলের হোক।

শিবচরণ। না না, একে একে সব হয়ে যাক। চলো চন্দর, তোমাদের খাইয়ে আনি গে। নিবারণ, তুমি কিছু ব্যস্ত হোয়ো না, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি। কিন্তু, লুচিটা কিছু কম পড়বে বোধ হচ্ছে।

নিবারণ। তা হলে কী হবে শিবু!

শিবচরণ। ওই দেখো! মিছিমিছি ভাব কেন? সে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন কেবল সন্দেশগুলো এসে পৌঁছলে বাঁচি। আমার তো বোধ হচ্ছে, ময়রা বেটা বায়না নিয়ে ফাঁকি দিলে।

নিবারণ। বলো কী ভাই!

শিবচরণ। ব্যস্ত হোয়ো না। আমি সব দেখে শুনে নিচ্ছি।

[শিবচরণ ও নিবারণের প্রস্থান

চন্দ্রকান্ত। ওরে বিনু, খাবার লোভে চলেছিস বুঝি?

বিনোদ। কেন, তোমার লোভ একেবারে নেই নাকি?

চন্দ্রকান্ত। কাজ আছে যে।

বিনোদ। কাজ তো ফতে হয়ে গেছে, আবার কী?

চন্দ্রকান্ত। যে কাজ হয়ে গেছে সে তো ব্যক্তিগত। এখন লড়াই বাকি আছে হিউম্যানিটির জন্যে।

বিনোদ। বাস্ রে, এই অর্ধেক রাত্তিরে শেষকালে হিউম্যানিটি নিয়ে পড়তে হবে?

চন্দ্রকান্ত। হিউম্যানিটির জন্যে যত ষড়যন্ত্র সে তো অর্ধেক রাত্তিরেই।

বিনোদ। কোন্ দুঃসাধ্য কাজ করতে হবে বলো শুনি।

চন্দ্রকান্ত। বাসরঘরের রুদ্ধ দুর্গ আজ আমরা স্টর্ম্ করব।

বিনোদ। আমরা ভীরু, সামান্য পুরুষজাত মাত্র— আমাদের দ্বারা কি এত বড়ো বিপ্লব ঘটতে পারবে।

চন্দ্রকান্ত। নিজেকে ক্ষুদ্র জ্ঞান কোরো না বিনোদ! ভেবে দেখো, ত্রেতাযুগে যারা সেতুবন্ধন করেছিল জীব হিসাবে তারাও যে আমাদের চেয়ে খুব বেশি শ্রেষ্ঠ ছিল তার প্রমাণ নেই— এমন-কি, এক-আধটা বাহু বাহুল্য ছাড়া অনেক বিষয়েই মিল ছিল; মহৎ লক্ষ্য হৃদয়ে রেখে তারাও হেঁটে সমুদ্র পার হল। আর, আমাদের কেবলমাত্র এই দরজাটুকু পার হতে হবে। এতকাল এই বাসরঘরের সামনে স্ত্রীপুরুষের যে বিচ্ছেদসমুদ্র বিরাজ করেছে কেবল একটিমাত্র মহাবীর বরবেশে সেটা লঙ্ঘন করবার অধিকারী; কিষ্কিন্ধ্যার বাকি সকলকেই এ পারে পড়ে থাকতে হয়, এই অগৌরব যদি আমরা মোচন করতে না পারি তা হলে ধিক্ আমাদের পৌরুষ!

বিনোদ। হিয়ার হিয়ার!

চন্দ্রকান্ত। এতদিন সেখানে কেবল ভুজমৃণালের শাসনই বলবান ছিল। আজ বঙ্গোপসাগরের উত্তর তীর থেকে হিমালয়ের দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত সকল পুরুষে এককণ্ঠে বলো দেখি, 'নাহি কি বল এ ভুজ-অর্গলে?'

বিনোদ। আছে আছে!

চন্দ্রকান্ত। নবযুগে পুরুষদের কারখানাঘর-আফিসঘরের সামনে ফেমিনিজ্‌ম্‌এর আক্রমণ চলছে, আজ বাসরঘরের সামনে আমরা ম্যাস্‌কুলিনিজ্‌ম্ প্রচার করব। আমরা যুগান্তরের পাইওনিয়ার।

বিনোদ। জয়, পুরুষজাতিকী জয়!

চন্দ্রকান্ত। অত্যাচারকারিণীদের সিংহাসন আজ বিচলিত হোক। আবার বলো, জয় পুরুষজাতিকী জয়। গদাই, গদাই, গদাই, গদাধর, ভীরু, ট্রেটর্, এসো তুমি, খোলো রুদ্ধদ্বার, ভাঙো পুরুষজাতির অপমানের বাধা।

বিনোদ। চন্দরদা, ওকে স্পেশ্যাল্ কন্‌শেসন্ দিয়ে এরা কিনে নিয়েছে— ডিভাইড অ্যাণ্ড্ রুল্ পলিসি। ওকে সহজে পাওয়া যাবে না।

চন্দ্রকান্ত। সে কিছুতেই হচ্ছে না। আজ অসম্মানিত পুরুষজাতির আহ্বান তার মুগ্ধ হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছবেই। গদাই! গদাধর! বিশ্বাসঘাতক! স্বজাতিবিদ্রোহী কাপুরুষ!

গদাই ইন্দু ও কমলের প্রবেশ

কমল। এখানে দাঁড়িয়ে আপনারা করছেন কী?

চন্দ্রকান্ত। সিডিশন্।

ইন্দু। আপনাদের সাহস তো কম নয়!

চন্দ্রকান্ত। শর্‌ট্‌হ্যাণ্ড্-লিখিয়ে রিপোর্টার কেউ উপস্থিত ছিল না, তাই ভাষাটা হয়তো কিছু অসংযত হয়েছিল। আর কিছুই নয়, আমরা বলছিলুম, 'ভাগ্যদেবীগণ, রুদ্ধদ্বার খোলো— পাপীদের ক্ষমা করবার প্রত্যক্ষ আনন্দটা ভোগ করে নাও, তাতে স্বর্গেরও গৌরব, মর্তেরও পরিত্রাণ।'

ইন্দু। যারা ক্ষমা করবার যোগ্য তাদের তো ক্ষমা হয়ে গেছে।

চন্দ্রকান্ত। এত বড়ো নিষ্ঠুর কথাটা বলতে পারলেন দয়াময়ী? দেবী, আমিই কি পাপিষ্ঠতম? এদের দুজনের চেয়েও অধম?

ইন্দু। তিনি আপনাকে উদ্ধারের আশা ছেড়ে দিয়েছেন।

চন্দ্রকান্ত। দেবী, সেটা কি তাঁর পক্ষে আমার চেয়ে কম শোচনীয়? যিনি তারিণী তাঁর জন্যে যদি একটা বাঁধা পাপীর বরাদ্দ না থাকে তবে তো একেবারে বেকার তিনি। যাকে বলে, আন্‌এম্‌প্লয়্‌মেন্ট্ প্রব্লেম্! বড়োবউ, তোমার অনুপস্থিতিতে যদি দৈবাৎ আমার সংশোধন হয়ে যায়, যদি তোমার জন্যে সবুর করতে না পারি, যদি পরিত্রাণের দোসরা পথ জুটে যায়, তা হলে সেটাতে কি তোমারই যশ না আমারই!

ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। আঃ, কী মিছেমিছি চেঁচাচ্ছ!

চন্দ্রকান্ত। মিছেমিছি নয় দেবী! পৃথিবীসুদ্ধ লোক চেঁচাচ্ছে পরিত্রাণের দরবারে —কেউ-বা ধর্মে, কেউ-বা কর্মে, কেউ-বা পলিটিক্‌সে, আর আমিই যদি চুপ করে থাকব তা হলে নিতান্তই ঠকব যে। এই দুটি ভাগ্যবানদের দিকে তাকিয়ে আমি আর থাকতে পারলুম না। একটু চেঁচিয়েছি, ফলও পেয়েছি— এখন যবনিকাপতনের পূর্বে দয়াময়ীদের বন্দনাটা সেরে নিই।

গান। প্রথমে চন্দ্রকান্ত পরে সকলে মিলিয়া

বাউলের সুর

যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে
সেই আমাদের ভালো।
আমাদের এই আঁধার ঘরে
সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো।
কেউ-বা অতি জ্বলজ্বল, কেউ-বা ম্লান ছলছল—
কেউ-বা কিছু দহন করে, কেউ-বা স্নিগ্ধ আলো।
নূতন প্রেমে নূতন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল-মধুর— একটুকু ঝাঁঝালো।
বাক্য যখন বিদায় করে চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো।
আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা,
তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
তোমার কথা বলতে কবির কথা ফুরালো।
যে মূর্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভালো লাগে—
কেউ-বা দিব্যি গৌরবরন, কেউ-বা দিব্যি কালো।

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

অনধিকার প্রবেশ

একদা প্রাতঃকালে পথের ধারে দাঁড়াইয়া এক বালক আর-এক বালকের সহিত একটি অসমসাহসিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বাজি রাখিয়াছিল। ঠাকুরবাড়ির মাধবীবিতান হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে পারিবে কি না, ইহাই লইয়া তর্ক। একটি বালক বলিল 'পারিব', আর-একটি বালক বলিল 'কখনোই পারিবে না'।

কাজটি শুনিতে সহজ অথচ করিতে কেন সহজ নহে তাহার বৃত্তান্ত আর-একটু বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক।

পরলোকগত মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির বিধবা স্ত্রী জয়কালী দেবী এই রাধানাথ জীউর মন্দিরের অধিকারিণী। অধ্যাপক মহাশয় টোলে যে তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন পত্নীর নিকটে একদিনের জন্যও সে উপাধি সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে উপাধির সার্থকতা ঘটিয়াছিল, কারণ, তর্ক এবং বাক্য সমস্তই তাঁহার পত্নীর অংশে পড়িয়াছিল, তিনি পতিরূপে তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিয়াছিলেন।

সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে জয়কালী অধিক কথা কহিতেন না কিন্তু অনেক সময় দুটি কথায়, এমন-কি, নীরবে অতি বড়ো প্রবল মুখবেগও বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন।

জয়কালী দীর্ঘাকার দৃঢ়শরীর তীক্ষ্ণনাসা প্রখরবুদ্ধি স্ত্রীলোক। তাঁহার স্বামী বর্তমানে তাঁহাদের দেবোত্তর সম্পত্তি নষ্ট হইবার জো হইয়াছিল। বিধবা তাহার সমস্ত বাকি বকেয়া আদায়, সীমাসরহদ্দ স্থির এবং বহুকালের বেদখল উদ্ধার করিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাপ্য হইতে কেহ তাহাকে এক কড়ি বঞ্চিত করিতে পারিত না।

এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌরুষের অংশ থাকাতে তাঁহার যথার্থ সঙ্গী কেহ ছিল না। স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে ভয় করিত। পরনিন্দা, ছোটো কথা বা নাকি কান্না তাঁহার অসহ্য ছিল। পুরুষেরাও তাঁহাকে ভয় করিত; কারণ, পল্লীবাসী

ভদ্রপুরুষদের চণ্ডীমণ্ডপগত অগাধ আলস্যকে তিনি একপ্রকার নীরব ঘৃণাপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষের দ্বারা ধিক্কার করিয়া যাইতে পারিতেন যাহা তাহাদের স্থূল জড়ত্ব ভেদ করিয়াও অন্তরে প্রবেশ করিত।

প্রবলরূপে ঘৃণা করিবার এবং সে ঘৃণা প্রবলরূপে প্রকাশ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই প্রৌঢ়া বিধবাটির ছিল। বিচারে যাহাকে অপরাধী করিতেন তাহাকে তিনি কথায় এবং বিনা কথায়, ভাবে এবং ভঙ্গীতে একেবারে দগ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন।

পল্লীর সমস্ত ক্রিয়াকর্মে বিপদে সম্পদে তাঁহার নিরলস হস্ত ছিল। সর্বত্রই তিনি নিজের একটি গৌরবের স্থান বিনা চেষ্টায় অতি সহজেই অধিকার করিয়া লইতেন। যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন সেখানে তিনিই যে সকলের প্রধানপদে, সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অথবা উপস্থিত কোনো ব্যক্তির মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না।

রোগীর সেবায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কিন্তু রোগী তাঁহাকে যমেরই মতো ভয় করিত। পথ্য বা নিয়মের লেশমাত্র লঙ্ঘন হইলে তাঁহার ক্রোধানল রোগের তাপ অপেক্ষা রোগীকে অধিক উত্তপ্ত করিয়া তুলিত।

এই দীর্ঘাকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার কঠোর নিয়মদণ্ডের ন্যায় পল্লীর মস্তকের উপর উদ্যত ছিলেন; কেহ তাঁহাকে ভালোবাসিতে অথবা অবহেলা করিতে সাহস করিত না। পল্লীর সকলের সঙ্গেই তাঁহার যোগ ছিল অথচ তাঁহার মতো অত্যন্ত একাকিনী কেহ ছিল না।

বিধবা নিঃসন্তান ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার গৃহে মানুষ হইত। পুরুষ অভিভাবক অভাবে তাহাদের যে কোনো প্রকার শাসন ছিল না এবং স্নেহান্ধ পিসিমার আদরে তাহারা যে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল এমন কথা কেহ বলিতে পারিত না। তাহাদের মধ্যে বড়োটির বয়স আঠারো হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহার বিবাহের প্রস্তাবও আসিত এবং পরিণয়বন্ধন সম্বন্ধে বালকটির চিত্তও উদাসীন ছিল না। কিন্তু পিসিমা তাহার সেই সুখবাসনায় একদিনের জন্যও প্রশ্রয় দেন নাই। অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় কিশোর নবদম্পতির নব প্রেমোদ্‌গমদৃশ্য তাঁহার কল্পনায় অত্যন্ত উপভোগ্য মনোরম বলিয়া প্রতীত হইত না। বরং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিবাহ করিয়া অন্য ভদ্র গৃহস্থের ন্যায় আলস্যভরে ঘরে বসিয়া পত্নীর আদরে প্রতিদিন স্ফীত হইতে থাকিবে, এ সম্ভাবনা তাঁহার নিকট নিরতিশয় হেয় বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি কঠিন ভাবে বলিতেন, পুলিন আগে উপার্জন করিতে আরম্ভ করুক, তার পরে বধূ ঘরে আনিবে। পিসিমার মুখের সেই কঠোর বাক্যে প্রতিবেশিনীদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

ঠাকুরবাড়িটি জয়কালীর সর্বাপেক্ষা যত্নের ধন ছিল। ঠাকুরের শয়ন বসন স্নানাহারের

তিলমাত্র ত্রুটি হইতে পারিত না। পূজক ব্রাহ্মণ দুটি দেবতার অপেক্ষা এই একটি মানবীকে অনেক বেশি ভয় করিত। পূর্বে এক সময় ছিল যখন দেবতার বরাদ্দ দেবতা পুরা পাইতেন না। কারণ, পূজক ঠাকুরের আর-একটি পূজার প্রতিমা গোপন মন্দিরে ছিল; তাহার নাম ছিল নিস্তারিণী। গোপনে ঘৃত দুগ্ধ ছানা ময়দার নৈবেদ্য স্বর্গে নরকে ভাগাভাগি হইয়া যাইত। কিন্তু আজকাল জয়কালীর শাসনে পূজার ষোলো আনা অংশই ঠাকুরের ভোগে আসিতেছে, উপদেবতাগণকে অন্যত্র জীবিকার অন্য উপায় অন্বেষণ করিতে হইয়াছে।

বিধবার যত্নে ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার তকৃতক্ করিতেছে— কোথাও একটি তৃণমাত্র নাই। একপার্শ্বে মঞ্চ অবলম্বন করিয়া মাধবীলতা উঠিয়াছে, তাহার শুষ্কপত্র পড়িবামাত্র জয়কালী তাহা তুলিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। ঠাকুরবাড়িতে পারিপাট্য পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইলে বিধবা তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়ার ছেলেরা পূর্বে লুকাচুরি খেলা উপলক্ষে এই প্রাঙ্গণের প্রান্তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং মধ্যে মধ্যে পাড়ার ছাগশিশু আসিয়া মাধবীলতার বল্কলাংশ কিছু কিছু ভক্ষণ করিয়া যাইত। এখন আর সে সুযোগ নাই। পর্বকাল ব্যতীত অন্য দিনে ছেলেরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না এবং ক্ষুধাতুর ছাগশিশুকে দণ্ডাঘাত খাইয়াই দ্বারের নিকট হইতে তারস্বরে আপন অজ-জননীকে আহ্বান করিতে করিতে ফিরিতে হইত।

অনাচারী ব্যক্তি পরমাত্মীয় হইলেও দেবালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না। জয়কালীর একটি যবনকরপক্ক-কুক্কুটমাংস-লোলুপ ভগিনীপতি আত্মীয়সন্দর্শন উপলক্ষে গ্রামে উপস্থিত হইয়া মন্দির-অঙ্গনে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, জয়কালী তাহাতে ত্বরিত ও তীব্র আপত্তি প্রকাশ করাতে সহোদরা ভগিনীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। এই দেবালয় সম্বন্ধে বিধবার এতই অতিরিক্ত অনাবশ্যক সতর্কতা ছিল যে, সাধারণের নিকট তাহা অনেকটা বাতুলতারূপে প্রতীয়মান হইত।

জয়কালী আর-সর্বত্রই কঠিন উন্নত স্বতন্ত্র, কেবল এই মন্দিরের সম্মুখে তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহটির নিকট তিনি একান্তরূপে জননী, পত্নী, দাসী— ইহার কাছে তিনি সতর্ক, সুকোমল, সুন্দর এবং সম্পূর্ণ অবনম্র। এই প্রস্তরের মন্দির এবং প্রস্তরের মূর্তিটি তাঁহার নিগূঢ় নারীস্বভাবের একমাত্র চরিতার্থতার বিষয় ছিল। ইহাই তাঁহার স্বামী, পুত্র, তাঁহার সমস্ত সংসার।

ইহা হইতেই পাঠকেরা বুঝিবেন, যে-বালকটি মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে মাধবীমঞ্জরী আহরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহার সাহসের সীমা ছিল না। সে জয়কালীর

কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নলিন। সে তাহার পিসিমাকে ভালো করিয়াই জানিত, তথাপি তাহার দুর্দান্ত প্রকৃতি শাসনের বশ হয় নাই। যেখানে বিপদ সেখানেই তাহার একটা আকর্ষণ ছিল, এবং যেখানে শাসন সেখানেই লঙ্ঘন করিবার জন্য তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকিত। জনশ্রুতি আছে, বাল্যকালে তাহার পিসিমার স্বভাবটিও এইরূপ ছিল।

জয়কালী তখন মাতৃস্নেহমিশ্রিত ভক্তির সহিত ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দালানে বসিয়া একমনে মালা জপিতেছিলেন।

বালকটি নিঃশব্দপদে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মাধবীতলায় দাঁড়াইল। দেখিল, নিম্নশাখার ফুলগুলি পূজার জন্য নিঃশেষিত হইয়াছে। তখন অতি ধীরে ধীরে সাবধানে মঞ্চে আরোহণ করিল। উচ্চশাখায় দুটি-একটি বিকচোন্মুখ কুঁড়ি দেখিয়া যেমন সে শরীর এবং বাহু প্রসারিত করিয়া তুলিতে যাইবে অমনি সেই প্রবল চেষ্টার ভরে জীর্ণ মঞ্চ সশব্দে ভাঙিয়া পড়িল। আশ্রিত লতা এবং বালক একত্রে ভূমিসাৎ হইল।

জয়কালী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রটির কীর্তি দেখিলেন, সবলে বাহু ধরিয়া তাহাকে মাটি হইতে তুলিলেন। আঘাত তাহার যথেষ্ট লাগিয়াছিল, কিন্তু সে আঘাতকে শাস্তি বলা যায় না, কারণ, তাহা অজ্ঞান জড়ের আঘাত। সেইজন্য পতিত বালকের ব্যথিত দেহে জয়কালীর সজ্ঞান শাস্তি মুহুর্মুহু সবলে বর্ষিত হইতে লাগিল। বালক একবিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া নীরবে সহ্য করিল। তখন তাহার পিসিমা তাহাকে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রুদ্ধ করিলেন। তাহার সেদিনকার বৈকালিক আহার নিষিদ্ধ হইল।

আহার বন্ধ হইল শুনিয়া দাসী মোক্ষদা কাতরকণ্ঠে ছলছলনেত্রে বালককে ক্ষমা করিতে অনুনয় করিল। জয়কালীর হৃদয় গলিল না। ঠাকুরানীর অজ্ঞাতসারে গোপনে ক্ষুধিত বালককে কেহ যে খাদ্য দিবে, বাড়িতে এমন দুঃসাহসিক কেহ ছিল না।

বিধবা মঞ্চসংস্কারের জন্য লোক ডাকিতে পাঠাইয়া পুনর্বার মালাহস্তে দালানে আসিয়া বসিলেন। মোক্ষদা কিছুক্ষণ পরে সভয়ে নিকটে আসিয়া কহিল, "ঠাকুরমা, কাকাবাবু ক্ষুধায় কাঁদিতেছেন, তাঁহাকে কিছু দুধ আনিয়া দিব কি ?"

জয়কালী অবিচলিত মুখে কহিলেন, "না।" মোক্ষদা ফিরিয়া গেল। অদূরবর্তী কুটীরের কক্ষ হইতে নলিনের করুণ ক্রন্দন ক্রমে ক্রোধের গর্জনে পরিণত হইয়া উঠিল— অবশেষে অনেক ক্ষণ পরে তাহার কাতরতার শ্রান্ত উচ্ছ্বাস থাকিয়া থাকিয়া জপনিরতা পিসিমার কানে আসিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল।

নলিনের আর্তকণ্ঠ যখন পরিশ্রান্ত ও মৌনপ্রায় হইয়া আসিয়াছে এমন সময় আর-একটি জীবের ভীত কাতরধ্বনি নিকটে ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে ধাবমান

মনুষ্যের দূরবর্তী চীৎকারশব্দ মিশ্রিত হইয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ পথে একটা তুমুল কলরব উত্থিত হইল।

সহসা প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পদশব্দ শোনা গেল। জয়কালী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, ভূপর্যন্ত মাধবীলতা আন্দোলিত হইতেছে।

সরোষকণ্ঠে ডাকিলেন, "নলিন!"

কেহ উত্তর দিল না। বুঝিলেন, অবাধ্য নলিন বন্দীশালা হইতে কোনোক্রমে পলায়ন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে রাগাইতে আসিয়াছে।

তখন অত্যন্ত কঠিনভাবে অধরের উপরে ওষ্ঠ চাপিয়া বিধবা প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন।

লতাকুঞ্জের নিকট পুনরায় ডাকিলেন, "নলিন!"

উত্তর পাইলেন না। শাখা তুলিয়া দেখিলেন, একটা অত্যন্ত মলিন শূকর প্রাণভয়ে ঘন পল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

যে লতাবিতান এই ইষ্টকপ্রাচীরের মধ্যে বৃন্দাবিপিনের সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ, যাহার বিকশিত কুসুমমঞ্জরীর সৌরভ গোপীবৃন্দের সুগন্ধি নিশ্বাস স্মরণ করাইয়া দেয় এবং কালিন্দীতীরবর্তী সুখবিহারের সৌন্দর্যস্বপ্ন জাগ্রত করিয়া তোলে— বিধবার সেই প্রাণাধিক যত্নের সুপবিত্র নন্দনভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল।

পূজারি ব্রাহ্মণ লাঠি হস্তে তাড়া করিয়া আসিল।

জয়কালী তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং দ্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অনতিকাল পরেই সুরাপানে-উন্মত্ত ডোমের দল মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশুর জন্য চীৎকার করিতে লাগিল।

জয়কালী রুদ্ধদ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "যা বেটারা, ফিরে যা! আমার মন্দির অপবিত্র করিস্‌ নে।"

ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরানী যে তাঁহার রাধানাথ জীউর মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দিবেন, ইহা তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজনামধারী অতি ক্ষুদ্র দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

শ্রাবণ ১৩০১

মেঘ ও রৌদ্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্বদিনে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আজ ক্ষান্তবর্ষণ প্রাতঃকালে ম্লান রৌদ্র ও খণ্ড মেঘে মিলিয়া পরিপক্কপ্রায় আউশ ধানের ক্ষেত্রের উপর পর্যায়ক্রমে আপন আপন সুদীর্ঘ তুলি বুলাইয়া যাইতেছিল; সুবিস্তৃত শ্যাম চিত্রপট একবার আলোকের স্পর্শে উজ্জ্বল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতেছিল আবার পরক্ষণেই ছায়াপ্রলেপে গাঢ় স্নিগ্ধতায় অঙ্কিত হইতেছিল।

যখন সমস্ত আকাশরঙ্গভূমিতে মেঘ এবং রৌদ্র, দুইটি মাত্র অভিনেতা, আপন আপন অংশ অভিনয় করিতেছিল তখন নিম্নে সংসাররঙ্গভূমিতে কত স্থানে কত অভিনয় চলেতেছিল তাহার আর সংখ্যা নাই।

আমরা যেখানে একটি ক্ষুদ্র জীবননাট্যের পট উত্তোলন করিলাম সেখানে গ্রামে পথের ধারে একটি বাড়ি দেখা যাইতেছে। বাহিরের একটি মাত্র ঘর পাকা, এবং সেই ঘরের দুই পার্শ্ব দিয়া জীর্ণপ্রায় ইষ্টকের প্রাচীর গুটিকতক মাটির ঘর বেষ্টন করিয়া আছে। পথ হইতে গরাদের জানলা দিয়া দেখা যাইতেছে, একটি যুবাপুরুষ খালি গায়ে তক্তপোশে বসিয়া বামহস্তে ক্ষণে ক্ষণে তালপাতার পাখা লইয়া গ্রীষ্ম এবং মশক দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং দক্ষিণ হস্তে বই লইয়া পাঠে নিবিষ্ট আছেন।

বাহিরে গ্রামের পথে একটি ডুরে-কাপড়-পরা বালিকা আঁচলে গুটিকতক কালো-জাম লইয়া একে একে নিঃশেষ করিতে করিতে উক্ত গরাদে-দেওয়া জানলার সম্মুখ দিয়া বারংবার যাতায়াত করিতেছিল। মুখের ভাবে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল, ভিতরে যে মানুষটি তক্তপোশে বসিয়া বই পড়িতেছে তাহার সহিত বালিকার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে —এবং কোনোমতে সে তাহার মনোযোগ আকর্ষণপূর্বক তাহাকে নীরবে অবজ্ঞাভরে জানাইয়া যাইতে চাহে যে, 'সম্প্রতি কালোজাম খাইতে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, তোমাকে আমি গ্রাহ্যমাত্র করি না।'

দুর্ভাগ্যক্রমে, ঘরের ভিতরকার অধ্যয়নশীল পুরুষটি চক্ষে কম দেখেন, দূর হইতে বালিকার নীরব উপেক্ষা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বালিকাও তাহা জানিত সুতরাং অনেক ক্ষণ নিষ্ফল আনাগোনার পর নীরব উপেক্ষার পরিবর্তে কালোজামের আঁটি ব্যবহার করিতে হইল। অন্ধের নিকটে অভিমানের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা এতই দুরূহ।

যখন ক্ষণে ক্ষণে দুই-চারিটা কঠিন আঁটি যেন দৈবক্রমে বিক্ষিপ্ত হইয়া কাঠের

দরজার উপর ঠক্ করিয়া শব্দ করিয়া উঠিল তখন পাঠরত পুরুষটি মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। মায়াবিনী বালিকা তাহা জানিতে পারিয়া দ্বিগুণ নিবিষ্টভাবে অঞ্চল হইতে দংশনযোগ্য সুপক্ব কালোজাম নির্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হইল। পুরুষটি ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বিশেষ চেষ্টাসহকারে নিরীক্ষণপূর্বক বালিকাকে চিনিতে পারিল এবং বই রাখিয়া জানলার কাছে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাস্যমুখে ডাকিল, "গিরিবালা !"

গিরিবালা অবিচলিত ভাবে নিজের অঞ্চলের মধ্যে জামপরীক্ষাকার্যে সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট থাকিয়া মৃদুগমনে আপন-মনে এক-এক পা করিয়া চলিতে লাগিল।

তখন ক্ষীণদৃষ্টি যুবাপুরুষের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, কোনো-একটি অজ্ঞানকৃত অপরাধের দণ্ডবিধান হইতেছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "কই, আজ আমাকে জাম দিলে না ?" গিরিবালা সে কথা কানে না আনিয়া বহু অন্বেষণ ও পরীক্ষায় একটি জাম মনোনীত করিয়া অত্যন্ত নিশ্চিন্তমনে খাইতে আরম্ভ করিল।

এই জামগুলি গিরিবালাদের বাগানের জাম এবং যুবাপুরুষের দৈনিক বরাদ্দ। কী জানি, সে কথা কিছুতেই আজ গিরিবালার স্মরণ হইল না, তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল যে, এগুলি সে একমাত্র নিজের জন্যই আহরণ করিয়াছে। কিন্তু নিজের বাগান হইতে ফল পাড়িয়া পরের দরজার সম্মুখে আসিয়া ঘটা করিয়া খাইবার কী অর্থ পরিষ্কার বুঝা গেল না। তখন পুরুষটি কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিল। গিরিবালা প্রথমটা আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, তাহার পরে সহসা অশ্রুজলে ভাসিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং আঁচলের জাম ভূতলে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সকালবেলাকার চঞ্চল রৌদ্র এবং চঞ্চল মেঘ বৈকালে শান্ত ও শ্রান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। শুভ্র স্ফীত মেঘ আকাশের প্রান্তভাগে স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছে এবং অপরাহ্নের অবসন্নপ্রায় আলোক গাছের পাতায়, পুষ্করিণীর জলে এবং বর্ষাস্নাত প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে। আবার সেই বালিকাটিকে সেই গরাদের জানলার সম্মুখে দেখা যাইতেছে এবং ঘরের মধ্যে সেই যুবা পুরুষটি বসিয়া আছে। প্রভেদের মধ্যে এবেলা বালিকার অঞ্চলে জাম নাই এবং যুবকের হস্তেও বই নাই। তদপেক্ষা গুরুতর এবং নিগূঢ় প্রভেদও কিছু কিছু ছিল।

এবেলাও বালিকা কী বিশেষ আবশ্যকে সেই বিশেষ স্থানে আসিয়া ইতস্তত করিতেছে বলা কঠিন। আর যাহাই আবশ্যক থাক্, ঘরের ভিতরকার মানুষটির সহিত আলাপ করিবার যে আবশ্যক আছে ইহা কোনোমতেই বালিকার ব্যবহারে প্রকাশ

পায় না। বরঞ্চ বোধ হইল সে দেখিতে আসিয়াছে, সকালবেলায় যে জামগুলা ফেলিয়া গেছে বিকালবেলায় তাহার কোনোটার অঙ্কুর বাহির হইয়াছে কি না।

কিন্তু অঙ্কুর না বাহির হইবার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি গুরুতর কারণ এই ছিল যে, ফলগুলি সম্প্রতি যুবকের সম্মুখে তক্তপোশের উপর রাশীকৃত ছিল; এবং বালিকা যখন ক্ষণে ক্ষণে অবনত হইয়া কোনো একটা অনির্দেশ্য কাল্পনিক পদার্থের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল তখন যুবক মনের হাস্য গোপন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে একটি একটি জাম নির্বাচন করিয়া সযত্নে আহার করিতেছিল। অবশেষে যখন দুটো-একটা আঁটি দৈবক্রমে বালিকার পায়ের কাছে, এমন-কি, পায়ের উপরে আসিয়া পড়িল তখন গিরিবালা বুঝিতে পারিল, যুবক বালিকার অভিমানের প্রতিশোধ লইতেছে। কিন্তু এই কি উচিত! যখন সে আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর সমস্ত গর্ব বিসর্জন দিয়া আত্মসমর্পণ করিবার অবসর খুঁজিতেছে তখন কি তাহার সেই অত্যন্ত দুরূহ পথে বাধা দেওয়া নিষ্ঠুরতা নহে। ধরা দিতে আসিয়াছে, এই কথাটা ধরা পড়িয়া বালিকা যখন ক্রমশ আরক্তিম হইয়া পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল তখন যুবক বাহিরে আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

সকালবেলাকার মতো এবেলাও বালিকা আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পালাইবার বহু চেষ্টা করিল, কিন্তু কাঁদিল না। বরঞ্চ রক্তবর্ণ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া উৎপীড়নকারীর পৃষ্ঠদেশে মুখ লুকাইয়া প্রচুর পরিমাণে হাসিতে লাগিল এবং যেন কেবলমাত্র বাহ্য আকর্ষণে নীত হইয়া পরাভূত বন্দীভাবে লৌহগরাদেবেষ্টিত কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আকাশে মেঘরৌদ্রের খেলা যেমন সামান্য, ধরাপ্রান্তে এই দুটি প্রাণীর খেলাও তেমনি সামান্য, তেমনি ক্ষণস্থায়ী। আবার আকাশে মেঘরৌদ্রের খেলা যেমন সামান্য নহে এবং খেলা নহে কিন্তু খেলার মতো দেখিতে মাত্র, তেমনি এই দুটি অখ্যাতনামা মনুষ্যের একটি কর্মহীন বর্ষাদিনের ক্ষুদ্র ইতিহাস সংসারের শত শত ঘটনার মধ্যে তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু ইহা তুচ্ছ নহে। যে বৃদ্ধ বিরাট অদৃষ্ট অবিচলিত গম্ভীরমুখে অনন্তকাল ধরিয়া যুগের সহিত যুগান্তর গাঁথিয়া তুলিতেছে সেই বৃদ্ধই বালিকার এই সকালবিকালের তুচ্ছ হাসিকান্নার মধ্যে জীবনব্যাপী সুখদুঃখের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতেছিল। তথাপি বালিকার এই অকারণ অভিমান বড়োই অর্থহীন বলিয়া বোধ হইল। কেবল দর্শকের কাছে নহে, এই ক্ষুদ্র নাট্যের প্রধান পাত্র উক্ত যুবকের নিকটেও। এই বালিকা কেন যে একদিন বা রাগ করে, একদিন বা অপরিমিত স্নেহ প্রকাশ করিতে থাকে, কোনোদিন বা দৈনিক বরাদ্দ বাড়াইয়া

দেয়, কোনোদিন বা দৈনিক বরাদ্দ একেবারেই বন্ধ করে, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নহে। এক-একদিন সে যেন তাহার সমস্ত কল্পনা ভাবনা এবং নৈপুণ্য একত্র করিয়া যুবকের সন্তোষসাধনে প্রবৃত্ত হয়, আবার এক-একদিন তাহার সমস্ত ক্ষুদ্র শক্তি তাহার সমস্ত কাঠিন্য একত্র সংহত করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করে। বেদনা দিতে না পারিলে তাহার কাঠিন্য দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে; কৃতকার্য হইলে সে কাঠিন্য অনুতাপের অশ্রুজলে শতধা বিগলিত হইয়া অজস্র স্নেহধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে।

এই তুচ্ছ মেঘরৌদ্র-খেলার প্রথম তুচ্ছ ইতিহাস পরপরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রামের মধ্যে আর সকলেই দলাদলি, চক্রান্ত, ইক্ষুর চাষ, মিথ্যা মকদ্দমা এবং পাটের কারবার লইয়া থাকিত, ভাবের আলোচনা এবং সাহিত্যচর্চা করিত কেবল শশিভূষণ এবং গিরিবালা।

ইহাতে কাহারো ঔৎসুক্য বা উৎকণ্ঠার কোনো বিষয় নাই। কারণ, গিরিবালার বয়স দশ এবং শশিভূষণ একটি সদ্যবিকশিত এম. এ. বি. এল.। উভয়ে প্রতিবেশী মাত্র।

গিরিবালার পিতা হরকুমার এককালে নিজগ্রামের পত্তনিদার ছিলেন। এখন দুরবস্থায় পড়িয়া সমস্ত বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের বিদেশী জমিদারের নায়েবি পদ গ্রহণ করিয়াছেন। যে পরগনায় তাঁহাদের বাস সেই পরগনারই নায়েবি, সুতরাং তাঁহাকে জন্মস্থান হইতে নড়িতে হয় না।

শশিভূষণ এম. এ. পাস করিয়া আইনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু কিছুতেই কোনো কর্মে ভিড়িলেন না। লোকের সঙ্গে মেশা বা সভাস্থলে দুটো কথা বলা, সেও তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠে না। চোখে কম দেখেন বলিয়া চেনা লোককে চিনিতে পারেন না এবং সেই কারণেই ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে হয়, লোকে সেটাকে ঔদ্ধত্য বলিয়া বিবেচনা করে।

কলিকাতায় জনসমুদ্রের মধ্যে আপন-মনে একলা থাকা শোভা পায় কিন্তু পল্লীগ্রামে সেটা বিশেষ স্পর্ধার মতো দেখিতে হয়। শশিভূষণের বাপ যখন বিস্তর চেষ্টায় পরাস্ত হইয়া অবশেষে তাঁহার অকর্মণ্য পুত্রটিকে পল্লীতে তাঁহাদের সামান্য বিষয়রক্ষাকার্যে নিয়োগ করিলেন তখন শশিভূষণকে পল্লীবাসীদের নিকট হইতে বিস্তর উৎপীড়ন উপহাস এবং লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছিল। লাঞ্ছনার আরো একটা কারণ ছিল; শান্তিপ্রিয়

শশিভূষণ বিবাহ করিতে সম্মত ছিলেন না— কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাগণ তাঁহার এই অনিচ্ছাকে দুঃসহ অহংকার জ্ঞান করিয়া কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেন না।

শশিভূষণের উপর যতই উপদ্রব হইতে লাগিল শশিভূষণ ততই আপন বিবরের মধ্যে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। একটি কোণের ঘরে তক্তপোশের উপর কতকগুলি বাঁধানো ইংরাজি বই লইয়া বসিয়া থাকিতেন; যখন যেটা ইচ্ছা হইত পাঠ করিতেন, এই তো ছিল তাঁর কাজ, বিষয় কী করিয়া রক্ষা হইত তাহা বিষয়ই জানে।

এবং পূর্বেই আভাসে বলা গিয়াছে, মানুষের মধ্যে তাঁহার সম্পর্ক ছিল কেবল গিরিবালার সহিত।

গিরিবালার ভাইরা ইস্কুলে যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া মূঢ় ভগ্নীটিকে কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিত, পৃথিবীর আকার কিরূপ; কোনোদিন বা প্রশ্ন করিত, সূর্য বড়ো না পৃথিবী বড়ো— সে যখন ভুল বলিত তখন তাহার প্রতি বিপুল অবজ্ঞা দেখাইয়া ভ্রম সংশোধন করিত। সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ, এ মতটা যদি গিরিবালার নিকট প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইত এবং সেই সন্দেহ যদি সে সাহস করিয়া প্রকাশ করিত, তবে তাহার ভাইরা তাহাকে দ্বিগুণ উপেক্ষাভরে কহিত, "ইস্! আমাদের বইয়ে লেখা আছে আর তুই—"

ছাপার বইয়ে এমন কথা লেখা আছে শুনিয়া গিরিবালা সম্পূর্ণ নিরুত্তর হইয়া যাইত, দ্বিতীয় আর-কোনো প্রমাণ তাহার নিকট আবশ্যক বোধ হইত না।

কিন্তু তাহার মনে মনে বড়ো ইচ্ছা করিত, সেও দাদাদের মতো বই লইয়া পড়ে। কোনো-কোনোদিন সে আপন ঘরে বসিয়া কোনো-একটা বই খুলিয়া বিড় বিড় করিয়া পড়ার ভান করিত এবং অনর্গল পাতা উলটাইয়া যাইত। ছাপার কালো কালো ছোটো ছোটো অপরিচিত অক্ষরগুলি কী যেন এক মহারহস্যশালার সিংহদ্বারে দলে দলে সার বাঁধিয়া স্কন্ধের উপরে ইকার ঐকার রেফ উঁচাইয়া পাহারা দিত, গিরিবালার কোনো প্রশ্নের কোনোই উত্তর করিত না। কথামালা তাহার ব্যাঘ্র শৃগাল অশ্ব গর্দভের একটি কথাও কৌতূহলকাতর বালিকার নিকট ফাঁস করিত না এবং আখ্যানমঞ্জরী তাহার সমস্ত আখ্যানগুলি লইয়া মৌনব্রতের মতো নীরবে চাহিয়া থাকিত।

গিরিবালা তাহার ভাইদের নিকট পড়া শিখিবার প্রস্তাব করিয়াছিল কিন্তু তাহার ভাইরা সে কথায় কর্ণপাতমাত্র করে নাই। একমাত্র শশিভূষণ তাহার সহায় ছিল।

গিরিবালার নিকট কথামালা এবং আখ্যানমঞ্জরী যেমন দুর্ভেদ্য রহস্যপূর্ণ ছিল শশিভূষণও প্রথম প্রথম অনেকটা সেইরূপ ছিল। লোহার গরাদে দেওয়া রাস্তার ধারের ছোটো বসিবার ঘরটিতে যুবক একাকী তক্তপোশের উপর পুস্তকে পরিবৃত

হইয়া বসিয়া থাকিত। গিরিবালা গরাদে ধরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া এই নতপৃষ্ঠ পাঠনিবিষ্ট অদ্ভুত লোকটিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত, পুস্তকের সংখ্যা তুলনা করিয়া মনে মনে স্থির করিত, শশিভূষণ তাহার ভাইদের অপেক্ষা অনেক বেশি বিদ্বান। তদপেক্ষা বিস্ময়জনক ব্যাপার তাহার নিকট আর কিছুই ছিল না। কথামালা প্রভৃতি পৃথিবীর প্রধান প্রধান পাঠ্যপুস্তকগুলি শশিভূষণ যে নিঃশেষপূর্বক পাঠ করিয়া ফেলিয়াছে, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র ছিল না। এইজন্য, শশিভূষণ যখন পুস্তকের পাত উলটাইত সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহার জ্ঞানের অবধি নির্ণয় করিতে পারিত না।

অবশেষে এই বিস্ময়মগ্ন বালিকাটি ক্ষীণদৃষ্টি শশিভূষণেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিল। শশিভূষণ একদিন একটা ঝক্‌ঝকে বাঁধানো বই খুলিয়া বলিল, "গিরিবালা, ছবি দেখবি আয়।" গিরিবালা তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া পালাইয়া গেল।

কিন্তু পরদিন সে পুনর্বার ডুরে কাপড় পরিয়া সেই গরাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া সেইরূপ গম্ভীর মৌন মনোযোগের সহিত শশিভূষণের অধ্যয়নকার্য নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। শশিভূষণ সেদিনও ডাকিল এবং সেদিনও সে বেণী দুলাইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পালাইল।

এইরূপে তাহাদের পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়া ক্রমে কখন ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিল এবং কখন যে বালিকা গরাদের বাহির হইতে শশিভূষণের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার তক্তপোশের উপর বাঁধানো পুস্তকস্তূপের মধ্যে স্থান পাইল, ঠিক সে তারিখটা নির্ণয় করিয়া দিতে ঐতিহাসিক গবেষণার আবশ্যক।

শশিভূষণের নিকট গিরিবালার লেখাপড়ার চর্চা আরম্ভ হইল। শুনিয়া সকলে হাসিবেন, এই মাস্টারটি তাহার ক্ষুদ্র ছাত্রীকে কেবল যে অক্ষর, বানান এবং ব্যাকরণ শিখাইত তাহা নহে— অনেক বড়ো বড়ো কাব্য তর্জমা করিয়া শুনাইত এবং তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিত। বালিকা কী বুঝিত তাহা অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু তাহার ভালো লাগিত তাহাতে সন্দেহ নাই। সে বোঝা না-বোঝায় মিশাইয়া আপন বাল্য-হৃদয়ে নানা অপরূপ কল্পনাচিত্র আঁকিয়া লইত। নীরবে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মন দিয়া শুনিত, মাঝে মাঝে এক-একটা অত্যন্ত অসংগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত এবং কখনো কখনো অকস্মাৎ একটা অসংলগ্ন প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হইত। শশিভূষণ তাহাতে কখনো কিছু বাধা দিত না— বড়ো বড়ো কাব্য সম্বন্ধে এই অতিক্ষুদ্র সমালোচকের নিন্দা প্রশংসা টীকা ভাষ্য শুনিয়া সে বিশেষ আনন্দ লাভ করিত। সমস্ত পল্লীর মধ্যে এই গিরিবালাই তাহার একমাত্র সমজদার বন্ধু।

গিরিবালার সহিত শশিভূষণের প্রথম পরিচয় যখন, তখন গিরির বয়স আট ছিল,

এখন তাহার বয়স দশ হইয়াছে। এই দুই বৎসরে সে ইংরাজি ও বাংলা বর্ণমালা শিখিয়া দুই-চারিটা সহজ বই পড়িয়া ফেলিয়াছে। এবং শশিভূষণের পক্ষেও পল্লীগ্রাম এই দুই বৎসর নিতান্ত সঙ্গবিহীন বিরস বলিয়া বোধ হয় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কিন্তু গিরিবালার বাপ হরকুমারের সহিত শশিভূষণের ভালোরূপ বনিবনাও হয় নাই। হরকুমার প্রথম প্রথম এই এম. এ. বি এলের নিকট মকদ্দমা মামলা সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে আসিত। এম. এ. বি এল. তাহাতে বড়ো-একটা মনোযোগ করিত না এবং আইনবিদ্যা সম্বন্ধে নায়েবের নিকট আপন অজ্ঞতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। নায়েব সেটাকে নিতান্তই ছল মনে করিত। এমনভাবে বছর দুয়েক কাটিল।

সম্প্রতি একটা অবাধ্য প্রজাকে শাসন করা আবশ্যক হইয়াছে। নায়েব মহাশয় তাহার নামে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ ও দাবিতে নালিশ রুজু করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পরামর্শের জন্য শশিভূষণকে কিছু বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। শশিভূষণ পরামর্শ দেওয়া দূরে থাক, শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে হরকুমারকে এমন গুটিদুই-চারি কথা বলিলেন যাহা তাঁহার কিছুমাত্র মিষ্ট বোধ হইল না।

এ দিকে আবার প্রজার নামে একটি মকদ্দমাতেও হরকুমার জিতিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইল শশিভূষণ উক্ত হতভাগ্য প্রজার সহায় ছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, এমন লোককে গ্রাম হইতে অবিলম্বে তাড়াইতে হইবে।

শশিভূষণ দেখিলেন, তাঁহার খেতের মধ্যে গোরু প্রবেশ করে, তাঁহার কলাইয়ের খোলায় আগুন লাগিয়া যায়, তাঁহার সীমানা লইয়া বিবাদ বাধে, তাঁহার প্রজারা সহজে খাজনা দেয় না এবং উলটিয়া তাঁহার নামে মিথ্যা মকদ্দমা আনিবার উপক্রম করে— এমন-কি, সন্ধ্যার সময় পথে বাহির হইলে তাঁহাকে মারিবে এবং রাত্রে তাঁহার বসতবাটীতে আগুন লাগাইয়া দিবে, এমন-সকল জনশ্রুতিও শোনা যাইতে লাগিল।

অবশেষে শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রকৃতি শশিভূষণ গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় পালাইবার আয়োজন করিলেন।

যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে গ্রামে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়িল। বরকন্দাজ কন্‌স্টেবল খানসামা কুকুর ঘোড়া সহিস মেথরে সমস্ত গ্রাম চঞ্চল হইয়া উঠিল। ছেলের দল ব্যাঘ্রের অনুবর্তী শৃগালের পালের ন্যায় সাহেবের আড্ডার নিকটে শঙ্কিত কৌতূহল সহকারে ঘুরিতে লাগিল।

নায়েব মহাশয় যথারীতি আতিথ্য শিরে খরচ লিখিয়া সাহেবের মুর্গি আণ্ডা ঘৃত দুগ্ধ জোগাইতে লাগিলেন। জয়েন্ট সাহেবের যে পরিমাণে খাদ্য আবশ্যক নায়েব মহাশয় তদপেক্ষা অনেক বেশি অক্ষুণ্ণচিত্তে সরবরাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাতঃকালে সাহেবের মেথর আসিয়া যখন সাহেবের কুক্কুরের জন্য একেবারে চার সের ঘৃত আদেশ করিয়া বসিল তখন দুর্গ্রহবশত সেটা তাঁহার সহ্য হইল না— মেথরকে উপদেশ দিলেন যে, সাহেবের কুত্তা যদিচ দেশি কুকুরের অপেক্ষা অনেকটা ঘি বিনা পরিতাপে হজম করিতে পারে তথাপি এতাধিক পরিমাণে স্নেহপদার্থ তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণজনক নহে। তাহাকে ঘি দিলেন না।

মেথর গিয়া সাহেবকে জানাইল যে, কুকুরের জন্য মাংস কোথায় পাওয়া যাইতে পারে ইহাই সে নায়েবের নিকট সন্ধান লইতে গিয়াছিল কিন্তু সে জাতিতে মেথর বলিয়া নায়েব অবজ্ঞাপূর্বক তাহাকে সর্বলোকসমক্ষে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, এমন-কি, সাহেবের প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

একে ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান সাহেবলোকের সহজেই অসহ্য বোধ হয়, তাহার উপর তাঁহার মেথরকে অপমান করিতে সাহস করিয়াছে, ইহাতে ধৈর্য রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ চাপরাসিকে আদেশ করিলেন, "বোলাও নায়েবকো।"

নায়েব কম্পান্বিতকলেবরে দুর্গানাম জপ করিতে করিতে সাহেবের তাম্বুর সম্মুখে খাড়া হইলেন। সাহেব তাম্বু হইতে মচ্‌মচ্‌ শব্দে বাহির হইয়া আসিয়া নায়েবকে উচ্চকণ্ঠে বিজাতীয় উচ্চারণে জিজ্ঞাসা করিলেন,"টুমি কী কারণ বশটো আমার মেঠরকে ডুর করিয়াছে?"

হরকুমার শশব্যস্ত হইয়া করজোড়ে জানাইলেন, সাহেবের মেথরকে দূর করিতে পারেন এমন স্পর্ধা কখনোই তাঁহার সম্ভবে না; তবে কি না কুকুরের জন্য একেবারে চারি সের ঘি চাহিয়া বসাতে প্রথমে তিনি উক্ত চতুষ্পদের মঙ্গলার্থে মৃদুভাবে আপত্তি প্রকাশ করিয়া পরে ঘৃত সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লোক পাঠাইয়াছেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে পাঠানো হইয়াছে এবং কোথায় পাঠানো হইয়াছে।

হরকুমার তৎক্ষণাৎ যেমন মুখে আসিল নাম করিয়া দিলেন। সেই সেই নামীয় লোকগণ সেই সেই গ্রামে ঘৃত আনিবার জন্য গিয়াছে কি না সন্ধান করিতে অতি সত্বর লোক পাঠাইয়া দিয়া সাহেব নায়েবকে তাম্বুতে বসাইয়া রাখিলেন।

দূতগণ অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া সাহেবকে জানাইল, ঘৃত সংগ্রহের জন্য কেহ কোথাও যায় নাই। নায়েবের সমস্ত কথাই মিথ্যা এবং মেথর যে সত্য বলিয়াছে তাহাতে আর হাকিমের সন্দেহ রহিল না। তখন জয়েণ্ট সাহেব ক্রোধে গর্জন করিয়া মেথরকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই শ্যালকের কর্ণ ধরিয়া তাম্বুর চারিধারে ঘোড়দৌড় করাও।" মেথর আর কালবিলম্ব না করিয়া চতুর্দিকে লোকারণ্যের মধ্যে সাহেবের আদেশ পালন করিল।

দেখিতে দেখিতে কথাটা ঘরে ঘরে রাষ্ট্র হইয়া গেল, হরকুমার গৃহে আসিয়া আহার ত্যাগ করিয়া মুমূর্ষুবৎ পড়িয়া রহিলেন।

জমিদারি কার্য উপলক্ষে নায়েবের শত্রু বিস্তর ছিল ; তাহারা এই ঘটনায় অত্যন্ত আনন্দলাভ করিল কিন্তু কলিকাতায়-গমনোদ্যত শশিভূষণ যখন এই সংবাদ শুনিলেন তখন তাঁহার সর্বাঙ্গের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রাতে তিনি হরকুমারের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন ; হরকুমার তাঁহার হাত ধরিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। শশিভূষণ কহিলেন, "সাহেবের নামে মানহানির মকদ্দমা আনিতে হইবে, আমি তোমার উকিল হইয়া লড়িব।"

স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নামে মকদ্দমা আনিতে হইবে শুনিয়া হরকুমার প্রথমটা ভীত হইয়া উঠিলেন ; শশিভূষণ কিছুতেই ছাড়িলেন না।

হরকুমার বিবেচনা করিতে সময় লইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন কথাটা চারি দিকে রাষ্ট্র হইয়াছে এবং শত্রুগণ আনন্দ প্রকাশ করিতেছে তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, শশিভূষণের শরণাপন্ন হইলেন, কহিলেন, "বাপু, শুনিলাম তুমি অকারণে কলিকাতায় যাইবার আয়োজন করিতেছ, সে তো কিছুতেই হইতে পারিবে না। তোমার মতো একজন লোক গ্রামে থাকিলে আমাদের সাহস কত থাকে। যাহা হউক আমাকে এই ঘোর অপমান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যে শশিভূষণ চিরকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃত নির্জনতার মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন তিনি আজ আদালতে আসিয়া হাজির হইলেন। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার নালিশ শুনিয়া তাঁহাকে প্রাইভেট কামরার মধ্যে ডাকিয়া লইয়া

অত্যন্ত খাতির করিয়া কহিলেন, "শশীবাবু, এ মকদ্দমাটা গোপনে মিটমাট করিয়া ফেলিলে ভালো হয় না কি।"

শশীবাবু টেবিলের উপরিস্থিত একখানি আইন গ্রন্থের মলাটের উপর তাঁহার কুঞ্চিতভ্রূ ক্ষীণ দৃষ্টি অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে রক্ষা করিয়া কহিলেন, "আমার মক্কেলকে আমি এরূপ পরামর্শ দিতে পারি না। তিনি প্রকাশ্যভাবে অপমানিত হইয়াছেন, গোপনে ইহার মিটমাট হইবে কী করিয়া।"

সাহেব দুইচারি কথা কহিয়া বুঝিলেন, এই স্বল্পভাষী স্বল্পদৃষ্টি লোকটিকে সহজে বিচলিত করা সম্ভব নহে, কহিলেন, "অল্‌রাইট্‌ বাবু, দেখা যাউক কতদূর কী হয়।"

এই বলিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মকদ্দমার দিন ফিরাইয়া দিয়া মফস্বলভ্রমণে বাহির হইলেন।

এ দিকে জয়েণ্ট সাহেব জমিদারকে পত্র লিখিলেন, "তোমার নায়েব আমার ভৃত্যদিগকে অপমান করিয়া আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, আশা করি, তুমি ইহার সমুচিত প্রতিকার করিবে।"

জমিদার শশব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ হরকুমারকে তলব করিলেন। নায়েব আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। জমিদার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "সাহেবের মেথর যখন চারি সের ঘি চাহিল তুমি বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ কেন দিলে না। তোমার কি বাপের কড়ি লাগিত।"

হরকুমার অস্বীকার করিতে পারিলেন না যে, ইহাতে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির কোনোরূপ ক্ষতি হইত না। নতশিরে অপরাধ স্বীকার করিয়া কহিলেন, "আমার গ্রহ মন্দ তাই এমন দুর্বুদ্ধি ঘটিয়াছিল।"

জমিদার কহিলেন, "তাহার পর আবার সাহেবের নামে নালিশ করিতে তোমাকে কে বলিল।"

হরকুমার কহিলেন, "ধর্মাবতার, নালিশ করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না; ওই আমাদের গ্রামের শশী, তাহার কোথাও কোনো মকদ্দমা জোটে না, সে ছোঁড়া নিতান্ত জোর করিয়া প্রায় আমার সম্মতি না লইয়াই এই হাঙ্গামা বাধাইয়া বসিয়াছে।"

শুনিয়া জমিদার শশিভূষণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বুঝিলেন, লোকটা অপদার্থ নব্য উকিল, কোনো ছুতায় একটা হুজুক তুলিয়া সাধারণের সমক্ষে পরিচিত হইবার চেষ্টায় আছে। নায়েবকে হুকুম করিয়া দিলেন, মকদ্দমা তুলিয়া লইয়া যেন অবিলম্বে ছোটো বড়ো ম্যাজিস্ট্রেট যুগলকে ঠাণ্ডা করা হয়।

নায়েব সাহেবের জন্য কিঞ্চিৎ ফলমূল শীতলভোগ উপহার লইয়া জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের

বাসায় গিয়া হাজির হইলেন। সাহেবকে জানাইলেন, সাহেবের নামে মকদ্দমা করা তাঁহার আদৌ স্বভাববিরুদ্ধ; কেবল শশিভূষণ নামে গ্রামের একটি অজাতশ্মশ্রু অপোগণ্ড অর্বাচীন উকিল তাঁহাকে একপ্রকার না জানাইয়াই এইরূপ স্পর্ধার কাজ করিয়াছে। সাহেব শশিভূষণের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত এবং নায়েবের প্রতি বড়ো সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন রাগের মাথায় নায়েববাবুকে 'ডণ্ড বিঢান' করিয়া তিনি 'ডুঃখিট্' আছেন। সাহেব বাংলা ভাষার পরীক্ষায় সম্প্রতি পুরস্কার লাভ করিয়া সাধারণের সহিত সাধুভাষায় বাক্যালাপ করিয়া থাকেন।

নায়েব কহিলেন, মা-বাপ কখনো-বা রাগ করিয়া শাস্তিও দিয়া থাকেন কখনো-বা আদর করিয়া কোলেও টানিয়া লন, ইহাতে সন্তানের বা মা-বাপের দুঃখের কোনো কারণ নাই।

অতঃপর জয়েন্ট্ সাহেবের সমস্ত ভৃত্যবর্গকে যথাযোগ্য পারিতোষিক দিয়া হরকুমার মফস্বলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট তাহার মুখে শশিভূষণের স্পর্ধার কথা শুনিয়া কহিলেন, "আমিও আশ্চর্য হইতেছিলাম যে, নায়েব বাবুকে বরাবর ভালো লোক বলিয়াই জানিতাম, তিনি যে সর্বাগ্রে আমাকে জানাইয়া গোপনে মিটমাট না করিয়া হঠাৎ মকদ্দমা আনিবেন, এ কী অসম্ভব ব্যাপার! এখন সমস্ত বুঝিতে পারিতেছি।"

অবশেষে নায়েবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শশী কন্‌গ্রেসে যোগ দিয়াছে কি না। নায়েব অম্লানমুখে বলিলেন, হাঁ।

সাহেব তাঁহার সাহেবি বুদ্ধিতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, এ সমস্তই কন্‌গ্রেসের চাল। একটা পাকচক্র বাধাইয়া অমৃতবাজারে প্রবন্ধ লিখিয়া গবর্মেণ্টের সহিত খিটিমিটি করিবার জন্য কন্‌গ্রেসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেলাগণ লুক্কায়িতভাবে চতুর্দিকে অবসর অনুসন্ধান করিতেছে। এই-সকল ক্ষুদ্র কণ্টকগণকে একদমে দলন করিয়া ফেলিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে অধিকতর সরাসরি ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই বলিয়া সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্টকে অত্যন্ত দুর্বল গবর্মেণ্ট বলিয়া মনে মনে ধিক্কার দিলেন। কিন্তু কন্‌গ্রেসওয়ালা শশিভূষণের নাম ম্যাজিস্ট্রেটের মনে রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সংসারে বড়ো বড়ো ব্যাপারগুলি যখন প্রবলভাবে গজাইয়া উঠিতে থাকে তখন ছোটো ছোটো ব্যাপারগুলিও ক্ষুধিত ক্ষুদ্র শিকড়জাল লইয়া জগতের উপর আপন দাবি বিস্তার করিতে ছাড়ে না।

শশিভূষণ যখন এই ম্যাজিস্ট্রেটের হাঙ্গামা লইয়া বিশেষ ব্যস্ত, যখন বিস্তৃত পুঁথিপত্র হইতে আইন উদ্ধার করিতেছেন, মনে মনে বক্তৃতায় শাণ দিতেছেন, কল্পনায় সাক্ষীকে জেরা করিতে বসিয়া গিয়াছেন ও প্রকাণ্ড আদালতের লোকারণ্যদৃশ্য এবং এই যুদ্ধপর্বের ভাবী পর্বাধ্যায়গুলি মনে আনিয়া ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত ও ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিতেছেন, তখন তাঁহার ক্ষুদ্র ছাত্রীটি তাহার ছিন্নপ্রায় চারুপাঠ ও মসীবিচিত্র লিখিবার খাতা, বাগান হইতে কখনো ফুল, কখনো ফল, মাতৃভাণ্ডার হইতে কোনোদিন আচার, কোনোদিন নারিকেলের মিষ্টান্ন, কোনোদিন পাতায়-মোড়া কেতকীকেশরসুগন্ধি গৃহনির্মিত খয়ের আনিয়া নিয়মিত সময়ে তাঁহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইত।

প্রথম দিনকতক দেখিল, শশিভূষণ একখানা চিত্রহীন প্রকাণ্ড কঠোরমূর্তি গ্রন্থ খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে পাত উল্টাইতেছেন, সেটা যে মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতেছেন তাহাও বোধ হইল না। অন্য সময়ে শশিভূষণ যে-সকল গ্রন্থ পড়িতেন, তাহার মধ্য হইতে কোনো না কোনো অংশ গিরিবালাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু ওই স্থূলকায় কালো মলাটের পুস্তক হইতে গিরিবালাকে শুনাইবার যোগ্য কি দুটো কথাও ছিল না। তা না থাক্, তাই বলিয়া ওই বইখানা কি এতই বড়ো, আর গিরিবালা কি এতই ছোটো।

প্রথমটা, গুরুর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গিরিবালা সুর করিয়া, বানান করিয়া, বেণীসমেত দেহের উত্তরার্ধ সবেগে দুলাইতে দুলাইতে উচ্চৈঃস্বরে আপনিই পড়া আরম্ভ করিয়া দিল। দেখিল তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। কালো মোটা বইখানার উপর মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া গেল। ওটাকে একটা কুৎসিত কঠোর নিষ্ঠুর মানুষের মতো করিয়া দেখিতে লাগিল। ওই বইখানা যে গিরিবালাকে বালিকা বলিয়া সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে তাহা যেন তাহার প্রত্যেক দুর্বোধ পাতা দুষ্ট মানুষের মুখের মতো আকার ধারণ করিয়া নীরবে প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই বইখানা যদি কোনো চোরে চুরি করিয়া লইয়া যাইত, তবে সেই চোরকে সে তাহার মাতৃভাণ্ডারের সমস্ত কেয়াখয়ের চুরি করিয়া পুরস্কার দিতে পারিত। সেই বইখানার বিনাশের জন্য সে মনে মনে দেবতার নিকট যে-সকল অসংগত ও অসম্ভব প্রার্থনা করিয়াছিল তাহা দেবতারা শুনেন নাই এবং পাঠকদিগকেও শুনাইবার কোনো আবশ্যক দেখি না।

তখন ব্যথিতহৃদয় বালিকা দুই-একদিন চারুপাঠ হস্তে গুরুগৃহে গমন বন্ধ করিল। এবং সেই দুই-একদিন পরে এই বিচ্ছেদের ফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সে অন্য ছলে শশিভূষণের গৃহসম্মুখবর্তী পথে আসিয়া কটাক্ষপাত করিয়া দেখিল, শশিভূষণ সেই কালো বইখানা ফেলিয়া একাকী দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া লোহার গরাদেগুলার প্রতি বিজাতীয় ভাষায় বক্তৃতা প্রয়োগ করিতেছেন। বোধ করি, বিচারকের মন কেমন

করিয়া গলাইবেন এই লোহাগুলার উপর তাহার পরীক্ষা হইতেছে। সংসারে অনভিজ্ঞ গ্রন্থবিহারী শশিভূষণের ধারণা ছিল যে, পুরাকালে ডিমস্থিনীস, সিসিরো, বার্ক, শেরিডন প্রভৃতি বাগ্মীগণ বাক্যবলে যে-সকল অসামান্য কার্য করিয়া গিয়াছেন— যেরূপ শব্দভেদী শরবর্ষণে অন্যায়কে ছিন্নভিন্ন, অত্যাচারকে লাঞ্ছিত এবং অহংকারকে ধূলিশায়ী করিয়া দিয়াছেন, আজিকার দোকানদারির দিনেও তাহা অসম্ভব নহে। প্রভুত্বমদগর্বিত উদ্ধত ইংরাজকে কেমন করিয়া তিনি জগৎসমক্ষে লজ্জিত ও অনুতপ্ত করিবেন, তিলকুচি গ্রামের জীর্ণ ক্ষুদ্র গৃহে দাঁড়াইয়া শশিভূষণ তাহারই চর্চা করিতেছিলেন। আকাশের দেবতারা শুনিয়া হাসিয়াছিলেন কি তাঁহাদের দেবচক্ষু অশ্রুসিক্ত হইতেছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

সুতরাং সেদিন গিরিবালা তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল না; সেদিন বালিকার অঞ্চলে জাম ছিল না; পূর্বে একবার জামের আঁটি ধরা পড়িয়া অবধি ওই ফল সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সংকুচিত ছিল। এমন-কি, শশিভূষণ যদি কোনোদিন নিরীহ ভাবে জিজ্ঞাসা করিত 'গিরি, আজ জাম নেই?' সে সেটাকে গূঢ় উপহাস জ্ঞান করিয়া সক্ষোভে 'যাঃও' বলিয়া তর্জন করিয়া পলায়নের উপক্রম করিত। জামের আঁটির অভাবে আজ তাহাকে একটা কৌশল অবলম্বন করিতে হইল। সহসা দূরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বালিকা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "স্বর্ণ ভাই, তুই যাস নে, আমি এখনি যাচ্ছি।"

পুরুষ পাঠক মনে করিতে পারেন যে, কথাটা স্বর্ণলতা নামক কোনো দূরবর্তিনী সঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত, কিন্তু পাঠিকারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন দূরে কেহই ছিল না, লক্ষ্য অত্যন্ত নিকট। কিন্তু হায়, অন্ধ পুরুষের প্রতি সে লক্ষ ভ্রষ্ট হইয়া গেল। শশিভূষণ যে শুনিতে পান নাই তাহা নহে, তিনি তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, বালিকা সত্যই ক্রীড়ার জন্য উৎসুক— এবং সেদিন তাহাকে খেলা হইতে অধ্যয়নে আকর্ষণ করিয়া আনিতে তাঁহার অধ্যবসায় ছিল না, কারণ তিনিও সেদিন কোনো কোনো হৃদয়ের দিকে লক্ষ করিয়া তীক্ষ্ণ শর সন্ধান করিতেছিলেন। বালিকার ক্ষুদ্র হস্তের সামান্য লক্ষ্য যেমন ব্যর্থ হইয়াছিল তাঁহার শিক্ষিত হস্তের মহৎ লক্ষ্যও সেইরূপ ব্যর্থ হইয়াছিল, পাঠকেরা সে সংবাদ পূর্বেই অবগত হইয়াছেন।

জামের আঁটির একটা গুণ এই যে, একে একে অনেকগুলি নিক্ষেপ করা যায়, চারিটি নিষ্ফল হইলে অন্তত পঞ্চমটি ঠিক স্থানে গিয়া লাগিতে পারে। কিন্তু স্বর্ণ হাজার কাল্পনিক হউক, তাহাকে 'এখনি যাচ্ছি' আশা দিয়া অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। থাকিলে স্বর্ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের স্বভাবতই সন্দেহ জন্মিতে পারে। সুতরাং

সে উপায়টি যখন নিষ্ফল হইল তখন গিরিবালাকে অবিলম্বে চলিয়া যাইতে হইল। তথাপি, স্বর্ণনাম্নী কোনো দূরস্থিত সহচরীর সঙ্গ লাভ করিবার অভিলাষ আন্তরিক হইলে যেরূপ সবেগে উৎসাহের সহিত পাদচারণা করা স্বাভাবিক হইত, গিরিবালার গতিতে তাহা লক্ষিত হইল না। সে যেন তাহার পৃষ্ঠ দিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছিল পশ্চাতে কেহ আসিতেছে কি না; যখন নিশ্চয় বুঝিল কেহ আসিতেছে না তখন আশার শেষতম ক্ষীণতম ভগ্নাংশটুকু লইয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, এবং কাহাকেও না দেখিয়া সেই ক্ষুদ্র আশাটুকু এবং শিথিলপত্র চারুপাঠখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া পথে ছড়াইয়া দিল। শশিভূষণ তাহাকে যে-বিদ্যাটুকু দিয়াছে সেটুকু যদি সে কোনো মতে ফিরাইয়া দিতে পারিত তবে বোধ হয় পরিত্যাজ্য জামের আঁটির মতো সে-সমস্তই শশিভূষণের দ্বারের সম্মুখে সশব্দে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিত। বালিকা প্রতিজ্ঞা করিল, দ্বিতীয়বার শশিভূষণের সহিত দেখা হইবার পূর্বেই সে সমস্ত পড়াশুনা ভুলিয়া যাইবে, তিনি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন তাহার কোনোটিরই উত্তর দিতে পারিবে না! একটি— একটি— একটিরও না! তখন! তখন শশিভূষণ অত্যন্ত জব্দ হইবে।

গিরিবালার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। পড়া ভুলিয়া গেলে শশিভূষণের যে কিরূপ তীব্র অনুতাপের কারণ হইবে তাহা মনে করিয়া সে পীড়িত হৃদয়ে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিল, এবং কেবলমাত্র শশিভূষণের দোষে বিস্মৃতশিক্ষা সেই হতভাগিনী ভবিষ্যৎ গিরিবালাকে কল্পনা করিয়া তাহার নিজের প্রতি করুণারস উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আকাশে মেঘ করিতে লাগিল; বর্ষাকালে এমন মেঘ প্রতিদিন করিয়া থাকে। গিরিবালা পথের প্রান্তে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; এমন অকারণ কান্না প্রতিদিন কত বালিকা কাঁদিয়া থাকে! উহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় কিছুই ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শশিভূষণের আইন সম্বন্ধীয় গবেষণা এবং বক্তৃতাচর্চা কী কারণে ব্যর্থ হইয়া গেল তাহা পাঠকদের অগোচর নাই। ম্যাজিস্ট্রেটের নামে মকদ্দমা অকস্মাৎ মিটিয়া গেল। হরকুমার তাঁহাদের জেলার বেঞ্চে অনরারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। একখানা মলিন চাপকান ও তৈলাক্ত পাগড়ি পরিয়া হরকুমার আজকাল প্রায়ই জেলায় গিয়া সাহেব-সুবাদিগকে নিয়মিত সেলাম করিয়া আসেন।

শশিভূষণের সেই কালো মোটা বইখানার প্রতি এতদিন পরে গিরিবালার অভিশাপ ফলিতে আরম্ভ করিল, সে একটি অন্ধকার কোণে নির্বাসিত হইয়া অনাদৃত বিস্মৃতভাবে

ধূলিস্তরসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহার অনাদর দেখিয়া যে বালিকা আনন্দ লাভ করিবে সেই গিরিবালা কোথায়।

শশিভূষণ যেদিন প্রথম আইনের গ্রন্থ বন্ধ করিয়া বসিলেন সেই দিনই হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন, গিরিবালা আসে নাই। তখন একে একে এই কয়দিনের ইতিহাস অল্পে অল্পে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে পড়িতে লাগিল, একদিন উজ্জ্বল প্রভাতে গিরিবালা অঞ্চল ভরিয়া নববর্ষার আর্দ্র বকুলফুল আনিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াও যখন তিনি গ্রন্থ হইতে দৃষ্টি তুলিলেন না, তখন তাহার উচ্ছ্বাসে সহসা বাধা পড়িল। সে তাহার অঞ্চলবিদ্ধ একটা সুঁচসূতা বাহির করিয়া নতশিরে একটি একটি করিয়া ফুল লইয়া মালা গাঁথিতে লাগিল— মালা অত্যন্ত ধীরে ধীরে গাঁথিল, অনেক বিলম্বে শেষ হইল, বেলা হইয়া আসিল, গিরিবালার ঘরে ফিরিবার সময় হইল, তথাপি শশিভূষণের পড়া শেষ হইল না। গিরিবালা মালাটা তক্তপোশের উপর রাখিয়া ম্লানভাবে চলিয়া গেল। মনে পড়িল, তাহার অভিমান প্রতিদিন কেমন করিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল; কবে হইতে সে তাঁহার ঘরে প্রবেশ না করিয়া ঘরের সম্মুখবর্তী পথে মধ্যে মধ্যে দেখা দিত এবং চলিয়া যাইত; অবশেষে কবে হইতে বালিকা সেই পথে আসাও বন্ধ করিয়াছে, সেও তো আজ কিছুদিন হইল। গিরিবালার অভিমান তো এতদিন স্থায়ী হয় না। শশিভূষণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হতবুদ্ধি হতকর্মের মতো দেয়ালে পিঠ দিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষুদ্র ছাত্রীটি না আসাতে তাঁহার পাঠ্যগ্রন্থগুলি নিতান্ত বিস্বাদ হইয়া আসিল। বই টানিয়া টানিয়া লইয়া দুই-চারিপাতা পড়িয়া ফেলিয়া দিতে হয়। লিখিতে লিখিতে ক্ষণে ক্ষণে সচকিতে পথের দিকে দ্বারের অভিমুখে প্রতীক্ষাপূর্ণ দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং লেখা ভঙ্গ হয়।

শশিভূষণের আশঙ্কা হইল, গিরিবালার অসুখ হইয়া থাকিবে। গোপনে সন্ধান লইয়া জানিলেন, সে আশঙ্কা অমূলক। গিরিবালা আজকাল আর ঘর হইতে বাহির হয় না। তাহার জন্য পাত্র স্থির হইয়াছে।

গিরি যেদিন চারুপাঠের ছিন্নখণ্ডে গ্রামের পঙ্কিল পথ বিকীর্ণ করিয়াছিল তাহার পরদিন প্রত্যুষে ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিচিত্র উপহার সংগ্রহ করিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল। অতিশয় গ্রীষ্ম হওয়াতে নিদ্রাহীন রাত্রি অতিবাহন করিয়া হরকুমার ভোরবেলা হইতে বাহিরে বসিয়া গা খুলিয়া তামাক খাইতেছিলেন। গিরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস।" গিরি কহিল, "শশিদাদার বাড়ি।" হরকুমার ধমক দিয়া কহিলেন, "শশিদাদার বাড়ি যেতে হবে না, ঘরে যা!" এই বলিয়া আসন্ন-শ্বশুরগৃহবাস বয়ঃপ্রাপ্তকন্যার লজ্জার অভাব সম্বন্ধে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। সেই

দিন হইতে তাহার বাহিরে আসা বন্ধ হইয়াছে। এবার আর তাহার অভিমান ভঙ্গ করিবার অবসর জুটিল না। আমসত্ত্ব, কেয়াখয়ের এবং জারকনেবু ভাণ্ডারের যথাস্থানে ফিরিয়া গেল। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, বকুলফুল ঝরিতে লাগিল, গাছ ভরিয়া পেয়ারা পাকিয়া উঠিল এবং শাখাস্খলিত পক্ষীচঞ্চুক্ষত সুপক্ক কালোজামে তরুতল প্রতিদিন সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। হায়, সেই ছিন্নপ্রায় চারুপাঠখানিও আর নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গ্রামে গিরিবালার বিবাহে যেদিন সানাই বাজিতেছিল সেদিন অনিমন্ত্রিত শশিভূষণ নৌকা ক'রিয়া কলিকাতা অভিমুখে চলিতেছিলেন।

মকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া অবধি হরকুমার শশীকে বিষচক্ষে দেখিতেন। কারণ, তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, শশী তাঁহাকে নিশ্চয় ঘৃণা করিতেছে। শশীর মুখে চোখে ব্যবহারে তিনি তাহার সহস্র কাল্পনিক নিদর্শন দেখিতে লাগিলেন। গ্রামের সকল লোকই তাঁহার অপমানবৃত্তান্ত ক্রমশ বিস্মৃত হইতেছে, কেবল শশিভূষণ একাকী সেই দুঃস্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে মনে করিয়া তিনি তাহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাঁহার অন্তঃকরণের মধ্যে একটুখানি সলজ্জ সংকোচ এবং সেই সঙ্গে প্রবল আক্রোশের সঞ্চার হইত। শশীকে গ্রামছাড়া করিতে হইবে বলিয়া হরকুমার প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন।

শশিভূষণের মতো লোককে গ্রামছাড়া করা কাজটা তেমন দুরূহ নহে। নায়েব মহাশয়ের অভিপ্রায় অনতিবিলম্বে সফল হইল। একদিন সকালবেলা পুস্তকের বোঝা এবং গুটিদুইচার টিনের বাক্স সঙ্গে লইয়া শশী নৌকায় চড়িলেন। গ্রামের সহিত তাঁহার যে একটি সুখের বন্ধন ছিল সেও আজ সমারোহ সহকারে ছিন্ন হইতেছে। সুকোমল বন্ধনটি যে কত দৃঢ়ভাবে তাঁহার হৃদয়কে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল তাহা তিনি পূর্বে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন নাই। আজ যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, গ্রামের বৃক্ষ-চূড়াগুলি অস্পষ্ট এবং উৎসবের বাদ্যধ্বনি ক্ষীণতর হইয়া আসিল, তখন সহসা অশ্রুবাষ্পে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল, রক্তোচ্ছ্বাসবেগে কপালের শিরাগুলা টন্ টন্ করিতে লাগিল এবং জগৎসংসারের সমস্ত দৃশ্য ছায়ানির্মিত মায়ামরীচিকার মতো অত্যন্ত অস্পষ্ট প্রতিভাত হইল।

প্রতিকূল বাতাস অতিশয় বেগে বহিতেছিল, সেই জন্য স্রোত অনুকূল হইলেও নৌকা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময়ে নদীর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটিল যাহাতে শশিভূষণের যাত্রার ব্যাঘাত করিয়া দিল।

স্টেশন ঘাট হইতে সদর মহকুমা পর্যন্ত একটি নূতন স্টিমার লাইন সম্প্রতি খুলিয়াছে। সেই স্টিমারটি সশব্দে পক্ষ সঞ্চালন করিয়া ঢেউ তুলিয়া উজানে আসিতেছিল। জাহাজে নূতন লাইনের অল্পবয়স্ক ম্যানেজার সাহেব এবং অল্পসংখ্যক যাত্রী ছিল। যাত্রীদের মধ্যে শশিভূষণের গ্রাম হইতেও কেহ কেহ উঠিয়াছিল।

একটি মহাজনের নৌকা কিছুদূর হইতে এই স্টিমারের সহিত পাল্লা দিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে ধরি ধরি করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে পশ্চাতে পড়িতেছিল। মাঝির ক্রমশ রোখ চাপিয়া গেল। সে প্রথম পালের উপর দ্বিতীয় পাল এবং দ্বিতীয় পালের উপরে ক্ষুদ্র তৃতীয় পালটা পর্যন্ত তুলিয়া দিল। বাতাসের বেগে সুদীর্ঘ মাস্তুল সম্মুখে আনত হইয়া পড়িল, এবং বিদীর্ণ তরঙ্গরাশি অট্টকলস্বরে নৌকার দুই পার্শ্বে উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। নৌকা তখন ছিন্নবল্গা অশ্বের ন্যায় ছুটিয়া চলিল। একস্থানে স্টিমারের পথ কিঞ্চিৎ বাঁকা ছিল, সেইখানে সংক্ষিপ্ততর পথ অবলম্বন করিয়া নৌকা স্টিমারকে ছাড়াইয়া গেল। ম্যানেজার সাহেব আগ্রহভরে রেলের উপর ঝুঁকিয়া নৌকার এই প্রতিযোগিতা দেখিতেছিল। যখন নৌকা তাহার পূর্ণতম বেগ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্টিমারকে হাতদুয়েক ছাড়াইয়া গিয়াছে এমনসময়ে সাহেব হঠাৎ একটা বন্দুক তুলিয়া স্ফীত পাল লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ করিয়া দিল। এক মুহূর্তে পাল ফাটিয়া গেল, নৌকা ডুবিয়া গেল, স্টিমার নদীর বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ম্যানেজার কেন যে এমন করিল তাহা বলা কঠিন। ইংরাজনন্দনের মনের ভাব আমরা বাঙালি হইয়া ঠিক বুঝিতে পারি না। হয়তো দিশি পালের প্রতিযোগিতা সে সহ্য করিতে পারে নাই, হয়তো একটা স্ফীত বিস্তীর্ণ পদার্থ বন্দুকের গুলির দ্বারা চক্ষের পলকে বিদীর্ণ করিবার একটা হিংস্র প্রলোভন আছে, হয়তো এই গর্বিত নৌকাটার বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে গুটিকয়েক ফুটা করিয়া নিমেষের মধ্যে ইহার নৌকালীলা সমাপ্ত করিয়া দিবার মধ্যে একটা প্রবল পৈশাচিক হাস্যরস আছে; নিশ্চয় জানি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, ইংরাজের মনের ভিতরে একটুখানি বিশ্বাস ছিল যে, এই রসিকতাটুকু করার দরুন সে কোনোরূপ শাস্তির দায়িক নহে— এবং ধারণা ছিল, যাহাদের নৌকা গেল এবং সম্ভবত প্রাণ সংশয়, তাহারা মানুষের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না।

সাহেব যখন বন্দুক তুলিয়া গুলি করিল এবং নৌকা ডুবিয়া গেল তখন শশিভূষণের পান্সি ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী হইয়াছে। শেষোক্ত ব্যাপারটি শশিভূষণ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি নৌকা লইয়া গিয়া মাঝি এবং মাল্লাদিগকে উদ্ধার করিলেন। কেবল এক ব্যক্তি ভিতরে বসিয়া রন্ধনের জন্য মশলা পিষিতেছিল, তাহাকে আর দেখা গেল না। বর্ষার নদী খরবেগে বহিয়া চলিল।

শশিভূষণের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে উত্তপ্ত রক্ত ফুটিতে লাগিল। আইন অত্যন্ত মন্দগতি—সে একটা বৃহৎ জটিল লৌহযন্ত্রের মতো; তৌল করিয়া সে প্রমাণ গ্রহণ করে এবং নির্বিকার ভাবে সে শাস্তি বিভাগ করিয়া দেয়, তাহার মধ্যে মানবহৃদয়ের উত্তাপ নাই। কিন্তু ক্ষুধার সহিত ভোজন, ইচ্ছার সহিত উপভোগ ও রোষের সহিত শাস্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া শশিভূষণের নিকট সমান অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। অনেক অপরাধ আছে যাহা প্রত্যক্ষ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ নিজ হস্তে তাহার শাস্তিবিধান না করিলে অন্তর্যামী বিধাতাপুরুষ যেন অন্তরের মধ্যে থাকিয়া প্রত্যক্ষকারীকে দগ্ধ করিতে থাকেন। তখন আইনের কথা স্মরণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে হৃদয় লজ্জা বোধ করে। কিন্তু কলের আইন এবং কলের জাহাজ ম্যানেজারটিকে শশিভূষণের নিকট হইতে দূরে লইয়া গেল। তাহাতে জগতের আর আর কী উপকার হইয়াছিল বলিতে পারি না কিন্তু সে যাত্রায় নিঃসন্দেহ শশিভূষণের ভারতবর্ষীয় প্লীহা রক্ষা পাইয়াছিল।

মাঝিমাল্লা যাহারা বাঁচিল তাহাদিগকে লইয়া শশী গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। নৌকায় পাট বোঝাই ছিল, সেই পাট উদ্ধারের জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং মাঝিকে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে পুলিসে দরখাস্ত দিতে অনুরোধ করিলেন।

মাঝি কিছুতেই সম্মত হয় না। সে বলিল, নৌকা তো মজিয়াছে, এক্ষণে নিজেকে মজাইতে পারিব না। প্রথমত, পুলিসকে দর্শনি দিতে হইবে; তাহার পর কাজকর্ম আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া আদালতে আদালতে ঘুরিতে হইবে; তাহার পর সাহেবের নামে নালিশ করিয়া কী বিপাকে পড়িতে হইবে ও কী ফল লাভ হইবে তাহা ভগবান জানেন। অবশেষে সে যখন জানিল, শশিভূষণ নিজে উকিল, আদালতখরচা তিনিই বহন করিবেন এবং মকদ্দমায় ভবিষ্যতে খেসারত পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে তখন রাজি হইল। কিন্তু শশিভূষণের গ্রামের লোক যাহারা স্টিমারে উপস্থিত ছিল তাহারা কিছুতেই সাক্ষ্য দিতে চাহিল না। তাহারা শশিভূষণকে কহিল, "মহাশয়, আমরা কিছুই দেখি নাই; আমরা জাহাজের পশ্চাৎ ভাগে ছিলাম, কলের ঘট্‌ঘট্‌ এবং জলের কল্‌কল্‌ শব্দে সেখান হইতে বন্দুকের আওয়াজ শুনিবারও কোনো সম্ভাবনা ছিল না।"

দেশের লোককে আন্তরিক ধিক্কার দিয়া শশিভূষণ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মকদ্দমা চালাইলেন।

সাক্ষীর কোনো আবশ্যক হইল না। ম্যানেজার স্বীকার করিল যে, সে বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল। কহিল, আকাশে এক ঝাঁক বক উড়িতেছিল, তাহাদেরই প্রতি লক্ষ করা হইয়াছিল। স্টিমার তখন পূর্ণবেগে চলিতেছিল এবং সেই মুহূর্তেই নদীর বাঁকের

অন্তরালে প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং সে জানিতেও পারে নাই, কাক মরিল, কি বক মরিল, কি নৌকাটা ডুবিল। অন্তরীক্ষে এবং পৃথিবীতে এত শিকারের জিনিস আছে যে, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক 'ডার্টি র‍্যাগ' অর্থাৎ মলিন বস্ত্রখণ্ডের উপর সিকিপয়সা দামেরও ছিটাগুলি অপব্যয় করিতে পারে না।

বেকসুর খালাস পাইয়া ম্যানেজার সাহেব চুরট ফুঁকিতে ফুঁকিতে ক্লাবে হুইস্ট্ খেলিতে গেল; যে লোকটা নৌকার মধ্যে মশলা পিষিতেছিল নয় মাইল তফাতে তাহার মৃতদেহ ডাঙায় আসিয়া লাগিল এবং শশিভূষণ চিত্তদাহ লইয়া আপন গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

যেদিন ফিরিয়া আসিলেন, সেদিন নৌকা সাজাইয়া গিরিবালাকে শ্বশুরবাড়ি লইয়া যাইতেছে। যদিও তাঁহাকে কেহ ডাকে নাই তথাপি শশিভূষণ ধীরে ধীরে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটে লোকের ভিড় ছিল সেখানে না গিয়া কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন। নৌকা ঘাট ছাড়িয়া যখন তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল তখন চকিতের মতো একবার দেখিতে পাইলেন, মাথায় ঘোমটা টানিয়া নববধূ নতশিরে বসিয়া আছে। অনেক দিন হইতে গিরিবালার আশা ছিল যে, গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্বে কোনোমতে একবার শশিভূষণের সহিত সাক্ষাৎ হইবে কিন্তু আজ সে জানিতেও পারিল না যে, তাহার গুরু অনতিদূরে তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। একবার সে মুখ তুলিয়াও দেখিল না, কেবল নিঃশব্দ রোদনে তাহার দুই কপোল বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

নৌকা ক্রমশ দূরে চলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। জলের উপর প্রভাতের রৌদ্র ঝিক্‌ঝিক্ করিতে লাগিল, নিকটের আম্রশাখায় একটা পাপিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মুহুর্মুহু গান গাহিয়া মনের আবেগ কিছুতেই নিঃশেষ করিতে পারিল না, খেয়া নৌকা লোক বোঝাই লইয়া পারাপার হইতে লাগিল, মেয়েরা ঘাটে জল লইতে আসিয়া উচ্চ কলস্বরে গিরির শ্বশুরালয়যাত্রার আলোচনা তুলিল, শশিভূষণ চশমা খুলিয়া চোখ মুছিয়া সেই পথের ধারে সেই গরাদের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র গৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ একবার মনে হইল যেন গিরিবালার কণ্ঠ শুনিতে পাইলেন! 'শশিদাদা!' —কোথায় রে কোথায়? কোথাও না! সে গৃহে না, সে পথে না, সে গ্রামে না— তাঁহার অশ্রুজলাভিষিক্ত অন্তরের মাঝখানটিতে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শশিভূষণ পুনরায় জিনিসপত্র বাঁধিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় কোনো কাজ নাই, সেখানে যাওয়ার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নাই; সেইজন্য রেলপথে না গিয়া বরাবর নদীপথে যাওয়াই স্থির করিলেন।

তখন পূর্ণবর্ষায় বাংলাদেশের চারি দিকেই ছোটো বড়ো আঁকাবাঁকা সহস্র জলময় জাল বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সরস শ্যামল বঙ্গভূমির শিরা-উপশিরাগুলি পরিপূর্ণ হইয়া তরুলতা তৃণগুল্ম ঝোপঝাড় ধান পাট ইক্ষুতে দশ দিকে উন্মত্ত যৌবনের প্রাচুর্য যেন একেবারে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে।

শশিভূষণের নৌকা সেই-সমস্ত সংকীর্ণ বক্র জলস্রোতের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। জল তখন তীরের সহিত সমতল হইয়া গিয়াছে। কাশবন শরবন এবং স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন হইয়াছে। গ্রামের বেড়া, বাঁশঝাড় ও আমবাগান একেবারে জলের অব্যবহিত ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে— দেবকন্যারা যেন বাংলাদেশের তরুমূলবর্তী আলবালগুলি জলসেচনে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

যাত্রার আরম্ভকালে স্নানচিক্কণ বনশ্রী রৌদ্রে উজ্জ্বল হাস্যময় ছিল, অনতিবিলম্বেই মেঘ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন যে দিকে দৃষ্টি পড়ে সেই দিকই বিষণ্ণ এবং অপরিচ্ছন্ন দেখাইতে লাগিল। বন্যার সময়ে গোরুগুলি যেমন জলবেষ্টিত মলিন পঙ্কিল সংকীর্ণ গোষ্ঠপ্রাঙ্গণের মধ্যে ভিড় করিয়া করুণনেত্রে সহিষ্ণুভাবে দাঁড়াইয়া শ্রাবণের ধারাবর্ষণে ভিজিতে থাকে, বাংলাদেশ আপনার কর্দমপিচ্ছিল ঘনসিক্ত রুদ্ধ জঙ্গলের মধ্যে মূকবিষণ্ণমুখে সেইরূপ পীড়িতভাবে অবিশ্রাম ভিজিতে লাগিল। চাষিরা টোকা মাথায় দিয়া বাহির হইয়াছে; স্ত্রীলোকেরা ভিজিতে ভিজিতে বাদলার শীতল বায়ুতে সংকুচিত হইয়া কুটির হইতে কুটিরান্তরে গৃহকার্যে যাতায়াত করিতেছে ও পিছল ঘাটে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলিয়া সিক্তবস্ত্রে জল তুলিতেছে, এবং গৃহস্থ পুরুষেরা দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে, নিতান্ত কাজের দায় থাকিলে কোমরে চাদর জড়াইয়া জুতা-হস্তে ছাতি-মাথায় বাহির হইতেছে— অবলা রমণীর মস্তকে ছাতি এই রৌদ্রদগ্ধ বর্ষাপ্লাবিত বঙ্গদেশের সনাতন পবিত্র প্রথার মধ্যে নাই।

বৃষ্টি যখন কিছুতেই থামে না তখন রুদ্ধ নৌকার মধ্যে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া শশিভূষণ পুনশ্চ রেলপথে যাওয়াই স্থির করিলেন। এক জায়গায় একটা প্রশস্ত মোহানার মতো জায়গায় আসিয়া শশিভূষণ নৌকা বাঁধিয়া আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে— সে কেবল খানার দোষে নয়, খোঁড়ার পাটারও পড়িবার দিকে একটু বিশেষ ঝোঁক আছে। শশিভূষণ সেদিন তাহার একটা প্রমাণ দিলেন।

দুই নদীর মোহানার মুখে বাঁশ বাঁধিয়া জেলেরা প্রকাণ্ড জাল পাতিয়াছে। কেবল একপার্শ্বে নৌকা চলাচলের স্থান রাখিয়াছে। বহুকাল হইতে তাহারা এ কার্য করিয়া থাকে এবং সেজন্য খাজনাও দেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এ বৎসর এই পথে হঠাৎ জেলার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুরের শুভাগমন হইয়াছে। তাঁহার বোট আসিতে দেখিয়া জেলেরা পূর্ব হইতে পার্শ্ববর্তী পথ নির্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাবধান করিয়া দিল। কিন্তু মনুষ্যরচিত কোনো বাধাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া ঘুরিয়া যাওয়া সাহেবের মাঝির অভ্যাস নাই। সে সেই জালের উপর দিয়াই বোট চালাইয়া দিল। জাল অবনত হইয়া বোটকে পথ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু তাহার হাল বাধিয়া গেল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে এবং চেষ্টায় হাল ছাড়াইয়া লইতে হইল।

পুলিস সাহেব অত্যন্ত গরম এবং রক্তবর্ণ হইয়া বোট বাঁধিলেন। তাঁহার মূর্তি দেখিয়াই জেলে চারটে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। সাহেব তাঁহার মাল্লাদিগকে জাল কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। তাহারা সেই সাত-আট শত টাকার বৃহৎ জাল কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল।

জালের উপর ঝাল ঝাড়িয়া অবশেষে জেলেদিগকে ধরিয়া আনিবার আদেশ হইল। কন্‌স্টেবল্ পলাতক জেলে চারিটির সন্ধান না পাইয়া যে চারি জনকে হাতের কাছে পাইল তাহাদিগকে ধরিয়া আনিল। তাহারা আপনাদিগকে নিরপরাধ বলিয়া জোড়হস্তে কাকুতিমিনতি করিতে লাগিল। পুলিসবাহাদুর যখন সেই বন্দীদিগকে সঙ্গে লইবার হুকুম দিতেছেন, এমন সময় চশমাপরা শশিভূষণ তাড়াতাড়ি একখানা জামা পরিয়া তাহার বোতাম না লাগাইয়া চটিজুতা চট্‌চট্ করিতে করিতে উর্ধ্বশ্বাসে পুলিসের বোটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কম্পিতস্বরে কহিলেন, "সার, জেলের জাল ছিঁড়িবার এবং এই চারি জন লোককে উৎপীড়ন করিবার তোমার কোনো অধিকার নাই।"

পুলিসের বড়ো কর্তা তাঁহাকে হিন্দিভাষায় একটা বিশেষ অসম্মানের কথা বলিবা-মাত্র তিনি এক মুহূর্তে কিঞ্চিৎ উচ্চ ডাঙা হইতে বোটের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াই একেবারে সাহেবের উপরে আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন। বালকের মতো, পাগলের মতো মারিতে লাগিলেন।

তাহার পর কী হইল তিনি জানেন না। পুলিসের থানার মধ্যে যখন জাগিয়া উঠিলেন তখন, বলিতে সংকোচ বোধ হয়, যেরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে মানসিক সম্মান অথবা শারীরিক আরাম বোধ করিলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ

শশিভূষণের বাপ উকিল ব্যারিস্টার লাগাইয়া প্রথমত শশীকে হাজত হইতে জামিনে খালাস করিলেন। তাহার পরে মকদ্দমার জোগাড় চলিতে লাগিল।

যে-সকল জেলের জাল নষ্ট হইয়াছে তাহারা শশিভূষণের এক পরগনার অন্তর্গত, এক জমিদারের অধীন। বিপদের সময় কখনো কখনো শশীর নিকটে তাহারা আইনের পরামর্শ লইতেও আসিত। যাহাদিগকে সাহেব বোটে ধরিয়া আনিয়াছিলেন তাহারাও শশিভূষণের অপরিচিত নহে।

শশী তাহাদিগকে সাক্ষী মানিবেন বলিয়া ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া যাহাদিগকে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হয় পুলিসের সহিত বিবাদ করিলে তাহারা কোথায় গিয়া নিষ্কৃতি পাইবে। একটার অধিক প্রাণ কাহার শরীরে আছে। যাহা লোকসান হইবার তাহা তো হইয়াছে, এখন আবার সাক্ষীর সপিনা ধরাইয়া এ কী মুশকিল। সকলে বলিল, "ঠাকুর, তুমি তো আমাদিগকে বিষম ফেসাদে ফেলিলে!"

বিস্তর বলা-কহার পর তাহারা সত্যকথা বলিতে স্বীকার করিল।

ইতিমধ্যে হরকুমার যেদিন বেঞ্চের কর্মোপলক্ষে জেলার সাহেবদিগকে সেলাম করিতে গেলেন পুলিস সাহেব হাসিয়া কহিলেন, "নায়েববাবু, শুনিতেছি তোমার প্রজারা পুলিসের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইয়াছে।"

নায়েব সচকিত হইয়া কহিলেন, "হাঁ! এও কি কখনো সম্ভব হয়। অপবিত্র জন্তুজাত পুত্রদিগের অস্থিতে এত ক্ষমতা!"

সংবাদপত্র-পাঠকেরা অবগত আছেন, মকদ্দমায় শশিভূষণের পক্ষ কিছুতেই টিঁকিতে পারিল না।

জেলেরা একে একে আসিয়া কহিল, পুলিস সাহেব তাহাদের জাল কাটিয়া দেন নাই, বোটে ডাকিয়া তাহাদের নাম ধাম লিখিয়া লইতেছিলেন।

কেবল তাহাই নহে, তাঁহার দেশস্থ গুটিচারেক পরিচিত লোক সাক্ষ্য দিল যে, তাহারা সে সময়ে ঘটনাস্থলে বিবাহের বরযাত্র উপলক্ষে উপস্থিত ছিল। শশিভূষণ যে অকারণে অগ্রসর হইয়া পুলিসের পাহারাওয়ালাদের প্রতি উপদ্রব করিয়াছে, তাহা তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে।

শশিভূষণ স্বীকার করিলেন যে, গালি খাইয়া বোটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি সাহেবকে মারিয়াছেন। কিন্তু জাল কাটিয়া দেওয়া ও জেলেদের প্রতি উপদ্রবই তাহার মূল কারণ।

এরূপ অবস্থায় যে বিচারে শশিভূষণ শাস্তি পাইলেন তাহাকে অন্যায় বলা যাইতে পারে না। তবে শাস্তিটা কিছু গুরুতর হইল। তিন-চারিটা অভিযোগ, আঘাত, অনধিকার প্রবেশ, পুলিসের কর্তব্যে ব্যাঘাত ইত্যাদি, সব ক'টাই তাঁহার বিরুদ্ধে পুরা প্রমাণ হইল।

শশিভূষণ তাঁহার সেই ক্ষুদ্র গৃহে তাঁহার প্রিয় পাঠ্যগ্রন্থগুলি ফেলিয়া পাঁচ বৎসর জেল খাটিতে গেলেন। তাঁহার বাপ আপিল করিতে উদ্যত হইলে তাঁহাকে শশিভূষণ বারংবার নিষেধ করিলেন ; কহিলেন, "জেল ভালো ! লোহার বেড়ি মিথ্যা কথা বলে না, কিন্তু জেলের বাহিরে যে স্বাধীনতা আছে সে আমাদিগকে প্রতারণা করিয়া বিপদে ফেলে। আর, যদি সৎসঙ্গের কথা বল তো, জেলের মধ্যে মিথ্যাবাদী কৃতঘ্ন কাপুরুষের সংখ্যা অল্প, কারণ স্থান পরিমিত— বাহিরে অনেক বেশি।"

দশম পরিচ্ছেদ

শশিভূষণের জেলে প্রবেশ করিবার অনতিকাল পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। তাঁহার আর বড়ো কেহ ছিল না। এক ভাই বহুকাল হইতে সেন্ট্রাল প্রভিন্সে কাজ করিতেন, দেশে আসা তাঁহার বড়ো ঘটিয়া উঠিত না, সেইখানেই তিনি বাড়ি তৈয়ারি করিয়া সপরিবারে স্থায়ী হইয়া বসিয়াছিলেন। দেশে বিষয়সম্পত্তি যাহা ছিল নায়েব হরকুমার তাহার অধিকাংশ নানা কৌশলে আত্মসাৎ করিলেন।

জেলের মধ্যে অধিকাংশ কয়েদিকে যে পরিমাণে দুঃখ ভোগ করিতে হয় দৈববিপাকে শশিভূষণকে তদপেক্ষা অনেক বেশি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তথাপি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল।

আবার একদা বর্ষার দিনে জীর্ণ শরীর ও শূন্য হৃদয় লইয়া শশিভূষণ কারাপ্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বাধীনতা পাইলেন, কিন্তু তাহা ছাড়া কারার বাহিরে তাঁহার আর-কেহ অথবা আর-কিছু ছিল না। গৃহহীন আত্মীয়হীন সমাজহীন কেবল তাঁহার একলাটির পক্ষে এত বড়ো জগৎ সংসার অত্যন্ত ঢিলা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

জীবনযাত্রার বিচ্ছিন্ন সূত্র আবার কোথা হইতে আরম্ভ করিবেন, এই কথা ভাবিতেছেন এমন সময়ে এক বৃহৎ জুড়ি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন ভৃত্য নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম শশিভূষণবাবু ?"

তিনি কহিলেন, "হাঁ।"

সে তৎক্ষণাৎ গাড়ির দরজা খুলিয়া তাঁহার প্রবেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।

তিনি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কোথায় যাইতে হইবে।"

সে কহিল, "আমার প্রভু আপনাকে ডাকিয়াছেন।"

পথিকদের কৌতূহলদৃষ্টিপাত অসহ্য বোধ হওয়াতে তিনি সেখানে আর অধিক বাদানুবাদ না করিয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে একটা কিছু ভ্রম আছে। কিন্তু একটা কোনো দিকে তো চলিতে হইবে— নাহয় এমনি করিয়া ভ্রম দিয়াই এই নূতন জীবনের ভূমিকা আরম্ভ হউক।

সেদিনও মেঘ এবং রৌদ্র আকাশময় পরস্পরকে শিকার করিয়া ফিরিতেছিল; পথের প্রান্তবর্তী বর্ষার জলপ্লাবিত গাঢ়শ্যাম শস্যক্ষেত্র চঞ্চল ছায়ালোকে বিচিত্র হইয়া উঠিতেছিল। হাটের কাছে একটা বৃহৎ রথ পড়িয়া ছিল এবং তাহার অদূরবর্তী মুদির দোকানে একদল বৈষ্ণব ভিক্ষুক গুপিযন্ত্র ও খোলকরতাল যোগে গান গাহিতেছিল—

এসো এসো ফিরে এসো— নাথ হে, ফিরে এসো!
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, বঁধু হে, ফিরে এসো!

গাড়ি অগ্রসর হইয়া চলিল, গানের পদ ক্রমে দূর হইতে দূরতর হইয়া কানে প্রবেশ করিতে লাগিল—

ওগো নিষ্ঠুর, ফিরে এসো হে! আমার করুণ কোমল, এসো!
ওগো সজলজলদস্নিগ্ধকান্ত সুন্দর, ফিরে এসো!

গানের কথা ক্রমে ক্ষীণতর অস্ফুটতর হইয়া আসিল, আর বুঝা গেল না। কিন্তু গানের ছন্দে শশিভূষণের হৃদয়ে একটা আন্দোলন তুলিয়া দিল, তিনি আপন মনে গুন্‌গুন্‌ করিয়া পদের পর পদ রচনা করিয়া যোজনা করিয়া চলিলেন, কিছুতে যেন থামিতে পারিলেন না—

আমার নিতি-সুখ, ফিরে এসো! আমার চিরদুখ, ফিরে এসো!
আমার সব-সুখ-দুখ-মন্থন-ধন, অন্তরে ফিরে এসো!
আমার চিরবাঞ্ছিত, এসো! আমার চিতসঞ্চিত, এসো!
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজবন্ধনে ফিরে এসো!
আমার বক্ষে ফিরিয়া এসো, আমার চক্ষে ফিরিয়া এসো,
আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এসো!
আমার মুখের হাসিতে এসো হে,
আমার চোখের সলিলে এসো!
আমার আদরে, আমার ছলনে,
আমার অভিমানে ফিরে এসো!

আমার সর্বস্মরণে এসো, আমার সর্বভরমে এসো—
আমার ধরম করম সোহাগ শরম জনম মরণে এসো !

গাড়ি যখন একটি প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে থামিল তখন শশিভূষণের গান থামিল।

তিনি কোনো প্রশ্ন না করিয়া ভৃত্যের নির্দেশক্রমে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যে ঘরে আসিয়া বসিলেন সে ঘরের চারি দিকেই বড়ো বড়ো কাচের আলমারিতে বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র মলাটের সারি সারি বই সাজানো। সেই দৃশ্য দেখিবামাত্র তাঁহার পুরাতন জীবন দ্বিতীয়বার কারামুক্ত হইয়া বাহির হইল। এই সোনার জলে অঙ্কিত নানা বর্ণে রঞ্জিত বইগুলি আনন্দলোকের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুপরিচিত রত্নখচিত সিংহদ্বারের মতো তাঁহার নিকটে প্রতিভাত হইল।

টেবিলের উপরেও কী কতকগুলি ছিল। শশিভূষণ তাঁহার ক্ষীণদৃষ্টি লইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলেন, একখানি বিদীর্ণ শ্লেট, তাহার উপরে গুটিকয়েক পুরাতন খাতা, একখানি ছিন্নপ্রায় ধারাপাত, কথামালা এবং একখানি কাশীরামদাসের মহাভারত।

শ্লেটের কাঠের ফ্রেমের উপর শশিভূষণের হস্তাক্ষরে কালি দিয়া খুব মোটা করিয়া লেখা— গিরিবালা দেবী। খাতা ও বইগুলির উপরেও ওই এক হস্তাক্ষরে এক নাম লিখিত।

শশিভূষণ কোথায় আসিয়াছেন, বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার বক্ষের মধ্যে রক্তস্রোত তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাহিরে চাহিলেন— সেখানে কী চক্ষে পড়িল। সেই ক্ষুদ্র গরাদে-দেওয়া ঘর, সেই অসমতল গ্রাম্যপথ, সেই ডুরে-কাপড়-পরা ছোটো মেয়েটি। এবং সেই আপনার শান্তিময় নিশ্চিন্ত নিভৃত জীবনযাত্রা।

সেদিনকার সেই সুখের জীবন কিছুই অসামান্য বা অত্যধিক নহে; দিনের পর দিন ক্ষুদ্র কাজে ক্ষুদ্র সুখে অজ্ঞাতসারে কাটিয়া যাইত, এবং তাঁহার নিজের অধ্যয়নকার্যের মধ্যে একটি বালিকা ছাত্রীর অধ্যাপনকার্য তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই গণ্য ছিল; কিন্তু গ্রাম-প্রান্তের সেই নির্জন দিনযাপন, সেই ক্ষুদ্র শান্তি, সেই ক্ষুদ্র সুখ, সেই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র মুখখানি সমস্তই যেন স্বর্গের মতো দেশকালের বহির্ভূত এবং আয়ত্তের অতীতরূপে কেবল আকাঙ্ক্ষারাজ্যের কল্পনাছায়ার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। সেদিনকার সেই-সমস্ত ছবি এবং স্মৃতি আজিকার এই বর্ষাম্লান প্রভাতের আলোকের সহিত এবং মনের মধ্যে মৃদুগুঞ্জিত সেই কীর্তনের গানের সহিত জড়িত মিশ্রিত হইয়া একপ্রকার সংগীতময় জ্যোতির্ময় অপূর্বরূপ ধারণ করিল। সেই জঙ্গলে বেষ্টিত কর্দমাক্ত সংকীর্ণ গ্রামপথের মধ্যে সেই অনাদৃত ব্যথিত বালিকার অভিমানমলিন মুখের শেষ স্মৃতিটি যেন বিধাতাবিরচিত

এক অসাধারণ আশ্চর্য অপরূপ অতি-গভীর অতি-বেদনাপরিপূর্ণ স্বর্গীয় চিত্রের মতো তাঁহার মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। তাহারই সঙ্গে কীর্তনের করুণ সুর বাজিতে লাগিল এবং মনে হইল যেন সেই পল্লীবালিকার মুখে সমস্ত বিশ্বহৃদয়ের এক অনির্বচনীয় দুঃখ আপনার ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে। শশিভূষণ দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া সেই টেবিলের উপর সেই শ্লেট বহি খাতার উপর মুখ রাখিয়া অনেক কাল পরে অনেক দিনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে মৃদু শব্দে সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়া দেখিলেন। তাঁহার সম্মুখে রুপার থালায় ফলমূলমিষ্টান্ন রাখিয়া গিরিবালা অদূরে দাঁড়াইয়া নীরবে অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি মস্তক তুলিতেই নিরাভরণা শুভ্রবসনা বিধবাবেশধারিণী গিরিবালা তাঁহাকে নতজানু হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল।

বিধবা উঠিয়া দাঁড়াইয়া যখন শীর্ণমুখ ম্লানবর্ণ ভগ্নশরীর শশিভূষণের দিকে সকরুণ স্নিগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিল, তখন তাহার দুই চক্ষু ঝরিয়া দুই কপোল বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

শশিভূষণ তাহাকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না; নিরুদ্ধ অশ্রুবাষ্প তাঁহার বাক্যপথ সবলে অবরোধ করিল, কথা এবং অশ্রু উভয়েই নিরুপায়ভাবে হৃদয়ের মুখে কণ্ঠের দ্বারে বদ্ধ হইয়া রহিল। সেই কীর্তনের দল ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে করিতে অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া গাহিতে লাগিল— এসো এসো হে!

আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১

প্রায়শ্চিত্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বর্গ ও মর্তের মাঝখানে একটা অনির্দেশ্য অরাজক স্থান আছে যেখানে ত্রিশঙ্কু রাজা ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, যেখানে আকাশকুসুমের অজস্র আবাদ হইয়া থাকে। সেই বায়ুদুর্গবেষ্টিত মহাদেশের নাম 'হইলে-হইতে-পারিত'। যাঁহারা মহৎ কার্য করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, যাঁহারা সামান্য ক্ষমতা লইয়া সাধারণ মানবের মধ্যে সাধারণভাবে সংসারের প্রাত্যহিক কর্তব্যসাধনে সহায়তা করিতেছেন তাঁহারাও ধন্য; কিন্তু যাঁহারা অদৃষ্টের ভ্রমক্রমে হঠাৎ দুয়ের মাঝখানে

পড়িয়াছেন তাঁহাদের আর কোনো উপায় নাই। তাঁহারা একটা কিছু হইলে হইতে পারিতেন কিন্তু সেই কারণেই তাঁহাদের পক্ষে কিছু-একটা হওয়া সর্বাপেক্ষা অসম্ভব।

আমাদের অনাথবন্ধু সেই মধ্যদেশবিলম্বিত বিধিবিড়ম্বিত যুবক। সকলেরই বিশ্বাস, তিনি ইচ্ছা করিলে সকল বিষয়েই কৃতকার্য হইতে পারিতেন। কিন্তু কোনো কালে তিনি ইচ্ছাও করিলেন না এবং কোনো বিষয়ে তিনি কৃতকার্যও হইলেন না, এবং সকলের বিশ্বাস তাঁহার প্রতি অটল রহিয়া গেল। সকলে বলিল, তিনি পরীক্ষায় ফার্স্ট্ হইবেন; তিনি আর পরীক্ষা দিলেন না। সকলের বিশ্বাস চাকরিতে প্রবিষ্ট হইলে যে কোনো ডিপার্ট্‌মেন্টের উচ্চতম স্থান তিনি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবেন; তিনি কোনো চাকরিই গ্রহণ করিলেন না। সাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার বিশেষ অবজ্ঞা, কারণ তাহারা অত্যন্ত সামান্য; অসাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না, কারণ মনে করিলেই তিনি তাহাদের অপেক্ষা অসাধারণতর হইতে পারিতেন।

অনাথবন্ধুর সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তি সুখসম্পদসৌভাগ্য দেশকালাতীত অনসম্ভবতার ভাণ্ডারে নিহিত ছিল, বিধাতা কেবল বাস্তবরাজ্যে তাঁহাকে একটি ধনী শ্বশুর এবং একটি সুশীলা স্ত্রী দান করিয়াছিলেন। স্ত্রীর নাম বিন্ধ্যবাসিনী।

স্ত্রীর নামটি অনাথবন্ধু পছন্দ করেন নাই এবং স্ত্রীটিকেও রূপে গুণে তিনি আপন যোগ্য জ্ঞান করিতেন না, কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনীর মনে স্বামীসৌভাগ্য গর্বের সীমা ছিল না। সকল স্ত্রীর সকল স্বামীর অপেক্ষা তাঁহার স্বামী যে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, এ সম্বন্ধে তাঁহার কোনো সন্দেহ ছিল না এবং তাঁহার স্বামীরও কোনো সন্দেহ ছিল না, এবং সাধারণের ধারণাও এই বিশ্বাসের অনুকূল ছিল।

এই স্বামীগর্ব পাছে কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয়, এজন্য বিন্ধ্যবাসিনী সর্বদাই সশঙ্কিত ছিলেন। তিনি যদি আপন হৃদয়ের অভ্রভেদী অটল ভক্তিপর্বতের উচ্চতম শিখরের উপরে এই স্বামীটিকে অধিরোহণ করাইয়া তাঁহাকে মূঢ় মর্তলোকের সমস্ত কটাক্ষপাত হইতে দূরে রক্ষা করিতে পারিতেন, তবে নিশ্চিন্তচিত্তে পতিপূজায় জীবন উৎসর্গ করিতেন। কিন্তু জড়জগতে কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারা ভক্তিভাজনকে উর্ধ্বে তুলিয়া রাখা যায় না এবং অনাথবন্ধুকেও পুরুষের আদর্শ বলিয়া মানে না এমন প্রাণী সংসারে বিরল নহে। এই জন্য বিন্ধ্যবাসিনীকে অনেক দুঃখ পাইতে হইয়াছে।

অনাথবন্ধু যখন কালেজে পড়িতেন তখন শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন। পরীক্ষার সময় আসিল, পরীক্ষা দিলেন না, এবং তাহার পরবৎসর কালেজ ছাড়িয়া দিলেন।

এই ঘটনায় সর্বসাধারণের সমক্ষে বিন্ধ্যবাসিনী অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। রাত্রে মৃদুস্বরে অনাথবন্ধুকে বলিলেন, "পরীক্ষাটা দিলেই ভালো হত।"

অনাথবন্ধু অবজ্ঞাভরে হাসিয়া কহিলেন, "পরীক্ষা দিলেই কি চতুর্ভুজ হয় না কি। আমাদের কেদারও তো পরীক্ষায় পাস হইয়াছে!"

বিন্ধ্যবাসিনী সান্ত্বনা লাভ করিলেন। দেশের অনেক গো-গর্দভ যে-পরীক্ষায় পাস করিতেছে সে-পরীক্ষা দিয়া অনাথবন্ধুর গৌরব কী আর বাড়িবে!

প্রতিবেশিনী কমলা তাহার বাল্যসখী বিন্দিকে আনন্দ-সহকারে খবর দিতে আসিল যে, তাহার ভাই রমেশ এবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জলপানি পাইতেছে। শুনিয়া বিন্ধ্যবাসিনী অকারণে মনে করিল, কমলার এই আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ নহে, ইহার মধ্যে তাহার স্বামীর প্রতি কিঞ্চিৎ গূঢ় শ্লেষ আছে। এইজন্য সখীর উল্লাসে উল্লাস প্রকাশ না করিয়া বরং গায়ে পড়িয়া কিঞ্চিৎ ঝগড়ার সুরে শুনাইয়া দিল যে, এল্. এ. পরীক্ষা একটা পরীক্ষার মধ্যেই গণ্য নহে: এমন-কি, বিলাতের কোনো কালেজে বি. এ.র নীচে পরীক্ষাই নাই। বলা বাহুল্য, এসমস্ত সংবাদ এবং যুক্তি বিন্ধ্য স্বামীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে।

কমলা সুখসংবাদ দিতে আসিয়া সহসা পরমপ্রিয়তমা প্রাণসখীর নিকট হইতে এরূপ আঘাত পাইয়া প্রথমটা কিছু বিস্মিত হইল। কিন্তু, সেও না কি স্ত্রীজাতীয় মনুষ্য, এই জন্য মুহূর্তকালের মধ্যেই বিন্ধ্যবাসিনীর মনের ভাব বুঝিতে পারিল এবং ভ্রাতার অপমানে তৎক্ষণাৎ তাহারও রসনাগ্রে একবিন্দু তীব্র বিষ সঞ্চারিত হইল; সে বলিল, "আমরা তো, ভাই, বিলাতও যাই নাই, সাহেব স্বামীকেও বিবাহ করি নাই, অত খবর কোথায় পাইব। মূর্খ মেয়েমানুষ, মোটামুটি এই বুঝি যে, বাঙালির ছেলেকে কালেজে এল. এ. দিতে হয়; তাও তো, ভাই, সকলে পারে না।" অত্যন্ত নিরীহ সুমিষ্ট এবং বন্ধুভাবে এই কথাগুলি বলিয়া কমলা চলিয়া আসিল, কলহবিমুখ বিন্ধ্য নিরুত্তরে সহ্য করিল এবং ঘরে প্রবেশ করিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

অল্পকালের মধ্যে আর-একটি ঘটনা ঘটিল। একটি দূরস্থ ধনী কুটুম্ব কিয়ৎকালের জন্য কলিকাতায় আসিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তদুপলক্ষে তাহার পিতা রাজকুমার বাবুর বাড়িতে বিশেষ একটা সমারোহ পড়িয়া গেল। জামাই-বাবু বাহিরের যে বড়ো বৈঠকখানাটি অধিকার করিয়া থাকিতেন নব-অভ্যাগতদের বিশেষ সমাদরের জন্য সেই ঘরটি ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে মামাবাবুর ঘরে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় লইতে অনুরোধ করা হইল।

এই ঘটনায় অনাথবন্ধুর অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রথমত, স্ত্রীর নিকটে গিয়া তাহার পিতৃনিন্দা করিয়া তাহাকে কাঁদাইয়া দিয়া শ্বশুরের উপর প্রতিশোধ তুলিলেন। তাহার পরে অনাহার প্রভৃতি অন্যান্য প্রবল উপায়ে অভিমান প্রকাশের

উপক্রম করিলেন। তাহা দেখিয়া বিন্ধ্যবাসিনী নিরতিশয় লজ্জিত হইল। তাহার মনে যে একটি সহজ আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল তাহা হইতেই সে বুঝিল, এরূপস্থলে সর্বসমক্ষে অভিমান প্রকাশ করার মতো লজ্জাকর আত্মাবমাননা আর কিছুই নাই। হাতে পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া বহু কষ্টে সে তাহার স্বামীকে ক্ষান্ত করিয়া রাখিল।

বিন্ধ্য অবিবেচক ছিল না, এইজন্য সে তাহার পিতামাতার প্রতি কোনো দোষারোপ করিল না; সে বুঝিল, ঘটনাটি সামান্য ও স্বাভাবিক। কিন্তু, এ কথাও তাহার মনে হইল যে, তাহার স্বামী শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া কুটুম্বের আদর হইতে বঞ্চিত হইতেছেন।

সেই দিন হইতে প্রতিদিন সে তাহার স্বামীকে বলিতে লাগিল, "আমাকে তোমাদের ঘরে লইয়া চলো; আমি আর এখানে থাকিব না।"

অনাথবন্ধুর মনে অহংকার যথেষ্ট ছিল কিন্তু আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল না। তাঁহার নিজ গৃহের দারিদ্র্যের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে কিছুতেই তাঁহার অভিরুচি হইল না। তখন তাঁহার স্ত্রী কিছু দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া কহিল, "তুমি যদি না যাও তো আমি একলাই যাইব।"

অনাথবন্ধু মনে মনে বিরক্ত হইয়া তাঁহার স্ত্রীকে কলিকাতার বাহিরে দূর ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহাদের মৃত্তিকানির্মিত খোড়ো ঘরে লইয়া যাইবার উদ্‌যোগ করিলেন। যাত্রাকালে রাজকুমার বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী কন্যাকে আরো কিছুকাল পিতৃগৃহে থাকিয়া যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন; কন্যা নীরবে নতশিরে গম্ভীরমুখে বসিয়া মৌনভাবে জানাইয়া দিল, না, সে হইতে পারিবে না।

তাহার সহসা এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া পিতামাতার সন্দেহ হইল যে, অজ্ঞাতসারে বোধ করি কোনোরূপে তাহাকে আঘাত দেওয়া হইয়াছে। রাজকুমার বাবু ব্যথিতচিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আমাদের কোনো অজ্ঞানকৃত আচরণে তোমার মনে কি ব্যথা লাগিয়াছে।"

বিন্ধ্যবাসিনী তাহার পিতার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিল, "এক মুহূর্তের জন্যও নহে। তোমাদের এখানে বড়ো সুখে বড়ো আদরে আমার দিন গিয়াছে।" বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সংকল্প অটল রহিল।

বাপ মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, যত স্নেহে যত আদরেই মানুষ কর, বিবাহ দিলেই মেয়ে পর হইয়া যায়।

অবশেষে অশ্রুনেত্রে সকলের নিকট বিদায় লইয়া আপন আজন্মকালের স্নেহমণ্ডিত পিতৃগৃহ এবং পরিজন ও সঙ্গিনীগণকে ছাড়িয়া বিন্ধ্যবাসিনী পালকিতে আরোহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতার ধনীগৃহে এবং পল্লীগ্রামের গৃহস্থঘরে বিস্তর প্রভেদ। কিন্তু, বিন্ধ্যবাসিনী একদিনের জন্যও ভাবে অথবা আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। প্রফুল্লচিত্তে গৃহকার্যে শাশুড়ির সহায়তা করিতে লাগিল। তাহাদের দরিদ্র অবস্থা জানিয়া পিতা নিজ ব্যয়ে কন্যার সহিত একটি দাসী পাঠাইয়াছিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীগৃহে পৌঁছিয়াই তাহাকে বিদায় করিয়া দিল। তাহার শ্বশুরঘরের দারিদ্র্য দেখিয়া বড়ো-মানুষের ঘরের দাসী প্রতি মুহূর্তে মনে মনে নাসাগ্র আকুঞ্চিত করিতে থাকিবে, এ আশঙ্কাও তাহার অসহ্য বোধ হইল।

শাশুড়ি স্নেহবশত বিন্ধ্যকে শ্রমসাধ্য কার্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেন কিন্তু বিন্ধ্য নিরলস অশ্রান্তভাবে প্রসন্নমুখে সকল কার্যে যোগ দিয়া শাশুড়ির হৃদয় অধিকার করিয়া লইল, এবং পল্লীরমণীগণ তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু, ইহার ফল সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হইল না। কারণ, বিশ্বনিয়ম 'নীতিবোধ প্রথম-ভাগে'র ন্যায় সাধুভাষায় রচিত সরল উপদেশাবলী নহে। নিষ্ঠুর বিদ্রূপপ্রিয় শয়তান মাঝখানে আসিয়া সমস্ত নীতিসূত্রগুলিকে ঘাঁটিয়া জট পাকাইয়া দিয়াছে। তাই ভালো কাজে সকল সময়ে উপস্থিতমতো বিশুদ্ধ ভালো ফল ঘটে না, হঠাৎ একটা গোল বাধিয়া ওঠে।

অনাথবন্ধুর দুইটি ছোটো এবং একটি বড়ো ভাই ছিল। বড়ো ভাই বিদেশে চাকরি করিয়া যে গুটিপঞ্চাশেক টাকা উপার্জন করিতেন, তাহাতেই তাহাদের সংসার চলিত এবং ছোটো দুটি ভাইয়ের বিদ্যাশিক্ষা হইত।

বলা বাহুল্য, আজকালকার দিনে মাসিক পঞ্চাশ টাকায় সংসারের শ্রীবৃদ্ধিসাধন অসম্ভব কিন্তু বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী শ্যামাশঙ্করীর গরিমাবৃদ্ধির পক্ষে উহাই যথেষ্ট ছিল। স্বামী সম্বৎসরকাল কাজ করিতেন, এইজন্য স্ত্রী সম্বৎসরকাল বিশ্রামের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাজকর্ম কিছুই করিতেন না অথচ এমন ভাবে চলিতেন যেন তিনি কেবলমাত্র তাঁহার উপার্জনক্ষম স্বামীটির স্ত্রী হইয়াই সমস্ত সংসারটাকে পরম বাধিত করিয়াছেন।

বিন্ধ্যবাসিনী যখন শ্বশুরবাড়ি আসিয়া গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় অহর্নিশি ঘরের কাজে প্রবৃত্ত হইল তখন শ্যামাশঙ্করীর সংকীর্ণ অন্তঃকরণটুকু কে যেন কষিয়া আঁটিয়া ধরিতে লাগিল। তাহার কারণ বোঝা শক্ত। বোধ করি বড়োবউ মনে করিলেন, মেজোবউ বড়ো ঘরের মেয়ে হইয়া কেবল লোক দেখাইবার জন্য ঘরকন্নার নীচ কাজে নিযুক্ত হইয়াছে, উহাতে

কেবল তাঁহাকে লোকের চক্ষে অপদস্থ করা হইতেছে। যে কারণেই হউক, মাসিক পঞ্চাশ টাকার স্ত্রী কিছুতেই ধনীবংশের কন্যাকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তাহার নম্রতার মধ্যে অসহ্য দেমাকের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন।

এদিকে অনাথবন্ধু পল্লীতে আসিয়া লাইব্রেরি স্থাপন করিলেন ; দশ-বিশজন স্কুলের ছাত্র জড়ো করিয়া সভাপতি হইয়া খবরের কাগজে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতে লাগিলেন ; এমন-কি, কোনো কোনো ইংরাজি সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হইয়া গ্রামের লোকদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু, দরিদ্র সংসারে একপয়সা আনিলেন না, বরঞ্চ বাজে খরচ অনেক হইতে লাগিল।

একটা কোনো চাকরি লইবার জন্য বিন্ধ্যবাসিনী তাঁহাকে সর্বদাই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তিনি কান দিলেন না। স্ত্রীকে বলিলেন, তাঁহার উপযুক্ত চাকরি আছে বটে কিন্তু পক্ষপাতী ইংরাজ গবর্মেণ্ট সে সকল পদে বড়ো বড়ো ইংরাজকে নিযুক্ত করে, বাঙালি হাজার যোগ্য হইলেও তাহার কোনো আশা নাই।

শ্যামাশঙ্করী তাঁহার দেবর এবং মেঝো জা'র প্রতি লক্ষ্যে এবং অলক্ষ্যে সর্বদাই বাক্য-বিষ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। গর্বভরে নিজেদের দারিদ্র্য আস্ফালন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমরা গরিব মানুষ, বড়ো মানুষের মেয়ে এবং বড়ো মানুষের জামাইকে পোষণ করিব কেমন করিয়া। সেখানে তো বেশ ছিলেন, কোনো দুঃখ ছিল না— এখানে ডালভাত খাইয়া এত কষ্ট কি সহ্য হইবে।"

শাশুড়ি বড়োবউকে ভয় করিতেন, তিনি দুর্বলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কোনো কথা বলিতে সাহস করিতেন না। মেজোবউও মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের ডালভাত এবং তদীয় স্ত্রীর বাক্যঝাল খাইয়া নীরবে পরিপাক করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে বড়ো ভাই ছুটিতে কিছুদিনের জন্য ঘরে আসিয়া স্ত্রীর নিকট হইতে অনেক উদ্দীপনাপূর্ণ ওজোগুণসম্পন্ন বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিদ্রার ব্যাঘাত যখন প্রতি রাত্রেই গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন একদিন অনাথবন্ধুকে ডাকিয়া শান্তভাবে স্নেহের সহিত কহিলেন, "তোমার একটা চাকরির চেষ্টা দেখা উচিত, কেবল আমি একলা সংসার চালাইব কী করিয়া।"

অনাথবন্ধু পদাহত সর্পের ন্যায় গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, দুই বেলা দুই মুষ্টি অত্যন্ত অখাদ্য মোটা ভাতের 'পর এত খোটা সহ্য হয় না। তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে লইয়া শ্বশুরবাড়ি যাইতে সংকল্প করিলেন।

কিন্তু, স্ত্রী কিছুতেই সম্মত হইল না। তাহার মতে ভাইয়ের অন্ন এবং ভাজের গালিতে কনিষ্ঠের পারিবারিক অধিকার আছে কিন্তু শ্বশুরের আশ্রয়ে বড়ো লজ্জা।

বিন্ধ্যবাসিনী শ্বশুরবাড়িতে দীনহীনের মতো নত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বাপের বাড়িতে সে আপন মর্যাদা রক্ষা করিয়া মাথা তুলিয়া চলিতে চায়।

এমন সময় গ্রামের এন্‌ট্রেন্‌স্‌স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি হইল। অনাথবন্ধুর দাদা এবং বিন্ধ্যবাসিনী উভয়েই তাঁহাকে এই কাজটি গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। তাহাতেও হিতে বিপরীত হইল। নিজের ভাই এবং একমাত্র ধর্মপত্নী যে তাঁহাকে এমন একটা অত্যন্ত তুচ্ছ কাজের যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন, ইহাতে তাঁহার মনে দুর্জয় অভিমানের সঞ্চার হইল এবং সংসারের ও সমস্ত কাজকর্মের প্রতি পূর্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বৈরাগ্য জন্মিয়া গেল।

তখন আবার দাদা তাঁহার হাতে ধরিয়া, মিনতি করিয়া, তাঁহাকে অনেক করিয়া ঠাণ্ডা করিলেন। সকলেই মনে করিলেন, ইহাকে আর কোনো কথা বলিয়া কাজ নাই, এ এখন কোনো প্রকারে ঘরে টিকিয়া গেলেই ঘরের সৌভাগ্য।

ছুটি অন্তে দাদা কর্মক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন; শ্যামাশঙ্করী রুদ্ধ আক্রোশে মুখখানা গোলাকার করিয়া তুলিয়া একটা বৃহৎ কুদর্শনচক্র নির্মাণ করিয়া রহিলেন। অনাথবন্ধু বিন্ধ্যবাসিনীকে আসিয়া কহিলেন, "আজকাল বিলাতে না গেলে কোনো ভদ্র চাকরি পাওয়া যায় না। আমি বিলাতে যাইতে মনস্থ করিতেছি, তুমি তোমার বাবার কাছ হইতে কোনো ছুতায় কিছু অর্থ সংগ্রহ করো।"

এক তো বিলাত যাইবার কথা শুনিয়া বিন্ধ্যর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল; তাহার পরে পিতার কাছে কী করিয়া অর্থ ভিক্ষা করিতে যাইবে, তাহা সে মনে করিতে পারিল না এবং মনে করিতে গিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল।

শ্বশুরের কাছে নিজমুখে টাকা চাহিতেও অনাথবন্ধুর অহংকারে বাধা দিল অথচ বাপের কাছ হইতে কন্যা কেন যে ছলে অথবা বলে অর্থ আকর্ষণ করিয়া না আনিবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ইহা লইয়া অনাথ অনেক রাগারাগি করিলেন এবং মর্মপীড়িত বিন্ধ্যবাসিনীকে বিস্তর অশ্রুপাত করিতে হইল।

এমন করিয়া কিছুদিন সাংসারিক অভাবে এবং মনের কষ্টে কাটিয়া গেল; অবশেষে শরৎকালে পূজা নিকটবর্তী হইল। কন্যা এবং জামাতাকে সাদরে আহ্বান করিয়া আনিবার জন্য রাজকুমার বাবু বহু সমারোহে যানবাহনাদি প্রেরণ করিলেন। এক বৎসর পরে কন্যা স্বামীসহ পুনরায় পিতৃভবনে প্রবেশ করিল। ধনী কুটুম্বের যে আদর তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল, জামাতা এবার তদপেক্ষা অনেক বেশি আদর পাইলেন। বিন্ধ্যবাসিনীও অনেককাল পরে মাথার অবগুণ্ঠন ঘুচাইয়া অহর্নিশি স্বজনস্নেহে ও উৎসবতরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

আজ ষষ্ঠী। কাল সপ্তমীপূজা আরম্ভ হইবে। ব্যস্ততা এবং কোলাহলের সীমা নাই। দূর এবং নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়পরিজনে অট্টালিকার প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ একেবারে পরিপূর্ণ।

সে রাত্রে বড়ো শ্রান্ত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনী শয়ন করিল। পূর্বে যে ঘরে শয়ন করিত এ সে ঘর নহে; এবার বিশেষ আদর করিয়া মা জামাতাকে তাঁহার নিজের ঘর ছাড়িয়া দিয়াছেন। অনাথবন্ধু কখন শয়ন করিতে আসিলেন তাহা বিন্ধ্য জানিতেও পারিল না। সে তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল।

খুব ভোরের বেলা হইতে শানাই বাজিতে লাগিল। কিন্তু, ক্লান্তদেহ বিন্ধ্যবাসিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। কমল এবং ভুবন দুই সখী বিন্ধ্যর শয়নদ্বারে আড়ি পাতিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া অবশেষে পরিহাসপূর্বক বাহির হইতে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; তখন বিন্ধ্য তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, তাহার স্বামী কখন উঠিয়া গিয়াছেন সে জানিতে পারে নাই। লজ্জিত হইয়া শয্যা ছাড়িয়া নামিয়া দেখিল, তাহার মাতার লোহার সিন্দুক খোলা এবং তাহার মধ্যে তাহার বাপের যে ক্যাশবাক্সটি থাকিত, সেটিও নাই।

তখন মনে পড়িল, কাল সন্ধ্যাবেলায় মায়ের চাবির গোচ্ছা হারাইয়া গিয়া বাড়িতে খুব একটা গোলযোগ পড়িয়া গিয়াছিল। সেই চাবি চুরি করিয়া কোনো একটি চোর এই কাজ করিয়াছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তখন হঠাৎ আশঙ্কা হইল, পাছে সেই চোর তাহার স্বামীকে কোনোরূপ আঘাত করিয়া থাকে। বুকটা ধড়াস্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বিছানার নীচে খুঁজিতে গিয়া দেখিল, খাটের পায়ের কাছে তাহার মায়ের চাবির গোচ্ছার নীচে একটি চিঠি চাপা রহিয়াছে।

চিঠি তাহার স্বামীর হস্তাক্ষরে লেখা। খুলিয়া পড়িয়া জানিল, তাহার স্বামী তাহার কোনো এক বন্ধুর সাহায্যে বিলাতে যাইবার জাহাজভাড়া সংগ্রহ করিয়াছে, এক্ষণে সেখানকার খরচপত্র চালাইবার অন্য কোনো উপায় ভাবিয়া না পাওয়াতে গতরাত্রে শ্বশুরের অর্থ অপহরণ করিয়া বারান্দাসংলগ্ন কাঠের সিঁড়ি দিয়া অন্দরের বাগানে নামিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অদ্যই প্রত্যূষে জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছে।

পত্রখানা পাঠ করিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হইয়া গেল। সেইখানেই খাটের খুরা ধরিয়া সে বসিয়া পড়িল। তাহার দেহের অভ্যন্তরে কর্ণকুহরের মধ্যে নিস্তব্ধ মৃত্যুরজনীর ঝিল্লিধ্বনির মতো একটা শব্দ হইতে লাগিল। তাহারই উপরে প্রাঙ্গণ হইতে প্রতিবেশীদের বাড়ি হইতে এবং দূর অট্টালিকা হইতে, বহুতর শানাই বহুতর সুরে তান ধরিল। সমস্ত বঙ্গদেশ তখন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শরতের উৎসবহাস্যরঞ্জিত রৌদ্র সকৌতুকে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। এত বেলা হইল তথাপি উৎসবের দিনে দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া ভুবন ও কমল উচ্চহাস্যে উপহাস করিতে করিতে গুম্ গুম্ শব্দে দ্বারে কিল মারিতে লাগিল। তাহাতেও কোনো সাড়া না পাইয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া উর্ধ্বকণ্ঠে "বিন্দী" "বিন্দী" করিয়া ডাকিতে লাগিল।

বিন্ধ্যবাসিনী ভগ্নরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "যাচ্ছি ; তোরা এখন যা।"

তাহারা সখীর পীড়া আশঙ্কা করিয়া মাকে ডাকিয়া আনিল। মা আসিয়া কহিলেন, "বিন্দু, কী হয়েছে মা, এখনো দ্বার বন্ধ কেন!"

বিন্ধ্য উচ্ছ্বসিত অশ্রু সংবরণ করিয়া কহিল, "একবার বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।"

মা অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজকুমার বাবুকে সঙ্গে করিয়া দ্বারে আসিলেন। বিন্ধ্য দ্বার খুলিয়া তাঁহাদিগকে ঘরে আনিয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

তখন বিন্ধ্য ভূমিতে পড়িয়া তাহার বাপের পা ধরিয়া বক্ষ শতধা বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "বাবা! আমাকে মাপ করো, আমি তোমার সিন্দুক হইতে টাকা চুরি করিয়াছি।"

তাঁহারা অবাক হইয়া বিছানায় বসিয়া পড়িলেন। বিন্ধ্য বলিল, তাহার স্বামীকে বিলাতে পাঠাইবার জন্য সে এই কাজ করিয়াছে।

তাহার বাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের কাছে চাহিস নাই কেন।"

বিন্ধ্যবাসিনী কহিল, "পাছে বিলাত যাইতে তোমরা বাধা দেও।"

রাজকুমার বাবু অত্যন্ত রাগ করিলেন। মা কাঁদিতে লাগিলেন, মেয়ে কাঁদিতে লাগিল এবং কলিকাতার চতুর্দিক হইতে বিচিত্র সুরে আনন্দের বাদ্য বাজিতে লাগিল।

যে বিন্ধ্য বাপের কাছেও কখনো অর্থ প্রার্থনা করিতে পারে নাই এবং যে স্ত্রী স্বামীর লেশমাত্র অসম্মান পরমাত্মীয়ের নিকট হইতেও গোপন করিবার জন্য প্রাণপণ করিতে পারিত, আজ একেবারে উৎসবের জনতার মধ্যে তাহার পত্নী-অভিমান, তাহার দুহিতৃসম্ভ্রম, তাহার আত্মমর্যাদা, চূর্ণ হইয়া প্রিয় এবং অপ্রিয়, পরিচিত এবং অপরিচিত সকলের পদতলে ধূলির মতো লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। পূর্ব হইতে পরামর্শ করিয়া, ষড়যন্ত্রপূর্বক চাবি চুরি করিয়া, স্ত্রীর সাহায্যে রাতারাতি অর্থ অপহরণপূর্বক অনাথবন্ধু বিলাতে পলায়ন করিয়াছে, এ কথা লইয়া আত্মীয়কুটুম্বপরিপূর্ণ বাড়িতে একটা ঢী ঢী পড়িয়া গেল। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ভুবন কমল এবং আরো অনেক স্বজন-প্রতিবেশী দাসদাসী সমস্ত শুনিয়াছিল। রুদ্ধদ্বার জামাতৃগৃহে উৎকণ্ঠিত কর্তাগৃহিণীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলেই কৌতুহলে এবং আশঙ্কায় ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছিল।

বিন্ধ্যবাসিনী কাহাকেও মুখ দেখাইল না। দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনাহারে বিছানায় পড়িয়া রহিল। তাহার সেই শোকে কেহ দুঃখ অনুভব করিল না। ষড়যন্ত্রকারিণীর দুষ্টবুদ্ধিতে সকলেই বিস্মিত হইল। সকলেই ভাবিল, বিন্ধ্যর চরিত্র এতদিন অবসরাভাবে অপ্রকাশিত ছিল। নিরানন্দ গৃহে পূজার উৎসব কোনো প্রকারে সম্পন্ন হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপমান এবং অবসাদে অবনত হইয়া বিন্ধ্য শ্বশুরবাড়ি ফিরিয়া আসিল। সেখানে পুত্রবিচ্ছেদকাতরা বিধবা শাশুড়ির সহিত পতিবিরহবিধুরা বধূর ঘনিষ্ঠতর যোগ স্থাপিত হইল। উভয়ে পরস্পর নিকটবর্তী হইয়া নীরব শোকের ছায়াতলে সুগভীর সহিষ্ণুতার সহিত সংসারের সমস্ত তুচ্ছতম কার্যগুলি পর্যন্ত স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। শাশুড়ি যে পরিমাণে কাছে আসিল পিতামাতা সেই পরিমাণে দূরে চলিয়া গেল। বিন্ধ্য মনে মনে অনুভব করিল, "শাশুড়ি দরিদ্র আমিও দরিদ্র, আমরা এক দুঃখবন্ধনে বদ্ধ। পিতামাতা ঐশ্বর্যশালী, তাঁহারা আমাদের অবস্থা হইতে অনেক দূরে।" একে দরিদ্র বলিয়া বিন্ধ্য তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক দূরবর্তী, তাহাতে আবার চুরি স্বীকার করিয়া সে আরো অনেক নীচে পড়িয়া গিয়াছে। স্নেহসম্পর্কের বন্ধন এত অধিক পার্থক্যভার বহন করিতে পারে কিনা কে জানে।

অনাথবন্ধু বিলাত গিয়া প্রথম প্রথম স্ত্রীকে রীতিমতো চিঠিপত্র লিখিতেন। কিন্তু, ক্রমেই চিঠি বিরল হইয়া আসিল এবং পত্রের মধ্যে একটা অবহেলার ভাব অলক্ষিত-ভাবে প্রকাশ হইতে লাগিল। তাঁহার অশিক্ষিতা গৃহকার্যরতা স্ত্রীর অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধি রূপগুণ সর্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠতর অনেক ইংরাজকন্যা অনাথবন্ধুকে সুযোগ্য সুবুদ্ধি এবং সুরূপ বলিয়া সমাদর করিত; এমন অবস্থায় অনাথবন্ধু আপনার একবস্ত্রপরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী অগৌরবর্ণা স্ত্রীকে কোনো অংশেই আপনার সমযোগ্য জ্ঞান করিবেন না, ইহা বিচিত্র নহে।

কিন্তু, তথাপি যখন অর্থের অনটন হইল তখন এই নিরুপায় বাঙালির মেয়েকেই টেলিগ্রাফ করিতে তাঁহার সংকোচ বোধ হইল না। এবং এই বাঙালির মেয়েই দুই হাতে কেবল দুইগাছি কাঁচের চুড়ি রাখিয়া গায়ের সমস্ত গহনা বেচিয়া টাকা পাঠাইতে লাগিল। পাড়াগাঁয়ে নিরাপদে রক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান নাই বলিয়া তাহার সমস্ত বহুমূল্য গহনাগুলি পিতৃগৃহে ছিল। স্বামীর কুটুম্বভবনে নিমন্ত্রণে যাইবার ছল করিয়া নানা উপলক্ষে বিন্ধ্যবাসিনী একে একে সকল গহনাই আনাইয়া লইল। অবশেষে

হাতের বালা, রুপার চুড়ি, বেনারসি শাড়ি এবং শাল পর্যন্ত বিক্রয় শেষ করিয়া বিস্তর বিনীত অনুনয়পূর্বক মাথার দিব্য দিয়া অশ্রুজলে পত্রের প্রত্যেক অক্ষর পংক্তি বিকৃত করিয়া বিন্ধ্য স্বামীকে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিল।

স্বামী চুল খাটো করিয়া, দাড়ি কামাইয়া কোট্‌প্যান্ট্‌লুন্ পরিয়া, ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং হোটেলে আশ্রয় লইলেন। পিতৃগৃহে বাস করা অসম্ভব— প্রথমত উপযুক্ত স্থান নাই, দ্বিতীয়ত পল্লীবাসী দরিদ্র গৃহস্থ জাতি নষ্ট হইলে একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়ে। শ্বশুরগণ আচারনিষ্ঠ পরম হিন্দু, তাঁহারাও জাতিচ্যুতকে আশ্রয় দিতে পারেন না।

অর্থাভাবে অতি শীঘ্রই হোটেল হইতে বাসায় নামিতে হইল। সে বাসায় তিনি স্ত্রীকে আনিতে প্রস্তুত নহেন। বিলাত হইতে আসিয়া স্ত্রী এবং মাতার সহিত কেবল দিন দুই-তিন দিনের বেলায় দেখা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

দুইটি শোকার্তা রমণীর কেবল এক সান্ত্বনা ছিল যে, অনাথবন্ধু স্বদেশে আত্মীয়বর্গের নিকটবর্তী স্থানে আছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে অনাথবন্ধুর অসামান্য ব্যারিস্টারি কীর্তিতে তাহাদের মনে গর্বের সীমা রহিল না। বিন্ধ্যবাসিনী আপনাকে যশস্বী স্বামীর অযোগ্য স্ত্রী বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিল, পুনশ্চ অযোগ্য বলিয়াই স্বামীর অহংকার অধিক করিয়া অনুভব করিল। সে দুঃখে পীড়িত এবং গর্বে বিস্ফারিত হইল। ম্লেচ্ছ আচার সে ঘৃণা করে, তবু স্বামীকে দেখিয়া মনে মনে কহিল, "আজকাল ঢের লোক তো সাহেব হয়, কিন্তু এমন তো কাহাকেও মানায় না— একেবারে ঠিক যেন বিলাতি সাহেব! বাঙালি বলিয়া চিনিবার যো নাই!"

বাসাখরচ যখন অচল হইয়া আসিল; যখন অনাথবন্ধু মনের ক্ষোভে স্থির করিলেন, অভিশপ্ত ভারতবর্ষে গুণের সমাদর নাই এবং তাঁহার স্বব্যবসায়ীগণ ঈর্ষাবশত তাঁহার উন্নতিপথে গোপনে বাধা স্থাপন করিতেছে; যখন তাঁহার খানার ডিশে আমিষ অপেক্ষা উদ্ভিজ্জের পরিমাণ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, দগ্ধকুক্কুটের সম্মানকর স্থান ভর্জিত চিংড়ি একচেটে করিবার উপক্রম করিল, বেশভূষার চিক্কণতা এবং ক্ষৌরমসৃণ মুখের গর্বোজ্জ্বল জ্যোতি ম্লান হইয়া আসিল; যখন সুতীব্র নিখাদে-বাঁধা জীবনতন্ত্রী ক্রমশ সকরুণ কড়ি মধ্যমের দিকে নামিয়া আসিতে লাগিল— এমন সময় রাজকুমার বাবুর পরিবারে এক গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিয়া অনাথবন্ধুর সংকটসংকুল জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনয়ন করিল। একদা গঙ্গাতীরবর্তী মাতুলালয় হইতে নৌকাযোগে ফিরিবার সময় রাজকুমার বাবুর একমাত্র পুত্র হরকুমার স্টিমারের সংঘাতে স্ত্রী এবং বালক পুত্র সহ জলমগ্ন হইয়া

প্রাণত্যাগ করে। এই ঘটনায় রাজকুমারের বংশে কন্যা বিন্ধ্যবাসিনী ব্যতীত আর কেহ রহিল না।

নিদারুণ শোকের কথঞ্চিৎ উপশম হইলে পরে রাজকুমার বাবু অনাথবন্ধুকে গিয়া অনুনয় করিয়া কহিলেন, "বাবা, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে হইবে। তোমরা ব্যতীত আমার আর কেহ নাই।"

অনাথবন্ধু উৎসাহসহকারে সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি মনে করিলেন, যে সকল বার্‌-লাইব্রেরি-বিহারী স্বদেশীয় ব্যারিস্টারগণ তাঁহাকে ঈর্ষা করে এবং তাঁহার অসামান্য ধীশক্তির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রকাশ করে না, এই উপায়ে তাহাদের প্রতি প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

রাজকুমার বাবু পণ্ডিতদিগের বিধান লইলেন। তাঁহারা বলিলেন, অনাথবন্ধু যদি গোমাংস না খাইয়া থাকে তবে তাহাকে জাতে তুলিবার উপায় আছে।

বিদেশে যদিচ উক্ত নিষিদ্ধ চতুষ্পদ তাঁহার প্রিয় খাদ্যশ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত হইত, তথাপি তাহা অস্বীকার করিতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না। প্রিয় বন্ধুদের নিকট কহিলেন, "সমাজ যখন স্বেচ্ছাপূর্বক মিথ্যা কথা শুনিতে চাহে তখন একটা মুখের কথায় তাহাকে বাধিত করিতে দোষ দেখি না। যে রসনা গোরু খাইয়াছে সে রসনাকে গোময় এবং মিথ্যা কথা নামক দুটো কদর্য পদার্থ দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া আমাদের আধুনিক সমাজের নিয়ম; আমি সে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে চাহি না।"

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিবার একটা শুভদিন নির্দিষ্ট হইল। ইতিমধ্যে অনাথবন্ধু কেবল যে ধুতিচাদর পরিলেন তাহা নহে, তর্ক এবং উপদেশের দ্বারা বিলাতি সমাজের গালে কালি এবং হিন্দুসমাজের গালে চুন লেপন করিতে লাগিলেন। যে শুনিল সকলেই খুশি হইয়া উঠিল।

আনন্দে গর্বে বিন্ধ্যবাসিনীর প্রীতিসুধাসিক্ত কোমল হৃদয়টি সর্বত্র উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। সে মনে মনে কহিল, "বিলাত হইতে যিনিই আসেন একেবারে আস্ত বিলাতি সাহেব হইয়া আসেন, দেখিয়া বাঙালি বলিয়া চিনিবার যো থাকে না, কিন্তু আমার স্বামী একেবারে অবিকৃতভাবে ফিরিয়াছেন বরঞ্চ তাঁহার হিন্দুধর্মে ভক্তি পূর্বাপেক্ষা আরো অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে।"

যথানির্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণপণ্ডিতে রাজকুমার বাবুর ঘর ভরিয়া গেল। অর্থব্যয়ের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। আহার এবং বিদায়ের আয়োজন যথোচিত হইয়াছিল।

অন্তঃপুরেও সমারোহের সীমা ছিল না। নিমন্ত্রিত পরিজনবর্গের পরিবেশন ও পরিচর্যায় সমস্ত প্রকোষ্ঠ ও প্রাঙ্গণ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ঘোরতর কোলাহল

এবং কর্মরাশির মধ্যে বিন্ধ্যবাসিনী প্রফুল্লমুখে শারদরৌদ্ররঞ্জিত প্রভাতবায়ুবাহিত লঘু মেঘখণ্ডের মতো আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। আজিকার দিনের সমস্ত বিশ্বব্যাপারের প্রধান নায়ক তাহার স্বামী। আজ যেন সমস্ত বঙ্গভূমি একটি মাত্র রঙ্গভূমি হইয়াছে এবং যবনিকা উদ্‌ঘাটনপূর্বক একমাত্র অনাথবন্ধুকে বিস্মিত বিশ্বদর্শকের নিকট প্রদর্শন করাইতেছে। প্রায়শ্চিত্ত যে অপরাধস্বীকার তাহা নহে, এ যেন অনুগ্রহপ্রকাশ। অনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া হিন্দুসমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। এবং সেই গৌরবচ্ছটা সমস্ত দেশ হইতে সহস্র রশ্মিতে বিচ্ছুরিত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনীর প্রেমপ্রমুদিত মুখের উপরে অপরূপ মহিমাজ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। এতদিনকার তুচ্ছ জীবনের সমস্ত দুঃখ এবং ক্ষুদ্র অপমান দূর হইয়া সে আজ তাহার পরিপূর্ণ পিতৃগৃহে সমস্ত আত্মীয়স্বজনের সমক্ষে উন্নতমস্তকে গৌরবের আসনে আরোহণ করিল। স্বামীর মহত্ত্ব আজ অযোগ্য স্ত্রীকে বিশ্বসংসারের নিকট সম্মানাস্পদ করিয়া তুলিল।

অনুষ্ঠান সমাধা হইয়াছে। অনাথবন্ধু জাতে উঠিয়াছেন। অভ্যাগত আত্মীয় ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়া তৃপ্তিপূর্বক আহার শেষ করিয়াছেন।

আত্মীয়েরা জামাতাকে দেখিবার জন্য অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জামাতা সুস্থচিত্তে তাম্বূল চর্বণ করিতে করিতে প্রসন্নহাস্যমুখে আলস্যমন্থরগমনে ভূমিলুণ্ঠ্যমান চাদরে অন্তঃপুরে যাত্রা করিলেন।

আহারান্তে ব্রাহ্মণগণের দক্ষিণার আয়োজন হইতেছে এবং ইত্যবসরে তাঁহারা সভাস্থলে বসিয়া তুমুল কলহসহকারে পাণ্ডিত্য বিস্তার করিতেছেন। কর্তা রাজকুমার বাবু ক্ষণকাল বিশ্রাম উপলক্ষে সেই কোলাহলাকুল পণ্ডিতসভায় বসিয়া স্মৃতির তর্ক শুনিতেছেন, এমন সময় দ্বারবান গৃহস্বামীর হস্তে এক কার্ড দিয়া খবর দিল, "এক সাহেবলোগ্ কা মেম আয়া।"

রাজকুমার বাবু চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই কার্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাহাতে ইংরাজিতে লেখা রহিয়াছে—মিসেস্ অনাথবন্ধু সরকার। অর্থাৎ, অনাথবন্ধু সরকারের স্ত্রী।

রাজকুমার বাবু অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কিছুতেই এই সামান্য একটি শব্দের অর্থগ্রহ করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে বিলাত হইতে সদ্যঃপ্রত্যাগতা আরক্তকপোলা আতাম্রকুন্তলা আনীললোচনা দুগ্ধফেনশুভ্রা হরিণলঘুগামিনী ইংরাজমহিলা স্বয়ং সভাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিচিত প্রিয়মুখ দেখিতে পাইলেন না। অকস্মাৎ মেমকে দেখিয়া সংহিতার সমস্ত তর্ক থামিয়া সভাস্থল শ্মশানের ন্যায় গভীর নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

এমন সময়ে ভূমিলুণ্ঠ্যমান চাদর লইয়া অলসমন্থরগামী অনাথবন্ধু রঙ্গভূমিতে আসিয়া পুনঃপ্রবেশ করিলেন। এবং মুহূর্তের মধ্যেই ইংরাজমহিলা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া তাঁহার তাম্বূলরাগরক্ত ওষ্ঠাধরে দাম্পত্যের মিলনচুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

সেদিন সভাস্থলে সংহিতার তর্ক আর উত্থাপিত হইতে পারিল না।

অগ্রহায়ণ ১৩০১

বিচারক

প্রথম পরিচ্ছেদ

অনেক অবস্থান্তরের পর অবশেষে গতযৌবনা ক্ষীরোদা যে পুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল সেও যখন তাহাকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেল, তখন অন্নমুষ্টির জন্য দ্বিতীয় আশ্রয় অন্বেষণের চেষ্টা করিতে তাহার অত্যন্ত ধিক্‌কার বোধ হইল।

যৌবনের শেষে শুভ্র শরৎকালের ন্যায় একটি গভীর প্রশান্ত প্রগাঢ় সুন্দর বয়স আসে যখন জীবনের ফল ফলিবার এবং শস্য পাকিবার সময়। তখন আর উদ্দাম যৌবনের বসন্তচঞ্চলতা শোভা পায় না। ততদিনে সংসারের মাঝখানে আমাদের ঘর বাঁধা একপ্রকার সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে; অনেক ভালোমন্দ, অনেক সুখদুঃখ, জীবনের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া অন্তরের মানুষটিকে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে; আমাদের আয়ত্তের অতীত কুহকিনী দুরাশার কল্পনালোক হইতে সমস্ত উদ্‌ভ্রান্ত বাসনাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতার গৃহপ্রাচীরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; তখন নূতন প্রণয়ের মুগ্ধদৃষ্টি আর আকর্ষণ করা যায় না, কিন্তু পুরাতন লোকের কাছে মানুষ আরো প্রিয়তর হইয়া উঠে। তখন যৌবনলাবণ্য অল্পে অল্পে বিশীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে, কিন্তু জরাবিহীন অন্তরপ্রকৃতি বহুকালের সহবাসক্রমে মুখে চক্ষে যেন স্ফুটতর রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়, হাসিটি দৃষ্টিপাতটি কণ্ঠস্বরটি ভিতরকার মানুষটির দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া উঠে। যাহা কিছু পাই নাই তাহার আশা ছাড়িয়া, যাহারা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য শোক সমাপ্ত করিয়া, যাহারা বঞ্চনা করিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া— যাহারা কাছে আসিয়াছে, ভালোবাসিয়াছে, সংসারের সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা শোকতাপ বিচ্ছেদের মধ্যে যে কয়টি প্রাণী নিকটে অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহাদিগকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সুনিশ্চিত সুপরীক্ষিত

চিরপরিচিতগণের প্রীতিপরিবেষ্টনের মধ্যে নিরাপদ নীড় রচনা করিয়া তাহারই মধ্যে সমস্ত চেষ্টার অবসান এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়। যৌবনের সেই স্নিগ্ধ সায়াহ্নে জীবনের সেই শান্তিপর্বেও যাহাকে নূতন সঞ্চয়, নূতন পরিচয়, নূতন বন্ধনের বৃথা আশ্বাসে নূতন চেষ্টায় ধাবিত হইতে হয়— তখনো যাহার বিশ্রামের জন্য শয্যা রচিত হয় নাই, যাহার গৃহপ্রত্যাবর্তনের জন্য সন্ধ্যাদীপ প্রজ্জলিত হয় নাই, সংসারে তাহার মতো শোচনীয় আর কেহ নাই।

ক্ষীরোদা তাহার যৌবনের প্রান্তসীমায় যেদিন প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার প্রণয়ী পূর্বরাত্রে তাহার সমস্ত অলংকার ও অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, বাড়িভাড়া দিবে এমন সঞ্চয় নাই— তিন বৎসরের শিশু পুত্রটিকে দুধ আনিয়া খাওয়াইবে এমন সংগতি নাই— যখন সে ভাবিয়া দেখিল, তাহার জীবনের আটত্রিশ বৎসরে সে একটি লোককেও আপনার করিতে পারে নাই, একটি ঘরের প্রান্তেও বাঁচিবার ও মরিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই; যখন তাহার মনে পড়িল, আবার আজ অশ্রুজল মুছিয়া দুই চক্ষে অঞ্জন পরিতে হইবে, অধরে ও কপোলে অলক্তরাগ চিত্রিত করিতে হইবে, জীর্ণ যৌবনকে বিচিত্র ছলনায় আচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে অসীম ধৈর্য সহকারে নূতন হৃদয় হরণের জন্য নূতন মায়াপাশ বিস্তার করিতে হইবে; তখন সে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া বারংবার কঠিন মেঝের উপর মাথা খুঁড়িতে লাগিল— সমস্ত দিন অনাহারে মুমূর্ষুর মতো পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দীপহীন গৃহকোণে অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। দৈবক্রমে একজন পুরাতন প্রণয়ী আসিয়া 'ক্ষীরো ক্ষীরো' শব্দে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। ক্ষীরোদা অকস্মাৎ দ্বার খুলিয়া ঝাঁটাহস্তে বাঘিনীর মতো গর্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল; রসপিপাসু যুবকটি অনতিবিলম্বে পলায়নের পথ অবলম্বন করিল।

ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া খাটের নীচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেই গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারের মধ্য হইতে ভগ্নকাতর কণ্ঠে 'মা মা' করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন ক্ষীরোদা সেই রোরুদ্যমান শিশুকে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটিয়া নিকটবর্তী কূপের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শব্দ শুনিয়া আলো হস্তে প্রতিবেশীগণ কূপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষীরোদা এবং শিশুকে তুলিতে বিলম্ব হইল না। ক্ষীরোদা তখন অচেতন এবং শিশুটি মরিয়া গেছে।

হাঁসপাতালে গিয়া ক্ষীরোদা আরোগ্য লাভ করিল। হত্যাপরাধে ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে সেসনে চালান করিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জজ মোহিতমোহন দত্ত স্ট্যাটুটরি সিভিলিয়ান। তাঁহার কঠিন বিচারে ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম হইল। হতভাগিনীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া উকিলগণ তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইলেন না। জজ তাহাকে তিলমাত্র দয়ার পাত্রী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।

না পারিবার কারণ আছে; একদিকে তিনি হিন্দুমহিলাগণকে দেবী আখ্যা দিয়া থাকেন, অপরদিকে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অবিশ্বাস। তাঁহার মত এই যে, রমণীগণ কুলবন্ধন ছেদন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, শাসন তিলমাত্র শিথিল হইলেই সমাজপিঞ্জরে একটি কুলনারীও অবশিষ্ট থাকিবে না।

তাঁহার এরূপ বিশ্বাসেরও কারণ আছে। সে কারণ জানিতে গেলে মোহিতের যৌবন-ইতিহাসের কিয়দংশ আলোচনা করিতে হয়।

মোহিত যখন কালেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়িতেন তখন আকারে এবং আচারে এখনকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের মানুষ ছিলেন। এখন মোহিতের সম্মুখে টাক, পশ্চাতে টিকি, মুণ্ডিত মুখে প্রতিদিন প্রাতঃকালে খরক্ষুরধারে গুম্ফশ্মশ্রুর অঙ্কুর উচ্ছেদ হইয়া থাকে; কিন্তু তখন তিনি সোনার চশমার গোঁফদাড়িতে এবং সাহেবি ধরনের কেশবিন্যাসে উনবিংশ শতাব্দীর নূতনসংস্করণ কার্তিকটির মতো ছিলেন। বেশভূষায় বিশেষ মনোযোগ ছিল, মদ্যমাংসে অরুচি ছিল না এবং আনুষঙ্গিক আরো দুটো-একটা উপসর্গ ছিল।

অদূরে একঘর গৃহস্থ বাস করিত। তাহাদের হেমশশী বলিয়া এক বিধবা কন্যা ছিল। তাহার বয়স অধিক হইবে না। চৌদ্দ হইতে পনেরোয় পড়িবে।

সমুদ্র হইতে বনরাজিনীলা তটভূমি যেমন রমণীয় স্বপ্নবৎ চিত্রবৎ মনে হয় এমন তীরের উপর উঠিয়া হয় না। বৈধব্যের বেষ্টন-অন্তরালে হেমশশী সংসার হইতে যেটুকু দূরে পড়িয়াছিল সেই দূরত্বের বিচ্ছেদবশত সংসারটা অহার কাছে পরপারবর্তী পরমরহস্যময় প্রমোদবনের মতো ঠেকিত। সে জানিত না এই জগৎ-যন্ত্রটার কল-কারখানা অত্যন্ত জটিল এবং লৌহকঠিন— সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সংশয়ে সংকটে ও নৈরাশ্যে পরিতাপে বিমিশ্রিত। তাহার মনে হইত, সংসারযাত্রা কলনাদিনী নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ জলপ্রবাহের মতো সহজ, সম্মুখবর্তী সুন্দর পৃথিবীর সকল পথগুলিই প্রশস্ত ও সরল, সুখ কেবল তাহার বাতায়নের বাহিরে এবং তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষা কেবল তাহার বক্ষপঞ্জরবর্তী স্পন্দিত পরিতপ্ত কোমল হৃদয়টুকুর অভ্যন্তরে। বিশেষত, তখন তাহার

অন্তরাকাশের দূর দিগন্ত হইতে একটা যৌবনসমীরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশ্বসংসারকে বিচিত্র বাসন্তী শ্রীতে বিভূষিত করিয়া দিয়াছিল ; সমস্ত নীলাম্বর তাহারই হৃদয়হিল্লোলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং পৃথিবী যেন তাহারই সুগন্ধ মর্মকোষের চতুর্দিকে রক্তপদ্মের কোমল পাপড়িগুলির মতো স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া ছিল।

ঘরে তাহার বাপ মা এবং দুটি ছোটো ভাই ছাড়া আর কেহ ছিল না। ভাই দুটি সকাল সকাল খাইয়া ইস্কুলে যাইত, আবার ইস্কুল হইতে আসিয়া আহারান্তে সন্ধ্যার পর পাড়ার নাইট-ইস্কুলে পাঠ অভ্যাস করিতে গমন করিত। বাপ সামান্য বেতন পাইতেন, ঘরে মাস্টার রাখিবার সামর্থ্য ছিল না।

কাজের অবসরে হেম তাহার নির্জন ঘরের বাতায়নে আসিয়া বসিত। একদৃষ্টে রাজপথের লোকচলাচল দেখিত ; ফেরিওয়ালা করুণ উচ্চস্বরে হাঁকিয়া যাইত, তাহাই শুনিত ; এবং মনে করিত পথিকেরা সুখী, ভিক্ষুকেরাও স্বাধীন, এবং ফেরিওয়ালা যে জীবিকার জন্য সুকঠিন প্রয়াসে প্রবৃত্ত তাহা নহে— উহারা যেন এই লোকচলাচলের সুখরঙ্গভূমিতে অন্যতম অভিনেতা মাত্র।

আর, সকালে বিকালে সন্ধ্যাবেলায় পরিপাটি-বেশধারী গর্বোদ্ধত স্ফীতবক্ষ মোহিতমোহনকে দেখিতে পাইত। দেখিয়া তাহাকে সর্বসৌভাগ্যসম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রের মতো মনে হইত। মনে হইত, ঐ উন্নতমস্তক সুবেশ সুন্দর যুবকটির সব আছে এবং উহাকে সব দেওয়া যাইতে পারে। বালিকা যেমন পুতুলকে সজীব মানুষ করিয়া খেলা করে, বিধবা তেমনি মোহিতকে মনে মনে সকল প্রকার মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তাহাকে দেবতা গড়িয়া খেলা করিত।

এক-একদিন সন্ধ্যার সময় দেখিতে পাইত, মোহিতের ঘর আলোকে উজ্জ্বল, নর্তকীর নূপুরনিক্বণ এবং বামাকণ্ঠের সংগীতধ্বনিতে মুখরিত। সেদিন সে ভিত্তিস্থিত চঞ্চল ছায়াগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিনিদ্র সতৃষ্ণ নেত্রে দীর্ঘ রাত্রি জাগিয়া বসিয়া কাটাইত। তাহার ব্যথিত পীড়িত হৃৎপিণ্ড পিঞ্জরের পক্ষীর মতো বক্ষপঞ্জরের উপর দুর্দান্ত আবেগে আঘাত করিতে থাকিত।

সে কি তাহার কৃত্রিম দেবতাটিকে বিলাসমত্ততার জন্য মনে মনে ভর্ৎসনা করিত, নিন্দা করিত ? তাহা নহে। অগ্নি যেমন পতঙ্গকে নক্ষত্রলোকের প্রলোভন দেখাইয়া আকর্ষণ করে, মোহিতের সেই আলোকিত গীতবাদ্যবিক্ষুব্ধ প্রমোদমদিরোচ্ছ্বসিত কক্ষটি হেমশশীকে সেইরূপ স্বর্গমরীচিকা দেখাইয়া আকর্ষণ করিত। সে গভীর রাত্রে একাকিনী জাগিয়া বসিয়া সেই অদূর বাতায়নের আলোক ও ছায়া ও সংগীত এবং আপন মনের আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা লইয়া একটি মায়ারাজ্য গড়িয়া তুলিত, এবং আপন মানস-

পুত্তলিকাকে সেই মায়াপুরীর মাঝখানে বসাইয়া বিস্মিত বিমুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিত, এবং আপন জীবন-যৌবন সুখ-দুঃখ ইহকাল-পরকাল সমস্তই বাসনার অঙ্গারে ধূপের মতো পুড়াইয়া সেই নির্জন নিস্তব্ধ মন্দিরে তাহার পূজা করিত। সে জানিত না তাহার সম্মুখবর্তী ঐ হর্ম্যবাতায়নের অভ্যন্তরে ঐ তরঙ্গিত প্রমোদপ্রবাহের মধ্যে এক নিরতিশয় ক্লান্তি গ্লানি পঙ্কিলতা বীভৎস ক্ষুধা এবং প্রাণক্ষয়কর দাহ আছে। ঐ বীতনিদ্র নিশাচর আলোকের মধ্যে যে এক হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কুটিলহাস্য প্রলয়ক্রীড়া করিতে থাকে, বিধবা দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইত না।

হেম আপন নির্জন বাতায়নে বসিয়া তাহার এই মায়াস্বর্গ এবং কল্পিত দেবতাটিকে লইয়া চিরজীবন স্বপ্নাবেশে কাটাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেবতা অনুগ্রহ করিলেন এবং স্বর্গ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। স্বর্গ যখন একেবারে পৃথিবীকে আসিয়া স্পর্শ করিল তখন স্বর্গও ভাঙিয়া গেল এবং যে ব্যক্তি এতদিন একলা বসিয়া স্বর্গ গড়িয়াছিল সেও ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইল।

এই বাতায়নবাসিনী মুগ্ধ বালিকাটির প্রতি কখন মোহিতের লালায়িত দৃষ্টি পড়িল, কখন তাহাকে 'বিনোদচন্দ্র' নামক মিথ্যা স্বাক্ষরে বারংবার পত্র লিখিয়া অবশেষে একখানি সশঙ্ক উৎকণ্ঠিত অশুদ্ধ বানান ও উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগপূর্ণ উত্তর পাইল, এবং তাহার পর কিছুদিন ঘাতপ্রতিঘাতে উল্লাসে-সংকোচে সন্দেহে সম্ভ্রমে আশায়-আশঙ্কায় কেমন করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল, তাহার পরে প্রলয়সুখোন্মত্ততায় সমস্ত জগৎ সংসার বিধবার চারি দিকে কেমন করিয়া ঘুরিতে লাগিল, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে ঘূর্ণনবেগে সমস্ত জগৎ অমূলক ছায়ার মতো কেমন করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল, এবং অবশেষে কখন একদিন অকস্মাৎ সেই ঘূর্ণ্যমান সংসারচক্র হইতে বেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া রমণী অতি দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, সে সকল বিবরণ বিস্তারিত করিয়া বলিবার আবশ্যক দেখি না।

একদিন গভীর রাত্রে পিতা মাতা ভ্রাতা এবং গৃহ ছাড়িয়া হেমশশী বিনোদচন্দ্র-ছদ্মনামধারী মোহিতের সহিত এক গাড়িতে উঠিয়া বসিল। দেবপ্রতিমা যখন তাহার সমস্ত মাটি এবং খড় এবং রাংতার গহনা লইয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইল তখন সে লজ্জায় ধিক্কারে মাটিতে মিশিয়া গেল।

অবশেষে গাড়ি যখন ছাড়িয়া দিল তখন সে কাঁদিয়া মোহিতের পায়ে ধরিল, বলিল, "ওগো, পায়ে পড়ি আমাকে আমার বাড়ি রেখে এসো।" মোহিত শশব্যস্ত হইয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল; গাড়ি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

জলনিমগ্ন মরণাপন্ন ব্যক্তির যেমন মুহূর্তের মধ্যে জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী স্পষ্ট মনে পড়ে, তেমনি সেই দ্বাররুদ্ধ গাড়ির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে হেমশশীর মনে পড়িতে লাগিল,

প্রতিদিন আহারের সময় তাহার বাপ তাহাকে সম্মুখে না লইয়া খাইতে বসিতেন না; মনে পড়িল, তাহার সর্বকনিষ্ঠ ভাইটি ইস্কুল হইতে আসিয়া তাহার দিদির হাতে খাইতে ভালোবাসে; মনে পড়িল, সকালে সে তাহার মায়ের সহিত পান সাজিতে বসিত এবং বিকালে মা তাহার চুল বাঁধিয়া দিতেন। ঘরের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কোণ এবং দিনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজটি তাহার মনের সম্মুখে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তাহার নিভৃত জীবন এবং ক্ষুদ্র সংসারটিকেই স্বর্গ বলিয়া মনে হইল। সেই পানসাজা, চুলবাঁধা, পিতার আহারস্থলে পাখা-করা, ছুটির দিনে মধ্যাহ্ননিদ্রার সময় তাঁহার পাকাচুল তুলিয়া দেওয়া, ভাইদের দৌরাত্ম্য সহ্য করা— এ সমস্তই তাহার কাছে পরম শান্তিপূর্ণ দুর্লভ সুখের মতো বোধ হইতে লাগিল; বুঝিতে পারিল না, এসব থাকিতে সংসারে আর কোন্ সুখের আবশ্যক আছে।

মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীতে ঘরে ঘরে সমস্ত কুলকন্যারা এখন গভীর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। সেই আপনার ঘরে আপনার শয্যাটির মধ্যে নিস্তব্ধ রাত্রের নিশ্চিন্ত নিদ্রা যে কত সুখের, তাহা ইতিপূর্বে কেন সে বুঝিতে পারে নাই। ঘরের মেয়েরা কাল সকাল-বেলায় ঘরের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে, নিঃসংকোচ নিত্যকর্মের মধ্যে প্রবৃত্ত হইবে, আর গৃহচ্যুতা হেমশশীর এই নিদ্রাহীন রাত্রি কোনখানে গিয়া প্রভাত হইবে এবং সেই নিরানন্দ প্রভাতে তাহাদের সেই গলির ধারের ছোটোখাটো ঘরকন্নাটির উপর যখন সকালবেলাকার চিরপরিচিত শান্তিময় হাস্যপূর্ণ রৌদ্রটি আসিয়া পতিত হইবে তখন সেখানে সহসা কী লজ্জা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে— কী লাঞ্ছনা, কী হাহাকার জাগ্রত হইয়া উঠিবে!

হেম হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া মরিতে লাগিল; সকরুণ অনুনয়সহকারে বলিতে লাগিল, "এখনো রাত আছে। আমার মা, আমার দুটি ভাই, এখনো জাগে নাই; এখনো আমাকে ফিরাইয়া রাখিয়া আইস।" কিন্তু, তাহার দেবতা কর্ণপাত করিল না; এক দ্বিতীয় শ্রেণীর চক্রশব্দমুখরিত রথে চড়াইয়া তাহাকে তাহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গলোকাভিমুখে লইয়া চলিল।

ইহার অনতিকাল পরেই দেবতা এবং স্বর্গ পুনশ্চ আর-একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর জীর্ণরথে চড়িয়া আর-এক পথে প্রস্থান করিলেন— রমণী আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহিতমোহনের পূর্ব ইতিহাস হইতে এই একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলাম। রচনা পাছে 'একঘেয়ে' হইয়া উঠে এইজন্য অন্যগুলি বলিলাম না।

এখন সে-সকল পুরাতন কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যকও নাই। এখন সেই বিনোদচন্দ্র নাম স্মরণ করিয়া রাখে, এমন কোনো লোক জগতে আছে কিনা সন্দেহ। এখন মোহিত শুদ্ধাচারী হইয়াছেন, তিনি আহ্নিকতর্পণ করেন এবং সর্বদাই শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন। নিজের ছোটো ছোটো ছেলেদিগকেও যোগাভ্যাস করাইতেছেন এবং বাড়ির মেয়েদিগকে সূর্য চন্দ্র মরুদ্গণের দুষ্প্রবেশ্য অন্তঃপুরে প্রবল শাসনে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু, এককালে তিনি একাধিক রমণীর প্রতি অপরাধ করিয়াছিলেন বলিয়া আজ রমণীর সর্বপ্রকার সামাজিক অপরাধের কঠিনতম দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন।

ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম দেওয়ার দুই-এক দিন পরে ভোজনবিলাসী মোহিত জেলখানার বাগান হইতে মনোমতো তরিতরকারি সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন। ক্ষীরোদা তাহার পতিত জীবনের সমস্ত অপরাধ স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে কি না জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইল। বন্দিনীশালায় প্রবেশ করিলেন।

দূর হইতে খুব একটা কলহের ধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন ক্ষীরোদা প্রহরীর সহিত ভারি ঝগড়া বাধাইয়াছে। মোহিত মনে মনে হাসিলেন; ভাবিলেন, স্ত্রীলোকের স্বভাবই এমনি বটে! মৃত্যু সন্নিকট তবু ঝগড়া করিতে ছাড়িবে না। ইহারা বোধ করি যমালয়ে গিয়া যমদূতের সহিত কোন্দল করে।

মোহিত ভাবিলেন, যথোচিত ভর্ৎসনা ও উপদেশের দ্বারা এখনো ইহার অন্তরে অনুতাপের উদ্রেক করা উচিত। সেই সাধু উদ্দেশ্যে তিনি ক্ষীরোদার নিকটবর্তী হইবামাত্র ক্ষীরোদা সকরুণস্বরে করজোড়ে কহিল, "ওগো জজ্‌বাবু, দোহাই তোমার! উহাকে বলো, আমার আংটি ফিরাইয়া দেয়।"

প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, ক্ষীরোদার মাথার চুলের মধ্যে একটি আংটি লুকানো ছিল— দৈবাৎ প্রহরীর চোখে পড়াতে সে সেটি কাড়িয়া লইয়াছে।

মোহিত আবার মনে মনে হাসিলেন। আজ বাদে কাল ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করিবে, তবু আংটির মায়া ছাড়িতে পারে না; গহনাই মেয়েদের সর্বস্ব!

প্রহরীকে কহিলেন, "কই, আংটি দেখি।" প্রহরী তাঁহার হাতে আংটি দিল।

তিনি হঠাৎ যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে লইলেন, এমনি চমকিয়া উঠিলেন। আংটির

একদিকে হাতির দাঁতের উপর তেলের রঙে আঁকা একটি গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত যুবকের অতি ক্ষুদ্র ছবি বসানো আছে এবং অপরদিকে সোনার গায়ে খোদা রহিয়াছে— বিনোদচন্দ্র।

তখন মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিলেন। চব্বিশ বৎসর পূর্বেকার আর-একটি অশ্রুসজল প্রীতিসুকোমল সলজ্জশঙ্কিত মুখ মনে পড়িল; সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

মোহিত আর-একবার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

পৌষ ১৩০১

নিশীথে

"ডাক্তার! ডাক্তার!"

জ্বালাতন করিল! এই অর্ধেক রাত্রে—

চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরণ বাবু। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্‌বিগ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি, তখন রাত্রি আড়াইটা।

দক্ষিণাচরণ বাবু বিবর্ণমুখে বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন, "আজ রাত্রে আবার সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে— তোমার ঔষধ কোনো কাজে লাগিল না।"

আমি কিঞ্চিৎ সসংকোচে বলিলাম, "আপনি বোধ করি মদের মাত্রা আবার বাড়াইয়াছেন।"

দক্ষিণাচরণ বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ওটা তোমার ভারি ভ্রম। মদ নহে; আদ্যোপান্ত বিবরণ না শুনিলে তুমি আসল কারণটা অনুমান করিতে পারিবে না।"

কুলুঙ্গির মধ্যে ক্ষুদ্র টিনের ডিবায় ম্লানভাবে কেরোসিন জ্বলিতেছিল, আমি তাহা উস্কাইয়া দিলাম; একটুখানি আলো জাগিয়া উঠিল এবং অনেকখানি ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। কোঁচাখানা গায়ের উপর টানিয়া একখানা খবরের-কাগজ-পাতা প্যাক্‌বাক্সের উপর বসিলাম। দক্ষিণাচরণ বাবু বলিতে লাগিলেন—

আমার প্রথমপক্ষের স্ত্রীর মতো এমন গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল। কিন্তু আমার তখন বয়স বেশি ছিল না, সহজেই রসাধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভালো করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাই অবিমিশ্র গৃহিণীপণায় মন উঠিত না। কালিদাসের সেই শ্লোকটা প্রায় মনে উদয় হইত—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

কিন্তু আমার গৃহিণীর কাছে ললিত কলাবিধির কোনো উপদেশ খাটিত না এবং সখী-ভাবে প্রণয়সম্ভাষণ করিতে গেলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। গঙ্গার স্রোতে যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড়ো বড়ো কাব্যের টুকরা এবং ভালো ভালো আদরের সম্ভাষণ মুহূর্তের মধ্যে অপদস্থ হইয়া ভাসিয়া যাইত। তাঁহার হাসিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।

তাহার পর, আজ বছর চারেক হইল আমাকে সাংঘাতিক রোগে ধরিল। ওষ্ঠব্রণ হইয়া জ্বরবিকার হইয়া, মরিবার দাখিল হইলাম। বাঁচিবার আশা ছিল না। একদিন এমন হইল যে, ডাক্তারে জবাব দিয়া গেল। এমন সময় আমার এক আত্মীয় কোথা হইতে এক ব্রহ্মচারী আনিয়া উপস্থিত করিল; সে গব্য ঘৃতের সহিত একটা শিকড় বাঁটিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিল। ঔষধের গুণেই হউক বা অদৃষ্টক্রমেই হউক সে-যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।

রোগের সময় আমার স্ত্রী অহর্নিশি এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম করেন নাই। সেই কটা দিন একটি অবলা স্ত্রীলোক, মানুষের সামান্য শক্তি লইয়া প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত, দ্বারে সমাগত যমদূতগুলার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশুর মতো দুই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, জগতের আর-কোনো-কিছুর প্রতিই দৃষ্টি ছিল না।

যম তখন পরাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় আমাকে তাঁহার কবল হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু, যাইবার সময় আমার স্ত্রীকে একটা প্রবল থাবা মারিয়া গেলেন।

আমার স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন, অনতিকাল পরে এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার নানাপ্রকার জটিল ব্যামোর সূত্রপাত হইল। তখন আমি তাঁহার সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে তিনি বিব্রত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন, "আঃ, করো কী! লোকে বলিবে কী! অমন করিয়া দিনরাত্রি তুমি আমার ঘরে যাতায়াত করিয়ো না।"

যেন নিজে পাখা খাইতেছি, এইরূপ ভান করিয়া রাত্রে যদি তাঁহাকে তাঁহার জ্বরের সময় পাখা করিতে যাইতাম তো ভারি একটা কাড়াকাড়ি ব্যাপার পড়িয়া যাইত। কোনোদিন যদি তাঁহার শুশ্রূষা উপলক্ষে আমার আহারের নিয়মিত সময় দশ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া যাইত, তবে সেও নানাপ্রকার অনুনয় অনুরোধ অনুযোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। স্বল্পমাত্র সেবা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন, "পুরুষমানুষের অতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়।"

আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ির সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নীচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের মতো একটুকরা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যন্ত সাদাসিধা এবং নিতান্ত দিশি। অর্থাৎ, তাহার মধ্যে গন্ধের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র্য ছিল না, এবং টবের মধ্যে অকিঞ্চিৎকর উদ্ভিজ্জের পার্শ্বে কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নির্মিত লাটিন নামের জয়ধ্বজা উড়িত না। বেল, জুঁই, গোলাপ, গন্ধরাজ, করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশি। প্রকাণ্ড একটা বকুলগাছের তলা সাদা মার্বল পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া দুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত কিন্তু গঙ্গা হইতে কুঠির পানসির বাবুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।

অনেকদিন শয্যাগত থাকিয়া একদিন চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় তিনি কহিলেন, "ঘরে বন্ধ থাকিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে; আজ একবার আমার সেই বাগানে গিয়া বসিব।"

আমি তাঁহাকে বহু যত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই বকুলতলের প্রস্তরবেদিকায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলাম। আমারই জানুর উপরে তাঁহার মাথাটি তুলিয়া রাখিতে পারিতাম কিন্তু জানি, সেটাকে তিনি অদ্ভুত আচরণ বলিয়া গণ্য করিবেন, তাই একটি বালিশ আনিয়া তাঁহার মাথার তলায় রাখিলাম।

দুটি-একটি করিয়া প্রস্ফুট বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চারি দিক শান্ত নিস্তব্ধ; সেই ঘনগন্ধপূর্ণ ছায়ান্ধকারে একপার্শ্বে নীরবে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিল।

আমি ধীরে ধীরে কাছের গোড়ায় আসিয়া দুই হস্তে তাঁহার একটি উত্তপ্ত শীর্ণ হাত

তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোনো আপত্তি করিলেন না। কিছুক্ষণ এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হৃদয় কেমন উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিল, আমি বলিয়া উঠিলাম, "তোমার ভালোবাসা আমি কোনোকালে ভুলিব না।"

তখনি বুঝিলাম, কথাটা বলিবার কোনো আবশ্যক ছিল না। আমার স্ত্রী হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস ছিল এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদস্বরূপে একটি কথামাত্র না বলিয়া কেবল তাঁহার সেই হাসির দ্বারা জানাইলেন, "কোনোকালে ভুলিবে না, ইহা কখনো সম্ভব নহে এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।"

ঐ সুমিষ্ট সুতীক্ষ্ণ হাসির ভয়েই আমি কখনো আমার স্ত্রীর সঙ্গে রীতিমতো প্রেমালাপ করিতে সাহস করি নাই। অসাক্ষাতে যে-সকল কথা মনে উদয় হইত, তাঁহার সম্মুখে গেলেই সেগুলাকে নিতান্ত বাজে কথা বলিয়া বোধ হইত। ছাপার অক্ষরে যে-সব কথা পড়িলে দুই চক্ষু বাহিয়া দর দর ধারায় জল পড়িতে থাকে সেই-গুলা মুখে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্রেক করে, এ পর্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

বাদপ্রতিবাদ কথায় চলে কিন্তু হাসির উপরে তর্ক চলে না, কাজেই চুপ করিয়া যাইতে হইল। জ্যোৎস্না উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, একটা কোকিল ক্রমাগতই কুহু কুহু ডাকিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন জ্যোৎস্না-রাত্রেও কি পিকবধূ বধির হইয়া আছে।

বহু চিকিৎসায় আমার স্ত্রীর রোগ-উপশমের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার বলিল, "একবার বায়ু পরিবর্তন করিয়া দেখিলে ভালো হয়।" আমি স্ত্রীকে লইয়া এলাহাবাদে গেলাম।

এইখানে দক্ষিণাবাবু হঠাৎ থমকিয়া চুপ করিলেন। সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। কুলুঙ্গিতে কেরোসিন মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতে লাগিল এবং নিস্তব্ধ ঘরে মশার ভন্‌ভন্‌ শব্দ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণাবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন—

সেখানে হারান ডাক্তার আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে অনেককাল একভাবে কাটাইয়া ডাক্তারও বলিলেন, আমিও বুঝিলাম এবং আমার স্ত্রীও বুঝিলেন যে, তাঁহার ব্যামো সারিবার নহে। তাঁহাকে চিররুগ্ন হইয়াই কাটাইতে হইবে।

তখন একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন, "যখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীঘ্র আমার মরিবার আশাও নাই তখন আর-কতদিন এই জীবন্মৃতকে লইয়া কাটাইবে। তুমি আর-একটা বিবাহ করো।"

এটা যেন কেবল একটা সুযুক্তি এবং সদ্‌বিবেচনার কথা— ইহার মধ্যে যে, ভারি একটা মহত্ত্ব বীরত্ব বা অসামান্য কিছু আছে, এমন ভাব তাঁহার লেশমাত্র ছিল না।

এইবার আমার হাসিবার পালা ছিল। কিন্তু, আমার কি তেমন করিয়া হাসিবার ক্ষমতা আছে। আমি উপন্যাসের প্রধান নায়কের ন্যায় গম্ভীর সমুচ্চভাবে বলিতে লাগিলাম, "যতদিন এই দেহে জীবন আছে—"

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, "নাও নাও! আর বলিতে হইবে না। তোমার কথা শুনিয়া আমি আর বাঁচি না!"

আমি পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলিলাম, "এ জীবনে আর-কাহাকেও ভালো-বাসিতে পারিব না।"

শুনিয়া আমার স্ত্রী ভারি হাসিয়া উঠিলেন। তখন আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

জানি না, তখন নিজের কাছেও কখনো স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছি কি না কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি, এই আরোগ্য-আশাহীন সেবাকার্যে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম। এ কার্যে যে ভঙ্গ দিব, এমন কল্পনাও আমার মনে ছিল না; অথচ, চিরজীবন এই চিররুগ্নকে লইয়া যাপন করিতে হইবে, এ কল্পনাও আমার নিকট পীড়াজনক হইয়াছিল। হায়, প্রথম যৌবনকালে যখন সম্মুখে তাকাইয়াছিলাম তখন প্রেমের কুহকে, সুখের আশ্বাসে, সৌন্দর্যের মরীচিকায় সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। আজ হইতে শেষ পর্যন্ত কেবলই আশাহীন সুদীর্ঘ সতৃষ্ণ মরুভূমি।

আমার সেবার মধ্যে সেই আন্তরিক শ্রান্তি নিশ্চয় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন জানিতাম না কিন্তু এখন সন্দেহমাত্র নাই যে, তিনি আমাকে যুক্তাক্ষরহীন প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার মতো অতি সহজে বুঝিতেন। সেইজন্য যখন উপন্যাসের নায়ক সাজিয়া গম্ভীরভাবে তাঁহার নিকট কবিত্ব ফলাইতে যাইতাম তিনি এমন সুগভীর স্নেহ অথচ অনিবার্য কৌতুকের সহিত হাসিয়া উঠিতেন। আমার নিজের অগোচর অন্তরের কথাও অন্তর্যামীর ন্যায় তিনি সমস্তই জানিতেন, এ কথা মনে করিলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

হারান ডাক্তার আমাদের স্বজাতীয়। তাঁহার বাড়িতে আমার প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকিত। কিছুদিন যাতায়াতের পর ডাক্তার তাঁহার মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটি অবিবাহিত; তাহার বয়স পনেরো হইবে। ডাক্তার

বলেন, তিনি মনের মতো পাত্র পান নাই বলিয়া বিবাহ দেন নাই। কিন্তু বাহিরের লোকের কাছে গুজব শুনিতাম— মেয়েটির কুলের দোষ ছিল।

কিন্তু, আর কোনো দোষ ছিল না। যেমন সুরূপ তেমনি সুশিক্ষা। সেইজন্য মাঝে মাঝে এক-একদিন তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে আমার বাড়ি ফিরিতে রাত হইত, আমার স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়াইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। তিনি জানিতেন, আমি হারান ডাক্তরের বাড়ি গিয়াছি কিন্তু বিলম্বের কারণ একদিনও আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই।

মরুভূমির মধ্যে আর-একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্যন্ত তখন চোখের সামনে কূলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছলছল ঢলঢল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না।

রোগীর ঘর আমার কাছে দ্বিগুণ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। তখন প্রায়ই শুশ্রূষা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম ভঙ্গ হইতে লাগিল।

হারান ডাক্তার আমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, যাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভালো; কারণ, বাঁচিয়া তাহাদের নিজেরও সুখ নাই, অন্যেরও অসুখ। কথাটা সাধারণভবে বলিতে দোষ নাই, তথাপি আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তাঁহার উচিত হয় নাই। কিন্তু, মানুষের জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তারদের মন এমন অসাড় যে, তাহারা ঠিক আমাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে না।

হঠাৎ একদিন পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম, আমার স্ত্রী হারানবাবুকে বলিতেছেন, "ডাক্তার, কতকগুলা মিথ্যা ঔষধ গিলাইয়া ডাক্তারখানার দেনা বাড়াইতেছ কেন। আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো, তখন এমন একটা ওষুধ দাও যাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়।"

ডাক্তার বলিলেন, "ছি, এমন কথা বলিবেন না।"

কথাটা শুনিয়া হঠাৎ আমার বক্ষে বড়ো আঘাত লাগিল। ডাক্তার চলিয়া গেলে আমার স্ত্রীর ঘরে গিয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিলাম, তাঁহার কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, "এ ঘর বড়ো গরম, তুমি বাহিরে যাও। তোমার বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে। খানিকটা না বেড়াইয়া আসিলে আবার রাত্রে তোমার ক্ষুধা হইবে না।"

বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া। আমিই তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলাম, ক্ষুধাসঞ্চারের পক্ষে খানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যক। এখন নিশ্চয় বলিতে

পারি, তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলনাটুকু বুঝিতেন। আমি নির্বোধ, মনে করিতাম তিনি নির্বোধ।

এই বলিয়া দক্ষিণাচরণ বাবু অনেকক্ষণ করতলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আমাকে একগ্লাস জল আনিয়া দাও।" জল খাইয়া বলিতে লাগিলেন—

একদিন ডাক্তারবাবুর কন্যা মনোরমা আমার স্ত্রীকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জানি না, কী কারণে তাঁহার সে প্রস্তাব আমার ভালো লাগিল না। কিন্তু, প্রতিবাদ করিবার কোনো হেতু ছিল না। তিনি একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেদিন আমার স্ত্রীর বেদনা অন্য দিনের অপেক্ষা কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছিল। যেদিন তাঁহার ব্যথা বাড়ে সেদিন তিনি অত্যন্ত স্থির নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন; কেবল মাঝে মাঝে মুষ্টি বদ্ধ হইতে থাকে এবং মুখ নীল হইয়া আসে, তাহাতেই তাঁহার যন্ত্রণা বুঝা যায়। ঘরে কোনো সাড়া ছিল না, আমি শয্যাপ্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম; সেদিন আমাকে বেড়াইতে যাইতে অনুরোধ করেন এমন সামর্থ্য তাঁহার ছিল না কিংবা হয়তো বড়ো কষ্টের সময় আমি কাছে থাকি, এমন ইচ্ছা তাঁহার মনে মনে ছিল। চোখে লাগিবে বলিয়া কেরোসিনের আলোটা দ্বারের পার্শ্বে ছিল। ঘর অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। কেবল এক-একবার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশমে আমার স্ত্রীর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শুনা যাইতেছিল।

এমন সময়ে মনোরমা ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক হইতে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িল। আলো-আঁধারে লাগিয়া তিনি কিছুক্ষণ ঘরের কিছুই দেখিতে না পাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

আমার স্ত্রী চমকিয়া আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে!"— তাঁহার সেই দুর্বল অবস্থায় হঠাৎ অচেনা লোক দেখিয়া ভয় পাইয়া আমাকে দুই-তিনবার অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "ও কে! ও কে গো!"

আমার কেমন দুর্বুদ্ধি হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, "আমি চিনি না।" বলিবামাত্রই কে যেন আমাকে কশাঘাত করিল। পরের মুহূর্তেই বলিলাম, "ওঃ, আমাদের ডাক্তারবাবুর কন্যা!"

স্ত্রী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন; আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই তিনি ক্ষীণস্বরে অভ্যাগতকে বলিলেন, "আপনি আসুন।" আমাকে বলিলেন, "আলোটা ধরো।"

মনোরমা ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার সহিত রোগিণীর অল্পস্বল্প আলাপ চলিতে লাগিল। এমন সময় ডাক্তারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি তাঁহার ডাক্তারখানা হইতে দুই শিশি ওষুধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই দুটি শিশি বাহির করিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলেন, "এই নীল শিশিটা মালিশ করিবার, আর এইটি খাইবার। দেখিবেন, দুইটাতে মিলাইবেন না, এ ওষুধটা ভারি বিষ।"

আমাকেও একবার সতর্ক করিয়া দিয়া ঔষধ দুটি শয্যাপার্শ্ববর্তী টেবিলে রাখিয়া দিলেন। বিদায় লইবার সময় ডাক্তার তাঁহার কন্যাকে ডাকিলেন।

মনোরমা কহিলেন, "বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক কেহ নাই, ইঁহাকে সেবা করিবে কে?"

আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "না, না, আপনি কষ্ট করিবেন না। পুরানো ঝি আছে, সে আমাকে মায়ের মতো যত্ন করে।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "উনি মা-লক্ষ্মী, চিরকাল পরের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, অন্যের সেবা সহিতে পারেন না।"

কন্যাকে লইয়া ডাক্তার গমনের উদ্‌যোগ করিতেছেন এমন সময় আমার স্ত্রী বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, ইনি এই বদ্ধঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, ইঁহাকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন?"

ডাক্তারবাবু আমাকে কহিলেন, "আসুন-না, আপনাকে নদীর ধার হইয়া একবার বেড়াইয়া আনি।"

আমি ঈষৎ আপত্তি দেখাইয়া অনতিবিলম্বে সম্মত হইলাম। ডাক্তারবাবু যাইবার সময় দুই শিশি ঔষধ সম্বন্ধে আবার আমার স্ত্রীকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সেদিন ডাক্তারের বাড়িতেই আহার করিলাম। ফিরিয়া আসিতে রাত হইল। আসিয়া দেখি আমার স্ত্রী ছট্‌ফট্ করিতেছেন। অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কি ব্যথা বাড়িয়াছে।"

তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না, নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়াছে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রেই ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলাম।

ডাক্তার প্রথমটা আসিয়া অনেকক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই ব্যাথাটা কি বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঔষধটা একবার মালিশ করিলে হয় না?"

বলিয়া শিশিটা টেবিল হইতে লইয়া দেখিলেন, সেটা খালি।

আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"আপনি কি ভুল করিয়া এই ওষুধটা খাইয়াছেন?"

আমার স্ত্রী ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানাইলেন, "হাঁ।"

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গাড়ি করিয়া তাঁহার বাড়ি হইতে পাম্প্ আনিতে ছুটিলেন। আমি অর্ধমূর্ছিতের ন্যায় আমার স্ত্রীর বিছানার উপর গিয়া পড়িলাম।

তখন, মাতা তাহার পীড়িত শিশুকে যেমন করিয়া সান্ত্বনা করে তেমনি করিয়া তিনি আমার মাথা তাঁহার বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া দুই হস্তের স্পর্শে আমাকে তাঁহার মনের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কেবল তাঁহার সেই করুণ স্পর্শের দ্বারাই আমাকে বারংবার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শোক করিয়ো না, ভালোই হইয়াছে, তুমি সুখী হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।"

ডাক্তার যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে।

দক্ষিণাচরণ আর-একবার জল খাইয়া বলিলেন, "উঃ, বড়ো গরম!" বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া বারকয়েক বারান্দায় পায়চারি করিয়া আসিয়া বসিলেন। বেশ বোঝা গেল, তিনি বলিতে চাহেন না কিন্তু আমি যেন জাদু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কথা কাড়িয়া লইতেছি। আবার আরম্ভ করিলেন—

মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলাম।

মনোরমা তাহার পিতার সম্মতিক্রমে আমাকে বিবাহ করিল; কিন্তু আমি যখন তাহাকে আদরের কথা বলিতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতাম, সে হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোন্‌খানে কী খটকা লাগিয়া গিয়াছিল, আমি কেমন করিয়া বুঝিব?

এইসময় আমার মদ খাইবার নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি। ছম্‌ছমে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখিদের বাসায় ডানা ঝাড়িবার শব্দটুকুও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুইধারে ঘনছায়াবৃত ঝাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাঁপিতেছিল।

শ্রান্তি বোধ করিতেই মনোরমা সেই বকুলতলায় শুভ্র পাথরের বেদীর উপর আসিয়া নিজের দুই বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। আমিও কাছে আসিয়া বসিলাম।

সেখানে অন্ধকার আরো ঘনীভূত; যতটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে তারায় আচ্ছন্ন; তরুতলের ঝিল্লিধ্বনি যেন অনন্তগগনবক্ষচ্যুত নিঃশব্দতার নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দের সরু পাড় বুনিয়া দিতেছে।

সেদিনও বৈকালে আমি কিছু মদ খাইয়াছিলাম, মনটা বেশ একটু তরলাবস্থায় ছিল। অন্ধকার যখন চোখে সহিয়া আসিল তখন বনচ্ছায়াতলে পাণ্ডুর বর্ণে অঙ্কিত সেই শিথিল-অঞ্চল শ্রান্তকায় রমণীর আবছায়া মূর্তিটি আমার মনে এক অনিবার্য আবেগের সঞ্চার করিল। মনে হইল, ও যেন একটি ছায়া, ওকে যেন কিছুতেই দুই বাহু দিয়া ধরিতে পারিব না।

এমন সময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল; তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলুদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথার উপরকার আকাশে আরোহণ করিল; সাদা পাথরের উপর সাদা শাড়িপরা সেই শ্রান্তশয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম, "মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনোকালে ভুলিতে পারিব না।"

কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম; মনে পড়িল, ঠিক এই কথাটা আর একদিন আর কাহাকেও বলিয়াছি! এবং সেই মুহূর্তেই বকুলগাছের শাখার উপর দিয়া ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নীচে দিয়া গঙ্গার পূর্বপার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিম পার পর্যন্ত হাহা— হাহা— হাহা— করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল। সেটা মর্মভেদী হাসি কি অভ্রভেদী হাহাকার, বলিতে পারি না। আমি তদ্দণ্ডেই পাথরের বেদীর উপর হইতে মূর্ছিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেলাম।

মূর্ছাভঙ্গে দেখিলাম, আমার ঘরে বিছানায় শুইয়া আছি। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হঠাৎ এমন হইল কেন?"

আমি কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলাম, "শুনিতে পাও নাই, সমস্ত আকাশ ভরিয়া হাহা করিয়া একটা হাসি বহিয়া গেল?"

স্ত্রী হাসিয়া কহিলেন, "সে বুঝি হাসি? সার বাঁধিয়া দীর্ঘ একঝাঁক পাখি উড়িয়া গেল, তাহাদেরই পাখার শব্দ শুনিয়াছিলাম। তুমি এত অল্পেই ভয় পাও?"

দিনের বেলায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, পাখির ঝাঁক উড়িবার শব্দই বটে, এই সময়ে উত্তরদেশ হইতে হংসশ্রেণী নদীর চরে চরিবার জন্য আসিতেছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না। তখন মনে হইত, চারি দিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে, সামান্য একটা উপলক্ষে হঠাৎ আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। অবশেষে এমন হইল, সন্ধ্যার পর মনোরমার সহিত একটা কথা বলিতে আমার সাহস হইত না।

তখন আমাদের বরানগরের বাড়ি ছাড়িয়া মনোরমাকে লইয়া বোটে করিয়া বাহির হইলাম। অগ্রহায়ণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত ভয় চলিয়া গেল। কয়দিন বড়ো সুখে ছিলাম। চারি দিকের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া মনোরমাও যেন তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার অনেকদিন পরে ধীরে ধীরে আমার নিকট খুলিতে লাগিল।

গঙ্গা ছাড়াইয়া খ'ড়ে ছাড়াইয়া অবশেষে পদ্মায় আসিয়া পৌঁছিলাম। ভয়ংকরী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মতো কৃশ নির্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তর পারে জনশূন্য তৃণশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধূ ধূ করিতেছে, এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগুলি এই রাক্ষসী নদীর নিতান্ত মুখের কাছে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে; পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক-একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে।

এইখানে বেড়াইবার সুবিধা দেখিয়া বোট বাঁধিলাম।

একদিন আমরা দুই জনে বেড়াইতে বেড়াইতে বহুদূরে চলিয়া গেলাম। সূর্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া যাইতেই শুক্লপক্ষের নির্মল চন্দ্রালোক দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠিল। সেই অন্তহীন শুভ্র বালির চরের উপর যখন অজস্র অবারিত উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্না একেবারে আকাশের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল, তখন মনে হইল যেন জনশূন্য চন্দ্রালোকের অসীম স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে কেবল আমরা দুই জনে ভ্রমণ করিতেছি। একটি লাল শাল মনোরমার মাথার উপর হইতে নামিয়া তাহার মুখখানি বেষ্টন করিয়া তাহার শরীরটি আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। নিস্তব্ধতা যখন নিবিড় হইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন শুভ্রতা এবং শূন্যতা ছাড়া যখন আর কিছুই রহিল না, তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হাতটি বাহির করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল; অত্যন্ত কাছে আসিয়া সে যেন তাহার সমস্ত শরীরমন জীবনযৌবন আমার উপর বিন্যস্ত করিয়া নিতান্ত নির্ভর করিয়া দাঁড়াইল। পুলকিত উদ্‌বেলিত হৃদয়ে মনে করিলাম, ঘরের মধ্যে কি যথেষ্ট ভালোবাসা যায়। এইরূপ অনাবৃত অবারিত অনন্ত আকাশ নহিলে কি দুটি মানুষকে কোথাও ধরে। তখন মনে হইল, আমাদের ঘর নাই, দ্বার নাই, কোথাও ফিরিবার নাই, এমনি

করিয়া হাতে হাতে ধরিয়া গম্যহীন পথে উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে চন্দ্রালোকিত শূন্যতার উপর দিয়া অবারিত ভাবে চলিয়া যাইব।

এইরূপে চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া দেখিলাম, সেই বালুকারাশির মাঝখানে অদূরে একটি জলাশয়ের মতো হইয়াছে— পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর সেইখানে জল বাধিয়া আছে।

সেই মরুবালুকাবেষ্টিত নিস্তরঙ্গ নিষুপ্ত নিশ্চল জলটুকুর উপরে একটি সুদীর্ঘ জ্যোৎস্নার রেখা মূর্ছিতভাবে পড়িয়া আছে। সেই জায়গাটাতে আসিয়া আমরা দুই জনে দাঁড়াইলাম— মনোরমা কী ভাবিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার মাথার উপর হইতে শালটা হঠাৎ খসিয়া পড়িল। আমি তাহার সেই জ্যোৎস্নাবিকশিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম।

সেইসময় সেই জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীরস্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল, "ও কে? ও কে? ও কে?"

আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার স্ত্রীও কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দুই জনেই বুঝিলাম, এই শব্দ মানুষিক নহে, অমানুষিকও নহে— চরবিহারী জলচর পাখির ডাক। হঠাৎ এত রাত্রে তাহাদের নিরাপদ নিভৃত নিবাসের কাছে লোকসমাগম দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই ভয়ের চমক খাইয়া আমরা দুই জনেই তাড়াতাড়ি বোটে ফিরিলাম। রাত্রে বিছানায় আসিয়া শুইলাম; শ্রান্তশরীরে মনোরমা অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন অন্ধকারে কে একজন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটিমাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপিচুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ও কে? ও কে? ও কে গো?"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই জ্বালাইয়া বাতি ধরাইলাম। সেই মুহূর্তেই ছায়ামূর্তি মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা—হাহা—হাহা করিয়া একটা হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ গ্রাম নগর পার হইয়া গেল— যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমশ ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে; ক্রমে যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল, ক্রমে তাহা যেন সূচির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল, এত ক্ষীণ শব্দ কখনো শুনি নাই, কল্পনা করি নাই; আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে

যাইতেছে কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না ; অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। যেমন আলো নিবাইয়া শুইলাম অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে, অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো।" আমার বুকের রক্তের ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গো।" সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেলফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কে গো!"

বলিতে বলিতে দক্ষিণাবাবু পাংশুবর্ণ হইয়া আসিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলাম, "একটু জল খান।" এমন সময় হঠাৎ আমার কেরোসিনের শিখাটা দপ দপ করিতে করিতে নিবিয়া গেল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইয়াছে। কাক ডাকিয়া উঠিল। দোয়েল শিশ দিতে লাগিল। আমার বাড়ির সম্মুখবর্তী পথে একটা মহিষের গাড়ির ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ জাগিয়া উঠিল। তখন দক্ষিণাবাবুর মুখের ভাব একেবারে বদল হইয়া গেল। ভয়ের কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না। রাত্রির কুহকে, কাল্পনিক শঙ্কার মত্ততায় আমার কাছে যে এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন সেজন্য যেন অত্যন্ত লজ্জিত এবং আমার উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিষ্টসম্ভাষণমাত্র না করিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেইদিনই অর্ধরাত্রে আবার আমার দ্বারে আসিয়া ঘা পড়িল, "ডাক্তার! ডাক্তার!"

মাঘ ১৩০১

আপদ

সন্ধ্যার দিকে ঝড় ক্রমশ প্রবল হইতে লাগিল। বৃষ্টির ঝাপট, বজ্রের শব্দ এবং বিদ্যুতের ঝিকমিকিতে আকাশে যেন সুরাসুরের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কালো কালো মেঘগুলো মহাপ্রলয়ের জয়পতাকার মতো দিগ্‌বিদিকে উড়িতে আরম্ভ করিল, গঙ্গার এপারে ওপারে বিদ্রোহী ঢেউগুলো কলশব্দে নৃত্য জুড়িয়া দিল, এবং বাগানের বড়ো বড়ো গাছগুলো সমস্ত শাখা ঝট্‌পট্ করিয়া হাহুতাশ সহকারে দক্ষিণে বামে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

তখন চন্দননগরের বাগানবাড়িতে একটি দীপালোকিত রুদ্ধ কক্ষে খাটের সম্মুখবর্তী নীচের বিছানায় বসিয়া স্ত্রী-পুরুষে কথাবার্তা চলিতেছিল।

শরৎবাবু বলিতেছিলেন, "আর কিছুদিন থাকিলেই তোমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিবে, তখন আমরা দেশে ফিরিতে পারিব।"

কিরণময়ী বলিতেছিলেন, "আমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিয়াছে, এখন দেশে ফিরিলে কোনো ক্ষতি হইবে না।"

বিবাহিত ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, কথাটা যত সংক্ষেপে রিপোর্ট করিলাম তত সংক্ষেপে শেষ হয় নাই। বিষয়টি বিশেষ দুরূহ নয়, তথাপি বাদপ্রতিবাদ কিছুতেই মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল না ; কর্ণহীন নৌকার মতো ক্রমাগতই ঘুর খাইয়া মরিতেছিল ; অবশেষে অশ্রুতরঙ্গে ডুবি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

শরৎ কহিলেন, "ডাক্তার বলিতেছে, আর কিছুদিন থাকিয়া গেলে ভালো হয়।"

কিরণ কহিলেন, "তোমার ডাক্তার তো সব জানে !"

শরৎ কহিলেন, "জান তো, এই সময়ে দেশে নানাপ্রকার ব্যামোর প্রাদুর্ভাব হয়, অতএব আর মাস দুয়েক কাটাইয়া গেলেই ভালো হয়।"

কিরণ কহিলেন, "এখানে এখন বুঝি কোথাও কাহারো কোনো ব্যামো হয় না !"

পূর্ব ইতিহাসটা এই। কিরণকে তাহার ঘরের এবং পাড়ার সকলেই ভালোবাসে, এমন-কি, শাশুড়ি পর্যন্ত। সেই কিরণের যখন কঠিন পীড়া হইল তখন সকলেই চিন্তিত হইয়া উঠিল, এবং ডাক্তার যখন বায়ুপরিবর্তনের প্রস্তাব করিল, তখন গৃহ এবং কাজকর্ম ছাড়িয়া প্রবাসে যাইতে তাহার স্বামী এবং শাশুড়ি কোনো আপত্তি করিলেন না। যদিও গ্রামের বিবেচক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই, বায়ুপরিবর্তনে আরোগ্যের আশা করা এবং স্ত্রীর জন্য এতটা হুলস্থুল করিয়া তোলা, নব্য স্ত্রৈণতার একটা নির্লজ্জ আতিশয্য বলিয়া স্থির করিলেন এবং প্রশ্ন করিলেন, ইতিপূর্বে কি কাহারো স্ত্রীর কঠিন পীড়া হয় নাই, শরৎ যেখানে যাওয়া স্থির করিয়াছেন সেখানে কি মানুষরা অমর, এবং এমন কোনো দেশ আছে কি যে অদৃষ্টের লিপি সফল হয় না— তথাপি শরৎ এবং তাঁহার মা সে-সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না ; তখন গ্রামের সমস্ত সমবেত বিজ্ঞতার অপেক্ষা তাঁহাদের হৃদয়লক্ষ্মী কিরণের প্রাণটুকু তাঁহাদের নিকট গুরুতর বোধ হইল। প্রিয়ব্যক্তির বিপদে মানুষের এরূপ মোহ ঘটিয়া থাকে।

শরৎ চন্দননগরের বাগানে আসিয়া বাস করিতেছেন, এবং কিরণও রোগমুক্ত হইয়াছেন, কেবল শরীর এখনো সম্পূর্ণ সবল হয় নাই। তাঁহার মুখে চক্ষে একটি

সকরুণ কৃশতা অঙ্কিত হইয়া আছে, যাহা দেখিলে হৃৎকম্পসহ মনে উদয় হয়, আহা বড়ো রক্ষা পাইয়াছে!

কিন্তু কিরণের স্বভাবটা সঙ্গপ্রিয়, আমোদপ্রিয়। এখানে একলা আর ভালো লাগিতেছে না; তাহার ঘরের কাজ নাই, পাড়ার সঙ্গিনী নাই; কেবল সমস্ত দিন আপনার রুগ্ন শরীরটাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে মন যায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দাগ মাপিয়া ঔষধ খাও, তাপ দাও, পথ্য পালন করো, ইহাতে বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে; আজ ঝড়ের সন্ধ্যাবেলায় রুদ্ধগৃহে স্বামীস্ত্রীতে তাহাই লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

কিরণ যতক্ষণ উত্তর দিতেছিল ততক্ষণ উভয়পক্ষে সমকক্ষভাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল, কিন্তু অবশেষে কিরণ যখন নিরুত্তর হইয়া বিনা প্রতিবাদে শরতের দিক হইতে ঈষৎ বিমুখ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বসিল তখন দুর্বল নিরুপায় পুরুষটির আর কোনো অস্ত্র রহিল না। পরাভব স্বীকার করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় বাহির হইতে বেহারা উচ্চৈঃস্বরে কী একটা নিবেদন করিল।

শরৎ উঠিয়া দ্বার খুলিয়া শুনিলেন, নৌকাডুবি হইয়া একটি ব্রাহ্মণবালক সাঁতার দিয়া তাঁহাদের বাগানে আসিয়া উঠিয়াছে।

শুনিয়া কিরণের মান-অভিমান দূর হইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ আলনা হইতে শুষ্কবস্ত্র বাহির করিয়া দিলেন এবং শীঘ্র একবাটি দুধ গরম করিয়া ব্রাহ্মণের ছেলেকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ছেলেটির লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, গোঁফের রেখা এখনো উঠে নাই। কিরণ তাহাকে নিজে থাকিয়া ভোজন করাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

শুনিলেন, সে যাত্রার দলের ছোকরা, তাহার নাম নীলকান্ত। তাহারা নিকটবর্তী সিংহবাবুদের বাড়ি যাত্রার জন্য আহূত হইয়াছিল; ইতিমধ্যে নৌকাডুবি হইয়া তাহাদের দলের লোকের কী গতি হইল কে জানে; সে ভালো সাঁতার জানিত, কোনোমতে প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

ছেলেটি এইখানেই রহিয়া গেল। আর একটু হইলেই সে মারা পড়িত, এই মনে করিয়া তাহার প্রতি কিরণের অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইল।

শরৎ মনে করিলেন, হইল ভালো, কিরণ একটা নূতন কাজ হাতে পাইলেন, এখন কিছুকাল এইভাবেই কাটিয়া যাইবে। ব্রাহ্মণবালকের কল্যাণে পুণ্যসঞ্চয়ের প্রত্যাশায় শাশুড়িও প্রসন্নতা লাভ করিলেন। এবং অধিকারী মহাশয় ও যমরাজের হাত হইতে সহসা এই ধনীপরিবারের হাতে বদলি হইয়া নীলকান্ত বিশেষ আরাম বোধ করিল।

কিন্তু অনতিবিলম্বে শরৎ এবং তাহার মাতার মত পরিবর্তন হইতে লাগিল। তাঁহারা ভাবিলেন, আর আবশ্যক নাই, এখন এই ছেলেটাকে বিদায় করিতে পারিলে আপদ যায়।

নীলকান্ত গোপনে শরতের গুড়গুড়িতে ফড়্ ফড়্ শব্দে তামাক টানিতে আরম্ভ করিল। বৃষ্টির দিনে অম্লানবদনে তাঁহার শখের সিল্কের ছাতাটি মাথায় দিয়া নববন্ধুসঞ্চয়-চেষ্টায় পল্লীতে পর্যটন করিতে লাগিল। কোথাকার একটা মলিন গ্রাম্য কুক্কুরকে আদর দিয়া এমনি স্পর্ধিত করিয়া তুলিল যে, সে অনাহূত শরতের সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্মল জাজিমের উপর পদপল্লবচতুষ্টয়ের ধূলিরেখায় আপন শুভাগমন-সংবাদ স্থায়ীভাবে মুদ্রিত করিয়া আসিতে লাগিল। নীলকান্তের চতুর্দিকে দেখিতে দেখিতে একটি সুবৃহৎ ভক্তশিশুসম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল, এবং সে-বৎসর গ্রামের আম্রকাননে কচি আম পাকিয়া উঠিবার অবসর পাইল না।

কিরণ এই ছেলেটিকে বড়ো বেশি আদর দিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শরৎ এবং শরতের মা সে বিষয়ে তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিতেন, কিন্তু তিনি তাহা মানিতেন না। শরতের পুরাতন জামা মোজা এবং নূতন ধুতি চাদর জুতা পরাইয়া তিনি তাহাকে বাবু সাজাইয়া তুলিলেন। মাঝে মাঝে যখন তখন তাহাকে ডাকিয়া লইয়া তাঁহার স্নেহ এবং কৌতুক উভয়ই চরিতার্থ হইত। কিরণ সহাস্যমুখে পানের বাটা পাশে রাখিয়া খাটের উপর বসিতেন, দাসী তাঁহার ভিজে এলোচুল চিরিয়া চিরিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া শুকাইয়া দিত এবং নীলকান্ত নীচে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া নলদময়ন্তীর পালা অভিনয় করিত— এইরূপে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন অত্যন্ত শীঘ্র কাটিয়া যাইত। কিরণ শরৎকে তাঁহার সহিত একাসনে দর্শকশ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু শরৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন এবং শরতের সম্মুখে নীলকান্তের প্রতিভাও সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পাইত না। শাশুড়ি এক একদিন ঠাকুর-দেবতার নাম শুনিবার আশায় আকৃষ্ট হইয়া আসিতেন কিন্তু অবিলম্বে তাঁহার চিরাভ্যস্ত মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রাবেশ ভক্তিকে অভিভূত এবং তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া দিত।

শরতের কাছ হইতে কান্‌মলা চড়টা চাপড়টা নীলকান্তের অদৃষ্টে প্রায়ই জুটিত; কিন্তু তদপেক্ষা কঠিনতর শাসনপ্রণালীতে আজন্ম অভ্যস্ত থাকাতে সেটা তাহার নিকট অপমান বা বেদনাজনক বোধ হইত না। নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর জলস্থলবিভাগের ন্যায় মানবজন্মটা আহার এবং প্রহারে বিভক্ত; প্রহারের অংশটাই অধিক।

নীলকান্তের ঠিক কত বয়স নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন; যদি চোদ্দ-পনেরো হয় তবে

বয়সের অপেক্ষা মুখ অনেক পাকিয়াছে বলিতে হইবে, যদি সতেরো আঠারো হয় তবে বয়সের অনুরূপ পাক ধরে নাই। হয় সে অকালপক্ব, নয় সে অকাল-অপক্ব।

আসল কথা এই, সে অতি অল্প বয়সেই যাত্রার দলে ঢুকিয়া রাধিকা, দময়ন্তী, সীতা এবং বিদ্যার সখী সাজিত। অধিকারীর আবশ্যকমতো বিধাতার বরে খানিক দূর পর্যন্ত বাড়িয়া তাহার বাড় থামিয়া গেল। তাহাকে সকলে ছোটোই দেখিত, আপনাকেও সে ছোটোই জ্ঞান করিত, বয়সের উপযুক্ত সম্মান সে কাহারো কাছে পাইত না। এই সকল স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক কারণ-প্রভাবে সতেরো বৎসর বয়সের সময় তাহাকে অনতিপক্ব সতেরোর অপেক্ষা অতিপরিপক্ব চোদ্দর মতো দেখাইত। গোঁফের রেখা না উঠাতে এই ভ্রম আরো দৃঢ়মূল হইয়াছিল। তামাকের ধোঁয়া লাগিয়াই হউক, বা বয়সানুচিত ভাষা প্রয়োগবশতই হউক, নীলকান্তের ঠোঁটের কাছটা কিছু বেশি পাকা বোধ হইত, কিন্তু তাহার বৃহৎ তারাবিশিষ্ট দুইটি চক্ষের মধ্যে একটা সারল্য এবং তারুণ্য ছিল। অনুমান করি, নীলকান্তের ভিতরটা স্বভাবত কাঁচা, কিন্তু যাত্রার দলের তা' লাগিয়া উপরিভাগে পক্বতার লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

শরৎবাবুর আশ্রয়ে চন্দননগরের বাগানে বাস করিতে করিতে নীলকান্তের উপর স্বভাবের নিয়ম অব্যাহতভাবে আপন কাজ করিতে লাগিল। সে এতদিন যে একটা বয়ঃসন্ধিস্থলে অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘকাল থামিয়া ছিল এখানে আসিয়া সেটা কখন একসময় নিঃশব্দে পার হইয়া গেল। তাহার সতেরো-আঠারো বৎসরের বয়ঃক্রম বেশ সম্পূর্ণভাবে পরিণত হইয়া উঠিল।

তাহার সে পরিবর্তন বাহির হইতে কাহারো চোখে পড়িল না কিন্তু তাহার প্রথম লক্ষণ এই যে, যখন কিরণ নীলকান্তের প্রতি বালকযোগ্য ব্যবহার করিতেন সে মনে মনে লজ্জিত এবং ব্যথিত হইত। একদিন আমোদপ্রিয় কিরণ তাহাকে স্ত্রীবেশে সখী সাজিবার কথা বলিয়াছিলেন, সে-কথাটা অকস্মাৎ তাহার বড়োই কষ্টদায়ক লাগিল অথচ তাহার উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাইল না। আজকাল তাহাকে যাত্রার অনুকরণ করিতে ডাকিলেই সে অদৃশ্য হইয়া যাইত। সে যে একটা লক্ষ্মীছাড়া যাত্রার দলের ছোকরার অপেক্ষা অধিক কিছু নয় এ কথা কিছুতে তাহার মনে লইত না।

এমন-কি, সে বাড়ির সরকারের নিকট কিছু কিছু করিয়া লেখাপড়া শিখিবার সংকল্প করিল। কিন্তু বউঠাকরুনের স্নেহভাজন বলিয়া নীলকান্তকে সরকার দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না, এবং মনের একাগ্রতা রক্ষা করিয়া পড়াশুনা কোনোকালে অভ্যাস না থাকাতে অক্ষরগুলো তাহার চোখের সামনে দিয়া ভাসিয়া যাইত। গঙ্গার ধারে চাঁপাতলায় গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়া কোলের উপর বই খুলিয়া সে দীর্ঘকাল বসিয়া

থাকিত; জল ছল্ ছল্ করিত, নৌকা ভাসিয়া যাইত, শাখার উপরে চঞ্চল অন্যমনস্ক পাখি কিচ্ মিচ্ শব্দে স্বগত উক্তি প্রকাশ করিত, নীলকান্ত বইয়ের পাতায় চক্ষু রাখিয়া কী ভাবিত সেই জানে অথবা সেও জানে না। একটা কথা হইতে কিছুতেই আর-একটা কথায় গিয়া পৌঁছিতে পারিত না, অথচ বই পড়িতেছি মনে করিয়া তাহার ভারি একটা আত্মগৌরব উপস্থিত হইত। সামনে দিয়া যখন একটা নৌকা যাইত তখন সে আরো অধিক আড়ম্বরের সহিত বইখানা তুলিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া পড়ার ভান করিত; দর্শক চলিয়া গেলে সে আর পড়ার উৎসাহ রক্ষা করিতে পারিত না।

পূর্বে সে অভ্যস্ত গানগুলো যন্ত্রের মতো যথানিয়মে গাহিয়া যাইত, এখন সেই গানের সুরগুলো তাহার মনে এক অপূর্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার করে। গানের কথা অতি যৎসামান্য, তুচ্ছ অনুপ্রাসে পরিপূর্ণ, তাহার অর্থও নীলকান্তের নিকট সম্যক বোধগম্য নহে, কিন্তু যখন সে গাহিত—

ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে
এমন নৃশংস কেন হলি রে—
বল্ কী জন্যে, এ অরণ্যে,
রাজকন্যের প্রাণসংশয় করিলি রে—

তখন সে যেন সহসা লোকান্তরে জন্মান্তরে উপনীত হইত; তখন চারি দিকের অভ্যস্ত জগৎটা এবং তাহার তুচ্ছ জীবনটা গানে তর্জমা হইয়া একটা নূতন চেহারা ধারণ করিত। রাজহংস এবং রাজকন্যার কথা হইতে তাহার মনে এক অপরূপ ছবির আভাস জাগিয়া উঠিত, সে আপনাকে কী মনে করিত স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না, কিন্তু যাত্রার দলের পিতৃ-মাতৃহীন ছোকরা বলিয়া ভুলিয়া যাইত। নিতান্ত অকিঞ্চনের ঘরের হতভাগ্য মলিন শিশু যখন সন্ধ্যাশয্যায় শুইয়া রাজপুত্র রাজকন্যা এবং সাত রাজার ধন মানিকের কথা শোনে, তখন সেই ক্ষীণদীপালোকিত জীর্ণ গৃহকোণের অন্ধকারে তাহার মনটা সমস্ত দারিদ্র্য ও হীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এক সর্বসম্ভব রূপকথার রাজ্যে একটা নূতন রূপ, উজ্জ্বল বেশ এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা ধারণ করে; সেইরূপ গানের সুরের মধ্যে এই যাত্রার দলের ছেলেটি আপনাকে এবং আপনার জগৎটিকে একটি নবীন আকারে সৃজন করিয়া তুলিত— জলের ধ্বনি, পাতার শব্দ, পাখির ডাক এবং যে লক্ষ্মী এই লক্ষ্মীছাড়াকে আশ্রয় দিয়াছেন তাঁহার সহাস্য স্নেহমুখচ্ছবি, তাঁহার কল্যাণমণ্ডিত বলয়বেষ্টিত বাহু দুইখানি এবং দুর্লভ সুন্দর পুষ্পদলকোমল রক্তিম চরণযুগল কী এক মায়ামন্ত্রবলে রাগিণীর মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। আবার একসময় এই গীতিমরীচিকা কোথায় অপসারিত হইত, যাত্রার দলের নীলকান্ত ঝাঁকড়া

চুল লইয়া প্রকাশ পাইত, আমবাগানের অধ্যক্ষ প্রতিবেশীর অভিযোগক্রমে শরৎ আসিয়া তাহার গালে ঠাস ঠাস করিয়া চড় কষাইয়া দিতেন, এবং বালক-ভক্তমণ্ডলীর অধিনায়ক হইয়া নীলকান্ত জলে স্থলে এবং তরুশাখাগ্রে নব নব উপদ্রব সৃজন করিতে বাহির হইত।

ইতিমধ্যে শরতের ভাই সতীশ কলিকাতা কলেজের ছুটিতে বাগানে আসিয়া আশ্রয় লইল। কিরণ ভারি খুশি হইলেন, তাঁহার হাতে আর-একটি কাজ জুটিল; উপবেশনে আহারে আচ্ছাদনে সমবয়স্ক ঠাকুরপোর প্রতি পরিহাসপাশ বিস্তার করিতে লাগিলেন। কখনো হাতে সিঁদুর মাখিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরেন, কখনো তাহার জামার পিঠে বাঁদর লিখিয়া রাখেন, কখনো ঝনাৎ করিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সুললিত উচ্চহাস্যে পলায়ন করেন। সতীশও ছাড়িবার পাত্র নহে; সে তাঁহার চাবি চুরি করিয়া, তাঁহার পানের মধ্যে লঙ্কা পুরিয়া, অলক্ষিতে খাটের খুরার সহিত তাঁহার আঁচল বাঁধিয়া প্রতিশোধ তুলিতে থাকে। এইরূপে উভয়ে সমস্তদিন তর্জন ধাবন হাস্য, এমন-কি, মাঝে মাঝে কলহ, ক্রন্দন, সাধাসাধি এবং পুনরায় শান্তিস্থাপন চলিতে লাগিল।

নীলকান্তকে কী ভূতে পাইল কে জানে। সে কী উপলক্ষ করিয়া কাহার সহিত বিবাদ করিবে ভাবিয়া পায় না, অথচ তাহার মন তীব্র তিক্তরসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে তাহার ভক্ত বালকগুলিকে অন্যায়রূপে কাঁদাইতে লাগিল, তাহার সেই পোষা দিশি কুকুরটাকে অকারণে লাথি মারিয়া কেঁই কেঁই শব্দে নভোমণ্ডল ধ্বনিত করিয়া তুলিল, এমন-কি, পথে ভ্রমণের সময় সবেগে ছড়ি মারিয়া আগাছাগুলার শাখাচ্ছেদন করিয়া চলিতে লাগিল।

যাহারা ভালো খাইতে পারে, তাহাদিগকে সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতে কিরণ অত্যন্ত ভালোবাসেন। ভালো খাইবার ক্ষমতাটা নীলকান্তের ছিল, সুখাদ্য দ্রব্য পুনঃপুনঃ খাইবার অনুরোধ তাহার নিকট কদাচ ব্যর্থ হইত না। এই জন্য কিরণ প্রায় তাহাকে ডাকিয়া লইয়া নিজে থাকিয়া খাওয়াইতেন, এবং এই ব্রাহ্মণবালকের তৃপ্তিপূর্বক আহার দেখিয়া তিনি বিশেষ সুখ অনুভব করিতেন। সতীশ আসার পরে অনবসরবশত নীলকান্তের আহারস্থলে প্রায় মাঝে মাঝে কিরণকে অনুপস্থিত থাকিতে হইত; পূর্বে এরূপ ঘটনায় তাহার ভোজনের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না, সে সর্বশেষে দুধের বাটি ধুইয়া তাহার জলসুদ্ধ খাইয়া তবে উঠিত— কিন্তু আজকাল কিরণ নিজে ডাকিয়া না খাওয়াইলে তাহার বক্ষ ব্যথিত, তাহার মুখ বিস্বাদ হইয়া উঠিত, না খাইয়া উঠিয়া পড়িত; বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে দাসীকে বলিয়া যাইত, আমার ক্ষুধা নাই। মনে করিত, কিরণ সংবাদ পাইয়া এখনি অনুতপ্তচিত্তে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন, এবং খাইবার জন্য

বারংবার অনুরোধ করিবেন, সে তথাপি কিছুতেই সে অনুরোধ পালন করিবে না, বলিবে, আমার ক্ষুধা নাই। কিন্তু কিরণকে কেহ সংবাদও দেয় না, কিরণ তাহাকে ডাকিয়াও পাঠান না; খাবার যাহা থাকে দাসী খাইয়া ফেলে। তখন সে আপন শয়নগৃহের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া অন্ধকার বিছানার উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফাঁপিয়া মুখের উপর সবলে বালিশ চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে থাকে; কিন্তু কী তাহার নালিশ, কাহার উপরে তাহার দাবি, কে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিবে! যখন কেহই আসে না, তখন স্নেহময়ী বিশ্বধাত্রী নিদ্রা আসিয়া ধীরে ধীরে কোমলকরস্পর্শে এই মাতৃহীন ব্যথিত বালকের অভিমান শান্ত করিয়া দেন।

নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা হইল, সতীশ কিরণের কাছে তাহার নামে সর্বদাই লাগায়; যেদিন কিরণ কোনো কারণে গম্ভীর হইয়া থাকিতেন সেদিন নীলকান্ত মনে করিত, সতীশের চক্রান্তে কিরণ তাহারই উপর রাগ করিয়া আছেন।

এখন হইতে নীলকান্ত একমনে তীব্র আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সর্বদাই দেবতার নিকট প্রার্থনা করে, "আর-জন্মে আমি যেন সতীশ হই এবং সতীশ যেন আমি হয়।" সে জানিত, ব্রাহ্মণের একান্ত মনের অভিশাপ কখনো নিষ্ফল হয় না, এই জন্য সে মনে মনে সতীশকে ব্রহ্মতেজে দগ্ধ করিতে গিয়া নিজে দগ্ধ হইতে থাকিত, এবং উপরের তলা হইতে সতীশ ও তাহার বউঠাকুরানীর উচ্ছ্বসিত উচ্চহাস্যমিশ্রিত পরিহাসকলরব শুনিতে পাইত।

নীলকান্ত স্পষ্টত সতীশের কোনোরূপ শত্রুতা করিতে সাহস করিত না, কিন্তু সুযোগমতো তাহার ছোটোখাটো অসুবিধা ঘটাইয়া প্রীতিলাভ করিত। ঘাটের সোপানে সাবান রাখিয়া সতীশ যখন গঙ্গায় নামিয়া ডুব দিতে আরম্ভ করিত তখন নীলকান্ত ফস্ করিয়া আসিয়া সাবান চুরি করিয়া লইত; সতীশ যথাকালে সাবানের সন্ধানে আসিয়া দেখিত, সাবান নাই। একদিন নাহিতে নাহিতে হঠাৎ দেখিল তাহার বিশেষ শখের চিকনের-কাজ-করা জামাটি গঙ্গার জলে ভাসিয়া যাইতেছে; ভাবিল, হাওয়ায় উড়িয়া গেছে, কিন্তু হাওয়াটা কোন্ দিক হইতে বহিল তাহা কেহ জানে না।

একদিন সতীশকে আমোদ দিবার জন্য কিরণ নীলকান্তকে ডাকিয়া তাহাকে যাত্রার গান গাহিতে বলিলেন, নীলকান্ত নিরুত্তর হইয়া রহিল; কিরণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর আবার কী হল রে।" নীলকান্ত তাহার জবাব দিল না। কিরণ পুনশ্চ বলিলেন, "সেই গানটা গা-না।" "সে আমি ভুলে গেছি" বলিয়া নীলকান্ত চলিয়া গেল।

অবশেষে কিরণের দেশে ফিরিবার সময় হইল। সকলেই প্রস্তুত হইতে লাগিল; সতীশও সঙ্গে যাইবে। কিন্তু নীলকান্তকে কেহ কোনো কথাই বলে না। সে সঙ্গে যাইবে কি থাকিবে, সে প্রশ্নমাত্র কাহারো মনে উদয় হয় না।

কিরণ নীলকান্তকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে শাশুড়ি স্বামী এবং দেবর সকলেই একবাক্যে আপত্তি করিয়া উঠিলেন, কিরণও তাঁহার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। অবশেষে যাত্রার দুই দিন আগে ব্রাহ্মণবালককে ডাকিয়া কিরণ তাহাকে স্নেহবাক্যে স্বদেশে যাইতে উপদেশ করিলেন।

সে উপরি উপরি কয়দিন অবহেলার পর মিষ্টবাক্য শুনিতে পাইয়া আর থাকিতে পারিল না, একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। কিরণেরও চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল; যাহাকে চিরকাল কাছে রাখা যাইবে না তাহাকে কিছুদিন আদর দিয়া তাহার মায়া বসিতে দেওয়া ভালো হয় নাই বলিয়া কিরণের মনে বড়ো অনুতাপ উপস্থিত হইল।

সতীশ কাছে উপস্থিত ছিল; সে অতবড়ো ছেলের কান্না দেখিয়া ভারি বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে মোলো, কথা নাই বার্তা নাই, একেবারে কাঁদিয়াই অস্থির!"

কিরণ এই কঠোর উক্তির জন্য সতীশকে ভর্ৎসনা করিলেন। সতীশ কহিল, "তুমি বোঝ না বউদিদি, তুমি সকলকেই বড়ো বেশি বিশ্বাস করো; কোথাকার কে তাহার ঠিক নাই, এখানে আসিয়া দিব্য রাজার হালে আছে। আবার পুনর্মূষিক হইবার আশঙ্কায় আজ মায়াকান্না জুড়িয়াছে— ও বেশ জানে যে, দুফোঁটা চোখের জল ফেলিলেই তুমি গলিয়া যাইবে।"

নীলকান্ত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল; কিন্তু তাহার মনটা সতীশের কাল্পনিক মূর্তিকে ছুরি হইয়া কাটিতে লাগিল, ছুঁচ হইয়া বিঁধিতে লাগিল, আগুন হইয়া জ্বালাইতে লাগিল, কিন্তু প্রকৃত সতীশের গায়ে একটি চিহ্নমাত্র বসিল না, কেবল তাহারই মর্মস্থল হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে সতীশ একটি শৌখিন দোয়াতদান কিনিয়া আনিয়াছিল, তাহাতে দুই পাশে দুই ঝিনুকের নৌকার উপর দোয়াত বসানো এবং মাঝে একটা জর্মন্‌ রৌপ্যের হাঁস উন্মুক্ত চঞ্চুপুটে কলম লইয়া পাখা মেলিয়া বসিয়া আছে, সেটির প্রতি সতীশের অত্যন্ত যত্ন ছিল; প্রায় সে মাঝে মাঝে সিল্কের রুমাল দিয়া অতি সযত্নে সেটি ঝাড়পোঁচ করিত। কিরণ প্রায়ই পরিহাস করিয়া সেই রৌপ্যহংসের চঞ্চু-অগ্রভাগে অঙ্গুলির আঘাত করিয়া বলিতেন "ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে এমন নৃশংস কেন হলি রে" এবং ইহাই উপলক্ষ করিয়া দেবরে তাঁহাতে হাস্যকৌতুকে বাগ্‌যুদ্ধ চলিত।

স্বদেশযাত্রার আগের দিন সকালবেলায় সে জিনিসটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কিরণ হাসিয়া কহিলেন, "ঠাকুরপো, তোমার রাজহংস তোমার দময়ন্তীর অন্বেষণে উড়িয়াছে।"

কিন্তু সতীশ অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল। নীলকান্তই যে সেটা চুরি করিয়াছে সে-বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র রহিল না— গতকল্য সন্ধ্যার সময় তাহাকে সতীশের ঘরের কাছে ঘুর ঘুর করিতে দেখিয়াছে, এমন সাক্ষীও পাওয়া গেল।

সতীশের সম্মুখে অপরাধী আনীত হইল। সেখানে কিরণও উপস্থিত ছিলেন। সতীশ একেবারেই তাহাকে বলিয়া উঠিলেন, "তুই আমার দোয়াত চুরি করে কোথায় রেখেছিস, এনে দে।"

নীলকান্ত নানা অপরাধে এবং বিনা অপরাধেও শরতের কাছে অনেক মার খাইয়াছে এবং বরাবর প্রফুল্লচিত্তে তাহা বহন করিয়াছে। কিন্তু কিরণের সম্মুখে যখন তাহার নামে দোয়াত চুরির অপবাদ আসিল, তখন তাহার বড়ো বড়ো দুই চোখ আগুনের মতো জ্বলিতে লাগিল ; তাহার বুকের কাছটা ফুলিয়া কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া উঠিল ; সতীশ আর একটা কথা বলিলেই সে তাহার দুই হাতের দশ নখ লইয়া ক্রুদ্ধ বিড়ালশাবকের মতো সতীশের উপর গিয়া পড়িত।

তখন কিরণ তাহাকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া মৃদুমিষ্টস্বরে বলিলেন, "নীলু, যদি সেই দোয়াতটা নিয়ে থাকিস আমাকে আস্তে আস্তে দিয়ে যা, তোকে কেউ কিছু বলবে না।"

তখন নীলকান্তের চোখ ফাটিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, অবশেষে সে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিরণ বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "নীলকান্ত কখনোই চুরি করে নি।"

শরৎ এবং সতীশ উভয়েই বলিতে লাগিলেন, "নিশ্চয়, নীলকান্ত ছাড়া আর কেহই চুরি করে নি।"

কিরণ সবলে বলিলেন, "কখনোই না।"

শরৎ নীলকান্তকে ডাকিয়া সওয়াল করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিরণ বলিলেন, "না, উহাকে এই চুরি সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না।"

সতীশ কহিলেন, "উহার ঘর এবং বাক্স খুঁজিয়া দেখা উচিত।"

কিরণ বলিলেন, "তাহা যদি কর, তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আমার জন্মশোধ আড়ি হইবে। নির্দোষীর প্রতি কোনোরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পাইবে না।"

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের পাতা দুই ফোঁটা জলে ভিজিয়া উঠিল। তাহার

পর সেই দুটি করুণ চক্ষুর অশ্রুজলের দোহাই মানিয়া নীলকান্তের প্রতি আর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হইল না।

নিরীহ আশ্রিত বালকের প্রতি এইরূপ অত্যাচারে কিরণের মনে অত্যন্ত দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি ভালো দুইজোড়া ফরাশডাঙার ধুতিচাদর, দুইটি জামা, একজোড়া নূতন জুতা এবং একটি দশ টাকার নোট লইয়া সন্ধ্যাবেলায় নীলকান্তের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নীলকান্তকে না বলিয়া সেই স্নেহ-উপহারগুলি আস্তে আস্তে তাহার বাক্সর মধ্যে রাখিয়া আসিবেন। টিনের বাক্সটিও তাঁহার দত্ত।

আঁচল হইতে চাবির গোচ্ছা লইয়া নিঃশব্দে সেই বাক্স খুলিলেন। কিন্তু তাঁহার উপহারগুলি ধরাইতে পারিলেন না। বাক্সর মধ্যে লাটাই, কঞ্চি, কাঁচা আম কাটিবার জন্য ঘষা ঝিনুক, ভাঙা গ্লাসের তলা প্রভৃতি নানা জাতীয় পদার্থ স্তূপাকারে রক্ষিত।

কিরণ ভাবিলেন, বাক্সটি ভালো করিয়া গুছাইয়া তাহার মধ্যে সকল জিনিস ধরাইতে পারিবেন। সেই উদ্দেশে বাক্সটি খালি করিতে লাগিলেন। প্রথমে লাটাই লাঠিম ছুরি ছড়ি প্রভৃতি বাহির হইতে লাগিল; তাহার পরে খানকয়েক ময়লা এবং কাচা কাপড় বাহির হইল, তাহার পরে সকলের নীচে হঠাৎ সতীশের সেই বহুযত্নের রাজহংসশোভিত দোয়াতদানটি বাহির হইয়া আসিল।

কিরণ আশ্চর্য হইয়া আরক্তিমমুখে অনেকক্ষণ সেটি হাতে করিয়া লইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে কখন নীলকান্ত পশ্চাৎ হইতে ঘরে প্রবেশ করিল তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। নীলকান্ত সমস্তই দেখিল, মনে করিল, কিরণ স্বয়ং চোরের মতো তাহার চুরি ধরিতে আসিয়াছেন এবং তাহার চুরিও ধরা পড়িয়াছে। সে যে সামান্য চোরের মতো লোভে পড়িয়া চুরি করে নাই, সে যে কেবল প্রতিহিংসাসাধনের জন্য এ কাজ করিয়াছে, সে যে ঐ জিনিসটা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল, কেবল এক মুহূর্তের দুর্বলতাবশত ফেলিয়া না দিয়া নিজের বাক্সর মধ্যে পুরিয়াছে, সে-সকল কথা সে কেমন করিয়া বুঝাইবে। সে চোর নয়, সে চোর নয়! তবে সে কী। কেমন করিয়া বলিবে সে কী। সে চুরি করিয়াছে কিন্তু সে চোর নহে। কিরণ যে তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, এ নিষ্ঠুর অন্যায় সে কিছুতেই বুঝাইতেও পারিবে না, বহন করিতেও পারিবে না।

কিরণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই দোয়াতদানটা বাক্সর ভিতরে রাখিলেন। চোরের মতো তাহার উপরে ময়লা কাপড় চাপা দিলেন, তাহার উপরে বালকের লাটাই

লাঠি লাঠিম ঝিনুক কাঁচের টুকরা প্রভৃতি সমস্তই রাখিলেন এবং সর্বোপরি তাঁহার উপহারগুলি ও দশ টাকার নোটটি সাজাইয়া রাখিলেন।

কিন্তু পরের দিন সেই ব্রাহ্মণবালকের কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেল না। গ্রামের লোকেরা বলিল, তাহাকে দেখে নাই; পুলিস বলিল, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তখন শরৎ বলিলেন, "এইবার নীলকান্তের বাক্সটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্।"

কিরণ জেদ করিয়া বলিলেন, "সে কিছুতেই হইবে না।"

বলিয়া বাক্সটি আপন ঘরে আনাইয়া দোয়াতটি বাহির করিয়া গোপনে গঙ্গার জলে ফেলিয়া আসিলেন।

শরৎ সপরিবারে দেশে চলিয়া গেলেন; বাগান একদিনে শূন্য হইয়া গেল। কেবল নীলকান্তের সেই পোষা গ্রাম্য কুকুরটা আহার ত্যাগ করিয়া নদীর ধারে ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ফাল্গুন ১৩০১

দিদি

প্রথম পরিচ্ছেদ

পল্লীবাসিনী কোনো এক হতভাগিনীর অন্যায়কারী অত্যাচারী স্বামীর দুষ্কৃতিসকল সবিস্তারে বর্ণনপূর্বক প্রতিবেশিনী তারা অত্যন্ত সংক্ষেপে নিজের রায় প্রকাশ করিয়া কহিল, "এমন স্বামীর মুখে আগুন।"

শুনিয়া জয়গোপালবাবুর স্ত্রী শশী অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিলেন— স্বামীজাতির মুখে চুরটের আগুন ছাড়া অন্য কোনো প্রকার আগুন কোনো অবস্থাতেই কামনা করা স্ত্রীজাতিকে শোভা পায় না।

অতএব এ সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎ সংকোচ প্রকাশ করাতে কঠিনহৃদয় তারা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কহিল, "এমন স্বামী থাকার চেয়ে সাতজন্ম বিধবা হওয়া ভালো।" এই বলিয়া সে সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল।

শশী মনে মনে কহিল, স্বামীর এমন কোনো অপরাধ কল্পনা করিতে পারি না, যাহাতে তাঁহার প্রতি মনের ভাব এত কঠিন হইয়া উঠিতে পারে। এই কথা মনের মধ্যে আলোচনা করিতে করিতেই তাহার কোমল হৃদয়ের সমস্ত প্রীতিরস তাহার প্রবাসী স্বামীর অভিমুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; শয্যাতলে তাহার স্বামী যে অংশে শয়ন করিত

সেই অংশের উপর বাহু প্রসারণ করিয়া পড়িয়া শূন্য বালিশকে চুম্বন করিল, বালিশের মধ্যে স্বামীর মাথার আভ্রাণ অনুভব করিল এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া কাঠের বাক্স হইতে স্বামীর একখানি বহুকালের লুপ্তপ্রায় ফোটোগ্রাফ এবং হাতের লেখা চিঠিগুলি বাহির করিয়া বসিল। সেদিনকার নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন এইরূপে নিভৃত কক্ষে নির্জন চিন্তায় পুরাতন স্মৃতিতে এবং বিষাদের অশ্রুজলে কাটিয়া গেল।

শশিকলা এবং জয়গোপালের যে নবদাম্পত্য তাহা নহে। বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল, ইতিমধ্যে সন্তানাদিও হইয়াছে। উভয়ে বহুকাল একত্রে অবস্থান করিয়া নিতান্ত সহজ সাধারণ ভাবেই দিন কাটিয়াছে। কোনো পক্ষেই অপরিমিত প্রেমোচ্ছ্বাসের কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই। প্রায় ষোল বৎসর একাদিক্রমে অবিচ্ছেদে যাপন করিয়া হঠাৎ কর্মবশে তাহার স্বামী বিদেশে চলিয়া যাওয়ার পর শশীর মনে একটা প্রবল প্রেমাবেগ জাগ্রত হইয়া উঠিল। বিরহের দ্বারা বন্ধনে যতই টান পড়িল কোমল হৃদয়ে প্রেমের ফাঁস ততই শক্ত করিয়া আঁটিয়া ধরিল ; ঢিলা অবস্থায় যাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে নাই এখন তাহার বেদনা টন্‌টন্‌ করিতে লাগিল।

তাই আজ এতদিন পরে এত বয়সে ছেলের মা হইয়া শশী বসন্তমধ্যাহ্নে নির্জন ঘরে বিরহশয্যায় উন্মেষিতযৌবনা নববধূর সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যে প্রেম অজ্ঞাতভাবে জীবনের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে সহসা আজ তাহারই কলগীতিশব্দে জাগ্রত হইয়া মনে মনে তাহারই উজান বাহিয়া দুই তীরে বহুদূরে অনেক সোনার পুরী অনেক কুঞ্জবন দেখিতে লাগিল— কিন্তু সেই অতীত সুখসম্ভাবনার মধ্যে এখন আর পদার্পণ করিবার স্থান নাই। মনে করিতে লাগিল, "এইবার যখন স্বামীকে নিকটে পাইব তখন জীবনকে নীরস এবং বসন্তকে নিষ্ফল হইতে দিব না।" কতদিন কতবার তুচ্ছ তর্কে সামান্য কলহে স্বামীর প্রতি সে উপদ্রব করিয়াছে ; আজ অনুতপ্তচিত্তে একান্ত মনে সংকল্প করিল, আর কখনোই সে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবে না, স্বামীর ইচ্ছায় বাধা দিবে না, স্বামীর আদেশ পালন করিবে, প্রীতিপূর্ণ নম্র হৃদয়ে স্বামীর ভালোমন্দ সমস্ত আচরণ সহ্য করিবে— কারণ, স্বামী সর্বস্ব, স্বামী প্রিয়তম, স্বামী দেবতা।

অনেকদিন পর্যন্ত শশিকলা তাহার পিতামাতার একমাত্র আদরের কন্যা ছিল। সেই জন্য জয়গোপাল যদিও সামান্য চাকরি করিত, তবু ভবিষ্যতের জন্য তাহার কিছুমাত্র ভাবনা ছিল না। পল্লীগ্রামে রাজভোগে থাকিবার পক্ষে তাহার শ্বশুরের যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল।

এমন সময় নিতান্ত অকালে প্রায় বৃদ্ধবয়সে শশিকলার পিতা কালীপ্রসন্নের একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। সত্য কথা বলিতে কি, পিতামাতার এইরূপ অনপেক্ষিত অসংগত

অন্যায় আচরণে শশী মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল; জয়গোপালও সবিশেষ প্রীতিলাভ করে নাই।

অধিক বয়সের ছেলেটির প্রতি পিতামাতার স্নেহ অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিল। এই নবাগত, ক্ষুদ্রকায়, স্তন্যপিপাসু, নিদ্রাতুর শ্যালকটি অজ্ঞাতসারে দুই দুর্বল হস্তের অতি ক্ষুদ্র বদ্ধমুষ্টির মধ্যে জয়গোপালের সমস্ত আশাভরসা যখন অপহরণ করিয়া বসিল, তখন সে আসামের চা বাগানে এক চাকরি লইল।

নিকটবর্তী স্থানে চাকরির সন্ধান করিতে সকলেই তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিল— কিন্তু সর্বসাধারণের উপর রাগ করিয়াই হউক অথবা চা-বাগানে দ্রুত বাড়িয়া উঠিবার কোনো উপায় জানিয়াই হউক, জয়গোপাল কাহারো কথায় কর্ণপাত করিল না; শশীকে সন্তানসহ তাহার বাপের বাড়ি রাখিয়া সে আসামে চলিয়া গেল। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর এই প্রথম বিচ্ছেদ।

এই ঘটনায় শিশু ভ্রাতাটির প্রতি শশিকলার ভারি রাগ হইল। যে মনের আক্ষেপ মুখ ফুটিয়া বলিবার জো নাই তাহারই আক্রোশটা সব চেয়ে বেশি হয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি আরামে স্তনপান করিতে ও চক্ষু মুদিয়া নিদ্রা দিতে লাগিল এবং তাহার বড়ো ভগিনীটি— দুধ গরম, ভাত ঠাণ্ডা, ছেলের ইস্কুলে যাওয়ার দেরি প্রভৃতি নানা উপলক্ষে নিশিদিন মান অভিমান করিয়া অস্থির হইল এবং অস্থির করিয়া তুলিল।

অল্প দিনের মধ্যেই ছেলেটির মার মৃত্যু হইল; মরিবার পূর্বে জননী তাঁহার কন্যার হাতে শিশুপুত্রটিকে সমর্পণ করিয়া দিয়া গেলেন।

তখন অনতিবিলম্বেই সেই মাতৃহীন ছেলেটি অনায়াসেই তাহার দিদির হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। হুহুংকার শব্দপূর্বক সে যখন তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরম আগ্রহের সহিত দন্তহীন ক্ষুদ্র মুখের মধ্যে তাহার মুখ চক্ষু নাসিকা সমস্তটা গ্রাস করিবার চেষ্টা করিত, ক্ষুদ্র মুষ্টির মধ্যে তাহার কেশগুচ্ছ লইয়া কিছুতেই দখল ছাড়িতে চাহিত না, সূর্যোদয় হইবার পূর্বেই জাগিয়া উঠিয়া গড়াইয়া তাহার গায়ের কাছে আসিয়া কোমল স্পর্শে তাহাকে পুলকিত করিয়া মহাকলরব আরম্ভ করিয়া দিত; যখন ক্রমে সে তাহাকে জিজি এবং জিজিমা বলিয়া ডাকিতে লাগিল, এবং কাজকর্ম ও অবসরের সময় নিষিদ্ধ কার্য করিয়া, নিষিদ্ধ খাদ্য খাইয়া, নিষিদ্ধ স্থানে গমনপূর্বক তাহার প্রতি বিধিমতো উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিল, তখন শশী আর থাকিতে পারিল না। এই স্বেচ্ছাচারী ক্ষুদ্র অত্যাচারীর নিকটে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া দিল। ছেলেটির মা ছিল না বলিয়া, তাহার প্রতি তাহার আধিপত্য ঢের বেশি হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছেলেটির নাম হইল নীলমণি। তাহার বয়স যখন দুই বৎসর তখন তাহার পিতার কঠিন পীড়া হইল। অতি শীঘ্র চলিয়া আসিবার জন্য জয়গোপালের নিকট পত্র গেল। জয়গোপাল যখন বহু চেষ্টায় ছুটি লইয়া আসিয়া পৌঁছিল তখন কালীপ্রসন্নের মৃত্যুকাল উপস্থিত।

মৃত্যুর পূর্বে কালীপ্রসন্ন নাবালক ছেলেটির তত্ত্বাবধানের ভার জয়গোপালের প্রতি অর্পণ করিয়া তাঁহার বিষয়ের সিকি অংশ কন্যার নামে লিখিয়া দিলেন।

সুতরাং বিষয়রক্ষার জন্য জয়গোপালকে কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতে হইল।

অনেকদিনের পরে স্বামীস্ত্রীর পুনর্মিলন হইল। একটা জড়পদার্থ ভাঙিয়া গেলে আবার ঠিক তাহার খাঁজে খাঁজে মিলাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু দুটি মানুষকে যেখানে বিচ্ছিন্ন করা হয় দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আর ঠিক সেখানে রেখায় রেখায় মেলে না। কারণ, মন জিনিসটা সজীব পদার্থ, নিমেষে নিমেষে তাহার পরিণতি এবং পরিবর্তন।

শশীর পক্ষে এই নূতন মিলনে নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। সে যেন তাহার স্বামীকে ফিরিয়া বিবাহ করিল। পুরাতন দাম্পত্যের মধ্যে চিরাভ্যাসবশত যে এক অসাড়তা জন্মিয়া গিয়াছিল, বিরহের আকর্ষণে তাহা অপসৃত হইয়া সে তাহার স্বামীকে যেন পূর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণতর ভাবে প্রাপ্ত হইল; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন দিনই আসুক, যতদিনই যাক, স্বামীর প্রতি এই দীপ্ত প্রেমের উজ্জ্বলতাকে কখনোই ম্লান হইতে দিব না।

নূতন মিলনে জয়গোপালের মনের অবস্থাটা অন্যরূপ। পূর্বে যখন উভয়ে অবিচ্ছেদে একত্রে ছিল, যখন স্ত্রীর সহিত তাহার সমস্ত স্বার্থের এবং বিচিত্র অভ্যাসের ঐক্যবন্ধন ছিল, স্ত্রী তখন জীবনের একটি নিত্য সত্য হইয়াছিল— তাহাকে বাদ দিতে গেলে দৈনিক অভ্যাসজালের মধ্যে সহসা অনেকখানি ফাঁক পড়িত। এইজন্য বিদেশে গিয়া জয়গোপাল প্রথম প্রথম অগাধ জলের মধ্যে পড়িয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তাহার সেই অভ্যাসবিচ্ছেদের মধ্যে নূতন অভ্যাসের তালি লাগিয়া গেল।

কেবল তাহাই নহে। পূর্বে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নিশ্চিন্তভাবে তাহার দিন কাটিয়া যাইত। মাঝে দুই বৎসর অবস্থা-উন্নতি-চেষ্টা তাহার মনে এমন প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার মনের সম্মুখে আর কিছুই ছিল না। এই নূতন নেশার তীব্রতার তুলনায় তাহার পূর্বজীবন বস্তুহীন ছায়ার মতো দেখাইতে লাগিল। স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে প্রধান পরিবর্তন ঘটায় প্রেম, এবং পুরুষের ঘটায় দুশ্চেষ্টা।

জয়গোপাল দুই বৎসর পরে আসিয়া অবিকল তাহার পূর্ব স্ত্রীটিকে ফিরিয়া পাইল না। তাহার স্ত্রীর জীবনে শিশু শ্যালকটি একটা নূতন পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছে। এই অংশটি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এই অংশে স্ত্রীর সহিত তাহার কোনো যোগ নাই। স্ত্রী তাহাকে আপনার এই শিশুস্নেহের ভাগ দিবার অনেক চেষ্টা করিত, কিন্তু ঠিক কৃতকার্য হইত কি না বলিতে পারি না।

শশী নীলমণিকে কোলে করিয়া আনিয়া হাস্যমুখে তাহার স্বামীর সম্মুখে ধরিত— নীলমণি প্রাণপণে শশীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাঁধে মুখ লুকাইত, কোনো প্রকার কুটুম্বিতার খাতির মানিত না। শশীর ইচ্ছা, তাহার এই ক্ষুদ্র ভ্রাতাটির যত প্রকার মন ভুলাইবার বিদ্যা আয়ত্ত আছে, সবগুলি জয়গোপালের নিকট প্রকাশ হয়; কিন্তু জয়গোপালও সেজন্য বিশেষ আগ্রহ অনুভব করিত না এবং শিশুটিও বিশেষ উৎসাহ দেখাইত না। জয়গোপাল কিছুতেই বুঝিতে পারিত না, এই কৃশকায় বৃহৎমস্তক গম্ভীরমুখ শ্যামবর্ণ ছেলেটার মধ্যে এমন কী আছে যেজন্য তাহার প্রতি এতটা স্নেহের অপব্যয় করা হইতেছে।

ভালোবাসার ভাবগতিক মেয়েরা খুব চট করিয়া বোঝে। শশী অবিলম্বেই বুঝিল, জয়গোপাল নীলমণির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত নহে। তখন ভাইটিকে সে বিশেষ সাবধানে আড়াল করিয়া রাখিত— স্বামীর স্নেহহীন বিরাগদৃষ্টি হইতে তাহাকে তফাতে রাখিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে ছেলেটি তাহার গোপন যত্নের ধন, তাহার একলার স্নেহের সামগ্রী হইয়া উঠিল। সকলেই জানেন, স্নেহ যত গোপনের, যত নির্জনের হয় ততই প্রবল হইতে থাকে।

নীলমণি কাঁদিলে জয়গোপাল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিত, এই জন্য শশী তাহাকে তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে চাপিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া, বুক দিয়া, তাহার কান্না থামাইবার চেষ্টা করিত— বিশেষত, নীলমণির কান্নায় যদি রাত্রে তাহার স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত হইত এবং স্বামী এই ক্রন্দনপরায়ণ ছেলেটার প্রতি অত্যন্ত হিংস্রভাবে ঘৃণা প্রকাশপূর্বক জর্জর চিত্তে গর্জন করিয়া উঠিত তখন শশী যেন অপরাধিনীর মতো সংকুচিত শশব্যস্ত হইয়া পড়িত; তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে করিয়া দূরে লইয়া গিয়া একান্ত সানুনয় স্নেহের স্বরে 'সোনা আমার, ধন আমার, মানিক আমার' বলিয়া ঘুম পাড়াইতে থাকিত।

ছেলেতে ছেলেতে নানা উপলক্ষে ঝগড়া বিবাদ হইয়াই থাকে। পূর্বে এরূপ স্থলে শশী নিজের ছেলেদের দণ্ড দিয়া ভাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করিত, কারণ, তাহার মা ছিল না। এখন বিচারকের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডবিধির পরিবর্তন হইল। এখন সর্বদাই নিরপরাধে এবং অবিচারে নীলমণিকে কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হইত। সেই অন্যায়

শশীর বক্ষে শেলের মতো বাজিত ; তাই সে দণ্ডিত ভ্রাতাকে ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে মিষ্ট দিয়া, খেলেনা দিয়া, আদর করিয়া, চুমো খাইয়া শিশুর আহত হৃদয়ে যথাসাধ্য সান্ত্বনা-বিধান করিবার চেষ্টা করিত।

ফলত দেখা গেল, শশী নীলমণিকে যতই ভালোবাসে জয়গোপাল নীলমণির প্রতি ততই বিরক্ত হয়, আবার জয়গোপাল নীলমণির প্রতি যতই বিরাগ প্রকাশ করে শশী তাহাকে ততই স্নেহসুধায় অভিষিক্ত করিয়া দিতে থাকে।

জয়গোপাল লোকটা কখনো তাহার স্ত্রীর প্রতি কোনোরূপ কঠোর ব্যবহার করে না এবং শশী নীরবে নম্রভাবে প্রীতির সহিত তাহার স্বামীর সেবা করিয়া থাকে ; কেবল এই নীলমণিকে লইয়া ভিতরে ভিতরে উভয়ে উভয়কে অহরহ আঘাত দিতে লাগিল।

এইরূপ নীরব দ্বন্দ্বের গোপন আঘাতপ্রতিঘাত প্রকাশ্য বিবাদের অপেক্ষা ঢের বেশি দুঃসহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নীলমণির সমস্ত শরীরের মধ্যে মাথাটাই সর্বপ্রধান ছিল। দেখিলে মনে হইত, বিধাতা যেন একটা সরু কাঠির মধ্যে ফুঁ দিয়া তাহার ডগার উপরে একটা বড়ো বুদ্‌বুদ্ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ডাক্তাররাও মাঝে মাঝে আশঙ্কা প্রকাশ করিত, ছেলেটি এইরূপ বুদ্‌বুদের মতোই ক্ষণভঙ্গুর ক্ষণস্থায়ী হইবে। অনেকদিন পর্যন্ত সে কথা কহিতে এবং চলিতে শেখে নাই। তাহার বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ দেখিয়া বোধ হইত, তাহার পিতামাতা তাঁহাদের অধিক বয়সের সমস্ত চিন্তাভার এই ক্ষুদ্র শিশুর মাথার উপরে চাপাইয়া দিয়া গেছেন।

দিদির যত্নে ও সেবায় নীলমণি তাহার বিপদের কাল উত্তীর্ণ হইয়া ছয় বৎসরে পা দিল।

কার্তিক মাসে ভাইফোঁটার দিনে নূতন জামা চাদর এবং একখানি লালপেড়ে ধুতি পরাইয়া বাবু সাজাইয়া নীলমণিকে শশী ভাইফোঁটা দিতেছেন এমন সময়ে পূর্বোক্ত স্পষ্টভাষিণী প্রতিবেশিনী তারা আসিয়া কথায় কথায় শশীর সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দিল।

সে কহিল, গোপনে ভাইয়ের সর্বনাশ করিয়া ঘটা করিয়া ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিবার কোনো ফল নাই।

শুনিয়া শশী বিস্ময়ে ক্রোধে বেদনায় বজ্রাহত হইল। অবশেষে শুনিতে পাইল, তাহারা স্বামীস্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া নাবালক নীলমণির সম্পত্তি খাজনার দায়ে নিলাম করাইয়া তাহার স্বামীর পিসতুতো ভাইয়ের নামে বেনামি করিয়া কিনিতেছে।

শুনিয়া শশী অভিশাপ দিল, যাহারা এতবড়ো মিথ্যা কথা রটনা করিতে পারে তাহাদের মুখে কুষ্ঠ হউক।

এই বলিয়া সরোদনে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া জনশ্রুতির কথা তাহাকে জানাইল।

জয়গোপাল কহিল, "আজকালকার দিনে কাহাকেও বিশ্বাস করিবার জো নাই। উপেন আমার আপন পিসতুতো ভাই, তাহার উপরে বিষয়ের ভার দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম— সে কখন গোপনে খাজনা বাকি ফেলিয়া মহল হাসিলপুর নিজে কিনিয়া লইয়াছে, আমি জানিতেও পারি নাই।"

শশী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নালিশ করিবে না?"

জয়গোপাল কহিল, "ভাইয়ের নামে নালিশ করি কী করিয়া। এবং নালিশ করিয়াও তো কোনো ফল নাই, কেবল অর্থ নষ্ট।"

স্বামীর কথা বিশ্বাস করা শশীর পরম কর্তব্য, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন এই সুখের সংসার, এই প্রেমের গার্হস্থ্য সহসা তাহার নিকট অত্যন্ত বিকট বীভৎস আকার ধারণ করিয়া দেখা দিল। যে সংসারকে আপনার পরম আশ্রয় বলিয়া মনে হইত, হঠাৎ দেখিল, সে একটা নিষ্ঠুর স্বার্থের ফাঁদ— তাহাদের দুটি ভাইবোনকে চারি দিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। সে একা স্ত্রীলোক, অসহায় নীলমণিকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে ভাবিয়া কূলকিনারা পাইল না। যতই চিন্তা করিতে লাগিল ততই ভয়ে এবং ঘৃণায় এবং বিপন্ন বালক ভ্রাতাটির প্রতি অপরিসীম স্নেহে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যদি উপায় জানিত তবে লাটসাহেবের নিকট নিবেদন করিয়া, এমন-কি, মহারানীর নিকট পত্র লিখিয়া তাহার ভাইয়ের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিত। মহারানী কখনোই নীলমণির বার্ষিক সাত শো আটান্ন টাকা মুনফার হাসিলপুর মহল বিক্রয় হইতে দিতেন না।

এইরূপে শশী যখন একেবারে মহারানীর নিকট দরবার করিয়া তাহার পিসতুতো দেবরকে সম্পূর্ণ জব্দ করিয়া দিবার উপায় চিন্তা করিতেছে তখন হঠাৎ নীলমণির জ্বর আসিয়া আক্ষেপ-সহকারে মূর্ছা হইতে লাগিল।

জয়গোপাল এক গ্রাম্য নেটিভ ডাক্তারকে ডাকিল। শশী ভালো ডাক্তারের জন্য অনুরোধ করাতে জয়গোপাল বলিল, "কেন, মতিলাল মন্দ ডাক্তার কী!"

শশী তখন তাঁহার পায়ে পড়িল, মাথার দিব্য দিল; জয়গোপাল বলিল, "আচ্ছা, শহর হইতে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইতেছি।"

শশী নীলমণিকে কোলে করিয়া, বুকে করিয়া পড়িয়া রহিল। নীলমণিও তাহাকে

একদণ্ড চোখের আড়াল হইতে দেয় না ; পাছে ফাঁকি দিয়া পালায় এই ভয়ে তাহাকে জড়াইয়া থাকে, এমন-কি, ঘুমাইয়া পড়িলেও আঁচলটি ছাড়ে না।

সমস্ত দিন এমনি ভাবে কাটিলে সন্ধ্যার পর জয়গোপাল আসিয়া বলিল, "শহরে ডাক্তারবাবুকে পাওয়া গেল না, তিনি দূরে কোথায় রোগী দেখিতে গিয়াছেন।" ইহাও বলিল, "মকদ্দমা-উপলক্ষে আমাকে আজই অন্যত্র যাইতে হইতেছে ; আমি মতিলালকে বলিয়া গেলাম, সে নিয়মিত আসিয়া রোগী দেখিয়া যাইবে।"

রাত্রে নীলমণি ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকিল। প্রাতঃকালেই শশী কিছুমাত্র বিচার না করিয়া রোগী ভ্রাতাকে লইয়া নৌকা চড়িয়া একেবারে শহরে গিয়া ডাক্তারের বাড়ি উপস্থিত হইল। ডাক্তার বাড়িতেই আছেন, শহর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। ভদ্র-স্ত্রীলোক দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাসা ঠিক করিয়া একটি প্রাচীনা বিধবার তত্ত্বাবধানে শশীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন এবং ছেলেটির চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

পরদিনই জয়গোপাল আসিয়া উপস্থিত। ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হইয়া স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত ফিরিতে অনুমতি করিল।

স্ত্রী কহিল, "আমাকে যদি কাটিয়া ফেল তবু আমি এখন ফিরিব না ; তোমরা আমার নীলমণিকে মারিয়া ফেলিতে চাও ; উহার মা নাই, বাপ নাই, আমি ছাড়া উহার আর কেহ নাই, আমি উহাকে রক্ষা করিব।"

জয়গোপাল রাগিয়া কহিল, "তবে এইখানেই থাকো, তুমি আর আমার ঘরে ফিরিয়ো না।"

শশী তখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, "ঘর তোমার কী ! আমার ভাইয়েরই তো ঘর।"

জয়গোপাল কহিল, "আচ্ছা, সে দেখা যাইবে !"

পাড়ার লোকে এই ঘটনায় কিছুদিন খুব আন্দোলন করিতে লাগিল। প্রতিবেশিনী তারা কহিল, "স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিতে হয় ঘরে বসিয়া কর্-না, বাপু ; ঘর ছাড়িয়া যাইবার আবশ্যক কী। হাজার হউক, স্বামী তো বটে।"

সঙ্গে যাহা টাকা ছিল সমস্ত খরচ করিয়া, গহনাপত্র বেচিয়া শশী তাহার ভাইকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিল। তখন সে খবর পাইল, দ্বারিগ্রামে তাহাদের যে বড়ো জোত ছিল, যে জোতের উপরে তাহাদের বাড়ি, নানারূপে যাহার আয় প্রায় বার্ষিক দেড়হাজার টাকা হইবে, সেই জোতটি জমিদারের সহিত যোগ করিয়া জয়গোপাল নিজের নামে খারিজ করিয়া লইয়াছে। এখন বিষয়টি সমস্তই তাহাদের, তাহার ভাইয়ের নহে।

ব্যামো হইতে সারিয়া উঠিয়া নীলমণি করুণস্বরে বলিতে লাগিল, "দিদি, বাড়ি

চলো।" সেখানে তাহার সঙ্গী ভাগিনেয়দের জন্য তাহার মন-কেমন করিতেছে। তাই বারংবার বলিল, "দিদি, আমাদের সেই ঘরে চলো-না, দিদি!" শুনিয়া দিদি কেবলই কাঁদিতে লাগিল। "আমাদের ঘর আর কোথায়!"

কিন্তু কেবল কাঁদিয়া কোনো ফল নাই, তখন পৃথিবীতে দিদি ছাড়া তাহার ভাইয়ের আর কেহ ছিল না। ইহা ভাবিয়া চোখের জল মুছিয়া শশী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারিণীবাবুর অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ধরিল।

ডেপুটিবাবু জয়গোপালকে চিনিতেন। ভদ্রঘরের স্ত্রী ঘরের বাহির হইয়া বিষয়-সম্পত্তি লইয়া স্বামীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে চাহে, ইহাতে শশীর প্রতি তিনি বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ জয়গোপালকে পত্র লিখিলেন। জয়গোপাল শ্যালকসহ তাহার স্ত্রীকে বলপূর্বক নৌকায় তুলিয়া বাড়ি লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল।

স্বামিস্ত্রীতে দ্বিতীয় বিচ্ছেদের পর পুনশ্চ এই দ্বিতীয়বার মিলন হইল। প্রজাপতির নির্বন্ধ!

অনেকদিন পরে ঘরে ফিরিয়া পুরাতন সহচরদিগকে পাইয়া নীলমণি বড়ো আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সেই নিশ্চিন্ত আনন্দ দেখিয়া অন্তরে অন্তরে শশীর হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শীতকালে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মফঃস্বল পর্যবেক্ষণে বাহির হইয়া শিকারসন্ধানে গ্রামের মধ্যে তাঁবু ফেলিয়াছেন। গ্রামের পথে সাহেবের সঙ্গে নীলমণির সাক্ষাৎ হয়। অন্য বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চাণক্যশ্লোকের কিঞ্চিৎ পরিবর্তনপূর্বক নখী দন্তী শৃঙ্গী প্রভৃতির সহিত সাহেবকেও যোগ করিয়া যথেষ্ট দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু, সুগম্ভীর-প্রকৃতি নীলমণি অটল কৌতূহলের সহিত প্রশান্তভাবে সাহেবকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

সাহেব সকৌতুকে কাছে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পাঠশালায় পড়?"

বালক নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, "হাঁ।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ পুস্তক পড়িয়া থাক?"

নীলমণি পুস্তক শব্দের অর্থ না বুঝিয়া নিস্তব্ধভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত এই পরিচয়ের কথা নীলমণি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার দিদির নিকট বর্ণনা করিল।

মধ্যাহ্নে চাপকান প্যাণ্টলুন পাগড়ি পরিয়া জয়গোপাল ম্যাজিস্ট্রেটকে সেলাম করিতে গিয়াছে। অর্থী প্রত্যর্থী চাপরাশি কনস্টেবলে চারি দিক লোকারণ্য। সাহেব গরমের ভয়ে তাম্বুর বাহিরে খোলা ছায়ায় ক্যাম্প টেবিল পাতিয়া বসিয়াছেন এবং জয়গোপালকে চৌকিতে বসাইয়া তাহাকে স্থানীয় অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। জয়গোপাল তাহার গ্রামবাসী সর্বসাধারণের সমক্ষে এই গৌরবের আসন অধিকার করিয়া মনে মনে স্ফীত হইতেছিল এবং মনে করিতেছিল, 'এই সময়ে চক্রবর্তীরা এবং নন্দীরা কেহ আসিয়া দেখিয়া যায় তো বেশ হয়!'

এমন সময় নীলমণিকে সঙ্গে করিয়া অবগুণ্ঠনাবৃত একটি স্ত্রীলোক একেবারে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "সাহেব, তোমার হাতে আমার এই অনাথ ভাইটিকে সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে রক্ষা করো।"

সাহেব তাঁহার সেই পূর্বপরিচিত বৃহৎমস্তক গম্ভীরপ্রকৃতি বালকটিকে দেখিয়া এবং স্ত্রীলোকটিকে ভদ্রস্ত্রীলোক বলিয়া অনুমান করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, "আপনি তাঁবুতে প্রবেশ করুন।"

স্ত্রীলোকটি কহিল, "আমার যাহা বলিবার আছে আমি এইখানেই বলিব।"

জয়গোপাল বিবর্ণমুখে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কৌতূহলী গ্রামের লোকেরা পরম কৌতুক অনুভব করিয়া চারি দিকে ঘেঁষিয়া আসিবার উপক্রম করিল। সাহেব বেত উচাইবামাত্র সকলে দৌড় দিল।

তখন শশী তাহার ভ্রাতার হাত ধরিয়া সেই পিতৃমাতৃহীন বালকের সমস্ত ইতিহাস আদ্যোপান্ত বলিয়া গেল। জয়গোপাল মধ্যে মধ্যে বাধা দিবার উপক্রম করাতে ম্যাজিস্ট্রেট রক্তবর্ণ মুখে গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চুপ রও!" এবং বেত্রাগ্র দ্বারা তাহাকে চৌকি ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইতে নির্দেশ করিয়া দিলেন।

জয়গোপাল মনে মনে শশীর প্রতি গর্জন করিতে করিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নীলমণি দিদির অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

শশীর কথা শেষ হইলে ম্যাজিস্ট্রেট জয়গোপালকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন এবং তাহার উত্তর শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশীকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, "বাছা, এ মকর্দমা যদিও আমার কাছে উঠিতে পারে না তথাপি তুমি নিশ্চিন্ত থাকো— এ-সম্বন্ধে যাহা কর্তব্য আমি করিব। তুমি তোমার ভাইটিকে লইয়া নির্ভয়ে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পার।"

শশী কহিল, "সাহেব, যতদিন নিজের বাড়ি ও না ফিরিয়া পায়, ততদিন আমার ভাইকে বাড়ি লইয়া যাইতে আমি সাহস করি না। এখন নীলমণিকে তুমি নিজের কাছে না রাখিলে ইহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।"

সাহেব কহিলেন, "তুমি কোথায় যাইবে ?"

শশী কহিল, "আমি আমার স্বামীর ঘরে ফিরিয়া যাইব, আমার কোনো ভাবনা নাই।"

সাহেব ঈষৎ হাসিয়া অগত্যা এই গলায়-মাদুলি-পরা কৃশকায় শ্যামবর্ণ গম্ভীর প্রশান্ত মৃদুস্বভাব বাঙালির ছেলেটিকে সঙ্গে লইতে রাজি হইলেন।

তখন শশী বিদায় লইবার সময় বালক তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল। সাহেব কহিলেন, "বাবা, তোমার কোনো ভয় নেই— এসো।"

ঘোমটার মধ্য হইতে অবিরল অশ্রু মোচন করিতে করিতে শশী কহিল, "লক্ষ্মী ভাই, যা, ভাই— আবার তোর দিদির সঙ্গে দেখা হবে।"

এই বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া কোনোমতে আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল; অমনি সাহেব নীলমণিকে বাম হস্তের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন, সে 'দিদি গো, দিদি' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল— শশী একবার ফিরিয়া চাহিয়া দূর হইতে প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে তাহার প্রতি নীরবে সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে চলিয়া গেল।

আবার সেই বহুকালের চিরপরিচিত পুরাতন ঘরে স্বামীস্ত্রীর মিলন হইল। প্রজাপতির নির্বন্ধ !

কিন্তু, এ মিলন অধিকদিন স্থায়ী হইল না। কারণ, ইহার অনতিকাল পরেই একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসীগণ সংবাদ পাইল যে, রাত্রে শশী ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে এবং রাত্রেই তাহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেছে।

কেহ এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলিল না। কেবল সেই প্রতিবেশিনী তারা মাঝে মাঝে গর্জন করিয়া উঠিতে চাহিত, সকলে 'চুপ্ চুপ্' করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিত।

বিদায়কালে শশী ভাইকে কথা দিয়া গিয়াছিল, আবার দেখা হইবে। সে কথা কোন্‌খানে রক্ষা হইয়াছে জানি না।

চৈত্র ১৩০১

প্রবন্ধ

জাপানযাত্রী

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মহিলাবিদ্যাপীঠে রবীন্দ্রনাথ
কারুইজাওআ. জাপান, ১৯১৬

জাপানযাত্রী

বোম্বাই থেকে যতবার যাত্রা করেছি জাহাজ চলতে দেরি করে নি। কলকাতার জাহাজে যাত্রার আগের রাত্রে গিয়ে বসে থাকতে হয়। এটা ভালো লাগে না। কেননা, যাত্রা করবার মানেই মনের মধ্যে চলার বেগ সঞ্চয় করা। মন যখন চলবার মুখে তখন তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা, তার এক শক্তির সঙ্গে তার আর-এক শক্তির লড়াই বাধানো। মানুষ যখন ঘরের মধ্যে জমিয়ে বসে আছে তখন বিদায়ের আয়োজনটা এইজন্যেই কষ্টকর; কেননা, থাকার সঙ্গে যাওয়ার সন্ধিস্থলটা মনের পক্ষে মুশকিলের জায়গা— সেখানে তাকে দুই উলটো দিক সামলাতে হয়, সে একরকমের কঠিন ব্যায়াম।

বাড়ির লোকেরা সকলেই জাহাজে চড়িয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল, বন্ধুরা ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে বিদায় দিলে, কিন্তু জাহাজ চললো না। অর্থাৎ, যারা থাকবার তারাই গেল, আর যেটা চলবার সেটাই স্থির হয়ে রইল; বাড়ি গেল সরে, আর তরী রইল দাঁড়িয়ে।

বিদায়মাত্রেরই একটা ব্যথা আছে; সে ব্যথাটার প্রধান কারণ এই, জীবনে যা-কিছুকে সব-চেয়ে নির্দিষ্ট করে পাওয়া গেছে তাকে অনির্দিষ্টের আড়ালে সমর্পণ করে যাওয়া। তার বদলে হাতে হাতে আর-একটা কিছুকে পাওয়া না গেলে এই শূন্যতাটাই মনের মধ্যে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সেই পাওনাটা হচ্ছে অনির্দিষ্টকে ক্রমে ক্রমে নির্দিষ্টের ভাণ্ডারের মধ্যে পেয়ে চলতে থাকা। অপরিচয়কে ক্রমে ক্রমে পরিচয়ের কোঠার মধ্যে ভুক্ত করে নিতে থাকা। সেইজন্যে যাত্রার মধ্যে যে দুঃখ আছে চলাটাই হচ্ছে তার ওষুধ। কিন্তু, যাত্রা করলুম অথচ চললুম না, এটা সহ্য করা শক্ত।

অচল জাহাজের ক্যাবিন হচ্ছে বন্ধনদশার দ্বিগুণ-চোলাই-করা কড়া আরক। জাহাজ চলে বলেই তার কামরার সংকীর্ণতাকে আমরা ক্ষমা করি। কিন্তু, জাহাজ যখন স্থির থাকে তখন ক্যাবিনে স্থির থাকা, মৃত্যুর ঢাকনাটার নীচে আবার গোরের ঢাকনার মতো।

ডেকের উপরেই শোবার ব্যবস্থা করা গেল। ইতিপূর্বে অনেকবার জাহাজে চড়েছি, অনেক কাপ্তেনের সঙ্গে ব্যবহার করেছি। আমাদের এই জাপানি কাপ্তেনের একটু বিশেষত্ব আছে। মেলামেশায় ভালোমানুষিতে হঠাৎ মনে হয় ঘোরো লোকের মতো। মনে হয়, এঁকে অনুরোধ করে যা-খুশি তাই করা যেতে পারে; কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় নিয়মের লেশমাত্র নড়চড় হবার জো নেই। আমাদের সহযাত্রী ইংরেজ বন্ধু ডেকের উপরে তাঁর ক্যাবিনের গদি আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের ঘাড় নড়ল, সে ঘটে উঠল না। সকালে ব্রেকফাস্টের সময় তিনি যে-টেবিলে বসেছিলেন সেখানে পাখা ছিল না; আমাদের টেবিলে জায়গা ছিল, সেই দেখে তিনি আমাদের টেবিলে বসবার ইচ্ছা জানালেন। অনুরোধটা সামান্য, কিন্তু কাপ্তেন বললেন, এ-বেলাকার মতো বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, ডিনারের সময় দেখা যাবে। আমাদের টেবিলে চৌকি খালি রইল, কিন্তু তবু নিয়মের ব্যত্যয় হল না। বেশ বোঝা যাচ্ছে অতি অল্পমাত্রও ঢিলেঢালা কিছু হতে পারবে না।

রাত্রে বাইরে শোওয়া গেল, কিন্তু এ কেমনতরো বাইরে? জাহাজের মাস্তুলে মাস্তুলে আকাশটা যেন ভীষ্মের মতো শরশয্যায় শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। কোথাও শূন্যরাজ্যের ফাঁকা নেই। অথচ বস্তুরাজ্যের স্পষ্টতাও নেই। জাহাজের আলোগুলো মস্ত একটা আয়তনের সূচনা করেছে, কিন্তু কোনো আকারকে দেখতে দিচ্ছে না।

কোনো একটি কবিতায় প্রকাশ করেছিলুম যে আমি নিশীথরাত্রির সভাকবি। আমার বরাবর এ কথাই মনে হয় যে, দিনের বেলাটা মর্তলোকের, আর রাত্রিবেলাটা সুরলোকের। মানুষ ভয় পায়, মানুষ কাজকর্ম করে, মানুষ তার পায়ের কাছের পথটা স্পষ্ট করে দেখতে চায়, এইজন্যে এতবড়ো একটা আলো জ্বালতে হয়েছে। দেবতার ভয় নেই, দেবতার কাজ নিঃশব্দে গোপনে, দেবতার চলার সঙ্গে স্তব্ধতার কোনো বিরোধ নেই, এইজন্যেই অসীম অন্ধকার দেবসভার আস্তরণ। দেবতা রাত্রেই আমাদের বাতায়নে এসে দেখা দেন।

কিন্তু, মানুষের কারখানা যখন আলো জ্বালিয়ে সেই রাত্রিকেও অধিকার করতে চায় তখন কেবল যে মানুষই ক্লিষ্ট হয় তা নয়, দেবতাকেও ক্লিষ্ট করে তোলে। আমরা যখন থেকে বাতি জ্বেলে রাত জেগে এগ্‌জামিন পাস করতে প্রবৃত্ত হয়েছি তখন থেকে সূর্যের আলোয় সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট নিজের সীমানা লঙ্ঘন করতে লেগেছি, তখন থেকেই সুর-মানবের যুদ্ধ বেধেছে। মানুষের কারখানা-ঘরের চিমনিগুলো ফুঁ দিয়ে দিয়ে নিজের অন্তরের কালিকে দ্যুলোকে বিস্তার করছে, সে অপরাধ তেমন গুরুতর নয়— কেননা, দিনটা মানুষের নিজের, তার মুখে সে কালি মাখালেও দেবতা

তা নিয়ে নালিশ করবেন না। কিন্তু, রাত্রির অখণ্ড অন্ধকারকে মানুষ যখন নিজের আলো দিয়ে ফুটো করে দেয় তখন দেবতার অধিকারে সে হস্তক্ষেপ করে। সে যেন নিজের দখল অতিক্রম করে আলোকের খুঁটি গেড়ে দেবলোকে আপন সীমানা চিহ্নিত করতে চায়।

সেদিন রাত্রে গঙ্গার উপরে সেই দেববিদ্রোহের বিপুল আয়োজন দেখতে পেলুম। তাই মানুষের ক্লান্তির উপর সুরলোকের শান্তির আশীর্বাদ দেখা গেল না। মানুষ বলতে চাচ্ছে, আমিও দেবতার মতো, আমার ক্লান্তি নেই। কিন্তু সেটা মিথ্যা কথা, এইজন্যে সে চারি দিকের শান্তি নষ্ট করছে। এইজন্যে অন্ধকারকেও সে অশুচি করে তুলেছে।

দিন আলোকের দ্বারা আবিল, অন্ধকারই পরম নির্মল। অন্ধকার রাত্রি সমুদ্রের মতো; তা অঞ্জনের মতো কালো, কিন্তু তবু নিরঞ্জন। আর দিন নদীর মতো; তা কালো নয়, কিন্তু পঙ্কিল। রাত্রির সেই অতলস্পর্শ অন্ধকারকেও সেদিন সেই খিদির-পুরের জেটির উপর মলিন দেখলুম। মনে হল, দেবতা স্বয়ং মুখ মলিন করে রয়েছেন।

এমনি খারাপ লেগেছিল এডেনের বন্দরে। সেখানে মানুষের হাতে বন্দী হয়ে সমুদ্রও কলুষিত। জলের উপরে তেল ভাসছে, মানুষের আবর্জনাকে স্বয়ং সমুদ্রও বিলুপ্ত করতে পারছে না। সেই রাত্রে জাহাজের ডেকের উপর শুয়ে অসীম রাত্রিকেও যখন কলঙ্কিত দেখলুম তখন মনে হল, একদিন ইন্দ্রলোক দানবের আক্রমণে পীড়িত হয়ে ব্রহ্মার কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন— আজ মানবের অত্যাচার থেকে দেবতাদের কোন্ রুদ্র রক্ষা করবেন।

২

জাহাজ ছেড়ে দিলে। মধুর বহিছে বায়ু, ভেসে চলি রঙ্গে।

কিন্তু এর রঙ্গটা কেবলমাত্র ভেসে চলার মধ্যেই নয়। ভেসে চলার একটি বিশেষ দৃষ্টি ও সেই বিশেষ দৃষ্টির বিশেষ রস আছে। যখন হেঁটে চলি তখন কোনো অখণ্ড ছবি চোখে পড়ে না। ভেসে চলার মধ্যে দুই বিরোধের পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়েছে— বসেও আছি, চলছিও। সেইজন্যে চলার কাজ হচ্ছে, অথচ চলার কাজে মনকে লাগাতে হচ্ছে না। তাই মন যা সামনে দেখছে তাকে পূর্ণ করে দেখছে। জল-স্থল-আকাশের সমস্তকে এক করে মিলিয়ে দেখতে পাচ্ছে।

ভেসে চলার মধ্যে দিয়ে দেখার আর একটা গুণ হচ্ছে এই যে, তা মনোযোগকে জাগ্রত করে, কিন্তু মনোযোগকে বদ্ধ করে না। না দেখতে পেলেও চলত, কোনো অসুবিধে হত না, পথ ভুলতুম না, গর্তয় পড়তুম না। এইজন্যে ভেসে চলার দেখাটা

হচ্ছে নিতান্তই দায়িত্ববিহীন দেখা ; দেখাটাই তার চরম লক্ষ্য, এইজন্যেই এই দেখাটা এমন বৃহৎ, এমন আনন্দময়।

এতদিনে এইটুকু বোঝা গেছে যে, মানুষ নিজের দাসত্ব করতে বাধ্য, কিন্তু নিজের সম্বন্ধেও দায়ে-পড়া কাজে তার প্রীতি নেই। যখন চলাটাকেই লক্ষ্য করে পায়চারি করি তখন সেটা বেশ ; কিন্তু যখন কোথাও পৌছবার দিকে লক্ষ্য করে চলতে হয় তখন সেই চলার বাধ্যতা থেকে মুক্তি পাওয়ার শক্তিতেই মানুষের সম্পদ প্রকাশ পায়। ধন জিনিসটার মানেই এই, তাতে মানুষের প্রয়োজন কমায় না কিন্তু নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে তার নিজের বাধ্যতা কমিয়ে দেয়। খাওয়া-পরা দেওয়া-নেওয়ার দরকার তাকে মেটাতেই হয়, কিন্তু তার বাইরে যেখানে তার উদ্‌বৃত্ত সেইখানেই মানুষ মুক্ত, সেইখানেই সে বিশুদ্ধ নিজের পরিচয় পায়। সেইজন্যেই ঘটিবাটি প্রভৃতি দরকারি জিনিসকেও মানুষ সুন্দর করে গড়ে তুলতে চায় ; কারণ, ঘটিবাটির উপযোগিতা মানুষের প্রয়োজনের পরিচয় মাত্র কিন্তু তার সৌন্দর্যে মানুষের নিজেরই রুচির, নিজেরই আনন্দের পরিচয়। ঘটিবাটির উপযোগিতা বলছে, মানুষের দায় আছে ; ঘটিবাটির সৌন্দর্য বলছে, মানুষের আত্মা আছে।

আমার না হলেও চলত, কেবল আমি ইচ্ছা করে করছি এই যে মুক্ত কর্তৃত্বের ও মুক্ত ভোক্তৃত্বের অভিমান, যে অভিমান বিশ্বস্রষ্টার এবং বিশ্বরাজ্যেশ্বরের, সেই অভিমানই মানুষের সাহিত্যে এবং আর্টে। এই রাজ্যটি মুক্ত মানুষের রাজ্য, এখানে জীবনযাত্রার দায়িত্ব নেই।

আজ সকালে যে প্রকৃতি সবুজ পাড়-দেওয়া গেরুয়া নদীর শাড়ি প'রে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে আমি তাকে দেখছি। এখানে আমি বিশুদ্ধ দ্রষ্টা। এই দ্রষ্টা আমিটি যদি নিজেকে ভাষায় বা রেখায় প্রকাশ করত তা হলে সেইটেই হত সাহিত্য, সেইটেই হত আর্ট। খামকা বিরক্ত হয়ে এমন কথা কেউ বলতে পারে, "তুমি দেখছ তাতে আমার গরজ কী। তাতে আমার পেটও ভরবে না, আমার ম্যালেরিয়াও ঘুচবে না, তাতে আমার ফসল-খেতে বেশি করে ফসল ধরবার উপায় হবে না।" ঠিক কথা। আমি যে দেখছি এতে তোমার কোনো গরজ নেই। অথচ আমি যে শুদ্ধমাত্র দ্রষ্টা. এ সম্বন্ধে বস্তুতই যদি তুমি উদাসীন হও তা হলে জগতে আর্ট এবং সাহিত্য-সৃষ্টির কোনো মানে থাকে না।

আমাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার, "আজ এতক্ষণ ধরে তুমি যে লেখাটা লিখছ ওটাকে কী বলবে। সাহিত্য, না তত্ত্বালোচনা ?"

নাই বললুম তত্ত্বালোচনা। তত্ত্বালোচনায় যে-ব্যক্তি আলোচনা করে সে প্রধান নয়,

তত্ত্বটাই প্রধান। সাহিত্যে সেই ব্যক্তিটাই প্রধান, তত্ত্বটা উপলক্ষ। এই যে সাদা মেঘের ছিটে-দেওয়া নীল আকাশের নীচে শ্যামল-ঐশ্বর্যময়ী ধরণীর আঙিনার সামনে দিয়ে সন্ন্যাসী জলের স্রোত উদাসী হয়ে চলেছে, তার মাঝখানে প্রধানত প্রকাশ পাচ্ছে দ্রষ্টা আমি। যদি ভূতত্ত্ব বা ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করতে হত তা হলে এই আমিকে সরে দাঁড়াতে হত। কিন্তু, এক আমির পক্ষে আর-এক আমির অহেতুক প্রয়োজন আছে, এইজন্য সময় পেলেই আমরা ভূতত্ত্বকে সরিয়ে রেখে সেই আমির সন্ধান করি।

তেমনি করেই কেবলমাত্র দৃশ্যের মধ্যে নয়, ভাবের মধ্যেও যে ভেসে চলেছে সেও সেই দ্রষ্টা আমি। সেখানে যা বলছে সেটা উপলক্ষ, যে বলছে সেই লক্ষ্য। বাহিরের বিশ্বের রূপধারার দিকেও আমি যেমন তাকাতে তাকাতে চলেছি, আমার অন্তরের চিন্তাধারা ভাবধারার দিকেও আমি তেমনি চিত্তদৃষ্টি দিয়ে তাকাতে তাকাতে চলেছি। এই ধারা কোনো বিশেষ কর্মের বিশেষ প্রয়োজনের সূত্রে বিধৃত নয়। এই ধারা প্রধানত লজিকের দ্বারাও গাঁথা নয়, এর গ্রন্থনসূত্র মুখ্যত আমি। সেইজন্যে আমি কেয়ারমাত্র করি নে, সাহিত্য সম্বন্ধে বক্ষ্যমাণ রচনাটিকে লোক পাকা কথা ব'লে গ্রহণ করবে কি না। বিশ্বলোকে এবং চিত্তলোকে 'আমি দেখছি' এই অনাবশ্যক আনন্দের কথাটা বলাই হচ্ছে আমার কাজ। এই কথাটা যদি ঠিক করে বলতে পারি তা হলে অন্য সকল আমির দলও বিনা প্রয়োজনে খুশি হয়ে উঠবে।

উপনিষদে লিখছে, এক-ডালে দুই পাখি আছে, তার মধ্যে এক পাখি খায় আর-এক পাখি দেখে। যে-পাখি দেখছে তারই আনন্দ বড়ো আনন্দ; কেননা, তার সে বিশুদ্ধ আনন্দ, মুক্ত আনন্দ। মানুষের নিজের মধ্যেই এই দুই পাখি আছে। এক পাখির প্রয়োজন আছে, আর-এক পাখির প্রয়োজন নেই। এক পাখি ভোগ করে, আর-এক পাখি দেখে। যে-পাখি ভোগ করে সে নির্মাণ করে, যে-পাখি দেখে সে সৃষ্টি করে। নির্মাণ করা মানে মাপে তৈরি করা, অর্থাৎ যেটা তৈরি হচ্ছে সেইটেই চরম নয়, সেইটেকে অন্য কিছুর মাপে তৈরি করা— নিজের প্রয়োজনের মাপে বা অন্যের প্রয়োজনের মাপে। আর, সৃষ্টি করা অন্য কোনো-কিছুর মাপের অপেক্ষা করে না, সে হচ্ছে নিজেকে সর্জন করা, নিজেকেই প্রকাশ করা। এইজন্য ভোগী পাখি যে সমস্ত উপকরণ নিয়ে কাজ করছে তা প্রধানত বাইরের উপকরণ, আর দ্রষ্টা পাখির উপকরণ হচ্ছে আমি-পদার্থ। এই আমির প্রকাশই সাহিত্য, আর্ট। তার মধ্যে কোনো দায়ই নেই, কর্তব্যের দায়ও না।

পৃথিবীতে সব-চেয়ে বড়ো রহস্য— দেখবার বস্তুটি নয়, যে দেখে সেই মানুষটি। এই রহস্য আপনি আপনার ইয়ত্তা পাচ্ছে না; হাজার হাজার অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে

আপনাকে দেখতে চেষ্টা করছে। যা-কিছু ঘটছে এবং যা-কিছু ঘটতে পারে, সমস্তর ভিতর দিয়ে নিজেকে বাজিয়ে দেখছে।

এই যে আমার এক আমি, এ বহুর মধ্যে দিয়ে চ'লে চ'লে নিজেকে নিত্য উপলব্ধি করতে থাকে। বহুর সঙ্গে মানুষের সেই একের মিলনজাত রসের উপলব্ধিই হচ্ছে সাহিত্যের সামগ্রী। অর্থাৎ, দৃষ্ট বস্তু নয়, দ্রষ্টা আমিই তার লক্ষ্য।

তোসামারু জাহাজ
২০ বৈশাখ ১৩২৩

৩

বৃহস্পতিবার বিকেলে সমুদ্রের মোহানায় পাইলট নেবে গেল। এর কিছু আগে থাকতেই সমুদ্রের রূপ দেখা দিয়েছে। তার কূলের বেড়ি খসে গেছে। কিন্তু, এখনো তার মাটির রঙ ঘোচে নি। পৃথিবীর চেয়ে আকাশের সঙ্গেই যে তার আত্মীয়তা বেশি, সে-কথা এখনো প্রকাশ হয় নি; কেবল দেখা গেল জলে আকাশে এক-দিগন্তের মালা বদল করেছে। যে ঢেউ দিয়েছে নদীর ঢেউয়ের ছন্দের মতো তার ছোটো ছোটো পদ-বিভাগ নয়; এ যেন মন্দাক্রান্তা, কিন্তু এখনো সমুদ্রের শার্দূলবিক্রীড়িত শুরু হয় নি।

আমাদের জাহাজের নীচের তলার ডেকে অনেকগুলি ডেক্-প্যাসেঞ্জার; তাদের অধিকাংশ মাদ্রাজি, এবং তারা প্রায় সকলেই রেঙ্গুনে যাচ্ছে। তাদের 'পরে এই জাহাজের লোকের ব্যবহারে কিছুমাত্র কঠোরতা নেই, তারা বেশ স্বচ্ছন্দে আছে। জাহাজের ভাণ্ডার থেকে তারা প্রত্যেকে একখানি করে ছবি আঁকা কাগজের পাখা পেয়ে ভারি খুশি হয়েছে।

এরা অনেকেই হিন্দু, সুতরাং এদের পথের কষ্ট ঘোচানো কারো সাধ্য নয়। কোনো-মতে আখ চিবিয়ে, চিঁড়ে খেয়ে এদের দিন যাচ্ছে। একটা জিনিস ভারি চোখে লাগে, সে হচ্ছে এই যে, এরা মোটের উপর পরিষ্কার— কিন্তু সেটা কেবল বিধানের গণ্ডির মধ্যে, বিধানের বাইরে এদের নোংরা হবার কোনো বাধা নেই। আখ চিবিয়ে তার ছিবড়ে অতি সহজেই সমুদ্রে ফেলে দেওয়া যায়, কিন্তু সেটুকু কষ্ট নেওয়া এদের বিধানে নেই— যেখানে বসে খাচ্ছে তার নেহাত কাছে ছিবড়ে ফেলছে, এমনি করে চারি দিকে কত আবর্জনা যে জমে উঠছে তাতে এদের ভ্রূক্ষেপ নেই; সব-চেয়ে আমাকে পীড়া দেয় যখন দেখি থুথু ফেলা সম্বন্ধে এরা বিচার করে না। অথচ, বিধান অনুসারে শুচিতা রক্ষা করবার বেলায় নিতান্ত সামান্য বিষয়েও এরা অসামান্য রকম কষ্ট স্বীকার করে।

আচারকে শক্ত করে তুললে বিচারকে ঢিলে করতেই হয়। বাইরে থেকে মানুষকে বাঁধলে মানুষ আপনাকে আপনি বাঁধবার শক্তি হারায়।

এদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান আছে; পরিষ্কার হওয়া সম্বন্ধে তারা যে বিশেষ সতর্ক তা নয়, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তাদের ভারি সতর্কতা। ভালো কাপড়টি প'রে টুপিটি বাগিয়ে তারা সর্বদা প্রস্তুত থাকতে চায়। একটুমাত্র পরিচয় হলেই অথবা না হলেও তারা দেখা হলেই প্রসন্নমুখে সেলাম করে। বোঝা যায়, তারা বাইরের সংসারটাকে মানে। কেবলমাত্র নিজের জাতের গণ্ডির মধ্যে যারা থাকে তাদের কাছে সেই গণ্ডির বাইরেকার লোকালয় নিতান্ত ফিকে। তাদের সমস্ত বাঁধাবাঁধি জাতরক্ষার বন্ধন। মুসলমান জাতে বাঁধা নয় ব'লে বাহিরের সংসারের সঙ্গে তার ব্যবহারের বাঁধাবাঁধি আছে। এইজন্যে আদবকায়দা মুসলমানের। আদবকায়দা হচ্ছে সমস্ত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম। মনুতে পাওয়া যায়, মা মাসি মামা পিসের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হবে, গুরুজনের গুরুত্বের মাত্রা কার কতদূর, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের মধ্যে পরস্পরের ব্যবহার কী রকম হবে, কিন্তু সাধারণভাবে মানুষের সঙ্গেমানুষের ব্যবহার কী রকম হওয়া উচিত তার বিধান নেই। এইজন্যে সম্পর্কবিচার ও জাতি-বিচারের বাইরে মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষার জন্যে, পশ্চিম-ভারত মুসলমানের কাছ থেকে সেলাম শিক্ষা করেছে। কেননা, প্রণাম-নমস্কারের সমস্ত বিধি কেবল জাতের মধ্যেই খাটে। বাহিরের সংসারটাকে ইতিপূর্বে আমরা অস্বীকার করে চলেছিলুম বলেই সাজসজ্জা সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা, হয় আমরা মুসলমানের কাছ থেকে নিয়েছি নয় ইংরেজের কাছ থেকে নিচ্ছি; ওটাতে আমাদের আরাম নেই। সেইজন্যে ভদ্রতার সাজ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত আমাদের পাকাপাকি কিছুই ঠিক হল না। বাঙালি ভদ্রসভায় সাজসজ্জার যে এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্য, তার কারণই এই। সব সাজই আমাদের সাজ। আমাদের নিজের সাজ, মণ্ডলীর ভিতরকার সাজ; সুতরাং বাহিরের সংসারের হিসাবে সেটা বিবসন বললেই হয়— অন্তঃপুরের মেয়েদের বসনটা যেরকম, অর্থাৎ দিগ বসনের সুন্দর অনুকরণ। বাইরের লোকের সঙ্গে আমরা ভাই খুড়ো দিদি মাসি প্রভৃতি কোনো-একটা সম্পর্ক পাতাবার জন্যে ব্যস্ত থাকি; নইলে আমরা থই পাই নে। হয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা নয় অত্যন্ত দূরত্ব, এর মাঝখানে যে একটা প্রকাণ্ড জায়গা আছে সেটা আজও আমাদের ভালো করে আয়ত্ত হয় নি। এমন-কি, সেখানকার বিধিবন্ধনকে আমরা হৃদ্যতার অভাব বলে নিন্দা করি। এ কথা ভুলে যাই, যে-সব মানুষকে হৃদয় দিতে পারি নে তাদেরও কিছু দেবার আছে। এই দানটাকে আমরা কৃত্রিম বলে গাল দিই, কিন্তু জাতের কৃত্রিম খাঁচার মধ্যে মানুষ ব'লেই এই সাধারণ আদবকায়দাকে আমাদের

কৃত্রিম বলে ঠেকে। বস্তুত, ঘরের মানুষকে আত্মীয় ব'লে এবং তার বাইরের মানুষকে আপন সমাজের ব'লে এবং তারও বাইরের মানুষকে মানবসমাজের ব'লে স্বীকার করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। হৃদয়ের বন্ধন, শিষ্টাচারের বন্ধন, এবং আদবকায়দার বন্ধন— এই তিনই মানুষের প্রকৃতিগত।

কাপ্তেন বলে রেখেছেন, আজ সন্ধ্যাবেলায় ঝড় হবে, ব্যারোমিটার নাবছে। কিন্তু, শান্ত আকাশে সূর্য অস্ত গেল। বাতাসে যে পরিমাণ বেগ থাকলে তাকে মন্দপবন বলে, অর্থাৎ যুবতীর মন্দগমনের সঙ্গে কবিরা তুলনা করতে পারে, এ তার চেয়ে বেশি ; কিন্তু ঢেউগুলোকে নিয়ে রুদ্রতালের করতাল বাজাবার মতো আসর জমে নি, যেটুকু খোলের বোল দিচ্ছে তাতে ঝড়ের গৌরচন্দ্রিকা বলেও মনে হয় নি। মনে করলুম, মানুষের কুষ্ঠির মতো বাতাসের কুষ্ঠি গণনার সঙ্গে ঠিক মেলে না, এ যাত্রা ঝড়ের ফাঁড়া কেটে গেল। তাই পাইলটের হাতে আমাদের ডাঙার চিঠিপত্র সমর্পণ করে দিয়ে প্রসন্ন সমুদ্রকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে ডেক-চেয়ার টেনে নিয়ে পশ্চিমমুখো হয়ে বসলুম।

হোলির রাত্রে হিন্দুস্থানি দরোয়ানদের খচমচির মতো বাতাসের লয়টা ক্রমেই দ্রুত হয়ে উঠল। জলের উপর সূর্যাস্তের আলপনা-আঁকা আসনটি আচ্ছন্ন ক'রে নীলাম্বরীর ঘোমটা-পরা সন্ধ্যা এসে বসল। আকাশে তখনো মেঘ নেই, আকাশসমুদ্রের ফেনার মতোই ছায়াপথ জল্‌জল্‌ করতে লাগল।

ডেকের উপর বিছানা করে যখন শুলুম তখন বাতাসে এবং জলে বেশ একটা কবির লড়াই চলছে ; একদিকে সোঁ সোঁ শব্দে তান লাগিয়েছে, আর-একদিকে ছল্‌ ছল্‌ শব্দে জবাব দিচ্ছে, কিন্তু ঝড়ের পালা বলে মনে হল না। আকাশের তারাদের সঙ্গে চোখোচোখি করে কখন এক সময়ে চোখ বুজে এল।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, আমি যেন মৃত্যু সম্বন্ধে কোনো একটি বেদমন্ত্র আবৃত্তি করে সেইটে কাকে বুঝিয়ে বলছি। আশ্চর্য তার রচনা, যেন একটা বিপুল আর্তস্বরের মতো, অথচ তার মধ্যে মরণের একটা বিরাট বৈরাগ্য আছে। এই মন্ত্রের মাঝখানে জেগে উঠে দেখি, আকাশ এবং জল তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সমুদ্র চামুণ্ডার মতো ফেনার জিব মেলে প্রচণ্ড অট্টহাস্যে নৃত্য করছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, মেঘগুলো মরিয়া হয়ে উঠেছে, যেন তাদের কাণ্ড-জ্ঞান নেই— বলছে, যা থাকে কপালে। আর, জলে যে বিষম গর্জন উঠছে তাতে মনের ভাবনাও যেন শোনা যায় না, এমনি বোধ হতে লাগল। মাল্লারা ছোটো ছোটো লণ্ঠন হাতে ব্যস্ত হয়ে এদিকে ওদিকে চলাচল করছে, কিন্তু নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে এঞ্জিনের প্রতি কর্ণধারের সংকেত-ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

এবার বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু, বাইরে জল বাতাসের গর্জন আর আমার মনের মধ্যে সেই স্বপ্নলব্ধ মরণমন্ত্র ক্রমাগত বাজতে লাগল। আমার ঘুমের সঙ্গে জাগরণ ঠিক যেন ওই ঝড় এবং ঢেউয়ের মতোই এলোমেলো মাতামাতি করতে থাকল, ঘুমোচ্ছি কি জেগে আছি বুঝতে পারছি নে।

রাগী মানুষ কথা কইতে না পারলে যেমন ফুলে ফুলে ওঠে, সকাল-বেলাকার মেঘগুলোকে তেমনি বোধ হল। বাতাস কেবলই শ ষ স, এবং জল কেবলই বাকি অন্তস্থ বর্ণ য র ল ব হ নিয়ে চণ্ডীপাঠ বাধিয়ে দিলে, আর মেঘগুলো জটা দুলিয়ে ভ্রূকুটি করে বেড়াতে লাগল। অবশেষে মেঘের বাণী জলধারায় নেবে পড়ল। নারদের বীণাধ্বনিতে বিষ্ণু গঙ্গাধারায় বিগলিত হয়েছিলেন একবার, আমার সেই পৌরাণিক কথা মনে এসেছিল। কিন্তু, এ কোন্ নারদ প্রলয়বীণা বাজাচ্ছে। এর সঙ্গে নন্দীভৃঙ্গীর যে মিল দেখি, আর ওদিকে বিষ্ণুর সঙ্গে রুদ্রের প্রভেদ ঘুচে গেছে।

এ-পর্যন্ত জাহাজের নিত্যক্রিয়া একরকম চলে যাচ্ছে, এমন-কি, আমাদের প্রাতরাশেরও ব্যাঘাত হল না। কাপ্তেনের মুখে কোনো উদ্‌বেগ নেই। তিনি বললেন, এই সময়টাতে এমন একটু-আধটু হয়ে থাকে; আমরা যেমন যৌবনের চাঞ্চল্য দেখে বলে থাকি, ওটা বয়সের ধর্ম।

ক্যাবিনের মধ্যে থাকলে ঝুমঝুমির ভিতরকার কড়াইগুলোর মতো নাড়া খেতে হবে, তার চেয়ে খোলাখুলি ঝড়ের সঙ্গে মোকাবিলা করাই ভালো। আমরা শাল কম্বল মুড়ি দিয়ে জাহাজের ডেকের উপর গিয়েই বসলুম। ঝড়ের ঝাপট পশ্চিম দিক থেকে আসছে, সেইজন্যে পূর্বদিকের ডেকে বসা দুঃসাধ্য ছিল না।

ঝড় ক্রমেই বেড়ে চলল। মেঘের সঙ্গে ঢেউয়ের সঙ্গে কোনো ভেদ রইল না। সমুদ্রের সে নীল রঙ নেই, চারি দিক ঝাপসা বিবর্ণ। ছেলেবেলার আরব্য-উপন্যাসে পড়েছিলুম, জেলের জালে যে ঘড়া উঠেছিল তার ঢাকনা খুলতেই তার ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো পাকিয়ে পাকিয়ে প্রকাণ্ড দৈত্য বেরিয়ে পড়ল। আমার মনে হল, সমুদ্রের নীল ঢাকনাটা কে খুলে ফেলেছে, আর ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো লাখো লাখো দৈত্য পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে করতে আকাশে উঠে পড়ছে।

জাপানি মাল্লারা ছুটোছুটি করছে কিন্তু তাদের মুখে হাসি লেগেই আছে। তাদের ভাব দেখে মনে হয়, সমুদ্র যেন অট্টহাস্যে জাহাজটাকে ঠাট্টা করছে মাত্র; পশ্চিম দিকের ডেকের দরজা প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ তবু সে-সব বাধা ভেদ করে এক একবার জলের ঢেউ হুড়মুড় করে এসে পড়ছে, আর তাই দেখে ওরা হো হো করে উঠছে। কাপ্তেন আমাদের বারবার বললেন, ছোটো ঝড়, সামান্য ঝড়। একসময় আমাদের

স্টুয়ার্ড্ এসে টেবিলের উপর আঙুল দিয়ে এঁকে ঝড়ের খাতিরে জাহাজের কী রকম পথ বদল হয়েছে, সেইটে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলে। ইতিমধ্যে বৃষ্টির ঝাপটা লেগে শাল কম্বল সমস্ত ভিজে শীতে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছে; আর কোথাও সুবিধা না দেখে কাপ্তেনের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। কাপ্তেনের যে কোনো উৎকণ্ঠা আছে, বাইরে থেকে তার কোনো লক্ষণ দেখতে পেলুম না।

ঘরে আর বসে থাকতে পারলুম না। ভিজে শাল মুড়ি দিয়ে আবার বাইরে এসে বসলুম। এত তুফানেও যে আমাদের ডেকের উপর আছড়ে আছড়ে ফেলছে না তার কারণ, জাহাজ আকণ্ঠ বোঝাই। ভিতরে যার পদার্থ নেই তার মতো দোলায়িত অবস্থা আমাদের জাহাজের নয়। মৃত্যুর কথা অনেকবার মনে হল। চারি দিকেই তো মৃত্যু, দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত মৃত্যু; আমার প্রাণ এর মধ্যে এতটুকু। এই অতি ছোটো-টার উপরেই কি সমস্ত আস্থা রাখব, আর এই এতবড়োটাকে কিছু বিশ্বাস করব না?— বড়োর উপরে ভরসা রাখাই ভালো।

ডেকে বসে থাকা আর চলছে না। নীচে নাবতে গিয়ে দেখি সিঁড়ি পর্যন্ত জুড়ে সমস্ত রাস্তা ঠেসে ভর্তি করে ডেক-প্যাসেঞ্জার বসে। বহু কষ্টে তাদের ভিতর দিয়ে পথ করে ক্যাবিনের মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। এইবার সমস্ত শরীর মন ঘুলিয়ে উঠল। মনে হল, দেহের সঙ্গে প্রাণের আর বনতি হচ্ছে না; দুধ মথন করলে মাখনটা যেরকম ছিন্ন হয়ে আসে প্রাণটা যেন তেমনি হয়ে এসেছে। জাহাজের উপরকার দোলা সহ্য করা যায়, জাহাজের ভিতরকার দোলা সহ্য করা শক্ত। কাঁকরের উপর দিয়ে চলা আর জুতার ভিতরে কাঁকর নিয়ে চলার যে তফাত, এ যেন তেমনি। একটাতে মার আছে বন্ধন নেই, আর একটাতে বেঁধে মার।

ক্যাবিনে শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলুম, ডেকের উপর কী যেন হুড়মুড় করে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ক্যাবিনের মধ্যে হাওয়া আসবার জন্যে যে ফানেলগুলো ডেকের উপর হাঁ করে নিশ্বাস নেয়, ঢাকা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ঢেউয়ের প্রবল চোটে তার ভিতর দিয়েও ঝলকে ঝলকে ক্যাবিনের মধ্যে জল এসে পড়ছে। বাইরে উনপঞ্চাশ বায়ুর নৃত্য, অথচ ক্যাবিনের মধ্যে গুমট। একটা ইলেকট্রিক পাখা চলছে তাতে তাপটা যেন গায়ের উপর ঘুরে ঘুরে লেজের ঝাপটা দিতে লাগল।

হঠাৎ মনে হয়, এ একেবারে অসহ্য। কিন্তু, মানুষের মধ্যে শরীর-মন-প্রাণের চেয়েও বড়ো একটা সত্তা আছে। ঝড়ের আকাশের উপরেও যেমন শান্ত আকাশ, তুফানের সমুদ্রের নীচে যেমন শান্ত সমুদ্র, সেই আকাশ সেই সমুদ্রই যেমন বড়ো, মানুষের অন্তরের গভীরে এবং সমুচ্চে সেইরকম একটি বিরাট শান্ত পুরুষ আছে— বিপদ এবং

দুঃখের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখলে তাকে পাওয়া যায়— দুঃখ তার পায়ের তলায়, মৃত্যু তাকে স্পর্শ করে না।

সন্ধ্যার সময় ঝড় থেমে গেল। উপরে গিয়ে দেখি, জাহাজটা সমুদ্রের কাছে এতক্ষণ ধরে যে চড়চাপড় খেয়েছে তার অনেক চিহ্ন আছে। কাপ্তেনের ঘরের একটা প্রাচীর ভেঙে গিয়ে তাঁর আসবাবপত্র সমস্ত ভিজে গেছে। একটা বাঁধা লাইফ-বোট জখম হয়েছে। ডেকে প্যাসেঞ্জারদের একটা ঘর এবং ভাণ্ডারের একটা অংশ ভেঙে পড়েছে। জাপানি মাল্লারা এমন-সকল কাজে প্রবৃত্ত ছিল যাতে প্রাণসংশয় ছিল। জাহাজ যে বারবার আসন্ন সংকটের সঙ্গে লড়াই করেছে তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল— জাহাজের ডেকের উপর কর্কের তৈরি সাঁতার দেবার জামাগুলো সাজানো। এক-সময়ে এগুলো বের করবার কথা কাপ্তেনের মনে এসেছিল। কিন্তু, এই ঝড়ের পালার মধ্যে সব-চেয়ে স্পষ্ট করে আমার মনে পড়ছে জাপানি মাল্লাদের হাসি।

শনিবার দিনে আকাশ প্রসন্ন কিন্তু সমুদ্রের আক্ষেপ এখনো ঘোচে নি। আশ্চর্য এই, ঝড়ের সময় জাহাজ এমন দোলে নি ঝড়ের পর যেমন তার দোলা। কালকেকার উৎপাতকে কিছুতেই যেন সে ক্ষমা করতে পারছে না, ক্রমাগতই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। শরীরের অবস্থাটাও অনেকটা সেইরকম; ঝড়ের সময় সে একরকম শক্ত ছিল কিন্তু পরের দিন ভুলতে পারছে না, তার উপর দিয়ে ঝড় গিয়েছে।

আজ রবিবার। জলের রঙ ফিকে হয়ে উঠেছে। এতদিন পরে আকাশে একটি পাখি দেখতে পেলুম— এই পাখিগুলিই পৃথিবীর বাণী আকাশে বহন করে নিয়ে যায়; আকাশ দেয় তার আলো, পৃথিবী দেয় তার গান। সমুদ্রের যা-কিছু গান সে কেবল তার নিজের ঢেউয়ের— তার কোলে জীব আছে যথেষ্ট, পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তাদের কারো কণ্ঠে সুর নেই; সেই অসংখ্য বোবা জীবের হয়ে সমুদ্র নিজেই কথা কচ্ছে। ডাঙার জীবেরা প্রধানত শব্দের দ্বারাই মনের ভাব প্রকাশ করে, জলচরদের ভাষা হচ্ছে গতি। সমুদ্র হচ্ছে নৃত্যলোক, আর পৃথিবী হচ্ছে শব্দলোক।

আজ বিকেলে চারটে-পাঁচটার সময় রেঙ্গুনে পৌঁছবার কথা। মঙ্গলবার থেকে শনিবার পর্যন্ত পৃথিবীতে নানা খবর চলাচল করছিল, আমাদের জন্যে সেগুলো সমস্ত জমে রয়েছে; বাণিজ্যের ধনের মতো নয় প্রতিদিন যার হিসাব চলছে, কোম্পানির কাগজের মতো অগোচরে যার সুদ জমছে।

২৪ বৈশাখ ১৩২৩

৪

২৪শে বৈশাখ অপরাহ্ণে রেঙ্গুনে এসে পৌঁছনো গেল।

চোখের পিছনে চেয়ে দেখার একটা পাকযন্ত্র আছে, সেইখানে দেখাগুলো বেশ করে হজম হয়ে না গেলে সেটাকে নিজের করে দেখানো যায় না। তা নাই বা দেখানো গেল, এমন কথা কেউ বলতে পারেন। যেখানে যাওয়া গেছে সেখানকার মোটামুটি বিবরণ দিতে দোষ কী।

দোষ না থাকতে পারে, কিন্তু আমার অভ্যাস অন্যরকম। আমি টুকে যেতে টেঁকে যেতে পারি নে। কখনো কখনো নোট নিতে ও রিপোর্ট দিতে অনুরুদ্ধ হয়েছি, কিন্তু সে-সমস্ত টুকরো কথা আমার মনের মুঠোর ফাঁক দিয়ে গলে ছড়িয়ে পড়ে যায়। প্রত্যক্ষটা একবার আমার মনের নেপথ্যে অপ্রত্যক্ষ হয়ে গিয়ে তার পরে যখন প্রকাশের মঞ্চে এসে দাঁড়ায় তখনই তার সঙ্গে আমার ব্যবহার।

ছুটতে ছুটতে তাড়াতাড়ি দেখে দেখে বেড়ানো আমার পক্ষে ক্লান্তিকর এবং নিষ্ফল। অতএব আমার কাছ থেকে বেশ ভদ্ররকম ভ্রমণবৃত্তান্ত তোমরা পাবে না। আদালতে সত্যপাঠ করে আমি সাক্ষী দিতে পারি যে রেঙ্গুন নামক এক শহরে আমি এসেছিলুম; কিন্তু যে আদালতে আরো বড়ো রকমের সত্যপাঠ করতে হয় সেখানে আমাকে বলতেই হবে, রেঙ্গুনে এসে পৌঁছই নি।

এমন হতেও পারে, রেঙ্গুন শহরটা খুব একটা সত্য বস্তু নয়। রাস্তাগুলি সোজা, চওড়া, পরিষ্কার; বাড়িগুলি তকতক্ করছে; রাস্তায় ঘাটে মাদ্রাজি, পাঞ্জাবি, গুজরাটি ঘুরে বেড়াচ্ছে; তার মধ্যে হঠাৎ কোথাও যখন রঙিন রেশমের কাপড়-পরা ব্রহ্মদেশের পুরুষ বা মেয়ে দেখতে পাই তখন মনে হয়, এরাই বুঝি বিদেশী। আসল কথা, গঙ্গার পুলটা যেমন গঙ্গার নয় বরঞ্চ সেটা গঙ্গার গলার ফাঁসি, রেঙ্গুন শহরটা তেমনি ব্রহ্মদেশের শহর নয়, ওটা যেন সমস্ত দেশের প্রতিবাদের মতো।

প্রথমত, ইরাবতী নদী দিয়ে শহরের কাছাকাছি যখন আসছি তখন ব্রহ্মদেশের প্রথম পরিচয়টা কী। দেখি, তীরে বড়ো বড়ো সব কেরোসিন তেলের কারখানা লম্বা লম্বা চিমনি আকাশে তুলে দিয়ে ঠিক যেন চিত হয়ে পড়ে বর্মা চুরুট খাচ্ছে। তার পরে যত এগোতে থাকি, দেশ-বিদেশের জাহাজের ভিড়। তার পর যখন ঘাটে এসে পৌঁছই তখন তট বলে পদার্থ দেখা যায় না— সারি সারি জেটিগুলো যেন বিকটাকার লোহার জোঁকের মতো ব্রহ্মদেশের গায়ে একেবারে ছেঁকে ধরেছে। তার পরে আপিস-আদালত দোকান-বাজারের মধ্যে দিয়ে আমার বাঙালি বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে উঠলুম; কোনো ফাঁক দিয়ে ব্রহ্মদেশের কোনো চেহারাই দেখতে পেলুম না। মনে হল, রেঙ্গুন ব্রহ্মদেশের ম্যাপে

আছে কিন্তু দেশে নেই। অর্থাৎ, এ শহর দেশের মাটি থেকে গাছের মতো ওঠে নি, এ শহর কালের স্রোতে ফেনার মতো ভেসেছে, সুতরাং এর পক্ষে এ জায়গাও যেমন অন্য জায়গাও তেমনি।

আসল কথা, পৃথিবীতে যে-সব শহর সত্য তা মানুষের মমতার দ্বারা তৈরি হয়ে উঠেছে। দিল্লি বল, আগ্রা বল, কাশী বল, মানুষের আনন্দ তাকে সৃষ্টি করে তুলেছে। কিন্তু বাণিজ্যলক্ষ্মী নির্মম, তার পায়ের নীচে মানুষের মানস-সরোবরের সৌন্দর্যশতদল ফোটে না। মানুষের দিকে সে তাকায় না, সে কেবল দ্রব্যকে চায়; যন্ত্র তার বাহন। গঙ্গা দিয়ে যখন আমাদের জাহাজ আসছিল তখন বাণিজ্যশ্রীর নির্লজ্জ নির্দয়তা নদীর দুই ধারে দেখতে দেখতে এসেছি। ওর মনে প্রীতি নেই ব'লেই বাংলাদেশের এমন সুন্দর গঙ্গার ধারকে এত অনায়াসে নষ্ট করতে পেরেছে।

আমি মনে করি, আমার পরম সৌভাগ্য এই যে, কদর্যতার লৌহবন্যা যখন কলকাতার কাছাকাছি দুই তীরকে, মেটেবুরুজ থেকে হুগলী পর্যন্ত, গ্রাস করবার জন্যে ছুটে আসছিল আমি তার আগেই জন্মেছি। তখনো গঙ্গার ঘাটগুলি গ্রামের স্নিগ্ধ বাহুর মতো গঙ্গাকে বুকের কাছে আপন ক'রে ধরে রেখেছিল, কুঠির নৌকাগুলি তখনো সন্ধ্যাবেলায় তীরে তীরে ঘাটে ঘাটে ঘরের লোকগুলিকে ঘরে ঘরে ফিরিয়ে আনত। একদিকে দেশের হৃদয়ের ধারা, আর-একদিকে দেশের এই নদীর ধারা, এর মাঝখানে কোনো কঠিন কুৎসিত বিচ্ছেদ এসে দাঁড়ায় নি।

তখনো কলকাতার আশেপাশে বাংলাদেশের যথার্থ রূপটিকে দুই চোখ ভরে দেখবার কোনো বাধা ছিল না। সেইজন্যেই কলকাতা আধুনিক শহর হলেও কোকিলশিশুর মতো তার পালনকর্ত্রীর নীড়কে একেবারে রিক্ত করে অধিকার করে নি। কিন্তু তার পরে বাণিজ্যসভ্যতা যতই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল ততই দেশের রূপ আচ্ছন্ন হতে চলল। এখন কলকাতা বাংলাদেশকে আপনার চারি দিক থেকে নির্বাসিত করে দিচ্ছে। দেশ ও কালের লড়াইয়ে দেশের শ্যামল শোভা পরাভূত হল, কালের করাল মূর্তিই লোহার দাঁত নখ মেলে কালো নিশ্বাস ছাড়তে লাগল।

এক সময়ে মানুষ বলেছিল, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ। তখন মানুষ লক্ষ্মীর যে-পরিচয় পেয়েছিল সে তো কেবল ঐশ্বর্যে নয়, তাঁর সৌন্দর্যে। তার কারণ, বাণিজ্যের সঙ্গে তখন মনুষ্যত্বের বিচ্ছেদ ঘটে নি। তাঁতের সঙ্গে তাঁতির, কামারের হাতুড়ির সঙ্গে কামারের হাতের, কারিগরের সঙ্গে তার কারুকার্যের মনের মিল ছিল। এইজন্যে বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে মানুষের হৃদয় আপনাকে ঐশ্বর্যে বিচিত্র ক'রে সুন্দর ক'রে ব্যক্ত করত। নইলে লক্ষ্মী তার পদ্মাসন পেতেন কোথা থেকে। যখন থেকে কল হল

বাণিজ্যের বাহন তখন থেকে বাণিজ্য হল শ্রীহীন। প্রাচীন ভেনিসের সঙ্গে আধুনিক ম্যাঞ্চেস্টরের তুলনা করলেই তফাতটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। ভেনিসে সৌন্দর্যে এবং ঐশ্বর্যে মানুষ আপনারই পরিচয় দিয়েছে, ম্যাঞ্চেস্টরে মানুষ সব দিকে আপনাকে খর্ব করে আপনার কলের পরিচয় দিয়েছে। এইজন্য কল-বাহন বাণিজ্য যেখানেই গেছে সেখানেই আপনার কালিমায় কদর্যতায় নির্মমতায় একটা লোলুপতার মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তীর্ণ করে দিচ্ছে। তাই নিয়ে কাটাকাটি-হানাহানির আর অন্ত নেই; তাই নিয়ে অসত্যে লোকালয় কলঙ্কিত এবং রক্তপাতে ধরাতল পঙ্কিল হয়ে উঠল। অন্নপূর্ণা আজ হয়েছেন কালী; তাঁর অন্নপরিবেশনের হাতা আজ হয়েছে রক্তপান করবার খর্পর। তাঁর স্মিতহাস্য আজ অট্টহাস্যে ভীষণ হল। যাই হোক, আমার বলবার কথা এই যে, বাণিজ্য মানুষকে প্রকাশ করে না, মানুষকে প্রচ্ছন্ন করে।

তাই বলছি, রেঙ্গুন তো দেখলুম কিন্তু সে কেবল চোখের দেখা, সে দেখার মধ্যে কোনো পরিচয় নেই; সেখান থেকে আমার বাঙালি বন্ধুদের আতিথ্যের স্মৃতি নিয়ে এসেছি, কিন্তু ব্রহ্মদেশের হাত থেকে কোনো দক্ষিণা আনতে পারি নি। কথাটা হয়তো একটু অত্যুক্তি হয়ে পড়ল। আধুনিকতার এই প্রাচীরের মধ্যে দেশের একটা গবাক্ষ হঠাৎ একটু খোলা পেয়েছিলুম। সোমবার দিন সকালে আমার বন্ধুরা এখানকার বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরে নিয়ে গেলেন।

এতক্ষণে একটা-কিছু দেখতে পেলুম। এতক্ষণ যার মধ্যে ছিলুম সে একটা অ্যাব্‌সট্রাক্‌শন, সে একটা অবিচ্ছিন্ন পদার্থ। সে একটা শহর, কিন্তু কোনো-একটা শহরই নয়। এখন যা দেখছি তার নিজেরই একটা বিশেষ চেহারা আছে। তাই সমস্ত মন খুশি হয়ে সজাগ হয়ে উঠল। আধুনিক বাঙালির ঘরে মাঝে মাঝে খুব ফ্যাশানওয়ালা মেয়ে দেখতে পাই; তারা খুব গট্‌গট্‌ করে চলে, খুব চট্‌পট্‌ করে ইংরেজি কয়; দেখে মস্ত একটা অভাব মনে বাজে; মনে হয় ফ্যাশানটাকেই বড়ো করে দেখছি, বাঙালির মেয়েটিকে নয়; এমন সময় হঠাৎ ফ্যাশানজালমুক্ত সরল সুন্দর স্নিগ্ধ বাঙালি-ঘরের কল্যাণীকে দেখলে তখনই বুঝতে পারি, এ তো মরীচিকা নয়, স্বচ্ছ গভীর সরোবরের মতো এর মধ্যে একটি তৃষাহরণ পূর্ণতা আপন পদ্মবনের পাড়টি নিয়ে টলটল করছে। মন্দিরের মধ্যে ঢুকতেই আমার মনে তেমনি একটি আনন্দের চমক লাগল; মনে হল, যাই হোক-না কেন, এটা ফাঁকা নয়, যেটুকু চোখে পড়ছে এ তার চেয়ে আরো অনেক বেশি। সমস্ত রেঙ্গুন শহরটা এর কাছে ছোটো হয়ে গেল; বহুকালের বৃহৎ ব্রহ্মদেশ এই মন্দিরটুকুর মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করলে।

প্রথমেই বাইরের প্রখর আলোর থেকে একটি পুরাতন কালের পরিণত ছায়ার মধ্যে

এসে প্রবেশ করলুম। থাকে থাকে প্রশস্ত সিঁড়ি উঠে চলেছে; তার উপরে আচ্ছাদন। এই সিঁড়ির দুই ধারে ফল ফুল বাতি, পূজার অর্ঘ্য বিক্রি চলছে। যারা বেচছে তারা অধিকাংশই ব্রহ্মীয় মেয়ে। ফুলের রঙের সঙ্গে তাদের রেশমের কাপড়ের রঙের মিল হয়ে মন্দিরের ছায়াটি সূর্যাস্তের আকাশের মতো বিচিত্র হয়ে উঠেছে। কেনাবেচার কোনো নিষেধ নেই, মুসলমান দোকানদারেরা বিলাতি মনিহারির দোকান খুলে বসে গেছে। মাছমাংসেরও বিচার নেই, চারি দিকে খাওয়াদাওয়া ঘরকন্না চলছে। সংসারের সঙ্গে মন্দিরের সঙ্গে ভেদমাত্র নেই, একেবারে মাখামাখি। কেবল, হাট-বাজারে যেরকম গোলমাল, এখানে তা দেখা গেল না। চারি দিক নিরালা নয়, অথচ নিভৃত; স্তব্ধ নয়, শান্ত। আমাদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশীয় একজন ব্যারিস্টার ছিলেন, এই মন্দিরসোপানে মাছমাংস কেনাবেচা এবং খাওয়া চলছে, এর কারণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, "বুদ্ধ আমাদের উপদেশ দিয়েছেন, তিনি বলে দিয়েছেন— কিসে মানুষের কল্যাণ, কিসে তার বন্ধন, তিনি তো জোর করে কারো ভালো করতে চান নি; বাহিরের শাসনে কল্যাণ নেই, অন্তরের ইচ্ছাতেই মুক্তি; এইজন্যে আমাদের সমাজে বা মন্দিরে আচার সম্বন্ধে জবরদস্তি নেই।"

সিঁড়ি বেয়ে উপরে যেখানে গেলুম সেখানে খোলা জায়গা, তারই নানা স্থানে নানারকমের মন্দির। সে মন্দিরে গাম্ভীর্য নেই, কারুকার্যের ঠেসাঠেসি ভিড়, সমস্ত যেন ছেলেমানুষের খেলনার মতো। এমন অদ্ভুত পাঁচমিশালি ব্যাপার আর কোথাও দেখা যায় না— এ যেন ছেলে-ভুলোনো ছড়ার মতো; তার ছন্দটা একটানা বটে, কিন্তু তার মধ্যে যা-খুশি-তাই এসে পড়েছে, ভাবের পরস্পর-সামঞ্জস্যের কোনো দরকার নেই। বহুকালের পুরাতন শিল্পের সঙ্গে এখনকার কালের নিতান্ত সস্তাদরের তুচ্ছতা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ভাবের অসংগতি বলে যে কোনো পদার্থ আছে, এরা তা যেন একেবারে জানেই না। আমাদের কলকাতায় বড়োমানুষের ছেলের বিবাহযাত্রায় রাস্তা দিয়ে যেমন সকল রকমের অদ্ভুত অসামঞ্জস্যের বন্যা বয়ে যায়, কেবলমাত্র পুঞ্জীকরণটাই তার লক্ষ্য, সজ্জীকরণ নয়, এও সেইরকম। এক ঘরে অনেকগুলো ছেলে থাকলে যেমন তারা গোলমাল করে, সেই গোলমাল করাতেই তাদের আনন্দ– এই মন্দিরের সাজসজ্জা, প্রতিমা, নৈবেদ্য, সমস্ত যেন সেইরকম ছেলেমানুষের উৎসব; তার মধ্যে অর্থ নেই, শব্দ আছে। মন্দিরের ওই সোনা-বাঁধানো পিতল-বাঁধানো চূড়াগুলি ব্রহ্মদেশের ছেলেমেয়েদের আনন্দের উচ্চহাস্যমিশ্রিত হো হো শব্দ— আকাশে ঢেউ খেলিয়ে উঠছে। এদের যেন বিচার করবার, গম্ভীর হবার বয়স হয় নি। এখানকার এই রঙিন মেয়েরাই সব-চেয়ে চোখে পড়ে। এদেশের শাখাপ্রশাখা ভরে এরা যেন

ফুল ফুটে রয়েছে। ভুঁইচাঁপার মতো এরাই দেশের সমস্ত— আর কিছু চোখে পড়ে না।

লোকের কাছে শুনতে পাই এখানকার পুরুষেরা অলস ও আরামপ্রিয়, অন্য দেশের পুরুষের কাজ প্রায় সমস্তই এখানে মেয়েরা করে থাকে। হঠাৎ মনে আসে, এটা বুঝি মেয়েদের উপরে জুলুম করা হয়েছে। কিন্তু, ফলে তো তার উলটোই দেখতে পাচ্ছি— এই কাজকর্মের হিল্লোলে মেয়েরা আরো যেন বেশি করে বিকশিত হয়ে উঠেছে। কেবল বাইরে বেরতে পারাই যে মুক্তি তা নয়, অবাধে কাজ করতে পাওয়া মানুষের পক্ষে তার চেয়ে বড়ো মুক্তি। পরাধীনতাই সব চেয়ে বড়ো বন্ধন নয়, কাজের সংকীর্ণতাই হচ্ছে সব চেয়ে কঠোর খাঁচা।

এখানকার মেয়েরা সেই খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে এমন পূর্ণতা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তারা নিজের অস্তিত্ব নিয়ে নিজের কাছে সংকুচিত হয়ে নেই; রমণীর লাবণ্যে যেমন তারা প্রেয়সী, শক্তির মুক্তিগৌরবে তেমনি তারা মহীয়সী। কাজেই যে মেয়েদের যথার্থ শ্রী দেয়, সাঁওতাল মেয়েদের দেখে তা আমি প্রথম বুঝতে পেরেছিলুম। তারা কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু কারিগর যেমন কঠিন আঘাতে মূর্তিটিকে সুব্যক্ত করে তোলে তেমনি এই পরিশ্রমের আঘাতেই এই সাঁওতাল মেয়েদের দেহ এমন নিটোল, এমন সুব্যক্ত হয়ে ওঠে; তাদের সকল প্রকার গতিভঙ্গিতে এমন একটা মুক্তির মহিমা প্রকাশ পায়। কবি কীটস্ বলেছেন, সত্যই সুন্দর। অর্থাৎ, সত্যের বাধামুক্ত সুসম্পূর্ণতাতেই সৌন্দর্য। সত্য মুক্তি লাভ করলে আপনিই সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়। প্রকাশের পূর্ণতাই সৌন্দর্য, এই কথাটাই আমি উপনিষদের এই বাণীতে অনুভব করি— আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি; অনন্তস্বরূপ যেখানে প্রকাশ পাচ্ছেন, সেইখানেই তাঁর অমৃতরূপ, আনন্দরূপ। মানুষ ভয়ে লোভে ঈর্ষায় মূঢ়তায় প্রয়োজনের সংকীর্ণতায় এই প্রকাশকে আচ্ছন্ন করে, বিকৃত করে; এবং সেই বিকৃতিকেই অনেকসময় বড়ো নাম দিয়ে বিশেষ ভাবে আদর করে থাকে।

তোসামারু জাহাজ
২৭ বৈশাখ ১৩২৩

৫

২৯ বৈশাখ। বিকেলের দিকে যখন পিনাঙের বন্দরে ঢুকছি, আমাদের সঙ্গে যে-বালকটি এসেছে, তার নাম মুকুল, সে বলে উঠল, "ইস্কুলে একদিন পিনাঙ সিঙাপুর মুখস্থ করে মরেছি, এ সেই পিনাঙ।" তখন আমার মনে হল, ইস্কুলের ম্যাপে পিনাঙ দেখা

যেমন সহজ ছিল, এ তার চেয়ে বেশি শক্ত নয়। তখন মাস্টার ম্যাপে আঙুল বুলিয়ে দেশ দেখাতেন, এ হচ্ছে জাহাজ বুলিয়ে দেখানো।

এরকম ভ্রমণের মধ্যে 'বস্তুতন্ত্রতা' খুব সামান্য। বসে বসে স্বপ্ন দেখবার মতো। না করছি চেষ্টা, না করছি চিন্তা, চোখের সামনে আপনা-আপনি সব জেগে উঠছে। এই-সব দেশ বের করতে, এর পথ ঠিক করে রাখতে, এর রাস্তাঘাট পাকা করে তুলতে, অনেক মানুষকে অনেক ভ্রমণ এবং অনেক দুঃসাহস করতে হয়েছে; আমরা সেই সমস্ত ভ্রমণ ও দুঃসাহসের বোতলে-ভরা মোরব্বা উপভোগ করছি যেন। এতে কোনো কাঁটা নেই, খোসা নেই, আঁটি নেই; কেবল শাঁসটুকু আছে, আর তার সঙ্গে যতটা সম্ভব চিনি মেশানো। অকূল সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে, দিগন্তের পর দিগন্তের পর্দা উঠে উঠে যাচ্ছে, দুর্গমতার একটা প্রকাণ্ড মূর্তি চোখে দেখতে পাচ্ছি; অথচ আলিপুরে খাঁচার-সিংহটার মতো তাকে দেখে আমোদ বোধ করছি; ভীষণও মনোহর হয়ে দেখা দিচ্ছে।

আরব্য উপন্যাসে আলাদিনের প্রদীপের কথা যখন পড়েছিলুম তখন সেটাকে ভারি লোভনীয় মনে হয়েছিল। এ তো সেই প্রদীপেরই মায়া। জলের উপরে স্থলের উপরে সেই প্রদীপটা ঘষছে, আর অদৃশ্য দৃশ্য হচ্ছে, দূর নিকটে এসে পড়ছে। আমরা এক জায়গায় বসে আছি, আর জায়গাগুলোই আমাদের সামনে এসে পড়ছে।

কিন্তু মানুষ ফলটাকেই যে মুখ্যভাবে চায় তা নয়, ফলিয়ে তোলানোটাই তার সব-চেয়ে বড়ো জিনিস। সেইজন্যে, এই যে ভ্রমণ করছি এর মধ্যে মন একটা অভাব অনুভব করছে, সেটি হচ্ছে এই যে আমরা ভ্রমণ করছি নে। সমুদ্রপথে আসতে আসতে মাঝে মাঝে দূরে দূরে এক-একটা পাহাড় দেখা দিচ্ছিল, আগাগোড়া গাছে ঢাকা; ঠিক যেন কোন্ দানবলোকের প্রকাণ্ড জন্তু তার কোঁকড়া সবুজ রোঁয়া নিয়ে সমুদ্রের ধারে ঝিমোতে ঝিমোতে রোদ পোয়াচ্ছে; মুকুল তাই দেখে বললে, ওইখানে নেবে যেতে ইচ্ছা করে। ওই ইচ্ছাটা হচ্ছে সত্যকার ভ্রমণ করবার ইচ্ছা। অন্য কর্তৃক দেখিয়ে দেওয়ার বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে নিজে দেখার ইচ্ছা। ওই পাহাড়ওয়ালা ছোটো ছোটো দ্বীপগুলোর নাম জানি নে, ইস্কুলের ম্যাপে ওগুলোকে মুখস্থ করতে হয় নি; দূর থেকে দেখে মনে হয়, ওরা একেবারে তাজা রয়েছে, সারকুলেটিং লাইব্রেরির বইগুলোর মতো মানুষের হাতে হাতে ফিরে নানা চিহ্নে চিহ্নিত হয়ে যায় নি; সেইজন্যে মনকে টানে। অন্যের পরে মানুষের বড়ো ঈর্ষা। যাকে আর কেউ পায় নি মানুষ তাকে পেতে চায়। তাতে যে পাওয়ার পরিমাণ বাড়ে তা নয়, কিন্তু পাওয়ার অভিমান বাড়ে।

সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছে তখন পিনাঙের বন্দরে জাহাজ এসে পৌছল। মনে হল,

বড়ো সুন্দর এই পৃথিবী। জলের সঙ্গে স্থলের যেন প্রেমের মিলন দেখলুম। ধরণী তার দুই বাহু মেলে সমুদ্রকে আলিঙ্গন করছে। মেঘের ভিতর দিয়ে নীলাভ পাহাড়গুলির উপরে যে একটি সুকোমল আলো পড়েছে সে যেন অতি সূক্ষ্ম সোনালি রঙের ওড়নার মতো; তাতে বধূর মুখ ঢেকেছে না প্রকাশ করছে, তা বলা যায় না। জলে স্থলে আকাশে মিলে এখানে সন্ধ্যাবেলাকার স্বর্ণতোরণের থেকে স্বর্গীয় নহবত বাজতে লাগল।

পালতোলা সমুদ্রের নৌকাগুলির মতো মানুষের সুন্দর সৃষ্টি অতি অল্পই আছে। যেখানে প্রকৃতির ছন্দে লয়ে মানুষকে চলতে হয়েছে সেখানে মানুষের সৃষ্টি সুন্দর না হয়ে থাকতে পারে না। নৌকোকে জলবাতাসের সঙ্গে সন্ধি করতে হয়েছে, এইজন্যেই জল বাতাসের শ্রীটুকু সে পেয়েছে। কল যেখানে নিজের জোরে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করতে পারে সেখানেই সেই ঔদ্ধত্যে মানুষের রচনা কুশ্রী হয়ে উঠতে লজ্জামাত্র করে না। কলের জাহাজে পালের জাহাজের চেয়ে সুবিধা আছে, কিন্তু সৌন্দর্য নেই। জাহাজ যখন আস্তে আস্তে বন্দরের গা ঘেঁষে এল, যখন প্রকৃতির চেয়ে মানুষের দুশ্চেষ্টা বড়ো হয়ে দেখা দিল, কলের চিমনিগুলো প্রকৃতির বাঁকা ভঙ্গিমার উপর তার সোজা আঁচড় কাটতে লাগল, তখন দেখতে পেলুম মানুষের রিপু জগতে কী কুশ্রীতাই সৃষ্টি করছে। সমুদ্রের তীরে তীরে, বন্দরে বন্দরে, মানুষের লোভ কদর্য ভঙ্গিতে স্বর্গকে ব্যঙ্গ করছে— এমনি করেই নিজেকে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত করে দিচ্ছে।

তোসামারু। পিনাঙ বন্দর

৬

২রা জ্যৈষ্ঠ। উপরে আকাশ, নীচে সমুদ্র। দিনে রাত্রে আমাদের দুই চক্ষুর বরাদ্দ এর বেশি নয়। আমাদের চোখদুটো মা-পৃথিবীর আদর পেয়ে পেটুক হয়ে গেছে। তার পাতে নানা রকমের জোগান দেওয়া চাই। তার অধিকাংশই সে স্পর্শও করে না, ফেলা যায়। কত যে নষ্ট হচ্ছে বলা যায় না, দেখবার জিনিস অতিরিক্ত পরিমাণে পাই বলেই দেখবার জিনিস সম্পূর্ণ করে দেখি নে। এইজন্যে মাঝে মাঝে আমাদের পেটুক চোখের পক্ষে এই রকমের উপবাস ভালো।

আমাদের সামনে মস্ত দুটো ভোজের থালা, আকাশ আর সাগর। অভ্যাসদোষে প্রথমটা মনে হয়, এ দুটো বুঝি একেবারে শূন্য থালা। তার পর দুই-এক দিন লঙ্ঘনের পর ক্ষুধা একটু বাড়লেই তখন দেখতে পাই, যা আছে তা নেহাত কম নয়। মেঘ

ক্রমাগত নতুন নতুন রঙে সরস হয়ে আসছে, আলো ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন স্বাদে আকাশকে এবং জলকে পূর্ণ করে তুলছে।

আমরা দিনরাত পৃথিবীর কোলে কাঁখে থাকি বলেই আকাশের দিকে তাকাই নে, আকাশের দিগ্‌বসনকে বলি উলঙ্গতা। যখন দীর্ঘকাল ওই আকাশের সঙ্গে মুখোমুখি করে থাকতে হয়, তখন তার পরিচয়ের বিচিত্রতায় অবাক হয়ে থাকি। ওখানে মেঘে মেঘে রূপের এবং রঙের অহেতুক বিকাশ। এ যেন গানের আলাপের মতো, রূপ-রঙের রাগরাগিণীর আলাপ চলছে— তাল নেই, আকার-আয়তনের বাঁধাবাঁধি নেই, কোনো অর্থবিশিষ্ট বাণী নেই, কেবলমাত্র মুক্ত সুরের লীলা। সেইসঙ্গে সমুদ্রের অপ্সরনৃত্য ও মুক্ত ছন্দের নাচ। তার মৃদঙ্গে যে বোল বাজছে তার ছন্দ এমন বিপুল যে, তার লয় খুঁজে পাওয়া যায় না। তাতে নৃত্যের উল্লাস আছে, অথচ নৃত্যের নিয়ম নেই।

এই বিরাট রঙ্গশালায় আকাশ এবং সমুদ্রের যে-রঙ্গ সেইটি দেখবার শক্তি ক্রমে আমাদের বেড়ে ওঠে। জগতে যা-কিছু মহান, তার চারি দিকে একটা বিরলতা আছে, তার পটভূমিকা (background) সাদাসিধে। সে আপনাকে দেখাবার জন্যে আর কিছুর সাহায্য নিতে চায় না। নিশীথের নক্ষত্রসভা অসীম অন্ধকারের অবকাশের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। এই সমুদ্র-আকাশের যে বৃহৎ প্রকাশ সেও বহু-উপকরণের দ্বারা আপন মর্যাদা নষ্ট করে না। এরা হল জগতের বড়ো ওস্তাদ, ছলাকলায় আমাদের মন ভোলাতে এরা অবজ্ঞা করে। মনকে শ্রদ্ধাপূর্বক আপন হতে অগ্রসর হয়ে এদের কাছে যেতে হয়। মন যখন নানা ভোগে জীর্ণ হয়ে অলস এবং 'অন্যথাবৃত্তি' হয়ে থাকে তখন এই ওস্তাদের আলাপ তার পক্ষে অত্যন্ত ফাঁকা।

আমাদের সুবিধে হয়েছে, সামনে আমাদের আর কিছু নেই। অন্যবারে যখন বিলিতি যাত্রী-জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছি তখন যাত্রীরাই ছিল এক দৃশ্য। তারা নাচে গানে খেলায় গোলেমালে অনন্তকে আচ্ছন্ন করে রাখত। এক মুহূর্তও তারা ফাঁকা ফেলে রাখতে চাইত না। তার উপরে সাজসজ্জা, কায়দাকানুনের উপসর্গ ছিল। এখানে জাহাজের ডেকের সঙ্গে সমুদ্র-আকাশের কোনো প্রতিযোগিতা নেই। যাত্রীর সংখ্যা অতি সামান্য, আমরাই চারজন; বাকি দু-তিনজন ধীর প্রকৃতির লোক। তার পরে, ঢিলাঢালা বেশেই ঘুমচ্ছি, জাগছি, খেতে যাচ্ছি, কারো কোনো আপত্তি নেই; তার প্রধান কারণ, এমন কোনো মহিলা নেই আমাদের অপরিচ্ছন্নতায় যাঁর অসম্ভ্রম হতে পারে।

এইজন্যেই প্রতিদিন আমরা বুঝতে পারছি, জগতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সামান্য ব্যাপার নয়, তার অভ্যর্থনার জন্যে স্বর্গে মর্তে রাজকীয় সমারোহ। প্রভাতে পৃথিবী

তার ঘোমটা খুলে দাঁড়ায়, তার বাণী নানা সুরে জেগে ওঠে; সন্ধ্যায় স্বর্গলোকের যবনিকা উঠে যায়, এবং দ্যুলোক আপন জ্যোতি-রোমাঞ্চিত নিঃশব্দতার দ্বারা পৃথিবীর সম্ভাষণে উত্তর দেয়। স্বর্গমর্তের এই মুখোমুখি আলাপ যে কত গম্ভীর এবং কত মহীয়ান, এই আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তা আমরা বুঝতে পারি।

দিগন্ত থেকে দেখতে পাই, মেঘগুলো নানা ভঙ্গিতে আকাশে উঠে চলেছে, যেন সৃষ্টিকর্তার আঙিনার আকার-ফোয়ারার মুখ খুলে গেছে। বস্তু প্রায় কিছুই নেই, কেবল আকৃতি, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই। নানা রকমের আকার—কেবল সোজা লাইন নেই। সোজা লাইনটা মানুষের হাতের কাজের। তার ঘরের দেওয়ালে, তার কারখানাঘরের চিমনিতে মানুষের জয়স্তম্ভ একেবারে সোজা খাড়া। বাঁকা রেখা জীবনের রেখা, মানুষ সহজে তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। সোজা রেখা জড় রেখা, সে সহজেই মানুষের শাসন মানে; সে মানুষের বোঝা বয়, মানুষের অত্যাচার সয়।

যেমন আকৃতির হরির লুঠ, তেমনি রঙের। রঙ যে কত রকম হতে পারে, তার সীমা নেই। রঙের তান উঠছে, তানের উপর তান; তাদের মিলও যেমন, তাদের অমিলও তেমনি; তারা বিরুদ্ধ নয়, অথচ বিচিত্র। রঙের সমারোহেও যেমন প্রকৃতির বিলাস, রঙের শান্তিতেও তেমনি। সূর্যাস্তের মুহূর্তে পশ্চিম আকাশ যেখানে রঙের ঐশ্বর্য পাগলের মতো দুই হাতে বিনা প্রয়োজনে ছড়িয়ে দিচ্ছে সেও যেমন আশ্চর্য, পূর্ব আকাশে যেখানে শান্তি এবং সংযম, সেখানেও রঙের পেলবতা, কোমলতা, অপরিমেয় গভীরতা তেমনি আশ্চর্য। প্রকৃতির হাতে অপর্যাপ্তও যেমন মহৎ হতে পারে, পর্যাপ্তও তেমনি। সূর্যাস্তে সূর্যোদয়ে প্রকৃতি আপনার ডাইনে বাঁয়ে একই কালে সেটা দেখিয়ে দেয়; তার খেয়াল আর ধ্রুপদ একই সঙ্গে বাজতে থাকে, অথচ কেউ কারো মহিমাকে আঘাত করে না।

তার পরে, রঙের আভায় আভায় জল যে কত বিচিত্র কথাই বলতে পারে তা কেমন করে বর্ণনা করব। সে তার জলতরঙ্গে রঙের যে গৎ বাজাতে থাকে, তাতে সুরের চেয়ে শ্রুতি অসংখ্য। আকাশ যে-সময়ে তার প্রশান্ত শুদ্ধতার উপর রঙের মহতোমহীয়ানকে দেখায় সমুদ্র সেইসময় তার ছোটো ছোটো লহরীর কম্পনে রঙের অণোরণীয়ানকে দেখাতে থাকে, তখন আশ্চর্যের অন্ত পাওয়া যায় না।

সমুদ্র-আকাশের গীতিনাট্যলীলায় রুদ্রের প্রকাশ কী রকম দেখা গেছে, সে পূর্বেই বলেছি। আবার কালও তিনি তাঁর ডমরু বাজিয়ে অট্টহাস্যে আর এক ভঙ্গিতে দেখা দিয়ে গেলেন। সকালে আকাশ জুড়ে নীল মেঘ এবং ধোঁয়ালো মেঘ স্তরে স্তরে পাকিয়ে

পাকিয়ে ফুলে ফুলে উঠল। মুষলধারে বৃষ্টি। বিদ্যুৎ আমাদের জাহাজের চার দিকে তার তলোয়ার খেলিয়ে বেড়াতে লাগল। তার পিছনে পিছনে বজ্রের গর্জন। একটা বজ্র ঠিক আমাদের সামনে জলের উপর পড়ল, জল থেকে একটা বাষ্পরেখা সাপের মতো ফোঁস করে উঠল। আর-একটা বজ্র পড়ল আমাদের সামনেকার মাস্তুলে। রুদ্র যেন সুইট্‌জার্‌ল্যাণ্ডের ইতিহাসবিশ্রুত বীর উইলিয়ম টেলের মতো তাঁর অদ্ভুত ধনুর্বিদ্যার পরিচয় দিয়ে গেলেন, মাস্তুলের ডগাটায় তাঁর বাণ লাগল, আমাদের স্পর্শ করল না। এই ঝড়ে আমাদের সঙ্গী আর-একটা জাহাজের প্রধান মাস্তুল বজ্রে বিদীর্ণ হয়েছে শুনলুম। মানুষ যে বাঁচে এই আশ্চর্য।

৭

এই কয়দিন আকাশ এবং সমুদ্রের দিকে চোখ ভরে দেখছি আর মনে হচ্ছে, অনন্তের রঙ তো শুভ্র নয়, তা কালো কিম্বা নীল। এই আকাশ খানিক দূর পর্যন্ত আকাশ অর্থাৎ প্রকাশ, ততটা সে সাদা। তার পরে সে অব্যক্ত, সেইখান থেকে সে নীল। আলো যতদূর সীমার রাজ্য সেই পর্যন্ত; তার পরেই অসীম অন্ধকার। সেই অসীম অন্ধকারের বুকের উপরে এই পৃথিবীর আলোকময় দিনটুকু যেন কৌস্তুভমণির হার দুলছে।

এই প্রকাশের জগৎ, এই গৌরাঙ্গী, তার বিচিত্র রঙের সাজ প'রে অভিসারে চলেছে— ওই কালোর দিকে, ওই অনির্বচনীয় অব্যক্তর দিকে। বাঁধা নিয়মের মধ্যে বাঁধা থাকাতেই তার মরণ— সে কুলকেই সর্বস্ব করে চুপ করে বসে থাকতে পারে না, সে কুল খুইয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এই বেরিয়ে যাওয়া বিপদের যাত্রা; পথে কাঁটা, পথে সাপ, পথে ঝড় বৃষ্টি— সমস্তকে অতিক্রম করে, বিপদকে উপেক্ষা করে সে যে চলেছে, সে কেবল ওই অব্যক্ত অসীমের টানে। অব্যক্তর দিকে, 'আরো'র দিকে প্রকাশের এই কুল-খোয়ানো অভিসারযাত্রা— প্রলয়ের ভিতর দিয়ে, বিপ্লবের কাঁটাপথে পদে পদে রক্তের চিহ্ন এঁকে।

কিন্তু কেন চলে, কোন্ দিকে চলে, ওদিকে তো পথের চিহ্ন নেই, কিছু তো দেখতে পাওয়া যায় না? না, দেখা যায় না, সব অব্যক্ত কিন্তু শূন্য তো নয়; কেননা, ওই দিক থেকেই বাঁশির সুর আসছে। আমাদের চলা, এ চোখে দেখে চলা নয়, এ সুরের টানে চলা। যেটুকু চোখে দেখে চলি সে তো বুদ্ধিমানের চলা, তার হিসাব আছে, তার প্রমাণ আছে; সে ঘুরে ঘুরে কুলের মধ্যেই চলা। সে চলায় কিছুই এগোয় না। আর যেটুকু বাঁশি শুনে পাগল হয়ে চলি, যে-চলায় মরা-বাঁচা জ্ঞান থাকে না, সেই পাগলের

চলাতেই জগৎ এগিয়ে চলেছে। সেই চলাকে নিন্দার ভিতর দিয়ে, বাধার ভিতর দিয়ে চলতে হয়; কোনো নজির মানতে গেলেই তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়। তার এই চলার বিরুদ্ধে হাজাররকম যুক্তি আছে, সে-যুক্তি তর্কের দ্বারা খণ্ডন করা যায় না। তার এই চলার কেবল একটিমাত্র কৈফিয়ত আছে— সে বলছে, ওই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বাঁশি আমাকে ডাকছে। নইলে কেউ কি সাধ করে আপনার সীমা ডিঙিয়ে যেতে পারে।

যে দিক থেকে ওই মনোহরণ অন্ধকারের বাঁশি বাজছে ওই দিকেই মানুষের সমস্ত আরাধনা, সমস্ত কাব্য, সমস্ত শিল্পকলা, সমস্ত বীরত্ব, সমস্ত আত্মত্যাগ মুখ ফিরিয়ে আছে; ওই দিকে চেয়েই মানুষ রাজ্যসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে বিবাগি হয়ে বেরিয়ে গেছে, মরণকে মাথায় করে নিয়েছে। ওই কালোকে দেখে মানুষ ভুলেছে। ওই কালোর বাঁশিতেই মানুষকে উত্তরমেরু দক্ষিণমেরুতে টানে, অনুবীক্ষণ দূরবীক্ষণের রাস্তা বেয়ে মানুষের মন দুর্গমের পথে ঘুরে বেড়ায়, বারবার মরতে মরতে সমুদ্রপারের পথ বের করে, বারবার মরতে মরতে আকাশপারের ডানা মেলতে থাকে।

মানুষের মধ্যে যে-সব মহাজাতি কুলত্যাগিনী তারাই এগচ্ছে, ভয়ের ভিতর থেকে অভয়ে, বিপদের ভিতর দিয়ে সম্পদে। যারা সর্বনাশা কালোর বাঁশি শুনতে পেলে না তারা কেবল পুঁথির নজির জড়ো করে কূল আঁকড়ে বসে রইল, তারা কেবল শাসন মানতেই আছে। তারা কেন বৃথা এই আনন্দলোকে জন্মেছে যেখানে সীমা কাটিয়ে অসীমের সঙ্গে নিত্যলীলাই হচ্ছে জীবনযাত্রা, যেখানে বিধানকে ভাসিয়ে দিতে থাকাই হচ্ছে বিধি।

আবার উলটো দিক থেকে দেখলে দেখতে পাই, ওই কালো অনন্ত আসছেন তাঁর আপনার শুভ্র জ্যোতির্ময়ী আনন্দমূর্তির দিকে। অসীমের সাধনা এই সুন্দরীর জন্যে, সেইজন্যেই তাঁর বাঁশি বিরাট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে এমন ব্যাকুল হয়ে বাজছে; অসীমের সাধনা এই সুন্দরীকে নূতন নূতন মালায় নূতন করে সাজাচ্ছে। ওই কালো এই রূপসীকে এক মুহূর্ত বুকের থেকে নামিয়ে রাখতে পারেন না, কেননা, এ যে তাঁর পরমা সম্পদ। ছোটোর জন্যে বড়োর এই সাধনা যে কী অসীম, তা ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে পাখির পাখায় পাখায়, মেঘের রঙে রঙে মানুষের হৃদয়ের অপরূপ লাবণ্যে মুহূর্তে মুহূর্তে ধরা পড়েছে। রেখায় রেখায়, রঙে রঙে, রসে রসে তৃপ্তির আর শেষ নেই। এই আনন্দ কিসের।— অব্যক্ত যে ব্যক্তর মধ্যে কেবলই আপনাকে প্রকাশ করছেন, আপনাকে ত্যাগ করে করে ফিরে পাচ্ছেন।

এই অব্যক্ত কেবলই যদি না-মাত্র শূন্যমাত্র হতেন তা হলে প্রকাশের কোনো

অর্থই থাকত না, তা হলে বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি কেবল একটা শব্দমাত্র হত। ব্যক্ত যদি অব্যক্তেরই প্রকাশ না হত তা হলে যা-কিছু আছে তা নিশ্চল হয়ে থাকত, কেবলই আরো-কিছুর দিকে আপনাকে নূতন করে তুলত না। এই আরো-কিছুর দিকেই সমস্ত জগতের আনন্দ কেন। এই অজানা আরো-কিছুর বাঁশি শুনেই সে কূল ত্যাগ করে কেন। ওই দিকে শূন্য নয় ব'লেই, ওই দিকেই সে পূর্ণকে অনুভব করে ব'লেই। সেইজন্যই উপনিষদ বলেছেন— ভূমৈব সুখং, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। সেইজন্যই তো সৃষ্টির এই লীলা দেখছি, আলো এগিয়ে চলেছে অন্ধকারের অকূলে, অন্ধকার নেমে আসছে আলোর কূলে। আলোর মন ভুলেছে কালোয়, কালোর মন ভুলেছে আলোয়।

মানুষ যখন জগৎকে না-এর দিক থেকে দেখে, তখন তার রূপক একেবারে উলটে যায়। প্রকাশের একটা উলটো পিঠ আছে, সে হচ্ছে প্রলয়। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে ছাড়া প্রাণের বিকাশ হতেই পারে না। হয়ে-ওঠার মধ্যে দুটো জিনিস থাকাই চাই— যাওয়া এবং হওয়া। হওয়াটাই হচ্ছে মুখ্য, যাওয়াটাই গৌণ।

কিন্তু মানুষ যদি উলটো পিঠেই চোখ রাখে, বলে, সবই যাচ্ছে, কিছুই থাকছে না; বলে, জগৎ বিনাশেরই প্রতিরূপ, সমস্তই মায়া, যা-কিছু দেখছি এ-সমস্তই 'না'; তা হলে এই প্রকাশের রূপকেই সে কালো ক'রে, ভয়ংকর ক'রে দেখে; তখন সে দেখে, এই কালো কোথাও এগচ্ছে না, কেবল বিনাশের বেশে নৃত্য করছে। আর, অনন্ত রয়েছেন আপনাতে আপনি নির্লিপ্ত, এই কালিমা তাঁর বুকের উপর মৃত্যুর ছায়ার মতো চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু স্তব্ধকে স্পর্শ করতে পারছে না। এই কালো দৃশ্যত আছে, কিন্তু বস্তুত নেই; আর যিনি কেবলমাত্র আছেন তিনি স্থির, ওই প্রলয়রূপিণী না-থাকা তাঁকে লেশমাত্র বিক্ষুব্ধ করে না। এখানে আলোর সঙ্গে কালোর সেই সম্বন্ধ, থাকার সঙ্গে না-থাকার যে সম্বন্ধ। কালোর সঙ্গে আলোর আনন্দের লীলা নেই; এখানে যোগের অর্থ হচ্ছে প্রেমের যোগ নয়, জ্ঞানের যোগ। দুইয়ের যোগে এক নয়, একের মধ্যেই এক। মিলনে এক নয়, প্রলয়ে এক।

কথাটাকে আর-একটু পরিষ্কার করবার চেষ্টা করি।

একজন লোক ব্যাবসা করছে। সে লোক করছে কী। তার মূলধনকে অর্থাৎ পাওয়া-সম্পদকে সে মুনফা অর্থাৎ না-পাওয়া সম্পদের দিকে প্রেরণ করছে। পাওয়া-সম্পদটা সীমাবদ্ধ ও ব্যক্ত, না-পাওয়া সম্পদটা অসীম ও অব্যক্ত। পাওয়া-সম্পদ সমস্ত বিপদ স্বীকার করে না-পাওয়া সম্পদের অভিসারে চলেছে। না-পাওয়া সম্পদ অদৃশ্য ও অলব্ধ বটে কিন্তু তার বাঁশি বাজছে, সেই বাঁশি ভূমার বাঁশি। যে-বণিক সেই বাঁশি শোনে সে আপন ব্যাঙ্কে-জমানো কোম্পানি-কাগজের কূল ত্যাগ ক'রে সাগর গিরি

ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এখানে কী দেখছি। না, পাওয়া-সম্পদের সঙ্গে না-পাওয়া সম্পদের একটি লাভের যোগ আছে। এই যোগে উভয়ত আনন্দ। কেননা, এই যোগে পাওয়া না-পাওয়াকে পাচ্ছে, এবং না-পাওয়া পাওয়ার মধ্যে ক্রমাগত আপনাকেই পাচ্ছে।

কিন্তু মনে করা যাক, একজন ভীতু লোক বণিকের খাতায় ওই খরচের দিকের হিসাবটাই দেখছে। বণিক কেবলই আপনার পাওয়া টাকা খরচ করেই চলেছে, তার অন্ত নেই। তার গা শিউরে ওঠে। সে বলে, এই তো প্রলয়! খরচের হিসাবের কালো অঙ্কগুলো রক্তলোলুপ রসনা দুলিয়ে কেবলই যে নৃত্য করছে। যা খরচ, অর্থাৎ বস্তুত যা নেই, তাই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অঙ্ক-বস্তুর আকার ধরে খাতা জুড়ে বেড়ে বেড়েই চলেছে। একেই তো বলে মায়া। বণিক মুগ্ধ হয়ে এই মায়া-অঙ্কটির চির-দীর্ঘায়মান শৃঙ্খল কাটাতে পারছে না। এ-স্থলে মুক্তিটা কী। না, ওই সচল অঙ্কগুলোকে একেবারে লোপ করে দিয়ে খাতার নিশ্চল নির্বিকার শুভ্র কাগজের মধ্যে নিরাপদ ও নিরঞ্জন হয়ে স্থিরত্ব লাভ করা। দেওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে একটি আনন্দময় সম্বন্ধ আছে যে-সম্বন্ধ থাকার দরুন মানুষ দুঃসাহসের পথে যাত্রা ক'রে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জয়লাভ করে, ভীতু মানুষ তাকে দেখতে পায় না। তাই বলে—

মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।

চীন সমুদ্র। তোসামারু
৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

৮

শুনেছিলুম, পারস্যের রাজা যখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন তখন হাতে খাওয়ার প্রসঙ্গে-তিনি ইংরেজকে বলেছিলেন, "কাঁটাচামচ দিয়ে খেতে গিয়ে তোমরা খাওয়ার একটা আনন্দ থেকে বঞ্চিত হও।" যারা ঘটকের হাত দিয়ে বিয়ে করে তারা কোর্টশিপের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। হাত দিয়ে স্পর্শ করেই খাবারের সঙ্গে কোর্টশিপ আরম্ভ হয়। আঙুলের ডগা দিয়েই স্বাদগ্রহণের শুরু।

আমার তেমনি জাহাজ থেকেই জাপানের স্বাদ শুরু হয়েছে। যদি ফরাসি জাহাজে করে জাপানে যেতুম তা হলে আঙুলের ডগা দিয়ে পরিচয় আরম্ভ হত না।

এর আগে অনেকবার বিলিতি জাহাজে করে সমুদ্রযাত্রা করেছি, তার সঙ্গে এই জাহাজের বিস্তর তফাত। সে সব জাহাজের কাপ্তেন ঘোরতর কাপ্তেন। যাত্রীদের

সঙ্গে খাওয়াদাওয়া হাসিতামাশা যে তার বন্ধ তা নয়; কিন্তু কাপ্তেনিটা খুব টক্‌টকে রাঙা। এত জাহাজে আমি ঘুরেছি, তার মধ্যে কোনো কাপ্তেনকেই আমার মনে পড়ে না। কেননা, তারা কেবলমাত্র জাহাজের অঙ্গ। জাহাজ-চালানোর মাঝখান দিয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ।

হতে পারে আমি যদি য়ুরোপীয় হতুম তা হলে তারা যে কাপ্তেন ছাড়াও আর কিছু, তারা যে মানুষ, এটা আমার অনুভব করতে বিশেষ বাধা হত না। কিন্তু, এ জাহাজেও আমি বিদেশী; একজন য়ুরোপীয়ের পক্ষেও আমি যা একজন জাপানির পক্ষেও আমি তাই।

এ জাহাজে চড়ে অবধি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের কাপ্তেনের কাপ্তেনিটা কিছুমাত্র লক্ষ্যগোচর নয়, একেবারেই সহজ মানুষ। যাঁরা তাঁর নিম্নতর কর্মচারী তাঁদের সঙ্গে তাঁর কর্মের সম্বন্ধ এবং দূরত্ব আছে, কিন্তু যাত্রীদের সঙ্গে কিছুমাত্র নেই। ঘোরতর ঝড়ঝাপটের মধ্যেও তাঁর ঘরে গেছি; দিব্যি সহজ ভাব। কথায় বার্তায় ব্যবহারে তাঁর সঙ্গে আমাদের যে জমে গিয়েছে, সে কাপ্তেন-হিসাবে নয়, মানুষ-হিসাবে। এ যাত্রা আমাদের শেষ হয়ে যাবে, তাঁর সঙ্গে জাহাজ-চলার সম্বন্ধ আমাদের ঘুচে যাবে, কিন্তু তাঁকে আমাদের মনে থাকবে।

আমাদের ক্যাবিনের যে স্টুয়ার্ড্ আছে সেও দেখি তার কাজকর্মের সীমাটুকুর মধ্যেই শক্ত হয়ে থাকে না। আমরা আপনাদের মধ্যে কথাবার্তা কচ্ছি তার মাঝখানে এসে সেও ভাঙা ইংরাজিতে যোগ দিতে বাধা বোধ করে না। মুকুল ছবি আঁকছে, সে এসে খাতা চেয়ে নিয়ে তার মধ্যে ছবি আঁকতে লেগে গেল।

আমাদের জাহাজের যিনি খাজাঞ্চি তিনি একদিন এসে আমাকে বললেন, "আমার মনে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন আসে, তোমার সঙ্গে তার বিচার করতে ইচ্ছে করি; কিন্তু আমি ইংরাজি এত কম জানি যে, মুখে মুখে আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি যদি কিছু না মনে কর তবে আমি মাঝে মাঝে কাগজে আমার প্রশ্ন লিখে এনে দেব, তুমি অবসরমতো সংক্ষেপে দু-চার কথায় তার উত্তর লিখে দিয়ো।" তার পর থেকে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ কী, এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার প্রশ্নোত্তর চলছে।

অন্য কোনো জাহাজের খাজাঞ্চি এই সব প্রশ্ন নিয়ে যে মাথা বকায়, কিম্বা নিজের কাজকর্মের মাঝখানে এরকম উপসর্গের সৃষ্টি করে, এরকম আমি মনে করতে পারি নে। এদের দেখে আমার মনে হয়, এরা নূতনজাগ্রত জাতি— এরা সমস্তই নূতন করে জানতে, নূতন করে ভাবতে উৎসুক। ছেলেরা নতুন জিনিস দেখলে যেমন ব্যগ্র হয়ে ওঠে, আইডিয়া সম্বন্ধে এদের যেন সেইরকম ভাব।

তা ছাড়া আর-একটা বিশেষত্ব এই যে, এক পক্ষে জাহাজের যাত্রী আর-এক পক্ষে জাহাজের কর্মচারী, এর মাঝখানকার গণ্ডিটা তেমন শক্ত নয়। আমি যে এই খাজাঞ্চির প্রশ্নের উত্তর লিখতে বসব, এ কথা মনে করতে তার কিছু বাধে নি— আমি দুটো কথা শুনতে চাই, তুমি দুটো কথা বলবে; এতে বিঘ্ন কী আছে। মানুষের উপর মানুষের যে একটি দাবি আছে সেই দাবিটা সরলভাবে উপস্থিত করলে মনের মধ্যে আপনি সাড়া দেয়, তাই আমি খুশি হয়ে আমার সাধ্যমতো এই আলোচনায় যোগ দিয়েছি।

আর-একটা জিনিস আমার বিশেষ করে চোখে লাগছে। মুকুল বালকমাত্র, সে ডেকের প্যাসেঞ্জার। কিন্তু, জাহাজের কর্মচারীরা তার সঙ্গে অবাধে বন্ধুত্ব করছে। কী করে জাহাজ চালায়, কী করে সমুদ্রে পথ নির্ণয় করে, কী করে গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতে হয়, কাজ করতে করতে তারা এই সমস্ত তাকে বোঝায়। তা ছাড়া নিজেদের কাজকর্ম আশাভরসার কথাও ওর সঙ্গে হয়। মুকুলের শখ গেল, জাহাজের এঞ্জিনের ব্যাপার দেখবে। ওকে কাল রাত্রি এগারোটার সময় জাহাজের পাতালপুরীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে এক ঘণ্টা ধরে সমস্ত দেখিয়ে আনলে।

কাজের সম্বন্ধের ভিতর দিয়েও মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ, এইটেই বোধ হয় আমাদের পূর্বদেশের জিনিস। পশ্চিমদেশ কাজকে খুব শক্ত করে খাড়া করে রাখে, সেখানে মানবসম্বন্ধের দাবি ঘেঁষতে পারে না। তাতে কাজ খুব পাকা হয় সন্দেহ নেই। আমি ভেবেছিলুম, জাপান তো য়ুরোপের কাছ থেকে কাজের দীক্ষা গ্রহণ করেছে, অতএব তার কাজের গণ্ডিও বোধ হয় পাকা। কিন্তু, এই জাপানি জাহাজে কাজ দেখতে পাচ্ছি, কাজের গণ্ডিগুলোকে দেখতে পাচ্ছি নে। মনে হচ্ছে, যেন আপনার বাড়িতে আছি, কোম্পানির জাহাজে নেই। অথচ, ধোওয়া মাজা প্রভৃতি জাহাজের নিত্যকর্মের কোনো খুঁত নেই।

প্রাচ্যদেশে মানবসমাজের সম্বন্ধগুলি বিচিত্র এবং গভীর। পূর্বপুরুষ যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের সঙ্গেও আমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। আমাদের আত্মীয়তার জাল বহুবিস্তৃত। এই নানা সম্বন্ধের নানা দাবি মেটানো আমাদের চিরাভ্যস্ত, সেইজন্যে তাতে আমাদের আনন্দ। আমাদের ভৃত্যেরাও কেবল বেতনের নয়, আত্মীয়তার দাবি করে। সেইজন্যে যেখানে আমাদের কোনো দাবি চলে না, যেখানে কাজ অত্যন্ত খাড়া, সেখানে আমাদের প্রকৃতি কষ্ট পায়। অনেক সময়ে ইংরেজ মনিবের সঙ্গে বাঙালি কর্মচারীর যে বোঝাপড়ার অভাব ঘটে তার কারণ এই— ইংরেজ কর্তা বাঙালি কর্মচারীর দাবি বুঝতে পারে না, বাঙালি কর্মচারী ইংরেজ কর্তার কাজের কড়া শাসন বুঝতে

পারে না। কর্মশালার কর্তা যে কেবলমাত্র কর্তা হবে তা নয়, মা-বাপ হবে, বাঙালি কর্মচারী চিরকালের অভ্যাসবশত এইটে প্রত্যাশা করে; যখন বাধা পায় তখন আশ্চর্য হয়, এবং মনে মনে মনিবকে দোষ না দিয়ে থাকতে পারে না। ইংরেজ কাজের দাবিকে মানতে অভ্যস্ত, বাঙালি মানুষের দাবিকে মানতে অভ্যস্ত; এইজন্যে উভয় পক্ষে ঠিকমতো মিটমাট হতে চায় না।

কিন্তু, কাজের সম্বন্ধ এবং মানুষের সম্বন্ধ এ দুইয়ের বিচ্ছেদ না হয়ে সামঞ্জস্য হওয়াটাই দরকার, এ কথা না মনে করে থাকা যায় না। কেমন করে সামঞ্জস্য হতে পারে, বাইরে থেকে তার কোনো বাঁধা নিয়ম ঠিক করে দেওয়া যায় না। সত্যকার সামঞ্জস্য প্রকৃতির ভিতর থেকে ঘটে। আমাদের দেশে প্রকৃতির এই ভিতরকার সামঞ্জস্য ঘটে ওঠা কঠিন, কেননা, যাঁরা আমাদের কাজের কর্তা তাঁদের নিয়ম অনুসারেই আমরা কাজ চালাতে বাধ্য।

জাপানে প্রাচ্যমন পাশ্চাত্যের কাছ থেকে কাজের শিক্ষালাভ করেছে, কিন্তু কাজের কর্তা তারা নিজেই। এইজন্যে মনের ভিতরে একটা আশা হয় যে, জাপানে হয়তো পাশ্চাত্য কাজের সঙ্গে প্রাচ্যভাবের একটা সামঞ্জস্য ঘটে উঠতে পারে। যদি সেটা ঘটে, তবে সেইটেই পূর্ণতার আদর্শ হবে। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় অনুকরণের ঝাঁজটা যখন কড়া থাকে তখন বিধিবিধান সম্বন্ধে ছাত্র গুরুর চেয়ে আরো কড়া হয়; কিন্তু ভিতরকার প্রকৃতি আস্তে আস্তে আপনার কাজ করতে থাকে, এবং শিক্ষার কড়া অংশগুলোকে নিজের জারক রসে গলিয়ে আপন করে নেয়। এই জীর্ণ করে নেওয়ার কাজটা একটু সময়সাধ্য। এইজন্যেই পশ্চিমের শিক্ষা জাপানে কী আকার ধারণ করবে, সেটা স্পষ্ট করে দেখবার সময় এখনো হয় নি। সম্ভবত, এখন আমরা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিস্তর অসামঞ্জস্য দেখতে পাব, যেটা কুশ্রী। আমাদের দেশেও পদে পদে তা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু, প্রকৃতির কাজই হচ্ছে অসামঞ্জস্যগুলোকে মিটিয়ে দেওয়া। জাপানে সেই কাজ চলছে সন্দেহ নেই। অন্তত, এই জাহাজটুকুর মধ্যে আমি তো এই দুই ভাবের মিলনের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।

৯

২রা জ্যৈষ্ঠে আমাদের জাহাজ সিঙাপুরে এসে পৌছল। অনতিকাল পরেই একজন জাপানি যুবক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন; তিনি এখানকার একটি জাপানি কাগজের সম্পাদক; তিনি আমাকে বললেন, তাঁদের জাপানের সব-চেয়ে বড়ো দৈনিকপত্রের সম্পাদকের কাছ থেকে তাঁরা তার পেয়েছেন যে আমি জাপানে যাচ্ছি; সেই সম্পাদক আমার কাছ থেকে একটি বক্তৃতা আদায় করবার জন্যে অনুরোধ

করেছেন। আমি বললুম, জাপানে না পৌঁছে আমি এ বিষয়ে আমার সম্মতি জানাতে পারব না। তখনকার মতো এইটুকুতেই মিটে গেল। আমাদের যুবক ইংরেজ বন্ধু পিয়ার্সন এবং মুকুল শহর দেখতে বেরিয়ে গেলেন। জাহাজ একেবারে ঘাটে লেগেছে। এই জাহাজের ঘাটের চেয়ে কুশ্রী বিভীষিকা আর নেই— এরই মধ্যে ঘন মেঘ করে বাদলা দেখা দিলে। বিকট ঘড়্ ঘড়্ শব্দে জাহাজ থেকে মাল ওঠানো নাবানো চলতে লাগল। আমি কুঁড়ে মানুষ, কোমর বেঁধে শহর দেখতে বেরনো আমার ধাতে নেই। আমি সেই বিষম গোলমালের সাইক্লোনের মধ্যে ডেক-এ বসে মনকে কোনোমতে শান্ত করে রাখবার জন্যে লিখতে বসে গেলুম।

খানিক বাদে কাপ্তেন এসে খবর দিলেন যে, একজন জাপানি মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি লেখা বন্ধ ক'রে একটি ইংরাজি-বেশ পরা জাপানি মহিলার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হলুম। তিনিও সেই জাপানি সম্পাদকের পক্ষ নিয়ে বক্তৃতা করবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করতে লাগলেন। আমি বহু কষ্টে সে অনুরোধ কাটালুম। তখন তিনি বললেন, "আপনি যদি একটু শহর বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছা করেন তো আপনাকে সব দেখিয়ে আনতে পারি।" তখন সেই বস্তা তোলার নিরন্তর শব্দ আমার মনটাকে জাঁতার মতো পিষছিল, কোথাও পালাতে পারলে বাঁচি; সুতরাং আমাকে বেশি পীড়াপীড়ি করতে হল না। সেই মহিলাটির মোটর গাড়িতে ক'রে শহর ছাড়িয়ে রবার গাছের আবাদের ভিতর দিয়ে, উঁচু-নিচু পাহাড়ের পথে অনেকটা দূর ঘুরে এলুম। জমি ঢেউ-খেলানো, ঘাস ঘন সবুজ, রাস্তার পাশ দিয়ে একটি ঘোলা জলের স্রোত কল্‌কল্ করে এঁকে বেঁকে ছুটে চলেছে, জলের মাঝে মাঝে আঁটিবাঁধা কাটা বেত ভিজছে। রাস্তার দুই ধারে সব বাগানবাড়ি। পথে ঘাটে চীনেই বেশি; এখানকার সকল কাজেই তারা আছে।

গাড়ি শহরের মধ্যে যখন এল, মহিলাটি তাঁর জাপানি জিনিসের দোকানে আমাকে নিয়ে গেলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে; মনে মনে ভাবছি, জাহাজে আমাদের সন্ধ্যাবেলাকার খাবার সময় হয়ে এল; কিন্তু সেখানে সেই শব্দের ঝড়ে বস্তা তোলপাড় করছে কল্পনা ক'রে কোনোমতেই ফিরতে মন লাগছিল না। মহিলাটি একটি ছোটো ঘরের মধ্যে বসিয়ে, আমাকে ও আমার সঙ্গী ইংরাজটিকে থালায় ফল সাজিয়ে খেতে অনুরোধ করলেন। ফল খাওয়া হলে পর তিনি আস্তে আস্তে অনুরোধ করলেন, যদি আপত্তি না থাকে তিনি আমাদের হোটেলে খাইয়ে আনতে ইচ্ছা করেন। তাঁর এ অনুরোধও আমরা লঙ্ঘন করি নি। রাত্রি প্রায় দশটার সময় তিনি আমাদের জাহাজে পৌঁছিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে গেলেন।

এই রমণীর ইতিহাসে কিছু বিশেষত্ব আছে। এঁর স্বামী জাপানে আইনব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু সে ব্যবসায় যথেষ্ট লাভজনক ছিল না। তাই আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য হাওয়া কঠিন হয়ে উঠছিল। স্ত্রীই স্বামীকে প্রস্তাব করলেন, "এসো আমরা একটা কিছু ব্যাবসা করি।" স্বামী প্রথমে তাতে নারাজ ছিলেন। তিনি বললেন, "আমাদের বংশে ব্যাবসা তো কেউ করে নি, ওটা আমাদের পক্ষে একটা হীন কাজ।" শেষকালে স্ত্রীর অনুরোধে রাজি হয়ে জাপান থেকে দুজনে মিলে সিঙাপুরে এসে দোকান খুললেন। সে আজ আঠারো বৎসর হল। আত্মীয়বন্ধু সকলেই একবাক্যে বললে, এইবার এরা মজল। এই স্ত্রীলোকটির পরিশ্রমে, নৈপুণ্যে এবং লোকের সঙ্গে ব্যবহারকুশলতায়, ক্রমশই ব্যবসায়ের উন্নতি হতে লাগল। গত বৎসরে এঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে; এখন এঁকে একলাই সমস্ত কাজ চালাতে হচ্ছে।

বস্তুত, এই ব্যবসাটি এই স্ত্রীলোকেরই নিজের হাতে তৈরি। আমি যে-কথা বলছিলুম এই ব্যবসায়ে তারই প্রমাণ দেখতে পাই। মানুষের মন বোঝা এবং মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করা স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ; এই মেয়েটির মধ্যে আমরাই তার পরিচয় পেয়েছি। তার পরে, কর্মকুশলতা মেয়েদের স্বাভাবিক। পুরুষ স্বভাবত কুঁড়ে, দায়ে পড়ে তাদের কাজ করতে হয়। মেয়েদের মধ্যে একটা প্রাণের প্রাচুর্য আছে যার স্বাভাবিক বিকাশ হচ্ছে কর্মপরতা। কর্মের সমস্ত খুঁটিনাটি যে কেবল ওরা সহ্য করতে পারে তা নয়, তাতে ওরা আনন্দ পায়। তা ছাড়া দেনাপাওনা সম্বন্ধে ওরা সাবধানী। এইজন্যে, যে-সব কাজে দৈহিক বা মানসিক সাহসিকতার দরকার হয় না সে-সব কাজ মেয়েরা পুরুষের চেয়ে ঢের ভালো করে করতে পারে, এই আমার বিশ্বাস। স্বামী যেখানে সংসার ছারখার করেছে সেখানে স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীর হাতে সংসার পড়ে সমস্ত সুশৃঙ্খলায় রক্ষা পেয়েছে, আমাদের দেশে তার বিস্তর প্রমাণ আছে। শুনেছি, ফ্রান্সের মেয়েরাও ব্যবসায়ে আপনাদের কর্মনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। যে-সব কাজে উদ্ভাবনার দরকার নেই, যে-সব কাজে পটুতা পরিশ্রম ও লোকের সঙ্গে ব্যবহারই সব-চেয়ে দরকার, সে-সব কাজ মেয়েদের।

৩রা জ্যৈষ্ঠ সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়লে। ঠিক এই ছাড়বার সময় একটি বিড়াল জলের মধ্যে পড়ে গেল। তখন সমস্ত ব্যস্ততা ঘুচে গিয়ে, ওই বিড়ালকে বাঁচানোই প্রধান কাজ হয়ে উঠল। নানা উপায়ে নানা কৌশলে তাকে জল থেকে উঠিয়ে তবে জাহাজ ছাড়লে। এতে জাহাজ ছাড়ার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেল। এইটিতে আমাকে বড়ো আনন্দ দিয়েছে।

চীন সমুদ্র
তোসামারু জাহাজ
৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

১০

সমুদ্রের উপর দিয়ে আমাদের দিনগুলি ভেসে চলেছে পালের নৌকার মতো। সে নৌকা কোনো ঘাটে যাবার নৌকা নয়, তাতে কোনো বোঝাই নেই। কেবলমাত্র ঢেউয়ের সঙ্গে, বাতাসের সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে কোলাকুলি করতে তারা বেরিয়েছে। মানুষের লোকালয় মানুষের বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই লোকালয়ের দাবি মিটিয়ে সময় পাওয়া যায় না, বিশ্বের নিমন্ত্রণ আর রাখতেই পারি নে। চাঁদ যেমন তার একটা মুখ সূর্যের দিকে ফিরিয়ে রেখেছে, তার আর-একটা মুখ অন্ধকার, তেমনি লোকালয়ের প্রচণ্ড টানে মানুষের সেই দিকের পিঠটাতেই চেতনার সমস্ত আলো খেলছে, অন্য একটা দিক আমরা ভুলেই গেছি; বিশ্ব যে মানুষের কতখানি, সে আমাদের খেয়ালেই আসে না।

সত্যকে যেদিকে ভুলি কেবল যে সেই দিকেই লোকসান তা নয়, সে লোকসান সকল দিকেই। বিশ্বকে মানুষ যে পরিমাণে যতখানি বাদ দিয়ে চলে তার লোকালয়ের তাপ এবং কলুষ সেই পরিমাণে ততখানি বেড়ে ওঠে। সেইজন্যেই ক্ষণে ক্ষণে মানুষের একেবারে উলটোদিকে টান আসে। সে বলে, "বৈরাগ্যমেবাভয়ং"— বৈরাগ্যের কোনো বালাই নেই। সে ব'লে বসে, সংসার কারাগার; মুক্তি খুঁজতে, শান্তি খুঁজতে সে বনে পর্বতে সমুদ্রতীরে ছুটে যায়। মানুষ সংসারের সঙ্গে বিশ্বের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে বলেই বড়ো করে প্রাণের নিশ্বাস নেবার জন্যে তাকে সংসার ছেড়ে বিশ্বের দিকে যেতে হয়। এতবড়ো অদ্ভুত কথা তাই মানুষকে বলতে হয়েছে— মানুষের মুক্তির রাস্তা মানুষের কাছ থেকে দূরে।

লোকালয়ের মধ্যে যখন থাকি অবকাশ জিনিসটাকে তখন ডরাই। কেননা, লোকালয় জিনিসটা একটা নিরেট জিনিস, তার মধ্যে ফাঁকমাত্রই ফাঁকা। সেই ফাঁকটাকে কোনোমতে চাপা দেবার জন্যে আমাদের মদ চাই, তাস পাশা চাই, রাজা-উজির মারা চাই— নইলে সময় কাটে না। অর্থাৎ সময়টাকে আমরা চাই নে, সময়টাকে আমরা বাদ দিতে চাই।

কিন্তু, অবকাশ হচ্ছে বিরাটের সিংহাসন। অসীম অবকাশের মধ্যে বিশ্বের প্রতিষ্ঠা। বৃহৎ যেখানে আছে অবকাশ সেখানে ফাঁকা নয়, একেবারে পরিপূর্ণ। সংসারের মধ্যে যেখানে বৃহৎকে আমরা রাখি নি সেখানে অবকাশ এমন ফাঁকা; বিশ্বে যেখানে বৃহৎ বিরাজমান সেখানে অবকাশ এমন গভীরভাবে মনোহর। গায়ে কাপড় না থাকলে মানুষের যেমন লজ্জা সংসারে অবকাশ আমাদের তেমনি লজ্জা দেয়; কেননা,

ওটা কিনা শূন্য তাই ওকে আমরা বলি জড়তা, আলস্য— কিন্তু, সত্যকার সন্ন্যাসীর পক্ষে অবকাশে লজ্জা নেই, কেননা, তার অবকাশ পূর্ণতা, সেখানে উলঙ্গতা নেই।

এ কেমনতরো? যেমন প্রবন্ধ এবং গান। প্রবন্ধে কথা যেখানে থামে সেখানে কেবলমাত্র ফাঁকা। গানে কথা যেখানে থামে সেখানে সুরে ভরাট। বস্তুত, সুর যতই বৃহৎ হয়, ততই কথার অবকাশ বেশি থাকা চাই। গায়কের সার্থকতা কথার ফাঁকে, লেখকের সার্থকতা কথার ঝাঁকে।

আমরা লোকালয়ের মানুষ এই যে জাহাজে করে চলছি, এইবার আমরা কিছু-দিনের জন্যে বিশ্বের দিকে মুখ ফেরাতে পেরেছি। সৃষ্টির যে পিঠে অনেকের ঠেলাঠেলি ভিড় সেদিক থেকে যে-পিঠে একের আসন সেদিকে এসেছি। দেখতে পাচ্ছি, এই যে নীল আকাশ এবং নীল সমুদ্রের বিপুল অবকাশ এ যেন অমৃতের পূর্ণ ঘট।

অমৃত— সে যে শুভ্র আলোর মতো পরিপূর্ণ এক। শুভ্র আলোয় বহুবর্ণচ্ছটা একে মিলেছে, অমৃতরসের তেমনি বহুরস একে নিবিড়। জগতে এই এক আলো যেমন নানাবর্ণে বিচিত্র, সংসারে তেমনি এই এক রসই নানা রসে বিভক্ত। এইজন্যে, অনেককে সত্য করে জানতে হলে সেই এককে সঙ্গে সঙ্গে জানতে হয়। গাছ থেকে যে-ডাল কাটা হয়েছে সে-ডালের ভার মানুষকে বইতে হয়; গাছে যে-ডাল আছে সে ডাল মানুষের ভার বইতে পারে। এক থেকে বিচ্ছিন্ন যে অনেক তারই ভার মানুষের পক্ষে বোঝা; একের মধ্যে বিধৃত যে অনেক সেই তো মানুষকে সম্পূর্ণ আশ্রয় দিতে পারে।

সংসারে একদিকে আবশ্যকের ভিড়, অন্যদিকে অনাবশ্যকের। আবশ্যকের দায় আমাদের বহন করতেই হবে, তাতে আপত্তি করলে চলবে না। যেমন ঘরে থাকতে হলে দেয়াল না হলে চলে না, এও তেমনি। কিন্তু সবটাই তো দেয়াল নয়। অন্তত খানিকটা করে জানলা থাকে, সেই ফাঁক দিয়ে আমরা আকাশের সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করি। কিন্তু, সংসারে দেখতে পাই, লোকে ওই জানলাটুকু সইতে পারে না। ওই ফাঁকটুকু ভরিয়ে দেবার জন্যে যতরকম সাংসারিক অনাবশ্যকের সৃষ্টি। ওই জানলাটার উপর বাজে কাজ, বাজে চিঠি, বাজে সভা, বাজে বক্তৃতা, বাজে হাঁসফাঁস্‌ মেরে দিয়ে দশে মিলে ওই ফাঁকটাকে একেবারে বুজিয়ে ফেলা হয়। নারকেলের ছিবড়ের মতো, এই অনাবশ্যকের পরিমাণটাই বেশি। ঘরে বাইরে, ধর্মে কর্মে, আমোদে আহ্লাদে, সকল বিষয়েই এরই অধিকার সব-চেয়ে বড়ো; এর কাজই হচ্ছে ফাঁক বুজিয়ে বেড়ানো।

কিন্তু, কথা ছিল ফাঁক বোজাব না, কেননা, ফাঁকের ভিতর দিয়ে ছাড়া পূর্ণকে পাওয়া যায় না। ফাঁকের ভিতর দিয়েই আলো আসে, হাওয়া আসে। কিন্তু, আলো হাওয়া

আকাশ যে মানুষের তৈরি জিনিস নয়, তাই লোকালয় পারতপক্ষে তাদের জন্যে জায়গা রাখতে চায় না— তাই আবশ্যক বাদে যেটুকু নিরালা থাকে সেটুকু অনাবশ্যক দিয়ে ঠেসে ভরতি করে দেয়। এমনি করে মানুষ আপনার দিনগুলোকে তো নিরেট করে তুলেইছে, রাত্রিটাকেও যতখানি পারে ভরাট করে দেয়। ঠিক যেন কলকাতার ম্যুনিসিপ্যালিটির আইন। যেখানে যত পুকুর আছে বুজিয়ে ফেলতে হবে, রাবিশ দিয়ে হোক, যেমন করে হোক। এমন-কি, গঙ্গাকেও যতখানি পারা যায় পুল-চাপা, জেটি-চাপা, জাহাজ-চাপা দিয়ে গলা টিপে মারবার চেষ্টা। ছেলেবেলাকার কলকাতা মনে পড়ে; ওই পুকুরগুলোই ছিল আকাশের স্যাঙাত, শহরের মধ্যে ওইখানটাতে দ্যুলোক এই ভূলোকে একটুখানি পা ফেলবার জায়গা পেত, ওইখানেই আকাশের আলোকের আতিথ্য করবার জন্য পৃথিবী আপন জলের আসনগুলি পেতে রেখেছিল।

আবশ্যকের একটা সুবিধা এই যে তার একটা সীমা আছে। সে সম্পূর্ণ বেতালা হতে পারে না; সে দশটা-চারটেকে স্বীকার করে, তার পার্বণের ছুটি আছে, সে রবিবারকে মানে, পারতপক্ষে রাত্রিকে সে ইলেকট্রিক লাইট দিয়ে একেবারে হেসে উড়িয়ে দিতে চায় না। কেননা, সে যেটুকু সময় নেয় আয়ু দিয়ে, অর্থ দিয়ে তার দাম চুকিয়ে দিতে হয়; সহজে কেউ তার অপব্যয় করতে পারে না। কিন্তু, অনাবশ্যকের তালমানের বোধ নেই; সে সময়কে উড়িয়ে দেয় অসময়কে টিঁকতে দেয় না। সে সদর রাস্তা দিয়ে ঢোকে, খিরকির রাস্তা দিয়ে ঢোকে, আবার জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ে। সে কাজের সময় দরজায় ঘা মারে, ছুটির সময় হুড়্মুড়্ করে আসে, রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তার কাজ নেই ব'লেই তার ব্যস্ততা আরো বেশি।

আবশ্যক কাজের পরিমাণ আছে, অনাবশ্যক কাজের পরিমাণ নেই; এইজন্যে অপরিমেয়ের আসনটি ওই লক্ষ্মীছাড়াই জুড়ে বসে, ওকে ঠেলে ওঠানো দায় হয়। তখনই মনে হয়, দেশ ছেড়ে পালাই, সন্ন্যাসী হয়ে বেরই, সংসারে আর টেঁকা যায় না!

যাক্, যেমনি বেরিয়ে পড়েছি অমনি বুঝতে পেরেছি, বিরাট বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যে আনন্দের সম্বন্ধ সেটাকে দিনরাত অস্বীকার করে কোনো বাহাদুরি নেই। এই যে ঠেলাঠেলি ঠেসাঠেসি নেই অথচ সমস্ত কানায় কানায় ভরা, এইখানকার দর্পণটিতে যেন নিজের মুখের ছায়া দেখতে পেলুম। 'আমি আছি' এই কথাটা গলির মধ্যে, ঘরবাড়ির মধ্যে ভারি ভেঙে চুরে বিকৃত হয়ে দেখা দেয়। এই কথাটাকে এই সমুদ্রের উপর আকাশের উপর সম্পূর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে দেখলে তবে তার মানে বুঝতে পারি; তখন আবশ্যককে ছাড়িয়ে, অনাবশ্যককে পেরিয়ে আনন্দলোকে তার অভ্যর্থনা দেখতে পাই; তখন স্পষ্ট করে বুঝি, ঋষি কেন মানুষদের অমৃতস্য পুত্রাঃ ব'লে আহ্বান করেছিলেন।

১১

সেই খিদিরপুরের ঘাট থেকে আরম্ভ করে আর এই হংকঙের ঘাট পর্যন্ত, বন্দরে বন্দরে বাণিজ্যের চেহারা দেখে আসছি। সে যে কী প্রকাণ্ড, এমন ক'রে তাকে চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। শুধু প্রকাণ্ড নয়, সে একটা জবড়জঙ্গ ব্যাপার। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ব্যাধের আহারের যে বর্ণনা আছে – সে এক-এক গ্রাসে এক-এক তাল গিলছে, তার ভোজন উৎকট, তার শব্দ উৎকট, এও সেইরকম; এই বাণিজ্যব্যাধটাও হাঁস্‌ফাঁস করতে করতে এক-এক পিণ্ড মুখে যা পুরছে, সে দেখে ভয় হয়। তার বিরাম নেই, আর তার শব্দই বা কী। লোহার হাত দিয়ে মুখে তুলছে, লোহার দাঁত দিয়ে চিবচ্ছে, লোহার পাকযন্ত্রে চিরপ্রদীপ্ত জঠরানলে হজম করছে এবং লোহার শিরা উপ-শিরার ভিতর দিয়ে তার জগৎজোড়া কলেবরের সর্বত্র সোনার রক্তস্রোত চালান করে দিচ্ছে।

একে দেখে মনে হয় যে, এ একটা জন্তু, এ যেন পৃথিবীর প্রথম যুগের দানব-জন্তুগুলোর মতো। কেবলমাত্র তার লেজের আয়তন দেখলেই শরীর আঁতকে ওঠে। তার পরে, সে জলচর হবে, কি স্থলচর হবে, কি পাখি হবে, এখনো তা স্পষ্ট ঠিক হয় নি; সে খানিকটা সরীসৃপের মতো, খানিকটা বাদুড়ের মতো, খানিকটা গণ্ডারের মতো। অঙ্গসৌষ্ঠব বলতে যা বোঝায় তা তার কোথাও কিছুমাত্র নেই। তার গায়ের চামড়া ভয়ংকর স্থূল; তার থাবা যেখানে পড়ে সেখানে পৃথিবীর গায়ের কোমল সবুজ চামড়া উঠে গিয়ে একেবারে তার হাড় বেরিয়ে পড়ে; চলবার সময় তার বৃহৎ বিরূপ লেজটা যখন নড়তে থাকে তখন তার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সংঘর্ষ হয়ে এমন আওয়াজ হতে থাকে যে, দিগঙ্গনারা মূর্ছিত হয়ে পড়ে। তার পরে, কেবলমাত্র তার এই বিপুল দেহটা রক্ষা করবার জন্যে এত রাশি রাশি খাদ্য তার দরকার হয় যে, ধরিত্রী ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। সে যে কেবলমাত্র খাবা খাবা জিনিস খাচ্ছে তা নয়, সে মানুষ খাচ্ছে— স্ত্রী পুরুষ ছেলে কিছুই সে বিচার করে না।

কিন্তু, জগতের সেই প্রথম যুগের দানব-জন্তুগুলো টিঁকল না। তাদের অপরিমিত বিপুলতাই পদে পদে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষি দেওয়াতে, বিধাতার আদালতে তাদের প্রাণদণ্ডের বিধান হল। সৌষ্ঠব জিনিসটা কেবলমাত্র সৌন্দর্যের প্রমাণ দেয় না, উপযোগিতারও প্রমাণ দেয়। হাঁস্‌ফাঁস্‌টা যখন অত্যন্ত বেশি চোখে পড়ে, আয়তনটার মধ্যে যখন কেবলমাত্র শক্তি দেখি, শ্রী দেখি নে, তখন বেশ বুঝতে পারা যায়, বিশ্বের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য নেই; বিশ্বশক্তির সঙ্গে তার শক্তির নিরন্তর সংঘর্ষ হতে হতে একদিন তাকে হার মেনে হাল ছেড়ে তলিয়ে যেতে হবেই। প্রকৃতির গৃহিণীপনা

কখনই কদর্য অমিতাচারকে অধিক দিন সইতে পারে না ; তার ঝাঁটা এসে পড়ল বলে। বাণিজ্যদানবটা নিজের বিরূপতায়, নিজের প্রকাণ্ড ভারের মধ্যে নিজের প্রাণদণ্ড বহন করছে। একদিন আসছে যখন তার লোহার কঙ্কালগুলোকে আমাদের যুগের স্তরের মধ্যে থেকে আবিষ্কার ক'রে পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা এই সর্বভুক দানবটার অদ্ভুত বিষমতা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করবে।

প্রাণীজগতে মানুষের যে যোগ্যতা, সে তার দেহের প্রাচুর্য নিয়ে নয়। মানুষের চামড়া নরম, তার গায়ের জোর অল্প, তার ইন্দ্রিয়শক্তিও পশুদের চেয়ে কম বই বেশি নয়। কিন্তু, সে এমন একটি বল পেয়েছে যা চোখে দেখা যায় না, যা জায়গা জোড়ে না, যা কোনো স্থানের উপর ভর না করেও সমস্ত জগতে আপন অধিকার বিস্তার করছে। মানুষের মধ্যে দেহপরিধি দৃশ্যজগৎ থেকে সরে গিয়ে অদৃশ্যের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। বাইবেলে আছে, যে নম্র সেই পৃথিবীকে অধিকার করবে ; তার মানেই হচ্ছে, নম্রতার শক্তি বাইরে নয়, ভিতরে— সে যত কম আঘাত দেয় ততই সে জয়ী হয়। সে রণক্ষেত্রে লড়াই করে না ; অদৃশ্যলোকে বিশ্বশক্তির সঙ্গে সন্ধি করে সে জয়ী হয়।

বাণিজ্যদানবকেও একদিন তার দানবলীলা সংবরণ করে মানব হতে হবে। আজ এই বাণিজ্যের মস্তিষ্ক কম, ওর হৃদয় তো একেবারেই নেই ; সেইজন্যে পৃথিবীতে ও কেবল আপনার ভার বাড়িয়ে চলেছে। কেবলমাত্র প্রাণপণ শক্তিতে আপনার আয়তনকে বিস্তীর্ণতর করে করেই ও জিততে চাচ্ছে। কিন্তু, একদিন যে জয়ী হবে তার আকার ছোটো, তার কর্মপ্রণালী সহজ ; মানুষের হৃদয়কে, সৌন্দর্যবোধকে, ধর্মবুদ্ধিকে সে মানে ; সে নম্র, সে সুশ্রী, সে কদর্যভাবে লুব্ধ নয় ; তার প্রতিষ্ঠা অন্তরের সুব্যবস্থায়, বাইরের আয়তনে না ; সে কাউকে বঞ্চিত ক'রে বড়ো নয়, সে সকলের সঙ্গে সন্ধি ক'রে বড়ো। আজকের দিনে পৃথিবীতে মানুষের সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে এই বাণিজ্যের অনুষ্ঠান সব চেয়ে কুশ্রী ; আপন ভারের দ্বারা পৃথিবীকে সে ক্লান্ত করছে, আপন শব্দের দ্বারা পৃথিবীকে বধির করছে, আপন আবর্জনার দ্বারা পৃথিবীকে মলিন করছে, আপন লোভের দ্বারা পৃথিবীকে আহত করছে। এই যে পৃথিবীব্যাপী কুশ্রীতা, এই যে বিদ্রোহ— রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ এবং মানবহৃদয়ের বিরুদ্ধে— এই যে লোভকে বিশ্বের রাজসিংহাসনে বসিয়ে তার কাছে দাসখত লিখে দেওয়া, এ প্রতিদিনই মানুষের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বকে আঘাত করছেই, তার সন্দেহ নেই। মুনফার নেশায় উন্মত্ত হয়ে এই বিশ্বব্যাপী দ্যূতক্রীড়ায় মানুষ নিজেকে পণ রেখে কতদিন খেলা চালাবে? এ খেলা ভাঙতেই হবে। যে-খেলায় মানুষ লাভ করবার লোভে নিজেকে লোকসান করে চলেছে, সে কখনোই চলবে না।

৯ই জ্যৈষ্ঠ। মেঘ বৃষ্টি বাদল কুয়াশায় আকাশ ঝাপসা হয়ে আছে ; হংকং বন্দরের পাহাড়গুলো দেখা দিয়েছে, তাদের গা বেয়ে বেয়ে ঝরনা ঝরে পড়ছে। মনে হচ্ছে, দৈত্যের দল সমুদ্রে ডুব দিয়ে তাদের ভিজে মাথা জলের উপর তুলেছে, তাদের জটা বেয়ে দাড়ি বেয়ে জল ঝরছে। এণ্ড্রুজ সাহেব বলছেন, দৃশ্যটা যেন পাহাড়-ঘেরা স্কট্‌ল্যাণ্ডের হ্রদের মতো ; তেমনিতরো ঘন সবুজ বেঁটে বেঁটে পাহাড়, তেমনিতরো ভিজে কম্বলের মতো আকাশের মেঘ, তেমনিতরো কুয়াশার ন্যাতা বুলিয়ে অল্প অল্প মুছে ফেলা জলস্থলের মূর্তি। কাল সমস্ত রাত বৃষ্টি বাতাস গিয়েছে ; কাল বিছানা আমার ভার বহন করে নি, আমিই বিছানাটাকে বহন করে ডেকের এধার থেকে ওধারে আশ্রয় খুঁজে খুঁজে ফিরেছি। রাত যখন সাড়ে দুপুর হবে, তখন এই বাদলের সঙ্গে মিথ্যা বিরোধ করবার চেষ্টা না করে তাকে প্রসন্ন মনে মেনে নেবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। এক-ধারে দাঁড়িয়ে ওই বাদলার সঙ্গে তান মিলিয়েই গান ধরলুম— শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে। এমনি করে ফিরে ফিরে অনেকগুলো গান গাইলুম, বানিয়ে বানিয়ে একটা নতুন গানও তৈরি করলুম, কিন্তু বাদলের সঙ্গে কবির লড়াইয়ে এই মর্ত-বাসীকেই হার মানতে হল। আমি অতো দম পাব কোথায়, আর আমার কবিত্বের বাতিক যতই প্রবল হোক-না, বায়ুবলে আকশের সঙ্গে পেরে উঠব কেন।

কাল রাত্রেই জাহাজের বন্দরে পৌছবার কথা ছিল, কিন্তু এইখানটায় সমুদ্রবাহী জলের স্রোত প্রবল হয়ে উঠল এবং বাতাসও বিরুদ্ধ ছিল, তাই পদে পদে দেরি হতে লাগল। জায়গাটাও সংকীর্ণ ও সংকটময়। কাপ্তেন সমস্ত রাত জাহাজের উপরতলায় গিয়ে সাবধানে পথের হিসাব করে চলেছেন। আজ সকালেও মেঘবৃষ্টির বিরাম নেই। সূর্য দেখা দিল না, তাই পথ ঠিক করা কঠিন। মাঝে মাঝে ঘণ্টা বেজে উঠছে, এঞ্জিন থেমে যাচ্ছে, নাবিকের দ্বিধা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আজ সকালে আহারের টেবিলে কাপ্তেনকে দেখা গেল না। কাল রাত দুপুরের সময় কাপ্তেন একবার কেবল বর্ষাতি পরে নেমে এসে আমাকে বলে গেলেন, ডেকের কোনো দিকেই শোবার সুবিধা হবে না, কেননা, বাতাসের বদল হচ্ছে।

এর মধ্যে একটি ব্যাপার দেখে আমার মনে বড়ো আনন্দ হয়েছিল। জাহাজের উপর থেকে একটা দড়িবাঁধা চামড়ার চোঙে করে মাঝে মাঝে সমুদ্রের জল তোলা হয়। কাল বিকেলে এক সময় মুকুলের হঠাৎ জানতে ইচ্ছা হল, এর কারণটা কী। সে তখনই উপরতলায় উঠে গেল। এই উপরতলাতেই জাহাজের হালের চাকা, এবং এখানেই পথনির্ণয়ের সমস্ত যন্ত্র। এখানে যাত্রীদের যাওয়া নিষেধ। মুকুল যখন গেল তখন তৃতীয় অফিসর কাজে নিযুক্ত। মুকুল তাঁকে প্রশ্ন করতেই তিনি ওকে বোঝাতে

শুরু করলেন। সমুদ্রের মধ্যে অনেকগুলি স্রোতের ধারা বইছে, তাদের উত্তাপের পরিমাণ স্বতন্ত্র। মাঝে মাঝে সমুদ্রের জল তুলে তাপমান দিয়ে পরীক্ষা করে সেই ধারাপথ নির্ণয় করা দরকার। সেই ধারার ম্যাপ বের করে তাদের গতিবেগের সঙ্গে জাহাজের গতিবেগের কী রকম কাটাকাটি হচ্ছে, তাই তিনি মুকুলকে বোঝাতে লাগলেন। তাতেও যখন সুবিধা হল না, তখন বোর্ডে খড়ি দিয়ে এঁকে ব্যাপারটাকে যথাসম্ভব সরল করে দিলেন।

কোনো বিলিতি জাহাজে মুকুলের পক্ষে এটা কোনোমতেই সম্ভবপর হত না ; সেখানে মুকুলকে অত্যন্ত সোজা করেই বুঝিয়ে দিত যে, ও জায়গায় তার নিষেধ। মোটের উপরে জাপানি অফিসরের সৌজন্য, কাজের নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, এই জাপানি জাহাজে কাজের নিয়মের ফাঁক দিয়ে মানুষের গতিবিধি আছে। অথচ নিয়মটা চাপা পড়ে যায় নি, তাও বারবার দেখেছি। জাহাজ যখন বন্দরে স্থির ছিল, যখন উপরতলার কাজ বন্ধ, তখন সেখানে বসে কাজ করবার জন্যে আমি কাপ্তেনের সম্মতি পেয়েছিলুম। সেদিন পিয়ার্সন সাহেব দুজন ইংরেজ আলাপীকে জাহাজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ডেকের উপর মাল তোলার শব্দে এণ্ডুজ সাহেব বিরক্ত হয়ে হঠাৎ প্রস্তাব করলেন, উপরের তলায় যাওয়া যাক। আমি সম্মতির জন্য প্রধান অফিসরকে জিজ্ঞাসা করলুম ; তিনি তখনই বললেন, "না।" নিয়ে গেলে কাজের ক্ষতি হত না, কেননা, কাজ তখন বন্ধ ছিল। কিন্তু নিয়মভঙ্গের একটা সীমা আছে, সে সীমা বন্ধুর পক্ষে যেখানে অপরিচিতের পক্ষে সেখানে না। উপরের তলা ব্যবহারের সম্মতিতেও আমি যেমন খুশি হয়েছিলুম, তার বাধাতেও তেমনি খুশি হলুম। স্পষ্ট দেখতে পেলুম, এর মধ্যে দাক্ষিণ্য আছে, কিন্তু দুর্বলতা নেই।

বন্দরে পৌঁছবামাত্র জাপান থেকে কয়েকখানি অভ্যর্থনার টেলিগ্রাম ও পত্র পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে প্রধান অফিসর এসে আমাকে বললেন, এ-যাত্রায় আমাদের সাঙ্ঘাই যাওয়া হল না, একেবারে এখান থেকে জাপান যাওয়া হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন। তিনি বললেন, জাপানবাসীরা আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে, তাই আমাদের সদর আপিস থেকে টেলিগ্রামে আদেশ এসেছে, অন্য বন্দরে বিলম্ব না করে চলে যেতে। সাঙ্ঘাইয়ের সমস্ত মাল আমরা এইখানেই নামিয়ে দেব, অন্য জাহাজে করে সেখানে যাবে।

এই খবরটি আমার পক্ষে যতই গৌরবজনক হোক, এখানে লেখবার দরকার ছিল না। কিন্তু আমার লেখবার কারণ হচ্ছে এই যে, এই ব্যাপারের একটু বিশেষত্ব আছে ; সেটা আলোচ্য। সেটা পুনশ্চ ওই একই কথা। অর্থাৎ ব্যাবসার দাবি

সচরাচর যে-পাথরের পাঁচিল খাড়া করে আত্মরক্ষা করে, এখানে তার মধ্যে দিয়েও মানবসম্বন্ধের আনাগোনার পথ আছে। এবং সে পথ কম প্রশস্ত নয়।

জাহাজ এখানে দিন দুয়েক থাকবে। সেই দুদিনের জন্যে শহরে নেবে হোটেলে থাকবার প্রস্তাব আমার মনে নিলে না। আমার মতো কুঁড়ে মানুষের পক্ষে আরামের চেয়ে বিরাম ভালো ; আমি বলি, সুখের ল্যাঠা অনেক, সোয়াস্তির বালাই নেই। আমি মাল তোলা-নামার উপদ্রব স্বীকার করেও জাহাজে রয়ে গেলুম। সেজন্যে আমার যে বকশিস মেলে নি, তা নয়।

প্রথমেই চোখে পড়ল জাহাজের ঘাটে চীনা মজুরদের কাজ। তাদের একটা করে নীল পায়জামা পরা এবং গা খোলা। এমন শরীরও কোথাও দেখি নি, এমন কাজও না। একেবারে প্রাণসার দেহ, লেশমাত্র বাহুল্য নেই। কাজের তালে তালে সমস্ত শরীরের মাংসপেশী কেবলই ঢেউ খেলাচ্ছে। এরা বড়ো বড়ো বোঝাকে এমন সহজে এবং এমন দ্রুত আয়ত্ত করছে যে সে দেখে আনন্দ হয়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও অনিচ্ছা, অবসাদ বা জড়ত্বের লেশমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। বাইরে থেকে তাদের তাড়া দেবার কোনো দরকার নেই। তাদের দেহের বীণাযন্ত্র থেকে কাজ যেন সংগীতের মতো বেজে উঠছে। জাহাজের ঘাটে মাল তোলা-নামার কাজ দেখতে যে আমার এত আনন্দ হবে, এ কথা আমি পূর্বে মনে করতে পারতুম না। পূর্ণ শক্তির কাজ বড়ো সুন্দর ; তার প্রত্যেক আঘাতে আঘাতে শরীরকে সুন্দর করতে থাকে, এবং সেই শরীরও কাজকে সুন্দর করে তোলে। এইখানে কাজের কাব্য এবং মানুষের শরীরের ছন্দ আমার সামনে বিস্তীর্ণ হয়ে দেখা দিলে। এ কথা জোর করে বলতে পারি, ওদের দেহের চেয়ে কোনো স্ত্রীলোকের দেহ সুন্দর হতে পারে না, কেননা, শক্তির সঙ্গে সুষমার এমন নিখুঁত সংগতি মেয়েদের শরীরে নিশ্চয়ই দুর্লভ। আমাদের জাহাজের ঠিক সামনেই আর-একটা জাহাজে বিকেল বেলায় কাজকর্মের পর সমস্ত চীনা মাল্লা জাহাজের ডেকের উপর কাপড় খুলে ফেলে স্নান করছিল ; মানুষের শরীরের যে কী স্বর্গীয় শোভা তা আমি এমন করে আর কোনোদিন দেখতে পাই নি।

কাজের শক্তি, কাজের নৈপুণ্য এবং কাজের আনন্দকে এমন পুঞ্জীভূতভাবে একত্র দেখতে পেয়ে আমি মনে মনে বুঝতে পারলুম, এই বৃহৎ জাতির মধ্যে কতখানি ক্ষমতা সমস্ত দেশ জুড়ে সঞ্চিত হচ্ছে। এখানে মানুষ পূর্ণপরিমাণে নিজেকে প্রয়োগ করবার জন্যে বহুকাল থেকে প্রস্তুত হচ্ছে। যে সাধনায় মানুষ আপনাকে আপনি ষোলো-আনা ব্যবহার করবার শক্তি পায়, তার কৃপণতা ঘুচে যায়, নিজেকে নিজে কোনো অংশে ফাঁকি দেয় না, সে যে মস্ত সাধনা। চীন সুদীর্ঘকাল সেই সাধনায় পূর্ণভাবে কাজ

করতে শিখেছে, সেই কাজের মধ্যেই তার নিজের শক্তি উদারভাবে আপনার মুক্তি এবং আনন্দ পাচ্ছে—এ একটি পরিপূর্ণতার ছবি। চীনের এই শক্তি আছে বলেই আমেরিকা চীনকে ভয় করেছে; কাজের উদ্যমে চীনকে সে জিততে পারে না, গায়ের জোরে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়।

এই এতবড়ো একটা শক্তি যখন আপনার আধুনিক কালের বাহনকে পাবে, অর্থাৎ যখন বিজ্ঞান তার আয়ত্ত হবে, তখন পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন্ শক্তি আছে? তখন তার কর্মের প্রতিভার সঙ্গে তার উপকরণের যোগসাধন হবে। এখন যে-সব জাতি পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করছে তারা চীনের সেই অভ্যুত্থানকে ভয় করে, সেই দিনকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু, যে জাতির যেদিকে যতখানি বড়ো হবার শক্তি আছে, সেদিকে তাকে ততখানি বড়ো হয়ে উঠতে দিতে বাধা দেওয়া যে-স্বজাতিপূজা থেকে জন্মেছে তার মতো এমন সর্বনেশে পূজা জগতে আর কিছুই নেই। এমন বর্বর জাতির কথা শোনা যায় যারা নিজের দেশের দেবতার কাছে পরদেশের মানুষকে বলি দেয়; আধুনিক কালের স্বজাতীয়তা তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ানক জিনিস, সে নিজের ক্ষুধার জন্যে এক-একটা জাতিকে-জাতি দেশকে-দেশ দাবি করে।

আমাদের জাহাজের বাঁ পাশে চীনের নৌকার দল। সেই নৌকাগুলিতে স্বামী স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে সকলে মিলে বাস করছে এবং কাজ করছে। কাজের এই ছবিই আমার কাছে সকলের চেয়ে সুন্দর লাগল। কাজের এই মূর্তিই চরম মূর্তি, একদিন এরই জয় হবে। না যদি হয়, বাণিজ্যদানব যদি মানুষের ঘর-করনা স্বাধীনতা সমস্তই গ্রাস ক'রে চলতে থাকে, এবং বৃহৎ এক দাসসম্প্রদায়কে সৃষ্টি করে তুলে তারই সাহায্যে অল্প কয়জনের আরাম এবং স্বার্থ সাধন করতে থাকে, তা হলে পৃথিবী রসাতলে যাবে। এদের মেয়ে পুরুষ ছেলে সকলে মিলে কাজ করবার এই ছবি দেখে আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। ভারতবর্ষে এই ছবি কবে দেখতে পাব? সেখানে মানুষ আপনার বারো-আনাকে ফাঁকি দিয়ে কাটাচ্ছে। এমন সব নিয়মের জাল, যাতে মানুষ কেবলই বেধে-বেধে গিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে পড়েই নিজের অধিকাংশ শক্তির বাজে খরচ করে এবং বাকি অধিকাংশকে কাজে খাটাতে পারে না— এমন বিপুল জটিলতা এবং জড়তার সমাবেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। চারি দিকে কেবলই জাতির সঙ্গে জাতির বিচ্ছেদ, নিয়মের সঙ্গে কাজের বিরোধ, আচারধর্মের সঙ্গে কালধর্মের দ্বন্দ্ব।

চীন সমুদ্র

তোসামারু জাহাজ

১২

১৬ই জ্যৈষ্ঠ। আজ জাহাজ জাপানের 'কোবে' বন্দরে পৌঁছবে। কয়দিন বৃষ্টি-বাদলের বিরাম নেই। মাঝে মাঝে জাপানের ছোটো ছোটো দ্বীপ আকাশের দিকে পাহাড় তুলে সমুদ্রযাত্রীদের ইশারা করছে, কিন্তু বৃষ্টিতে কুয়াশাতে সমস্ত ঝাপসা; বাদলার হাওয়ায় সর্দিকাশি হয়ে গলা ভেঙে গেলে তার আওয়াজ যেরকম হয়ে থাকে, ওই দ্বীপগুলোর সেইরকম ঘোরতর সর্দির আওয়াজের চেহারা। বৃষ্টির ছাট এবং ভিজে হাওয়ার তাড়া এড়াবার জন্যে ডেকের এধার থেকে ওধারে চৌকি টেনে নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি।

আমাদের সঙ্গে যে জাপানি যাত্রী দেশে ফিরছেন তিনি আজ ভোরেই তাঁর ক্যাবিন ছেড়ে একবার ডেকের উপর উঠে এসেছেন, জাপানের প্রথম অভ্যর্থনা গ্রহণ করবার জন্যে। তখন কেবল একটি মাত্র ছোটো নীলাভ পাহাড় মানসসরোবরের মস্ত একটি নীল পদ্মের কুঁড়িটির মতো জলের উপরে জেগে রয়েছে। তিনি স্থির নেত্রে এইটুকু কেবল দেখে নীচে নেবে গেলেন; তাঁর সেই চোখে ওই পাহাড়টুকুকে দেখা আমাদের শক্তিতে নেই— আমরা দেখছি নূতনকে, তিনি দেখছেন তাঁর চিরন্তনকে; আমরা অনেক তুচ্ছকে বাদ দিয়ে দিয়ে দেখছি, তিনি ছোটো বড়ো সমস্তকেই তাঁর এক বিরাটের অঙ্গ করে দেখছেন; এইজন্যেই ছোটোও তাঁর কাছে বড়ো, ভাঙাও তাঁর কাছে জোড়া, অনেক তাঁর কাছে এক। এই দৃষ্টিই সত্য দৃষ্টি।

জাহাজ যখন একেবারে বন্দরে এসে পৌঁছল তখন মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য উঠেছে। বড়ো বড়ো জাপানি অপ্সরা নৌকা আকাশে পাল উড়িয়ে দিয়ে, যেখানে বরুণদেবের সভাপ্রাঙ্গণে সূর্যদেবের নিমন্ত্রণ হয়েছে, সেইখানে নৃত্য করছে। প্রকৃতির নাট্যমঞ্চে বাদলার যবনিকা উঠে গিয়েছে; ভাবলুম, এইবার ডেকের উপরে রাজার হালে বসে সমুদ্রের তীরে জাপানের প্রথম প্রবেশটা ভালো করে দেখে নিই।

কিন্তু, সে কি হবার জো আছে। নিজের নামের উপমা গ্রহণ করতে যদি কোনো অপরাধ না থাকে তা হলে বলি, আমার আকাশের মিতা যখন খালাস পেয়েছেন তখন আমার পালা আরম্ভ হল। আমার চারি দিকে একটু কোথাও ফাঁক দেখতে পেলুম না। খবরের কাগজের চর তাদের প্রশ্ন এবং তাদের ক্যামেরা নিয়ে আমাকে আচ্ছন্ন করে দিলে।

কোবে শহরে অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় বণিক আছেন, তার মধ্যে বাঙালির ছিটে-ফোঁটাও কিছু পাওয়া যায়। আমি হংকং শহরে পৌঁছেই এই ভারতবাসীদের টেলিগ্রাম পেয়েছিলুম, তাঁরাই আমার আতিথ্যের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা জাহাজে গিয়ে আমাকে

ধরলেন। ওদিকে জাপানের বিখ্যাত চিত্রকর টাইক্কন এসে উপস্থিত। ইনি যখন ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়িতে ছিলেন। কাট্‌সটাকেও দেখা গেল, ইনিও আমাদের চিত্রকর বন্ধু। সেই সঙ্গে সানো এসে উপস্থিত, ইনি এককালে আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রমে জুজুৎসু ব্যায়ামের শিক্ষক ছিলেন। এর মধ্যে কাওয়াগুচিরও দর্শন পাওয়া গেল। এটা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, আমাদের নিজের ভাবনা আর ভাবতে হবে না। কিন্তু দেখতে পেলুম, সেই ভাবনার ভার অনেকে মিলে যখন গ্রহণ করেন তখন ভাবনার আর অন্ত থাকে না। আমাদের প্রয়োজন অল্প, কিন্তু আয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে উঠল। জাপানি পক্ষ থেকে তাঁদের ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে টানাটানি করতে লাগলেন, কিন্তু ভারতবাসীর আমন্ত্রণ আমি পূর্বেই গ্রহণ করেছি। এই নিয়ে বিষম একটা সংকট উপস্থিত হল। কোনো পক্ষই হার মানতে চান না। বাদ বিতণ্ডা বচসা চলতে লাগল। আবার, এরই সঙ্গে সঙ্গে সেই খবরের কাগজের চরের দল আমার চারি দিকে পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল। দেশ ছাড়বার মুখে বঙ্গসাগরে পেয়েছিলুম বাতাসের সাইক্লোন, এখানে জাপানের ঘাটে এসে পৌঁছেই পেলুম মানুষের সাইক্লোন। দুটোর মধ্যে যদি বাছাই করতেই হয়, আমি প্রথমটাই পছন্দ করি। খ্যাতি জিনিসের বিপদ এই যে, তার মধ্যে যতটুকু আমার দরকার কেবলমাত্র সেইটুকু গ্রহণ করেই নিষ্কৃতি নেই, তার চেয়ে অনেক বেশি নিতে হয়; সেই বেশিটুকুর বোঝা বিষম বোঝা। অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টির মধ্যে কোন্‌টা যে ফসলের পক্ষে বেশি মুশকিল জানি নে।

এখানকার একজন প্রধান গুজরাটি বণিক মোরারজি, তাঁরই বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছি। সেই সব খবরের কাগজের অনুচররা এখানে এসেও উপস্থিত। বহুকষ্টে ব্যূহ ভেদ করে বেরোতে পেরেছি।

এই উৎপাতটা আশা করি নি। জাপান যে নতুন মদ পান করেছে এই খবরের কাগজের ফেনিলতা তারই একটা অঙ্গ। এত ফেনা আমেরিকাতেও দেখি নি। এই জিনিসটা কেবলমাত্র কথার হাওয়ার বুদ্‌বুদপুঞ্জ— এতে কারো সত্যকার প্রয়োজনও দেখি নে, আমোদও বুঝি নে; এতে কেবলমাত্র পাত্রটার মাথা শূন্যতায় ভরতি করে দেয়, মাদকতার ছবিটাকে কেবল চোখের সামনে প্রকাশ করে। এই মাতলামিটাই আমাকে সব-চেয়ে পীড়া দেয়। যাক্‌গে।

মোরারজির বাড়িতে আহারে আলাপে অভ্যর্থনায় কাল রাত্তিরটা কেটেছে। এখানকার ঘরকন্নার মধ্যে প্রবেশ করে সব-চেয়ে চোখে পড়ে জাপানি দাসী! মাথায় একখানা ফুলে-ওঠা খোঁপা, গালদুটো ফুলো ফুলো, চোখদুটো ছোটো, নাকের একটুখানি অপ্রতুলতা, কাপড় বেশ সুন্দর, পায়ে খড়ের চটি— কবিরা সৌন্দর্যের যে-রকম বর্ণনা

করে থাকেন তার সঙ্গে অনৈক্য ঢের, অথচ মোটের উপর দেখতে ভালো লাগে; যেন মানুষের সঙ্গে পুতুলের সঙ্গে, মাংসের সঙ্গে মোমের সঙ্গে মিশিয়ে একটা পদার্থ; আর সমস্ত শরীরে ক্ষিপ্রতা, নৈপুণ্য, বলিষ্ঠতা। গৃহস্বামী বলেন, এরা যেমন কাজের, তেমনি এরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমি আমার অভ্যাসবশত ভোরে উঠে জানলার বাইরে চেয়ে দেখলুম, প্রতিবেশীদের বাড়িতে ঘরকন্নার হিল্লোল তখন জাগতে আরম্ভ করেছে— সেই হিল্লোল মেয়েদের হিল্লোল। ঘরে ঘরে এই মেয়েদের কাজের ঢেউ এমন বিচিত্র বৃহৎ এবং প্রবল ক'রে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু, এটা দেখলেই বোঝা যায়, এমন স্বাভাবিক আর কিছু নেই। দেহযাত্রা জিনিসটার ভার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মেয়েদেরই হাতে; এই দেহযাত্রার আয়োজন উদ্যোগ মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সুন্দর। কাজের এই নিয়ত তৎপরতায় মেয়েদের স্বভাব যথার্থ মুক্তি পায় ব'লে শ্রীলাভ করে। বিলাসের জড়তায় কিম্বা যে-কারণেই হোক, মেয়েরা যেখানে এই কর্মপরতা থেকে বঞ্চিত সেখানে তাদের বিকার উপস্থিত হয়, তাদের দেহমনের সৌন্দর্য-হানি হতে থাকে, এবং তাদের যথার্থ আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে। এই যে এখানে সমস্তক্ষণ ঘরে ঘরে ক্ষিপ্রবেগে মেয়েদের হাতের কাজের স্রোত অবিরত বইছে এ আমার দেখতে ভারি সুন্দর লাগছে। মাঝে মাঝে পাশের ঘর থেকে এদের গলার আওয়াজ এবং হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছি, আর মনে মনে ভাবছি, মেয়েদের কথা ও হাসি সকল দেশেই সমান। অর্থাৎ সে যেন স্রোতের জলের উপরকার আলোর মতো একটা ঝিকিমিকি ব্যাপার, জীবনচাঞ্চল্যের অহেতুক লীলা।

কোবে

১৩

নতুনকে দেখতে হলে, মনকে একটু বিশেষ করে বাতি জ্বালাতে হয়। পুরোনোকে দেখতে হলে, ভালো করে চোখ মেলতেই হয় না। সেইজন্যে নতুনকে যত শীঘ্র পারে দেখে নিয়ে, মন আপনার অতিরিক্ত বাতিগুলো নিবিয়ে ফেলে। খরচ বাঁচাতে চায়, মনোযোগকে উসকে রাখতে চায় না।

মুকুল আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, "দেশে থাকতে বই প'ড়ে, ছবি দেখে জাপানকে যেরকম বিশেষভাবে নতুন বলে মনে হত, এখানে কেন তা হচ্ছে না।" তার কারণই এই। রেঙ্গুন থেকে আরম্ভ করে সিঙাপুর, হংকং দিয়ে আসতে আসতে মনের নতুন দেখার বিশেষ আয়োজনটুকু ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে আসে। যখন বিদেশী সমুদ্রের এ কোণে ও কোণে ন্যাড়া ন্যাড়া পাহাড়গুলো উঁকি মারতে থাকে তখন বলতে থাকি বাঃ! তখন

মুকুল বলে, ওইখানে নেবে গিয়ে থাকতে বেশ মজা! ও মনে করে, এই নতুনকে প্রথম দেখার উত্তেজনা বুঝি চিরদিনই থাকবে; ওখানে ওই ছোটো ছোটো পাহাড়গুলোর সঙ্গে গলা-ধরাধরি করে সমুদ্র বুঝি চিরদিনই এই নতুন ভাষায় কানাকানি করে; যেন ওইখানে পৌঁছলে পরে সমুদ্রের চঞ্চলনীল, আকাশের শান্তনীল আর ওই পাহাড়গুলোর ঝাপসা-নীল ছাড়া আর কিছুর দরকারই হয় না। তার পরে, বিরল ক্রমে অবিরল হতে লাগল, ক্ষণে ক্ষণে আমাদের জাহাজ এক-একটা দ্বীপের গা ঘেঁষে চলল; তখন দেখি দূরবীন টেবিলের উপরে অনাদরে পড়ে থাকে, মন আর সাড়া দেয় না। যখন দেখবার সামগ্রী বেড়ে ওঠে তখন দেখাটাই কমে যায়। নতুনকে ভোগ ক'রে ক'রে নতুনের খিদে ক্রমেই মরে যায়।

হপ্তাখানেক জাপানে আছি কিন্তু মনে হচ্ছে, যেন অনেক দিন আছি। তার মানে, পথঘাট, গাছপালা, লোকজনের যেটুকু নতুন সেটুকু তেমন গভীর নয়, তাদের মধ্যে যেটা পুরোনো সেইটেই পরিমাণে বেশি। অফুরান নতুন কোথাও নেই; অর্থাৎ, যার সঙ্গে আমাদের চিরপরিচিত খাপ খায় না, জগতে এমন অসংগত কিছুই নেই। প্রথমে ধাঁ করে চোখে পড়ে, যেগুলো হঠাৎ আমাদের মনের অভ্যাসের সঙ্গে মেলে না। তার পরে পুরোনোর সঙ্গে নতুনের যে যে অংশের রঙে মেলে, চেহারায় কাছাকাছি আসে, মন তাড়াতাড়ি সেইগুলোকে পাশাপাশি সাজিয়ে নিয়ে তাদের সঙ্গে ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। তাস খেলতে বসে আমরা হাতে কাগজ পেলে রঙ এবং মূল্য -অনুসারে তাদের পরে পরে সাজিয়ে নিই; এও সেইরকম। শুধু তো নতুনকে দেখে যাওয়া নয়, তাঁর সঙ্গে যে ব্যবহার করতে হবে; কাজেই মন তাকে নিজের পুরোনো কাঠামোর মধ্যে যত শীঘ্র পারে গুছিয়ে নেয়। যেই গোছানো হয় তখন দেখতে পাই, তত বেশি নতুন নয় যতটা গোড়ায় মনে হয়েছিল; আসলে পুরোনো, ভঙ্গিটাই নতুন।

তারপরে আর-এক মুশকিল হয়েছে এই যে, দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীর সকল সভ্য জাতই বর্তমান কালের ছাঁচে ঢালাই হয়ে একই রকম চেহারা অথবা চেহারার অভাব ধারণ করেছে। আমার এই জানলায় বসে কোবে শহরের দিকে তাকিয়ে এই যা দেখছি এ তো লোহার জাপান, এ তো রক্তমাংসের নয়। একদিকে আমার জানলা, আর-একদিকে সমুদ্র, এর মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা শহর। চীনেরা যেরকম বিকটমূর্তি ড্র্যাগন আঁকে—সেইরকম। আঁকাবাঁকা বিপুল দেহ নিয়ে সে যেন সবুজ পৃথিবীটিকে খেয়ে ফেলেছে। গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি লোহার চালগুলো ঠিক যেন তারই পিঠের আঁশের মতো রৌদ্রে ঝক্‌ঝক্ করছে। বড়ো কঠিন, বড়ো কুৎসিৎ— এই দরকার-নামক দৈত্যটা। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের যে অন্ন আছে তা ফলে শস্যে বিচিত্র এবং সুন্দর; কিন্তু সেই অন্নকে যখন

গ্রাস করতে যাই তখন তাকে তাল পাকিয়ে একটা পিণ্ড করে তুলি ; তখন বিশেষত্বকে দরকারের চাপে পিষে ফেলি। কোবে শহরের পিঠের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি, মানুষের দরকার পদার্থটা স্বভাবের বিচিত্রতাকে একাকার করে দিয়েছে। মানুষের দরকার আছে, এই কথাটাই ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে, হাঁ করতে করতে, পৃথিবীর অধিকাংশকে গ্রাস করে ফেলছে। প্রকৃতিও কেবল দরকারের সামগ্রী, মানুষও কেবল দরকারের মানুষ হয়ে আসছে।

যেদিন থেকে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়েছি, ঘাটে ঘাটে দেশে দেশে এইটেই খুব বড়ো করে দেখতে পাচ্ছি। মানুষের দরকার মানুষের পূর্ণতাকে যে কতখানি ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এর আগে কোনো দিন আমি সেটা এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাই নি। এক সময়ে মানুষ এই দরকারকে ছোটো করে দেখেছিল। ব্যাবসাকে তারা নীচের জায়গা দিয়েছিল ; টাকা রোজগার করাটাকে সম্মান করে নি। দেবপূজা ক'রে, বিদ্যাদান ক'রে, আনন্দ দান ক'রে যারা টাকা নিয়েছে মানুষ তাদের ঘৃণা করেছে। কিন্তু আজকাল জীবনযাত্রা এতই বেশি দুঃসাধ্য, এবং টাকার আয়তন ও শক্তি এতই বেশি বড়ো হয়ে উঠেছে যে, দরকার এবং দরকারের বাহনগুলোকে মানুষ আর ঘৃণা করতে সাহস করে না। এখন মানুষ আপনার সকল জিনিসেরই মূল্যের পরিমাণ টাকা দিয়ে বিচার করতে লজ্জা করে না। এতে করে মানুষের প্রকৃতির বদল হয়ে আসছে— জীবনের লক্ষ্য এবং গৌরব, অন্তর থেকে বাইরের দিকে, আনন্দ থেকে প্রয়োজনের দিকে অত্যন্ত ঝুঁকে পড়ছে। মানুষ ক্রমাগত নিজেকে বিক্রি করতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করছে না। ক্রমশই সমাজের এমন একটা বদল হয়ে আসছে যে, টাকাই মানুষের যোগ্যতারূপে প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ, এটা কেবল দায়ে পড়ে ঘটছে, প্রকৃতপক্ষে এটা সত্য নয়। তাই, এক সময়ে যে-মানুষ মনুষ্যত্বের খাতিরে টাকাকে অবজ্ঞা করতে জানত এখন সে টাকার খাতিরে মনুষ্যত্বকে অবজ্ঞা করছে। রাজ্যতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, ঘরে বাইরে, সর্বত্রই তার পরিচয় কুৎসিত হয়ে উঠছে। কিন্তু, বীভৎসতাকে দেখতে পাচ্ছি নে, কেননা, লোভে দুই চোখ আচ্ছন্ন।

জাপানে শহরের চেহারায় জাপানিত্ব বিশেষ নেই, মানুষের সাজসজ্জা থেকেও জাপান ক্রমশ বিদায় নিচ্ছে। অর্থাৎ, জাপান ঘরের পোশাক ছেড়ে আপিসের পোশাক ধরেছে। আজকাল পৃথিবী জোড়া একটা আপিস-রাজ্য বিস্তীর্ণ হয়েছে, সেটা কোনো বিশেষ দেশ নয়। যেহেতু আপিসের সৃষ্টি আধুনিক য়ুরোপ থেকে, সেইজন্যে এর বেশ আধুনিক য়ুরোপের। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এই বেশে মানুষের বা দেশের পরিচয় দেয় না, আপিস-রাজ্যের পরিচয় দেয়। আমাদের দেশেও ডাক্তার বলছে, "আমার ওই হ্যাট-

কোটের দরকার আছে।” আইনজীবীও তাই বলছে, বণিকও তাই বলছে। এমনি করেই দরকার জিনিসটা বেড়ে চলতে চলতে সমস্ত পৃথিবীকে কুৎসিৎভাবে একাকার করে দিচ্ছে।

এইজন্যে জাপানের শহরের রাস্তায় বেরলেই প্রধানভাবে চোখে পড়ে জাপানের মেয়েরা। তখন বুঝতে পারি, এরাই জাপানের ঘর, জাপানের দেশ। এরা আপিসের নয়। কারো কারো কাছে শুনতে পাই, জাপানের মেয়েরা এখানকার পুরুষের কাছ থেকে সম্মান পায় না। সে-কথা সত্য কি মিথ্যা জানি নে, কিন্তু একটা সম্মান আছে সেটা বাইরে থেকে দেওয়া নয়, সেটা নিজের ভিতরকার। এখানকার মেয়েরাই জাপানের বেশে জাপানের সম্মানরক্ষার ভার নিয়েছে। ওরা দরকারকেই সকলের চেয়ে বড়ো করে খাতির করে নি, সেইজন্যেই ওরা নয়নমনের আনন্দ।

একটা জিনিস এখানে পথে ঘাটে চোখে পড়ে। রাস্তায় লোকের ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল একেবারে নেই। এরা যেন চেঁচাতে জানে না, লোকে বলে জাপানের ছেলেরা সুদ্ধ কাঁদে না। আমি এপর্যন্ত একটি ছেলেকেও কাঁদতে দেখি নি। পথে মোটরে করে যাবার সময়ে মাঝে মাঝে যেখানে ঠেলাগাড়ি প্রভৃতি বাধা এসে পড়ে, সেখানে মোটরের চালক শান্তভাবে অপেক্ষা করে; গাল দেয় না, হাঁকাহাঁকি করে না। পথের মধ্যে হঠাৎ একটা বাইসিক্‌ল্ মোটরের উপরে এসে পড়বার উপক্রম করলে, আমাদের দেশের চালক এ অবস্থায় বাইসিক্‌ল্-আরোহীকে অনাবশ্যক গাল না দিয়ে থাকতে পারত না। এ লোকটা ভ্রূক্ষেপমাত্র করলে না। এখানকার বাঙালিদের কাছে শুনতে পেলুম যে, রাস্তায় দুই বাইসিক্‌লে, কিম্বা গাড়ির সঙ্গে বাইসিক্‌লের ঠোকাঠুকি হয়ে যখন রক্তপাত হয়ে যায়, তখনো উভয় পক্ষ চেঁচামেচি গালমন্দ না করে গায়ের ধুলো ঝেড়ে চলে যায়।

আমার কাছে মনে হয়, এইটেই জাপানের শক্তির মূল কারণ। জাপানি বাজে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি করে নিজের বলক্ষয় করে না। প্রাণশক্তির বাজে খরচ নেই ব'লে প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না। শরীর মনের এই শান্তি ও সহিষ্ণুতা ওদের স্বজাতীয় সাধনার একটা অঙ্গ। শোকে দুঃখে আঘাতে উত্তেজনায়, ওরা নিজেকে সংযত করতে জানে। সেইজন্যেই বিদেশের লোকেরা প্রায় বলে, জাপানিকে বোঝা যায় না, ওরা অত্যন্ত বেশি গূঢ়। এর কারণই হচ্ছে, এরা নিজেকে সর্বদা ফুটো দিয়ে ফাঁক দিয়ে গ'লে পড়তে দেয় না।

এই যে নিজের প্রকাশকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করতে থাকা, এ ওদের কবিতাতেও দেখা যায়। তিন লাইনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই। এই তিন লাইনই

ওদের কবি, পাঠক, উভয়ের পক্ষেই যথেষ্ট। সেইজন্তেই এখানে এসে অবধি, রাস্তায় কেউ গান গাচ্ছে, এ আমি শুনি নি। এদের হৃদয় ঝরনার জলের মতো শব্দ করে না, সরোবরের জলের মতো স্তব্ধ। এপর্যন্ত ওদের যত কবিতা শুনেছি সবগুলিই হচ্ছে ছবি দেখার কবিতা, গান গাওয়ার কবিতা নয়। হৃদয়ের দাহ এবং ক্ষোভ প্রাণকে খরচ করে, এদের সেই খরচ কম। এদের অন্তরের সমস্ত প্রকাশ সৌন্দর্যবোধে। সৌন্দর্যবোধ জিনিসটা স্বার্থনিরপেক্ষ। ফুল, পাখি, চাঁদ, এদের নিয়ে আমাদের কাঁদাকাটা নেই। এদের সঙ্গে আমাদের নিছক সৌন্দর্যভোগের সম্বন্ধ— এরা আমাদের কোথাও মারে না, কিছু কাড়ে না, এদের দ্বারা আমাদের জীবনে কোথাও ক্ষয় ঘটে না। সেইজন্তেই তিন লাইনেই এদের কুলোয়, এবং কল্পনাটাতেও এরা শান্তির ব্যাঘাত করে না।

এদের দুটো বিখ্যাত পুরোনো কবিতার নমুনা দেখলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে :

পুরোনো পুকুর,
ব্যাঙের লাফ,
জলের শব্দ।

বাস! আর দরকার নেই। জাপানি পাঠকের মনটা চোখে ভরা। পুরোনো পুকুর মানুষের পরিত্যক্ত, নিস্তব্ধ, অন্ধকার। তার মধ্যে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়তেই শব্দটা শোনা গেল। শোনা গেল— এতে বোঝা যাবে পুকুরটা কী রকম স্তব্ধ। এই পুরোনো পুকুরের ছবিটা কী ভাবে মনের মধ্যে এঁকে নিতে হবে সেইটুকু কেবল কবি ইশারা করে দিলে ; তার বেশি একেবারে অনাবশ্যক।

আর-একটা কবিতা :

পচা ডাল,
একটা কাক,
শরৎকাল।

আর বেশি না! শরৎকালে গাছের ডালে পাতা নেই, দুই-একটা ডাল পচে গেছে, তার উপরে কাক ব'সে। শীতের দেশে শরৎকালটা হচ্ছে গাছের পাতা ঝরে যাবার, ফুল পড়ে যাবার, কুয়াশায় আকাশ ম্লান হবার কাল— এই কালটা মৃত্যুর ভাব মনে আনে। পচা ডালে কালো কাক বসে আছে, এইটুকুতেই পাঠক শরৎকালের সমস্ত রিক্ততা ও ম্লানতার ছবি মনের সামনে দেখতে পায়। কবি কেবল সূত্রপাত করে দিয়েই সরে দাঁড়ায়। তাকে যে অত অল্পের মধ্যেই সরে যেতে হয় তার কারণ এই যে, জাপানি পাঠকের চেহারা দেখার মানসিক শক্তিটা প্রবল।

এইখানে একটা কবিতার নমুনা দিই, যেটা চোখে দেখার চেয়ে বড়ো :

স্বর্গ এবং মর্ত হচ্ছে ফুল,
দেবতারা এবং বুদ্ধ হচ্ছেন ফুল—
মানুষের হৃদয় হচ্ছে ফুলের অন্তরাত্মা।

আমার মনে হয়, এই কবিতাটিতে জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল হয়েছে। জাপান স্বর্গমর্তকে বিকশিত ফুলের মতো সুন্দর করে দেখছে ; ভারতবর্ষ বলছে, এই যে এক বৃন্তে দুই ফুল, স্বর্গ এবং মর্ত, দেবতা এবং বুদ্ধ— মানুষের হৃদয় যদি না থাকত তবে এ ফুল কেবলমাত্র বাইরের জিনিস হত— এই সুন্দরের সৌন্দর্যটিই হচ্ছে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে।

যাই হোক, এই কবিতাগুলির মধ্যে কেবল যে বাক্‌সংযম তা নয়, এর মধ্যে ভাবের সংযম। এই ভাবের সংযমকে হৃদয়ের চাঞ্চল্য কোথাও ক্ষুব্ধ করছে না। আমাদের মনে হয়, এইটেতে জাপানের একটা গভীর পরিচয় আছে। এক কথায় বলতে গেলে, একে বলা যেতে পারে হৃদয়ের মিতব্যয়িতা।

মানুষের একটা ইন্দ্রিয়শক্তিকে খর্ব করে আর-একটাকে বাড়ানো চলে, এ আমরা দেখেছি। সৌন্দর্যবোধ এবং হৃদয়াবেগ, এ দুটোই হৃদয়বৃত্তি। আবেগের বোধ এবং প্রকাশকে খর্ব ক'রে সৌন্দর্যের বোধ এবং প্রকাশকে প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে— এখানে এসে অবধি এই কথাটা আমার মনে হয়েছে। হৃদয়োচ্ছ্বাস আমাদের দেশে এবং অন্যত্র বিস্তর দেখেছি, সেইটে এখানে চোখে পড়ে না। সৌন্দর্যের অনুভূতি এখানে এত বেশি করে এবং এমন সর্বত্র দেখতে পাই যে স্পষ্টই বুঝতে পারি যে, এটা এমন একটা বিশেষ বোধ যা আমরা ঠিক বুঝতে পারি নে। এ যেন কুকুরের ঘ্রাণশক্তি ও মৌমাছির দিক্‌বোধের মতো, আমাদের উপলব্ধির অতীত। এখানে যে-লোক অত্যন্ত গরিব সেও প্রতিদিন নিজের পেটের ক্ষুধাকে বঞ্চনা ক'রেও এক-আধ পয়সার ফুল না কিনে বাঁচে না। এদের চোখের ক্ষুধা এদের পেটের ক্ষুধার চেয়ে কম নয়।

কাল দুজন জাপানি মেয়ে এসে আমাকে এ দেশের ফুল সাজানোর বিদ্যা দেখিয়ে গেল। এর মধ্যে কত আয়োজন, কত চিন্তা কত নৈপুণ্য আছে, তার ঠিকানা নেই। প্রত্যেক পাতা এবং প্রত্যেক ডালটির উপর মন দিতে হয়। চোখে দেখার ছন্দ এবং সংগীত যে এদের কাছে কত প্রবলভাবে সুগোচর, কাল আমি ওই দুজন জাপানি মেয়ের কাজ দেখে বুঝতে পারছিলুম।

একটা বইয়ে পড়ছিলুম, প্রাচীনকালে বিখ্যাত যোদ্ধা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অবকাশ-কালে এই ফুল সাজাবার বিদ্যার আলোচনা করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল, এতে

তাঁদের রণদক্ষতা ও বীরত্বের উন্নতি হয়। এর থেকেই বুঝতে পারবে, জাপানি নিজের এই সৌন্দর্য-অনুভূতিকে শৌখিন জিনিস বলে মনে করে না; ওরা জানে, গভীরভাবে এতে মানুষের শক্তিবৃদ্ধি হয়। এই শক্তিবৃদ্ধির মূল কারণটা হচ্ছে শান্তি; যে-সৌন্দর্যের আনন্দ নিরাসক্ত আনন্দ তাতে জীবনের ক্ষয় নিবারণ করে, এবং যে-উত্তেজনা-প্রবণতায় মানুষের মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তিকে মেঘাচ্ছন্ন করে তোলে এই সৌন্দর্যবোধ তাকে পরিশান্ত করে।

সেদিন একজন ধনী জাপানি তাঁর বাড়িতে চা-পান-অনুষ্ঠানে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তোমরা ওকাকুরার Book of Tea পড়েছ, তাতে এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। সেদিন এই অনুষ্ঠান দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, জাপানির পক্ষে এটা ধর্মানুষ্ঠানের তুল্য। এ ওদের একটা জাতীয় সাধনা। ওরা কোন্ আইডিয়ালকে লক্ষ্য করছে, এর থেকে তা বেশ বোঝা যায়।

কোবে থেকে দীর্ঘ পথ মোটরযানে করে গিয়ে প্রথমেই একটি বাগানে প্রবেশ করলুম— সে বাগান ছায়াতে সৌন্দর্যে এবং শান্তিতে একেবারে নিবিড়ভাবে পূর্ণ। বাগান জিনিসটা যে কী, তা এরা জানে; কতকগুলো কাঁকর ফেলে আর গাছ পুঁতে মাটির উপরে জিয়োমেট্রি কষাকেই যে বাগান করা বলে না, তা জাপানি-বাগানে ঢুকলেই বোঝা যায়; জাপানি চোখ এবং হাত দুই-ই প্রকৃতির কাছ থেকে সৌন্দর্যের দীক্ষালাভ করেছে, যেমন ওরা দেখতে জানে তেমনি ওরা গড়তে জানে। ছায়াপথ দিয়ে গিয়ে এক জায়গায় গাছের তলায় গর্ত-করা একটা পাথরের মধ্যে স্বচ্ছ জল আছে, সেই জলে আমরা প্রত্যেকে হাত মুখ ধুলুম। তার পরে, একটি ছোট্ট ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বেঞ্চির উপরে ছোটো ছোটো গোল গোল খড়ের আসন পেতে দিলে তার উপরে আমরা বসলুম। নিয়ম হচ্ছে এইখানে কিছুকাল নীরব হয়ে বসে থাকতে হয়। গৃহস্বামীর সঙ্গে যাবামাত্রই দেখা হয় না। মনকে শান্ত করে স্থির করবার জন্যে ক্রমে ক্রমে নিমন্ত্রণ ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। আস্তে আস্তে দুটো তিনটে ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করতে করতে, শেষে আসল জায়গায় যাওয়া গেল। সমস্ত ঘরই নিস্তব্ধ, যেন চিরপ্রদোষের ছায়াবৃত; কারো মুখে কথা নেই। মনের উপর এই ছায়াঘন নিঃশব্দ নিস্তব্ধতার সম্মোহন ঘনিয়ে উঠতে থাকে। অবশেষে ধীরে ধীরে গৃহস্বামী এসে নমস্কারের দ্বারা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।

ঘরগুলিতে আসবাব নেই বললেই হয়, অথচ মনে হয় যেন এ-সমস্ত ঘর কী একটাতে পূর্ণ, গম্‌গম্ করছে। একটিমাত্র ছবি কিম্বা একটিমাত্র পাত্র কোথাও আছে। নিমন্ত্রিতেরা সেইটি বহুযত্নে দেখে দেখে নীরবে তৃপ্তিলাভ করেন। যে-জিনিস যথার্থ

সুন্দর তার চারি দিকে মস্ত একটি বিরলতার অবকাশ থাকা চাই। ভালো জিনিসগুলিকে ঘেঁষাঘেঁষি করে রাখা তাদের অপমান করা— সে যেন সতী স্ত্রীকে সতীনের ঘর করতে দেওয়ার মতো। ক্রমে ক্রমে অপেক্ষা ক'রে ক'রে, স্তব্ধতা ও নিঃশব্দতার দ্বারা মনের ক্ষুধাকে জাগ্রত ক'রে তুলে, তার পরে এইরকম দুটি-একটি ভালো জিনিস দেখালে সে যে কী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এখানে এসে তা স্পষ্ট বুঝতে পারলুম। আমার মনে পড়ল, শান্তিনিকেতন আশ্রমে যখন আমি এক-একদিন এক-একটি গান তৈরি করে সকলকে শোনাতুম, তখন সকলেরই কাছে সেই গান তার হৃদয় সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করে দিত। অথচ সেই সব গানকেই তোড়া বেঁধে কলকাতায় এনে যখন বান্ধবসভায় ধরেছি, তখন তারা আপনার যথার্থ শ্রীকে আবৃত করে রেখেছে। তার মানেই কলকাতার বাড়িতে গানের চারি দিকে ফাঁকা নেই— সমস্ত লোকজন, ঘরবাড়ি কাজকর্ম, গোলমাল, তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়েছে। যে-আকাশের মধ্যে তার ঠিক অর্থটি বোঝা যায়, সেই আকাশ নেই।

তার পরে গৃহস্বামী এসে বললেন, চা তৈরি এবং পরিবেশনের ভার বিশেষ কারণে তিনি তাঁর মেয়ের উপরে দিয়েছেন। তাঁর মেয়ে এসে নমস্কার ক'রে চা তৈরিতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর প্রবেশ থেকে আরম্ভ করে চা তৈরির প্রত্যেক অঙ্গ যেন কবিতার ছন্দের মতো। ধোওয়া মোছা, আগুনজ্বালা, চা-দানির ঢাকা খোলা, গরম জলের পাত্র নামানো, পেয়ালায় চা ঢালা, অতিথির সম্মুখে এগিয়ে দেওয়া, সমস্ত এমন সংযম এবং সৌন্দর্যে মণ্ডিত যে, সে না দেখলে বোঝা যায় না। এই চা-পানের প্রত্যেক আসবাবটি দুর্লভ এবং সুন্দর। অতিথির কর্তব্য হচ্ছে, এই পাত্রগুলিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একান্ত মনোযোগ দিয়ে দেখা। প্রত্যেক পাত্রের স্বতন্ত্র নাম এবং ইতিহাস। কত যে তার যত্ন, সে বলা যায় না।

সমস্ত ব্যাপারটা এই। শরীরকে মনকে একান্ত সংযত করে নিরাসক্ত প্রশান্ত মনে সৌন্দর্যকে নিজের প্রকৃতির মধ্যে গ্রহণ করা। ভোগীর ভোগোন্মাদ নয়; কোথাও লেশমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা বা অমিতাচার নেই; মনের উপরতলায় সর্বদা যেখানে নানা স্বার্থের আঘাতে, নানা প্রয়োজনের হাওয়ায়, কেবলই ঢেউ উঠছে, তার থেকে দূরে সৌন্দর্যের গভীরতার মধ্যে নিজেকে সমাহিত করে দেওয়াই হচ্ছে এই চা-পান অনুষ্ঠানের তাৎপর্য।

এর থেকে বোঝা যায়, জাপানের যে-সৌন্দর্যবোধ সে তার একটা সাধনা, একটা প্রবল শক্তি। বিলাস জিনিসটা অন্তরে বাহিরে কেবল খরচ করায়, তাতেই দুর্বল করে। কিন্তু, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধ মানুষের মনকে স্বার্থ এবং বস্তুর সংঘাত থেকে রক্ষা

করে। সেইজন্যেই জাপানির মনে এই সৌন্দর্যরসবোধ পৌরুষের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছে।

এই উপলক্ষে আর-একটি কথা বলবার আছে। এখানে মেয়ে-পুরুষের সামীপ্যের মধ্যে কোনো গ্লানি দেখতে পাই নে; অন্যত্র মেয়ে-পুরুষের মাঝখানে যে একটা লজ্জা-সংকোচের আবিলতা আছে, এখানে তা নেই। মনে হয়, এদের মধ্যে মোহের একটা আবরণ যেন কম। তার প্রধান কারণ, জাপানে স্ত্রী-পুরুষেরা একত্রে বিবস্ত্র হয়ে স্নান করার প্রথা আছে। এই প্রথার মধ্যে যে লেশমাত্র কলুষ নেই তার প্রমাণ এই— নিকটতম আত্মীয়েরাও এতে মনে কোনো বাধা অনুভব করে না। এমনি ক'রে এখানে স্ত্রী পুরুষের দেহ পরস্পরের দৃষ্টিতে কোনো মায়াকে পালন করে না। দেহ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের মন খুব স্বাভাবিক। অন্য দেশের কলুষদৃষ্টি ও দুষ্টবুদ্ধির খাতিরে আজকাল শহরে এই নিয়ম উঠে যাচ্ছে। কিন্তু, পাড়াগাঁয়ে এখনো এই নিয়ম চলিত আছে। পৃথিবীতে যত সভ্য দেশ আছে তার মধ্যে কেবল জাপান মানুষের দেহ সম্বন্ধে যে মোহমুক্ত, এটা আমার কাছে খুব একটা বড়ো জিনিস বলে মনে হয়।

অথচ আশ্চর্য এই যে, জাপানের ছবিতে উলঙ্গ স্ত্রীমূর্তি কোথাও দেখা যায় না। উলঙ্গতার গোপনীয়তা ওদের মনে রহস্যজাল বিস্তার করে নি ব'লেই এটা সম্ভবপর হয়েছে। আরো একটা জিনিস দেখতে পাই। এখানে মেয়েদের কাপড়ের মধ্যে নিজেকে স্ত্রীলোক বলে বিজ্ঞাপন দেবার কিছুমাত্র চেষ্টা নাই। প্রায় সর্বত্রই মেয়েদের বেশের মধ্যে এমন কিছু ভঙ্গি থাকে যাতে বোঝা যায়, তারা বিশেষভাবে পুরুষের মোহদৃষ্টির প্রতি দাবি রেখেছে। এখানকার মেয়েদের কাপড় সুন্দর, কিন্তু সে কাপড়ে দেহের পরিচয়কে ইঙ্গিতের দ্বারা দেখাবার কোনো চেষ্টা নেই। জাপানিদের মধ্যে চরিত্রদৌর্বল্য যে কোথাও নেই তা আমি বলছি নে, কিন্তু স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধকে ঘিরে তুলে প্রায় সকল সভ্যদেশেই মানুষ যে একটা কৃত্রিম মোহপরিবেষ্টন রচনা করেছে জাপানির মধ্যে অন্তত তার একটা আয়োজন কম বলে মনে হল এবং অন্তত সেই পরিমাণে এখানে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ স্বাভাবিক এবং মোহমুক্ত।

আর একটি জিনিস আমাকে বড়ো আনন্দ দেয়, সে হচ্ছে জাপানের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে। রাস্তায় ঘাটে সর্বত্র এত বেশি পরিমাণে এত ছোটো ছেলেমেয়ে আমি আর কোথাও দেখি নি। আমার মনে হল, যে-কারণে জাপানিরা ফুল ভালোবাসে সেই কারণেই ওরা শিশু ভালোবাসে। শিশুর ভালোবাসায় কোনো কৃত্রিম মোহ নেই— আমরা ওদের ফুলের মতোই নিঃস্বার্থ নিরাসক্তভাবে ভালোবাসতে পারি।

কাল সকালেই ভারতবর্ষের ডাক যাবে, এবং আমরাও টোকিও যাত্রা করব।

একটি কথা তোমরা মনে রেখো— আমি যেমন যেমন দেখছি তেমনি তেমনি লিখে চলেছি। এ কেবল একটা নতুন দেশের উপর চোখ বুলিয়ে যাবার ইতিহাস মাত্র। এর মধ্যে থেকে তোমরা কেউ যদি অধিক পরিমাণে, এমন-কি, অল্প পরিমাণেও 'বস্তুতন্ত্রতা' দাবি কর তো নিরাশ হবে। আমার এই চিঠিগুলি জাপানের ভূবৃত্তান্তরূপে পাঠ্যসমিতি নির্বাচন করবেন না, নিশ্চয় জানি। জাপান সম্বন্ধে আমি যা কিছু মতামত প্রকাশ করে চলেছি তার মধ্যে জাপান কিছু পরিমাণে আছে, আমিও কিছু পরিমাণে আছি, এইটে তোমরা যদি মনে নিয়ে পড় তা হলেই ঠকবে না। ভুল বলব না, এমন আমার প্রতিজ্ঞা নয়; যা মনে হচ্ছে বলব, এই আমার মতলব।

২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

কোবে

১৪

যেমন যেমন দেখছি তেমনি তেমনি লিখে যাওয়া আর সম্ভব নয়। পূর্বেই লিখেছি, জাপানিরা বেশি ছবি দেয়ালে টাঙায় না, গৃহসজ্জায় ঘর ভরে ফেলে না। যা তাদের কাছে রমণীয় তা তারা অল্প করে দেখে; দেখা সম্বন্ধে এরা যথার্থ ভোগী বলেই দেখা সম্বন্ধে এদের পেটুকতা নেই। এরা জানে, অল্প করে না দেখলে পূর্ণ পরিমাণে দেখা হয় না। জাপান-দেখা সম্বন্ধেও আমার তাই ঘটছে; দেখবার জিনিস একেবারে হুড়মুড় করে চার দিক থেকে চোখের উপর চেপে পড়ছে, তাই প্রত্যেকটিকে সুস্পষ্ট করে সম্পূর্ণ করে দেখা এখন আর সম্ভব হয় না। এখন, কিছু রেখে কিছু বাদ দিয়ে চলতে হবে।

এখানে এসেই আদর অভ্যর্থনার সাইক্লোনের মধ্যে পড়ে গেছি; সেই সঙ্গে খবরের কাগজের চরেরা চারি দিকে তুফান লাগিয়ে দিয়েছে। এদের ফাঁক দিয়ে যে জাপানের আর কিছু দেখব, এমন আশা ছিল না। জাহাজে এরা ছেঁকে ধরে, রাস্তায় এরা সঙ্গে সঙ্গে চলে, ঘরের মধ্যে এরা ঢুকে পড়তে সংকোচ করে না।

এই কৌতূহলীর ভিড় ঠেলতে ঠেলতে, অবশেষে টোকিও শহরে এসে পৌঁছনো গেল। এখানে আমাদের চিত্রকর বন্ধু য়োকোয়ামা টাইক্কানের বাড়িতে এসে আশ্রয় পেলুম। এখন থেকে ক্রমে জাপানের অন্তরের পরিচয় পেতে আরম্ভ করা গেল।

প্রথমেই জুতো জোড়াটাকে বাড়ির দরজার কাছে ত্যাগ করতে হল। বুঝলুম, জুতো জোড়াটা রাস্তার, পা জিনিসটাই ঘরের। ধুলো জিনিসটাও দেখলুম এদের ঘরের নয়, সেটা বাইরের পৃথিবীর। বাড়ির ভিতরকার সমস্ত ঘর এবং পথ মাদুর

দিয়ে মোড়া, সেই মাদুরের নীচে শক্ত খড়ের গদি ; তাই এদের ঘরের মধ্যে যেমন পায়ের ধুলো পড়ে না তেমনি পায়ের শব্দও হয় না। দরজাগুলো ঠেলা দরজা, বাতাসে যে ধড়াধ্বড় পড়বে এমন সম্ভাবনা নেই।

আর-একটা ব্যাপার এই— এদের বাড়ি জিনিসটা অত্যন্ত অধিক নয়। দেয়াল, কড়ি, বরগা, জানলা, দরজা, যতদূর পরিমিত হতে পারে তাই। অর্থাৎ, বাড়িটা মানুষকে ছাড়িয়ে যায় নি, সম্পূর্ণ তার আয়ত্তের মধ্যে। একে মাজা-ঘষা ধোওয়া-মোছা দুঃসাধ্য নয়।

তার পরে, ঘরে যেটুকু দরকার তা ছাড়া আর কিছু নেই। ঘরের দেয়াল-মেঝে সমস্ত যেমন পরিষ্কার তেমনি ঘরের ফাঁকটুকুও যেন তক্‌তক্‌ করছে ; তার মধ্যে বাজে জিনিসের চিহ্নমাত্র পড়ে নি। মস্ত সুবিধে এই যে, এদের মধ্যে যাদের সাবেক চাল আছে তারা চৌকি টেবিল একেবারে ব্যবহার করে না। সকলেই জানে, চৌকি টেবিলগুলো জীব নয় বটে কিন্তু তারা হাত-পা-ওয়ালা। যখন তাদের কোনো দরকার নেই তখনো তারা দরকারের অপেক্ষায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অতিথিরা আসছে যাচ্ছে, কিন্তু অতিথিদের এই খাপগুলি জায়গা জুড়েই আছে। এখানে ঘরের মেঝের উপরে মানুষ বসে, সুতরাং যখন তারা চলে যায় তখন ঘরের আকাশে তারা কোনো বাধা রেখে যায় না। ঘরের একধারে মাদুর নেই, সেখানে পালিশ-করা কাষ্ঠখণ্ড ঝক্‌ঝক্‌ করছে, সেইদিকের দেয়ালে একটি ছবি ঝুলছে, এবং সেই ছবির সামনে সেই তক্তাটির উপর একটি ফুলদানির উপরে ফুল সাজানো। ওই যে ছবিটি আছে ওটা আড়ম্বরের জন্যে নয়, ওটা দেখবার জন্যে। সেইজন্যে যাতে ওর গা ঘেঁষে কেউ না বসতে পারে, যাতে ওর সামনে যথেষ্ট পরিমাণে অব্যাহত অবকাশ থাকে, তারই ব্যবস্থা রয়েছে। সুন্দর জিনিসকে যে এরা কত শ্রদ্ধা করে, এর থেকেই তা বোঝা যায়। ফুল-সাজানোও তেমনি। অন্যত্র নানা ফুল ও পাতাকে ঠেসে একটা তোড়ার মধ্যে বেঁধে ফেলে— ঠিক যেমন করে বারুণীযোগের সময় তৃতীয়শ্রেণীর যাত্রীদের এক গাড়িতে ভরতি করে দেওয়া হয়, তেমনি— কিন্তু এখানে ফুলের প্রতি সে অত্যাচার হবার জো নেই ; ওদের জন্যে থার্ডক্লাসের গাড়ি নয়, ওদের জন্যে রিজার্ভ-করা সেলুন। ফুলের সঙ্গে ব্যবহারে এদের না আছে দড়াদড়ি, না আছে ঠেলাঠেলি, না আছে হট্টগোল।

ভোরের বেলা উঠে জানলার কাছে আসন পেতে যখন বসলুম তখন বুঝলুম, জাপানিরা কেবল যে শিল্পকলায় ওস্তাদ তা নয়, মানুষের জীবনযাত্রাকে এরা একটি কলাবিদ্যার মতো আয়ত্ত করেছে। এরা এটুকু জানে যে-জিনিসের মূল্য আছে, গৌরব আছে, তার জন্যে যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে দেওয়া চাই। পূর্ণতার জন্যে রিক্ততা সব-চেয়ে

দরকারি। বস্তুবাহুল্য জীবনবিকাশের প্রধান বাধা। এই সমস্ত বাড়িটির মধ্যে কোথাও একটি কোণেও একটু অনাদর নেই, অনাবশ্যকতা নেই। চোখকে মিছিমিছি কোনো জিনিস আঘাত করছে না, কানকে বাজে কোনো শব্দ বিরক্ত করছে না। মানুষের মন নিজেকে যতখানি ছড়াতে চায় ততখানি ছড়াতে পারে, পদে পদে জিনিসপত্রের উপরে ঠোকর খেয়ে পড়ে না।

যেখানে চারি দিকে এলোমেলো, ছড়াছড়ি, নানা জঞ্জাল, নানা আওয়াজ, সেখানে যে প্রতি মুহূর্তেই আমাদের জীবনের এবং মনের শক্তিক্ষয় হচ্ছে সে আমরা অভ্যাসবশত বুঝতে পারি নে। আমাদের চারি দিকে যা-কিছু আছে সমস্তই আমাদের প্রাণমনের কাছে কিছু-না-কিছু আদায় করছেই। যে-সব জিনিস অদরকারি এবং অসুন্দর তারা আমাদের কিছুই দেয় না, কেবল আমাদের কাছে থেকে নিতে থাকে। এমনি করে নিশিদিন আমাদের যা ক্ষয় হচ্ছে, সেটাতে আমাদের শক্তির কম অপব্যয় হচ্ছে না।

সেদিন সকালবেলায় মনে হল, আমার মন যেন কানায় কানায় ভরে উঠেছে। এতদিন যেরকম করে মনের শক্তি বহন করেছি সে যেন চালুনিতে জল ধরা, কেবল গোলমালের ছিদ্র দিয়ে সমস্ত বেরিয়ে গেছে; আর, এখানে এ যেন ঘটের ব্যবস্থা। আমাদের দেশের ক্রিয়াকর্মের কথা মনে হল। কী প্রচুর অপব্যয়। কেবলমাত্র জিনিসপত্রের গণ্ডগোল নয়— মানুষের কী চেঁচামেচি, ছুটোছুটি, গলা-ভাঙাভাঙি। আমাদের নিজের বাড়ির কথা মনে হল। বাঁকাচোরা উঁচুনিচু রাস্তার উপর দিয়ে গোরুর গাড়ি চলার মতো সেখানকার জীবনযাত্রা। যতটা চলছে তার চেয়ে আওয়াজ হচ্ছে ঢের বেশি। দরোয়ান হাঁক দিচ্ছে, বেহারাদের ছেলেরা চেঁচামেচি করছে, মেথরদের মহলে ঘোরতর ঝগড়া বেধে গেছে, মারোয়াড়ি প্রতিবেশিনীরা চীৎকার শব্দে একঘেয়ে গান ধরেছে, তার আর অন্তই নেই। আর, ঘরের ভিতরে নানা জিনিসপত্রের ব্যবস্থা এবং অব্যবস্থা — তার বোঝা কি কম। সেই বোঝা কি কেবল ঘরের মেঝে বহন করছে। তা নয়, প্রতি ক্ষণেই আমাদের মন বহন করছে। যা গোছালো তার বোঝা কম, যা অগোছালো তার বোঝা আরো বেশি, এই যা তফাত। যেখানে একটা দেশের সমস্ত লোকই কম চেঁচায়, কম জিনিস ব্যবহার করে, ব্যবস্থাপূর্বক কাজ করতে যাদের আশ্চর্য দক্ষতা, সমস্ত দেশ জুড়ে তাদের যে কতখানি শক্তি জমে উঠছে তার কি হিসেব আছে।

জাপানিরা যে রাগ করে না তা নয়, কিন্তু সকলের কাছেই একবাক্যে শুনেছি, এরা ঝগড়া করে না। এদের গালাগালির অভিধানে একটিমাত্র কথা আছে—বোকা—তার ঊর্ধ্বে এদের ভাষা পৌঁছয় না! ঘোরতর রাগারাগি মনান্তর হয়ে গেল, পাশের

ঘরে তার টুঁ শব্দ পৌঁছল না, এইটি হচ্ছে জাপানি রীতি। শোকদুঃখ সম্বন্ধেও এই-রকম স্তব্ধতা।

এদের জীবনযাত্রায় এই রিক্ততা, বিরলতা, মিতাচার কেবলমাত্র যদি অভাবাত্মক-হত তা হলে সেটাকে প্রশংসা করবার কোনো হেতু থাকত না। কিন্তু, এই তো দেখছি— এরা ঝগড়া করে না বটে অথচ প্রয়োজনের সময় প্রাণ দিতে, প্রাণ নিতে এরা পিছপাও হয় না। জিনিসপত্রের ব্যবহারে এদের সংযম, কিন্তু জিনিসপত্রের প্রতি প্রভুত্ব এদের তো কম নয়। সকল বিষয়েই এদের যেমন শক্তি তেমনি নৈপুণ্য, তেমনি সৌন্দর্যবোধ।

এ সম্বন্ধে যখন আমি এদের প্রশংসা করেছি, তখন এদের অনেকের কাছেই শুনেছি যে, "এটা আমরা বৌদ্ধধর্মের প্রসাদে পেয়েছি। অর্থাৎ, বৌদ্ধধর্মের একদিকে সংযম আর-একদিকে মৈত্রী, এই যে সামঞ্জস্যের সাধনা আছে এতেই আমরা মিতাচারের দ্বারাই অমিত শক্তির অধিকার পাই। বৌদ্ধধর্ম যে মধ্যপথের ধর্ম।"

শুনে আমার লজ্জা বোধ হয়। বৌদ্ধধর্ম তো আমাদের দেশেও ছিল, কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রাকে তো এমন আশ্চর্য ও সুন্দর সামঞ্জস্যে বেঁধে তুলতে পারে নি। আমাদের কল্পনায় ও কাজে এমনতরো প্রভূত আতিশয্য, ঔদাসীন্য, উচ্ছৃঙ্খলতা কোথা থেকে এল।

একদিন জাপানি নাচ দেখে এলুম। মনে হল, এ যেন দেহভঙ্গির সংগীত। এই সংগীত আমাদের দেশের বীণার আলাপ। অর্থাৎ, পদে পদে মীড়। ভঙ্গিবৈচিত্র্যের পরস্পরের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই কিম্বা কোথাও জোড়ের চিহ্ন দেখা যায় না; সমস্ত দেহ পুষ্পিত লতার মতো একসঙ্গে দুলতে দুলতে সৌন্দর্যের পুষ্পবৃষ্টি করছে। খাঁটি য়ুরোপীয় নাচ অর্ধনারীশ্বরের মতো, আধখানা ব্যায়াম, আধখানা নাচ; তার মধ্যে লম্ফঝম্প, ঘুরপাক, আকাশকে লক্ষ্য করে লাথি-ছোঁড়াছুঁড়ি আছে। জাপানি নাচ একেবারে পরিপূর্ণ নাচ। তার সজ্জার মধ্যেও লেশমাত্র উলঙ্গতা নেই। অন্য দেশের নাচে দেহের সৌন্দর্যলীলার সঙ্গে দেহের লালসা মিশ্রিত। এখানে নাচের কোনো ভঙ্গির মধ্যে লালসার ইশারামাত্র দেখা গেল না। আমার কাছে তার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে, সৌন্দর্যপ্রিয়তা জাপানির মনে এমন সত্য যে তার মধ্যে কোনোরকমের মিশল তাদের দরকার হয় না এবং সহ্য হয় না।

কিন্তু, এদের সংগীতটা আমার মনে হল বড়ো বেশি দূর এগোয় নি। বোধ হয় চোখ আর কান, এই দুইয়ের উৎকর্ষ একসঙ্গে ঘটে না। মনের শক্তিস্রোত যদি এর কোনো একটা রাস্তা দিয়ে অত্যন্ত বেশি আনাগোনা করে তা হলে অন্য রাস্তাটায় তার

ধারা অগভীর হয়। ছবি জিনিসটা হচ্ছে অবনীর, গান জিনিসটা গগনের। অসীম যেখানে সীমার মধ্যে সেখানে ছবি; অসীম যেখানে সীমাহীনতায় সেখানে গান। রূপ-রাজ্যের কলা ছবি, অপরূপ রাজ্যের কলা গান। কবিতা উভচর, ছবির মধ্যেও চলে, গানের মধ্যেও ওড়ে। কেননা, কবিতার উপকরণ হচ্ছে ভাষা। ভাষার একটা দিকে অর্থ, আর-একটা দিকে সুর; এই অর্থের যোগে ছবি গড়ে ওঠে, সুরের যোগে গান।

জাপানি রূপরাজ্যের সমস্ত দখল করেছে। যা-কিছু চোখে পড়ে তার কোথাও জাপানির আলস্য নেই, অনাদর নেই; তার সর্বত্রই সে একেবারে পরিপূর্ণতার সাধনা করেছে। অন্য দেশে গুণী এবং রসিকের মধ্যেই রূপরসের যে-বোধ দেখতে পাওয়া যায় এ দেশে সমস্ত জাতের মধ্যে তাই ছড়িয়ে পড়েছে। য়ুরোপে সর্বজনীন বিদ্যা-শিক্ষা আছে, সর্বজনীন সৈনিকতার চর্চাও সেখানে অনেক জায়গায় প্রচলিত, কিন্তু এমনতরো সর্বজনীন রসবোধের সাধনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানে দেশের সমস্ত লোক সুন্দরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

তাতে কি এরা বিলাসী হয়েছে। অকর্মণ্য হয়েছে? জীবনের কঠিন সমস্যা ভেদ করতে এরা কি উদাসীন কিম্বা অক্ষম হয়েছে।— ঠিক তার উলটো; এরা এই সৌন্দর্যসাধনা থেকেই মিতাচার শিখেছে; এই সৌন্দর্যসাধনা থেকেই এরা বীর্য এবং কর্মনৈপুণ্য লাভ করেছে। আমাদের দেশে একদল লোক আছে তারা মনে করে, শুষ্কতাই বুঝি পৌরুষ, এবং কর্তব্যের পথে চলবার সদুপায় হচ্ছে রসের উপবাস— তারা জগতের আনন্দকে মুড়িয়ে ফেলাকেই জগতের ভালো করা মনে করে।

য়ুরোপে যখন গেছি তখন তাদের কলকারখানা, তাদের কাজের ভিড়, তাদের ঐশ্বর্য এবং প্রতাপ খুব করে চোখে পড়েছে এবং মনকে অভিভূত করেছে। তবু, "এহ বাহ্য"। কিন্তু, জাপানে আধুনিকতার ছদ্মবেশ ভেদ করে যা চোখে পড়ে, সে হচ্ছে মানুষের হৃদয়ের সৃষ্টি। সে অহংকার নয়, আড়ম্বর নয়, সে পূজা। প্রতাপ নিজেকে প্রচার করে; এইজন্যে যতদূর পারে বস্তুর আয়তনকে বাড়িয়ে তুলে আর-সমস্তকে তার কাছে নত করতে চায়। কিন্তু, পূজা আপনার চেয়ে বড়োকে প্রচার করে; এইজন্যে তার আয়োজন সুন্দর এবং খাঁটি, কেবলমাত্র মস্ত এবং অনেক নয়। জাপান আপনার ঘরে বাইরে সর্বত্র সুন্দরের কাছে আপন অর্ঘ্য নিবেদন করে দিচ্ছে। এ দেশে আসবা-মাত্র সকলের চেয়ে বড়ো বাণী যা কানে এসে পৌঁছয় সে হচ্ছে, "আমার ভালো লাগল, আমি ভালোবাসলুম।" এই কথাটি দেশসুদ্ধ সকলের মনে উদয় হওয়া সহজ নয়, এবং সকলের বাণীতে প্রকাশ হওয়া আরো শক্ত। এখানে কিন্তু প্রকাশ হয়েছে।

প্রত্যেক ছোটো জিনিসে, ছোটো ব্যবহারে সেই আনন্দের পরিচয় পাই। সেই আনন্দ ভোগের আনন্দ নয়, পূজার আনন্দ। সুন্দরের প্রতি এমন আন্তরিক সম্ভ্রম অন্য কোথাও দেখি নি। এমন সাবধানে, যত্নে, এমন শুচিতা রক্ষা ক'রে সৌন্দর্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে অন্য কোনো জাতি শেখে নি। যা এদের ভালো লাগে তার সামনে এরা শব্দ করে না। সংযমই প্রচুরতার পরিচয় এবং স্তব্ধতাই গভীরতাকে প্রকাশ করে, এরা সেটা অন্তরের ভিতর থেকে বুঝেছে। এবং এরা বলে, সেই আন্তরিক বোধশক্তি এরা বৌদ্ধধর্মের সাধনা থেকে পেয়েছে। এরা স্থির হয়ে শক্তিকে নিরোধ করতে পেরেছে বলেই সেই অক্ষুণ্ণ শক্তি এদের দৃষ্টিকে বিশুদ্ধ এবং বোধকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

পূর্বেই বলেছি, প্রতাপের পরিচয়ে মন অভিভূত হয়, কিন্তু এখানে যে পূজার পরিচয় দেখি তাতে মন অভিভবের অপমান অনুভব করে না। মন আনন্দিত হয়, ঈর্ষান্বিত হয় না। কেননা, পূজা যে আপনার চেয়ে বড়োকে প্রকাশ করে, সেই বড়োর কাছে সকলেই আনন্দমনে নত হতে পারে, মনে কোথাও বাজে না। দিল্লিতে যেখানে প্রাচীন হিন্দুরাজার কীর্তিকলার বুকের মাঝখানে কুতুবমিনার অহংকারের মুষলের মতো খাড়া হয়ে আছে সেখানে সেই ঔদ্ধত্য মানুষের মনকে পীড়া দেয়; কিম্বা কাশীতে যেখানে হিন্দুর পূজাকে অপমানিত করবার জন্যে আরঙজীব মসজিদ স্থাপন করেছে সেখানে না দেখি শ্রীকে, না দেখি কল্যাণকে। কিন্তু, যখন তাজমহলের সামনে গিয়ে দাঁড়াই তখন এ তর্ক মনে আসে না যে, এটা হিন্দুর কীর্তি না মুসলমানের কীর্তি। তখন একে মানুষের কীর্তি বলেই হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি।

জাপানের যেটা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সেটা অহংকারের প্রকাশ নয়, আত্মনিবেদনের প্রকাশ, সেইজন্যে এই প্রকাশ মানুষকে আহ্বান করে, আঘাত করে না। এইজন্যে জাপানে যেখানে এই ভাবের বিরোধ দেখি সেখানে মনের মধ্যে বিশেষ পীড়া বোধ করি। চীনের সঙ্গে নৌযুদ্ধে জাপান জয়লাভ করেছিল— সেই জয়ের চিহ্নগুলিকে কাঁটার মতো দেশের চার দিকে পুঁতে রাখা যে বর্বরতা, সেটা যে অসুন্দর, সে-কথা জাপানের বোঝা উচিত ছিল। প্রয়োজনের খাতিরে অনেক ক্রূর কর্ম মানুষকে করতে হয়, কিন্তু সেগুলোকে ভুলতে পারাই মনুষ্যত্ব। মানুষের যা চিরস্মরণীয়, যার জন্যে মানুষ মন্দির করে, মঠ করে, সে তো হিংসা নয়।

আমরা অনেক আচার, অনেক আসবাব য়ুরোপের কাছ থেকে নিয়েছি— সব সময়ে প্রয়োজনের খাতিরে নয়, কেবলমাত্র সেগুলো য়ুরোপীয় বলেই। য়ুরোপের কাছে আমাদের মনের এই যে পরাভব ঘটেছে অভ্যাসবশত সেজন্যে আমরা লজ্জা করতেও

ভুলে গেছি। য়ুরোপের যত বিদ্যা আছে সবই যে আমাদের শেখবার, এ কথা মানি; কিন্তু যত ব্যবহার আছে সবই যে আমাদের নেবার, এ কথা আমি মানি নে। তবু, যা নেবার যোগ্য জিনিস তা সব দেশ থেকেই নিতে হবে, এ কথা বলতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সেইজন্যেই, জাপানে যে-সব ভারতবাসী এসেছে তাদের সম্বন্ধে একটা কথা আমি বুঝতে পারি নে। দেখতে পাই, তারা তো য়ুরোপের নানা অনাবশ্যক নানা কুশ্রী জিনিসও নকল করেছে; কিন্তু তারা কি জাপানের কোনো জিনিসই চোখে দেখতে পায় না। তারা এখান থেকে যে-সব বিদ্যা শেখে সেও য়ুরোপের বিদ্যা, এবং যাদের কিছুমাত্র আর্থিক বা অন্য-রকম সুবিধা আছে তারা কোনোমতে এখান থেকে আমেরিকায় দৌড় দিতে চায়। কিন্তু যে-সব বিদ্যা এবং আচার ও আসবাব জাপানের সম্পূর্ণ নিজের, তার মধ্যে কি আমরা গ্রহণ করবার জিনিস কিছুই দেখি নে।

আমি নিজের কথা বলতে পারি, আমাদের জীবনযাত্রার উপযোগী জিনিস আমরা এখান থেকে যত নিতে পারি এমন য়ুরোপ থেকে নয়। তা ছাড়া জীবনযাত্রার রীতি যদি আমরা অসংকোচে জাপানের কাছ থেকে শিখে নিতে পারতুম, তা হলে আমাদের ঘরদুয়ার এবং ব্যবহার শুচি হত, সুন্দর হত, সংযত হত। জাপান ভারতবর্ষ থেকে যা পেয়েছে তাতে আজ ভারতবর্ষকে লজ্জা দিচ্ছে; কিন্তু দুঃখ এই যে, সেই লজ্জা অনুভব করবার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের যত লজ্জা সমস্ত কেবল য়ুরোপের কাছে; তাই য়ুরোপের ছেঁড়া কাপড় কুড়িয়ে কুড়িয়ে তালি-দেওয়া অদ্ভুত আবরণে আমরা লজ্জা রক্ষা করতে চাই। এদিকে জাপানপ্রবাসী ভারতবাসীরা বলে, জাপান আমাদের এসিয়াবাসী ব'লে অবজ্ঞা করে; অথচ আমরাও জাপানকে এমনি অবজ্ঞা করি যে, তার আতিথ্য গ্রহণ করেও প্রকৃত জাপানকে চক্ষেও দেখি নে; জাপানের ভিতর দিয়ে বিকৃত য়ুরোপকেই কেবল দেখি। জাপানকে যদি দেখতে পেতুম তা হলে আমাদের ঘর থেকে অনেক কুশ্রীতা, অশুচিতা, অব্যবস্থা, অসংযম আজ দূরে চলে যেত।

বাংলাদেশে আজ শিল্পকলার নূতন অভ্যুদয় হয়েছে, আমি সেই শিল্পীদের জাপানে আহ্বান করছি। নকল করবার জন্যে নয়, শিক্ষা করবার জন্যে। শিল্প জিনিসটা যে কত বড়ো জিনিস, সমস্ত জাতির সেটা যে কত বড়ো সম্পদ, কেবলমাত্র শৌখিনতাকে সে যে কতদূর পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে— তার মধ্যে জ্ঞানীর জ্ঞান, ভক্তের ভক্তি, রসিকের রসবোধ যে কত গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছে, তা এখানে এলে তবে স্পষ্ট বোঝা যায়।

টোকিওতে আমি যে-শিল্পীবন্ধুর বাড়িতে ছিলুম সেই টাইক্কানের নাম পূর্বেই বলেছি; ছেলেমানুষের মতো তাঁর সরলতা, তাঁর হাসি তাঁর চারি দিককে হাসিয়ে রেখে

দিয়েছে। প্রসন্ন তাঁর মুখ, উদার তাঁর হৃদয়, মধুর তাঁর স্বভাব। যতদিন তাঁর বাড়িতে ছিলুম, আমি জানতেই পারি নি তিনি কত বড়ো শিল্পী। ইতিমধ্যে য়োকোহামায় একজন ধনী এবং রসজ্ঞ ব্যক্তির আমরা আতিথ্য লাভ করেছি। তাঁর এই বাগানটি নন্দনবনের মতো এবং তিনিও সকল বিষয়ে এখানকারই যোগ্য। তাঁর নাম হারা। তাঁর কাছে শুনলুম, য়োকোয়ামা টাইকান এবং তানজান শিমোমুরা আধুনিক জাপানের দুই সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁরা আধুনিক য়ুরোপের নকল করেন না, প্রাচীন জাপানেরও না। তাঁরা প্রথার বন্ধন থেকে জাপানের শিল্পকে মুক্তি দিয়েছেন। হারার বাড়িতে টাইকানের ছবি যখন প্রথম দেখলুম, আশ্চর্য হয়ে গেলুম। তাতে না আছে বাহুল্য, না আছে শৌখিনতা। তাতে যেমন একটা জোর আছে তেমনি সংযম। বিষয়টা এই— চীনের একজন প্রাচীন কালের কবি ভাবে ভোর হয়ে চলেছে; তার পিছনে একজন বালক একটি বীণাযন্ত্র বহু যত্নে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে তার নেই; তার পিছনে একটি বাঁকা উইলো গাছ। জাপানে তিনভাগওয়ালা যে খাড়া পর্দার প্রচলন আছে সেই রেশমের পর্দার উপর আঁকা; মস্ত পর্দা এবং প্রকাণ্ড ছবি। প্রত্যেক রেখা প্রাণে ভরা। এর মধ্যে ছোটোখাটো কিম্বা জবড়জঙ্গ কিছুই নেই; যেমন উদার তেমনি গভীর, তেমনি আয়াসহীন। নৈপুণ্যের কথা একেবারে মনেই হয় না; নানা রঙ নানা রেখার সমাবেশ নেই; দেখবামাত্র মনে হয় খুব বড়ো এবং খুব সত্য। তার পরে তাঁর ভূদৃশ্যচিত্র দেখলুম। একটি ছবি— পটের উচ্চপ্রান্তে একখানি পূর্ণ চাঁদ, মাঝখানে একটি নৌকা, নীচের প্রান্তে দুটো দেওদার গাছের ডাল দেখা যাচ্ছে; আর কিছু না, জলের কোনো রেখা পর্যন্ত নেই। জ্যোৎস্নার আলোয় স্থির জল কেবলমাত্র বিস্তীর্ণ শুভ্রতা— এটা যে জল সে কেবলমাত্র ওই নৌকো আছে বলেই বোঝা যাচ্ছে; আর, এই সর্বব্যাপী বিপুল জ্যোৎস্নাকে ফলিয়ে তোলবার জন্যে যত কিছু কালিমা সে কেবলই ওই দুটো পাইন গাছের ডালে। ওস্তাদ এমন একটা জিনিসকে আঁকতে চেয়েছেন যার রূপ নেই, যা বৃহৎ এবং নিস্তব্ধ— জ্যোৎস্নারাত্রি— অতলস্পর্শ তার নিঃশব্দতা। কিন্তু, আমি যদি তাঁর সব ছবির বিস্তারিত বর্ণনা করতে যাই তা হলে আমার কাগজও ফুরোবে, সময়েও কুলোবে না। হারা সান সবশেষে নিয়ে গেলেন একটি লম্বা সংকীর্ণ ঘরে সেখানে এক-দিকের প্রায় সমস্ত দেয়াল জুড়ে একটি খাড়া পর্দা দাঁড়িয়ে। এই পর্দায় শিমোমুরার আঁকা একটি প্রকাণ্ড ছবি। শীতের পরে প্রথম বসন্ত এসেছে; প্লাম গাছের ডালে একটাও পাতা নেই, সাদা সাদা ফুল ধরেছে, ফুলের পাপড়ি ঝরে ঝরে পড়ছে; বৃহৎ পর্দার এক প্রান্তে দিগন্তের কাছে রক্তবর্ণ সূর্য দেখা দিয়েছে, পর্দার অপর প্রান্তে প্লাম গাছের রিক্ত

ডালের আড়ালে দেখা যাচ্ছে একটি অন্ধ হাতজোড় করে সূর্যের বন্দনায় রত। একটি অন্ধ, এক গাছ, এক সূর্য, আর সোনায়-ঢালা এক সুবৃহৎ আকাশ; এমন ছবি আমি কখনো দেখি নি। উপনিষদের সেই প্রার্থনাবাণী যেন রূপ ধরে আমার কাছে দেখা দিলে— তমসো মা জ্যোতির্গময়। কেবল অন্ধ মানুষের নয় অন্ধ প্রকৃতির এই প্রার্থনা, তমসো মা জ্যোতির্গময়— সেই প্লাম গাছের একাগ্র প্রসারিত শাখাপ্রশাখার ভিতর দিয়ে জ্যোতির্লোকের দিকে উঠছে। অথচ, আলোয় আলোময়— তারি মাঝখানে অন্ধের প্রার্থনা।

কাল শিমোমুরার আর-একটা ছবি দেখলুম। পটের আয়তন তো ছোটো, অথচ ছবির বিষয় বিচিত্র। সাধক তার ঘরের মধ্যে বসে ধ্যান করছে; তার সমস্ত রিপুগুলি তাকে চারি দিকে আক্রমণ করেছে। অর্ধেক মানুষ অর্ধেক জন্তুর মতো তাদের আকার, অত্যন্ত কুৎসিত, তাদের কেউ বা খুব সমারোহ করে আসছে, কেউ বা আড়ালে আবডালে উঁকিঝুঁকি মারছে। কিন্তু, তবু এরা সবাই বাইরেই আছে; ঘরের ভিতরে তার সামনে সকলের চেয়ে তার বড়ো রিপু বসে আছে; তার মূর্তি ঠিক বুদ্ধের মতো। কিন্তু, লক্ষ্য করে দেখলেই দেখা যায়, সে সাঁচ্চা বুদ্ধ নয়— স্থূল তার দেহ, মুখে তার বাঁকা হাসি। সে কপট আত্মম্ভরিতা, পবিত্র রূপ ধরে এই সাধককে বঞ্চিত করছে। এ হচ্ছে আধ্যাত্মিক অহমিকা, শুচি এবং সুগম্ভীর মুক্তস্বরূপ বুদ্ধের ছদ্মবেশ ধরে আছে; একেই চেনা শক্ত, এই হচ্ছে অন্তরতম রিপু, অন্য কদর্য রিপুরা বাইরের। এইখানে দেবতাকে উপলক্ষ করে মানুষ আপনার প্রবৃত্তিকে পূজা করছে।

আমরা যাঁর আশ্রয়ে আছি, সেই হারা সান গুণী এবং গুণজ্ঞ। তিনি রসে হাস্যে ঔদার্যে পরিপূর্ণ। সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ের গায়ে, তাঁর এই পরম সুন্দর বাগানটি সর্বসাধারণের জন্যে নিত্যই উদ্‌ঘাটিত। মাঝে মাঝে বিশ্রামগৃহ আছে; যে-খুশি সেখানে এসে চা খেতে পারে। একটা খুব লম্বা ঘর আছে, সেখানে যারা বনভোজন করতে চায় তাদের জন্যে ব্যবস্থা আছে। হারা সানের মধ্যে কৃপণতাও নেই, আড়ম্বরও নেই, অথচ তাঁর চার দিকে সমারোহ আছে। মূঢ় ধনাভিমানীর মতো তিনি মূল্যবান জিনিসকে কেবলমাত্র সংগ্রহ করে রাখেন না; তার মূল্য তিনি বোঝেন, তার মূল্য তিনি দেন, এবং তার কাছে তিনি সম্ভ্রমে আপনাকে নত করতে জানেন।

১৫

এশিয়ার মধ্যে জাপানই এই কথাটি একদিন হঠাৎ অনুভব করলে যে, য়ুরোপ যে-শক্তিতে পৃথিবীতে সর্বজয়ী হয়ে উঠেছে একমাত্র সেই শক্তির দ্বারাই তাকে ঠেকানো

যায়। নইলে তার চাকার নীচে পড়তেই হবে এবং একবার পড়লে কোনোকালে আর ওঠবার উপায় থাকবে না।

এই কথাটি যেমনি তার মাথায় ঢুকল অমনি সে আর এক মুহূর্ত দেরি করলে না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই য়ুরোপের শক্তিকে আত্মসাৎ করে নিলে। য়ুরোপের কামান বন্দুক, কুচ-কাওয়াজ, কল-কারখানা, আপিস-আদালত, আইন-কানুন যেন কোন্ আলাদিনের প্রদীপের জাদুতে পশ্চিমলোক থেকে পূর্বলোকে একেবারে আস্ত উপড়ে এনে বসিয়ে দিলে। নতুন শিক্ষাকে ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়া, বাড়িয়ে তোলা নয়; তাকে ছেলের মতো শৈশব থেকে যৌবনে মানুষ করে তোলা নয়— তাকে জামাইয়ের মতো একোবারে পূর্ণ যৌবনে ঘরের মধ্যে বরণ করে নেওয়া। বৃদ্ধ বনস্পতিকে এক জায়গা থেকে তুলে আর-এক জায়গায় রোপণ করবার বিদ্যা জাপানের মালীরা জানে; য়ুরোপের শিক্ষাকেও তারা তেমনি করেই তার সমস্ত জটিল শিকড় এবং বিপুল ডালপালা সমেত নিজের দেশের মাটিতে এক রাত্রির মধ্যেই খাড়া করে দিলে। শুধু যে তার পাতা ঝরে পড়ল না তা নয়, পরদিন থেকেই তার ফল ধরতে লাগল। প্রথম কিছুদিন ওরা য়ুরোপ থেকে শিক্ষকের দল ভাড়া করে এনেছিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাদের প্রায় সমস্ত সরিয়ে দিয়ে, হালে এবং দাঁড়ে নিজেরাই বসে গেছে— কেবল পালটা এমন আড় ক'রে ধরেছে যাতে পশ্চিমের হাওয়াটা তার উপরে পুরো এসে লাগে।

ইতিহাসে এতবড়ো আশ্চর্য ঘটনা আর কখনো হয় নি। কারণ, ইতিহাস তো যাত্রার পালা গান করা নয় যে, ষোলো বছরের ছোকরাকে পাকা গোঁপদাড়ি পরিয়ে দিলেই সেই মুহূর্তে তাকে নারদমুনি করে তোলা যেতে পারে। শুধু য়ুরোপের অস্ত্র ধার করলেই যদি য়ুরোপ হওয়া যেত, তা হলে আফগানিস্থানেরও ভাবনা ছিল না। কিন্তু, য়ুরোপের আসবাবগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করবার মতো মনোবৃত্তি জাপান এক নিমেষেই কেমন করে গড়ে তুললে, সেইটেই বোঝা শক্ত।

সুতরাং এ-কথা মানতেই হবে, এ জিনিস তাকে গোড়া থেকে গড়তে হয় নি, ওটা তার একরকম গড়াই ছিল। সেইজন্যেই যেমনি তার চৈতন্য হল অমনি তার প্রস্তুত হতে বিলম্ব হল না। তার যা-কিছু বাধা ছিল সেটা বাইরের; অর্থাৎ, একটা নতুন জিনিসকে বুঝে পড়ে আয়ত্ত করে নিতে যেটুকু বাধা সেইটুকু মাত্র; তার নিজের অন্তরে কোনো বিরোধের বাধা ছিল না।

পৃথিবীতে মোটামুটি দুরকম জাতের মন আছে— এক স্থাবর, আর-এক জঙ্গম। এই মানসিক স্থাবর-জঙ্গমতার মধ্যে একটা ঐকান্তিক ভেদ আছে, এমন কথা বলতে

চাই নে। স্থাবরকেও দায়ে পড়ে চলতে হয়, জঙ্গমকেও দায়ে পড়ে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু স্থাবরের লয় বিলম্বিত, আর জঙ্গমের লয় দ্রুত।

জাপানের মনটাই ছিল স্বভাবত জঙ্গম; লম্বা লম্বা দশকুশি তালের গাম্ভারি চাল তার নয়। এইজন্যে সে এক দৌড়ে দু-তিন শো বছর হু হু করে পেরিয়ে গেল। আমাদের মতো যারা দুর্ভাগ্যের বোঝা নিয়ে হাজার বছর পথের ধারে বটতলায় শুয়ে গড়িয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে, তারা অভিমান করে বলে, "ওরা ভারি হালকা, আমাদের মতো গাম্ভীর্য থাকলে ওরা এমন বিশ্রীরকম দৌড়ধাপ করতে পারত না। সাঁচ্চা জিনিস কখনো এত শীঘ্র গড়ে উঠতে পারে না।"

আমরা যাই বলি-না কেন, চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এশিয়ার এই প্রান্তবাসী জাত য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত জটিল ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারছে। এর একমাত্র কারণ, এরা যে কেবল ব্যবস্থা-টাকেই নিয়েছে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মনটাকেও পেয়েছে। নইলে পদে পদে অস্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রীর বিষম ঠোকাঠুকি বেধে যেত; নইলে ওদের শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষার লড়াই কিছুতেই মিটত না, এবং বর্ম ওদের দেহটাকে পিষে দিত।

মনের যে-জঙ্গমতার জোরে ওরা আধুনিক কালের প্রবল প্রবাহের সঙ্গে নিজের গতিকে এত সহজে মিলিয়ে দিতে পেরেছে সেটা জাপানি পেয়েছে কোথা থেকে।

জাপানিদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে, ওরা মিশ্র জাতি। ওরা একেবারে খাস মঙ্গোলীয় নয়। এমন-কি, ওদের বিশ্বাস ওদের সঙ্গে আর্যরক্তেরও মিশ্রণ ঘটেছে। জাপানিদের মধ্যে মঙ্গোলীয় এবং ভারতীয় দুই ছাঁদেরই মুখ দেখতে পাই, এবং ওদের মধ্যে বর্ণেরও বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। আমার চিত্রকর বন্ধু টাইক্কানকে বাঙালি কাপড় পরিয়ে দিলে, তাঁকে কেউ জাপানি বলে সন্দেহ করবে না। এমন আরো অনেককে দেখেছি।

যে-জাতির মধ্যে বর্ণসংকরতা খুব বেশি ঘটেছে তার মনটা এক ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায় না। প্রকৃতিবৈচিত্র্যের সংঘাতে তার মনটা চলনশীল হয়ে থাকে। এই চলনশীলতায় মানুষকে অগ্রসর করে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

রক্তের অবিমিশ্রতা কোথাও যদি দেখতে চাই, তা হলে বর্বর জাতির মধ্যে যেতে হয়। তারা পরকে ভয় করেছে, তারা অল্পপরিসর আশ্রয়ের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের জাতকে স্বতন্ত্র রেখেছে। তাই, আদিম অস্ট্রেলিয় জাতির আদিমতা আর ঘুচল না; আফ্রিকার মধ্যদেশে কালের গতি বন্ধ বললেই হয়।

কিন্তু, গ্রীস পৃথিবীর এমন একটা জায়গায় ছিল যেখানে একদিকে এশিয়া, একদিকে

ইজিপ্ট, একদিকে য়ুরোপের মহাদেশ তার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে তাকে আলোড়িত করেছে। গ্রীকেরা অবিমিশ্র জাতি ছিল না, রোমকেরাও না। ভারতবর্ষেও অনার্যে আর্যে যে মিশ্রণ ঘটেছিল সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

জাপানিকেও দেখলে মনে হয়, তারা এক ধাতুতে গড়া নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই মিথ্যা করেও আপনার রক্তের অবিমিশ্রতা নিয়ে গর্ব করে; জাপানের মনে এই অভিমান কিছুমাত্র নেই। জাপানিদের সঙ্গে ভারতীয় জাতির মিশ্রণ হয়েছে, এ কথার আলোচনা তাদের কাগজে দেখেছি এবং তা নিয়ে কোনো পাঠক কিছুমাত্র বিচলিত হয় নি। শুধু তাই নয়, চিত্রকলা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের কাছে তারা যে ঋণী সে কথা আমরা একেবারেই ভুলে গেছি, কিন্তু জাপানিরা এই ঋণ স্বীকার করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

বস্তুত, ঋণ তারাই গোপন করতে চেষ্টা করে— ঋণ যাদের হাতে ঋণই রয়ে গেছে, ধন হয়ে ওঠে নি। ভারতের কাছ থেকে জাপান যদি কিছু নিয়ে থাকে সেটা সম্পূর্ণ তার আপন সম্পত্তি হয়েছে। যে-জাতির মনের মধ্যে চলন-ধর্ম প্রবল সেই জাতিই পরের সম্পদকে নিজের সম্পদ করে নিতে পারে। যার মন স্থাবর বাইরের জিনিস তার পক্ষে বিষম ভার হয়ে ওঠে; কারণ, তার নিজের অচল অস্তিত্বই তার পক্ষে প্রকাণ্ড একটা বোঝা।

কেবলমাত্র জাতিসংকরতা নয়, স্থানসংকীর্ণতা জাপানের পক্ষে একটা মস্ত সুবিধা হয়েছে। ছোটো জায়গাটি সমস্ত জাতির মিলনের পক্ষে পুটপাকের কাজ করেছে। বিচিত্র উপকরণ ভালোরকম করে গলে মিশে বেশ নিবিড় হয়ে উঠেছে। চীন বা ভারতবর্ষের মতো বিস্তীর্ণ জায়গায় বৈচিত্র্য কেবল বিভক্ত হয়ে উঠতে চেষ্টা করে, সংহত হতে চায় না।

প্রাচীনকালে গ্রীস রোম এবং আধুনিক কালে ইংলণ্ড সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে সম্মিলিত হয়ে বিস্তীর্ণ স্থানকে অধিকার করতে পেরেছে। আজকের দিনে এশিয়ার মধ্যে জাপানের সেই সুবিধা। একদিকে তার মানসপ্রকৃতির মধ্যে চিরকালই চলন-ধর্ম আছে, যে জন্য চীন কোরিয়া প্রভৃতি প্রতিবেশীর কাছ থেকে জাপান তার সভ্যতার সমস্ত উপকরণ অনায়াসে আত্মসাৎ করতে পেরেছে; আর-একদিকে অল্পপরিসর জায়গায় সমস্ত জাতি অতি সহজেই এক ভাবে ভাবিত, এক প্রাণে অনুপ্রাণিত হতে পেরেছে। তাই যে-মুহূর্তে জাপানের মস্তিষ্কের মধ্যে এই চিন্তা স্থান পেলে যে আত্ম-রক্ষার জন্যে য়ুরোপের কাছ থেকে তাকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে সেই মুহূর্তে জাপানের সমস্ত কলেবরের মধ্যে অনুকূল চেষ্টা জাগ্রত হয়ে উঠল।

য়ুরোপের সভ্যতা একান্তভাবে জঙ্গম মনের সভ্যতা, তা স্থাবর মনের সভ্যতা নয়। এই সভ্যতা ক্রমাগতই নূতন চিন্তা, নূতন চেষ্টা, নূতন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বিপ্লব-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় পক্ষবিস্তার করে উড়ে চলেছে। এশিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানের মনে সেই স্বাভাবিক চলনধর্ম থাকাতেই জাপান সহজেই য়ুরোপের ক্ষিপ্রতালে চলতে পেরেছে এবং তাতে করে তাকে প্রলয়ের আঘাত সইতে হয় নি। কারণ, উপকরণ সে যা-কিছু পাচ্ছে তার দ্বারা সে সৃষ্টি করছে; সুতরাং নিজের বর্ধিষ্ণু জীবনের সঙ্গে এ-সমস্তকে সে মিলিয়ে নিতে পারছে। এই সমস্ত নতুন জিনিস যে তার মধ্যে কোথাও কিছু বাধা পাচ্ছে না, তা নয়, কিন্তু সচলতার বেগেই সেই বাধা ক্ষয় হয়ে চলেছে। প্রথম প্রথম যা অসংগত অদ্ভুত হয়ে দেখা দিচ্ছে ক্রমে ক্রমে তার পরিবর্তন ঘটে সুসংগতি জেগে উঠছে। একদিন যে-অনাবশ্যককে সে গ্রহণ করেছে আর-একদিন সেটাকে ত্যাগ করছে; একদিন যে আপন জিনিসকে পরের হাটে সে খুইয়েছে আর-একদিন সেটাকে আবার ফিরে নিচ্ছে। এই তার সংশোধনের প্রক্রিয়া এখনো নিত্য তার মধ্যে চলছে। যে-বিকৃতি মৃত্যুর তাকেই ভয় করতে হয়; যে-বিকৃতি প্রাণের লীলাবৈচিত্র্যে হঠাৎ এক-এক সময়ে দেখা দেয় প্রাণ আপনি তাকে সামলে নিয়ে নিজের সমে এসে দাঁড়াতে পারে।

আমি যখন জাপানে ছিলুম তখন একটা কথা বারবার আমার মনে এসেছে। আমি অনুভব করছিলুম, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালির সঙ্গে জাপানির এক জায়গায় যেন মিল আছে। আমাদের এই বৃহৎ দেশের মধ্যে বাঙালিই সব প্রথমে নূতনকে গ্রহণ করেছে, এবং এখনো নূতনকে গ্রহণ ও উদ্ভাবন করবার মতো তার চিত্তের নমনীয়তা আছে।

তার একটা কারণ, বাঙালির মধ্যে রক্তের অনেক মিশল ঘটেছে; এমন মিশ্রণ ভারতের আর কোথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ। তার পরে, বাঙালি ভারতের যে প্রান্তে বাস করে সেখানে বহুকাল ভারতের অন্য প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। বাংলা ছিল পাণ্ডববর্জিত দেশ। বাংলা একদিন দীর্ঘকাল বৌদ্ধপ্রভাবে অথবা অন্য যে কারণেই হোক আচারভ্রষ্ট হয়ে নিতান্ত একঘরে হয়েছিল, তাতে করে তার একটা সংকীর্ণ স্বাতন্ত্র্য ঘটেছিল; এই কারণেই বাঙালির চিত্ত অপেক্ষাকৃত বন্ধনমুক্ত, এবং নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা বাঙালির পক্ষে যত সহজ হয়েছিল এমন ভারতবর্ষের অন্য কোনো দেশের পক্ষে হয় নি। য়ুরোপীয় সভ্যতার পূর্ণ দীক্ষা জাপানের মতো আমাদের পক্ষে অবাধ নয়; পরের কৃপণ হস্ত থেকে আমরা যেটুকু পাই তার বেশি আমাদের পক্ষে দুর্লভ। কিন্তু, য়ুরোপীয় শিক্ষা আমাদের দেশে যদি সম্পূর্ণ সুগম হত তা হলে কোনো

সন্দেহ নেই, বাঙালি সকল দিক থেকেই তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করত। আজ নানা দিক থেকে বিদ্যাশিক্ষা আমাদের পক্ষে ক্রমশই দুর্মূল্য হয়ে উঠছে, তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকীর্ণ প্রবেশদ্বারে বাঙালির ছেলে প্রতিদিন মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে মরছে। বস্তুত, ভারতের অন্য সকল প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে যে-একটা অসন্তোষের লক্ষণ অত্যন্ত প্রবল দেখা যায় তার একমাত্র কারণ, আমাদের প্রতিহত গতি। যা কিছু ইংরেজি তার দিকে বাঙালির উদ্‌বোধিত চিত্ত একান্ত প্রবলবেগে ছুটেছিল; ইংরেজের অত্যন্ত কাছে যাবার জন্যে আমরা প্রস্তুত হয়েছিলুম— এ সম্বন্ধে সকলরকম সংস্কারের বাধা লঙ্ঘন করবার জন্যে বাঙালিই সর্বপ্রথমে উদ্যত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, এইখানে ইংরেজের কাছেই যখন বাধা পেল তখন বাঙালির মনে যে প্রচণ্ড অভিমান জেগে উঠল সেটা হচ্ছে তার অনুরাগেরই বিকার।

এই অভিমানই আজ নবযুগের শিক্ষাকে গ্রহণ করবার পক্ষে বাঙালির মনে সকলের চেয়ে বড়ো অন্তরায় হয়ে উঠেছে। আজ আমরা যে-সকল কূটতর্ক ও মিথ্যা যুক্তি দ্বারা পশ্চিমের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার চেষ্টা করছি সেটা আমাদের স্বাভাবিক নয়। এইজন্যেই সেটা এমন সুতীব্র, সেটা ব্যাধির প্রকোপের মতো পীড়ার দ্বারা এমন করে আমাদের সচেতন করে তুলেছে।

বাঙালির মনের এই প্রবল বিরোধের মধ্যেও তার চলনধর্মই প্রকাশ পায়। কিন্তু, বিরোধ কখনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। বিরোধে দৃষ্টি কলুষিত ও শক্তি বিকৃত হয়ে যায়। যত বড়ো বেদনাই আমাদের মনে থাক্‌, এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটনের ভার বাঙালির উপরেই পড়েছে। এইজন্যেই বাংলার নবযুগের প্রথম পথপ্রবর্তক রামমোহন রায়। পশ্চিমকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে তিনি ভীরুতা করেন নি, কেননা, পূর্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অটল ছিল। তিনি যে-পশ্চিমকে দেখতে পেয়েছিলেন সে তো শস্ত্রধারী পশ্চিম নয়, বাণিজ্যজীবী পশ্চিম নয়, সে হচ্ছে জ্ঞানে-প্রাণে-উদ্ভাসিত পশ্চিম।

জাপান য়ুরোপের কাছ থেকে কর্মের দীক্ষা আর অস্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছে। তার কাছ থেকে বিজ্ঞানের শিক্ষাও সে লাভ করতে বসেছে। কিন্তু, আমি যতটা দেখেছি তাতে আমার মনে হয়, য়ুরোপের সঙ্গে জাপানের একটা অন্তরতর জায়গায় অনৈক্য আছে। যে গূঢ় ভিত্তির উপরে য়ুরোপের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত সেটা আধ্যাত্মিক। সেটা কেবলমাত্র কর্মনৈপুণ্য নয়, সেটা তার নৈতিক আদর্শ। এইখানে জাপানের সঙ্গে য়ুরোপের মূলগত প্রভেদ। মনুষ্যত্বের যে-সাধনা অমৃতলোককে মানে এবং সেই অভিমুখে চলতে থাকে, যে-সাধনা কেবলমাত্র সামাজিক ব্যবস্থার অঙ্গ নয়, যে-সাধনা

সাংসারিক প্রয়োজন বা স্বজাতিগত স্বার্থকেও অতিক্রম ক'রে আপনার লক্ষ্য স্থাপন করেছে, সেই সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে য়ুরোপের মিল যত সহজ জাপানের সঙ্গে তার মিল তত সহজ নয়। জাপানি সভ্যতার সৌধ এক-মহলা— সেই হচ্ছে তার সমস্ত শক্তি এবং দক্ষতার নিকেতন। সেখানকার ভাণ্ডারে সব-চেয়ে বড়ো জিনিস যা সঞ্চিত হয় সে হচ্ছে কৃতকর্মতা; সেখানকার মন্দিরে সব-চেয়ে বড়ো দেবতা স্বাদেশিক স্বার্থ। জাপান তাই সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে সহজেই আধুনিক জর্মনির শক্তি-উপাসক নবীন দার্শনিকদের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করতে পেরেছে; নীট্‌ঝের গ্রন্থ তাদের কাছে সব-চেয়ে সমাদৃত। তাই আজ পর্যন্ত জাপান ভালো করে স্থির করতেই পারলে না— কোনো ধর্মে তার প্রয়োজন আছে কিনা, এবং ধর্মটা কী। কিছুদিন এমনও তার সংকল্প ছিল যে, সে খৃস্টানধর্ম গ্রহণ করবে। তখন তার বিশ্বাস ছিল যে, য়ুরোপ যে ধর্মকে আশ্রয় করেছে সেই ধর্ম হয়তো তাকে শক্তি দিয়েছে, অতএব খৃস্টানিকে কামান-বন্দুকের সঙ্গে সঙ্গেই সংগ্রহ করা দরকার হবে। কিন্তু, আধুনিক য়ুরোপে শক্তি-উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে কিছুকাল থেকে এই কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে যে, খৃস্টানধর্ম স্বভাব-দুর্বলের ধর্ম, তা বীরের ধর্ম নয়। য়ুরোপ বলতে শুরু করেছিল, যে-মানুষ ক্ষীণ তারই স্বার্থ নম্রতা ক্ষমা ও ত্যাগধর্ম প্রচার করা। সংসারে যারা পরাজিত সে-ধর্মে তাদেরই সুবিধা; সংসারে যারা জয়শীল সে-ধর্মে তাদের বাধা। এই কথাটা জাপানের মনে সহজেই লেগেছে। এইজন্যে জাপানের রাজশক্তি আজ মানুষের ধর্মবুদ্ধিকে অবজ্ঞা করছে। এই অবজ্ঞা আর-কোনো দেশে চলতে পারত না; কিন্তু জাপানে চলতে পারছে তার কারণ জাপানে এই বোধের বিকাশ ছিল না এবং সেই বোধের অভাব নিয়েই জাপান আজ গর্ব বোধ করছে— সে জানছে, পরকালের দাবি থেকে সে মুক্ত, এইজন্যই ইহকালে সে জয়ী হবে।

জাপানের কর্তৃপক্ষেরা যে ধর্মকে বিশেষরূপে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন সে হচ্ছে শিন্তো ধর্ম। তার কারণ, এই ধর্ম কেবলমাত্র সংস্কারমূলক, আধ্যাত্মিকতামূলক নয়। এই ধর্ম রাজাকে এবং পূর্বপুরুষদের দেবতা ব'লে মানে। সুতরাং স্বদেশাসক্তিকে সুতীব্র করে তোলবার উপায়-রূপে এই সংস্কারকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কিন্তু, য়ুরোপীয় সভ্যতা মঙ্গোলীয় সভ্যতার মতো এক-মহলা নয়। তার একটি অন্তরমহল আছে। সে অনেক দিন থেকেই কিংডম্ অব্ হেভ্‌নকে স্বীকার করে আসছে। সেখানে নম্র যে সে জয়ী হয়; পর যে সে আপনার চেয়ে বেশি হয়ে ওঠে। কৃতকর্মতা নয়, পরমার্থই সেখানে চরম সম্পদ। অনন্তের ক্ষেত্রে সংসার সেখানে আপনার সত্য মূল্য লাভ করে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার এই অন্তরমহলের দ্বার কখনো কখনো বন্ধ হয়ে যায়, কখনো কখনো সেখানকার দীপ জ্বলে না। তা হোক, কিন্তু এ মহলের পাকা ভিত; বাইরের কামান গোলা এর দেয়াল ভাঙতে পারবে না; শেষ পর্যন্তই এ টিঁকে থাকবে এবং এইখানেই সভ্যতার সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

আমাদের সঙ্গে য়ুরোপের আর-কোথাও যদি মিল না থাকে, এই বড়ো জায়গায় মিল আছে। আমরা অন্তরতর মানুষকে মানি— তাকে বাইরের মানুষের চেয়ে বেশি মানি। যে জন্ম মানুষের দ্বিতীয় জন্ম, তার মুক্তির জন্ম, তার জন্যে আমরা বেদনা অনুভব করি। এই জায়গায়, মানুষের এই অন্তরমহলে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের যাতায়াতের একটা পথচিহ্ন দেখতে পাই। এই অন্তরমহলে মানুষের যে-মিলন সেই মিলনই সত্য মিলন। এই মিলনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করবার কাজে বাঙালির আহ্বান আছে, তার অনেক চিহ্ন অনেকদিন থেকেই দেখা যাচ্ছে।

যাত্রী

পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি

পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি

হারুনা-মারু জাহাজ
২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪

সকাল আটটা। আকাশে ঘন মেঘ, দিগন্ত বৃষ্টিতে ঝাপসা, বাদলার হাওয়া খুঁতখুঁতে ছেলের মতো কিছুতেই শান্ত হতে চাচ্ছে না। বন্দরের শানবাঁধানো বাঁধের ওপারে দুরন্ত সমুদ্র লাফিয়ে লাফিয়ে গর্জে উঠছে, কাকে যেন ঝুঁটি ধরে পেড়ে ফেলতে চায়, নাগাল পায় না। স্বপ্নের আক্রোশে সমস্ত মনটা যেমন বুকের কাছে গুমরে ঠেলে ঠেলে উঠতে থাকে, আর রুদ্ধকণ্ঠের বদ্ধবাণী কান্না হয়ে হা হা করে ফেটে পড়তে চায়, ওই ফেনিয়ে-ওঠা বোবার গর্জন শুনে বৃষ্টিধারায়-পাণ্ডুবর্ণ সমুদ্রকে তেমনি বোধ হচ্ছে একটা অতলস্পর্শ অক্ষম ক্ষোভের দুঃস্বপ্ন।

যাত্রার মুখে এইরকম দুর্যোগকে কুলক্ষণ বলে মনটা ম্লান হয়ে যায়। আমাদের বুদ্ধিটা পাকা, সে একেলে, লক্ষণ-অলক্ষণ মানে না ; আমাদের রক্তটা কাঁচা, সে আদিম-কালের— তার ভয়ভাবনাগুলো তর্কবিচারকে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ঝেঁকে ওঠে, ওই পাথরের বেড়ার ওপারের অবুঝ ঢেউগুলোরই মতো। বুদ্ধি আপন যুক্তির কেল্লার মধ্যে বিশ্ব-প্রকৃতির যতরকম ভাষাহীন আভাস-ইঙ্গিতের স্পর্শ থেকে সরে বসে থাকে। রক্ত থাকে আপন বুদ্ধির বেড়ার বাইরে ; তার উপর মেঘের ছায়া পড়ে, ঢেউয়ের দোলা লাগে ; বাতাসের বাঁশিতে তাকে নাচায়, আলো-আঁধারের ইশারা থেকে সে কত কী মানে বের করে ; আকাশে যখন অপ্রসন্নতা তখন তার আর শান্তি নেই।

অনেকবার দূরদেশে যাত্রা করেছি, মনের নোঙরটা তুলতে খুব বেশি টানাটানি করতে হয় নি। এবার সে কিছু যেন জোরে ডাঙা আঁকড়ে আছে। তার থেকে বোধ হচ্ছে, এতদিন পরে আমার বয়স হয়েছে। না-চলতে চাওয়া প্রাণের কৃপণতা, সঞ্চয় কম হলে খরচ করতে সংকোচ হয়।

তবু মনে জানি, ঘাটের থেকে কিছু দূরে গেলেই এই পিছুটানের বাঁধন খসে যাবে। তরুণ পথিক বেরিয়ে আসবে রাজপথে। এই তরুণ একদিন গান গেয়েছিল, "আমি

চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।" আজই সেই গান কি উজান হাওয়ায় ফিরে গেল। সাগরপারে যে-অপরিচিতা আছে তার অবগুণ্ঠন মোচন করবার জন্যে কি কোনো উৎকণ্ঠা নেই।

কিছুদিন আগে চীন থেকে আমার কাছে নিমন্ত্রণ এসেছিল। সেখানকার লোকে আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চেয়েছিল— কোনো পাকা কথা। অর্থাৎ, সে নিমন্ত্রণ প্রবীণকে নিমন্ত্রণ।

দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এবার আমার নিমন্ত্রণ এল, তাদের শতবার্ষিক উৎসবে যোগ দেবার জন্যে। তাই হালকা হয়ে চলেছি, আমাকে প্রবীণ সাজতে হবে না। বক্তৃতা যত করি তার কুয়াশার মধ্যে আমি আপনি ঢাকা পড়ে যাই। সে তো আমার কবির পরিচয় নয়।

গুটির থেকে প্রজাপতি বেরয় তার নিজের স্বভাবে। গুটির থেকে রেশমের সুতো বেরতে থাকে বস্তুতত্ত্ববিদের টানাটানিতে। তখন থেকে প্রজাপতির অবস্থা শোকাবহ। আমার মাঝবয়স পেরিয়ে গেলে পর আমি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গেলুম; সেখানে আমাকে ধরে-বেঁধে বক্তৃতা করালে, তবে ছাড়লে। তার পর থেকে হিতকথার আসরে আমার আনাগোনার আর অন্ত নেই। আমার কবির পরিচয়টা গৌণ হয়ে গেল। পঞ্চাশ বছর কাটিয়েছিলুম সংসারের বেদরকারি মহলে বেসরকারি ভাবে; মনুর মতে যখন বনে যাবার সময় তখন হাজির হতে হল দরকারের দরবারে। সভা সমিতি আমার কাছে সরকারি কাজ আদায় করতে লেগে গেল। এতেই বোধ হচ্ছে, আমার শনির দশা।

কবি হন বা কলাবিৎ হন তাঁরা লোকের ফরমাশ টেনে আনেন— রাজার ফরমাশ, প্রভুর ফরমাশ, বহুপ্রভুর সমাবেশরূপী সাধারণের ফরমাশ। ফরমাশের আক্রমণ থেকে তাঁদের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নেই। তার একটা কারণ, অন্দরে তাঁরা মানেন সরস্বতীকে, সদরে তাঁদের মেনে চলতে হয় লক্ষ্মীকে। সরস্বতী ডাক দেন অমৃতভাণ্ডারে, লক্ষ্মী ডাক দেন অন্নের ভাণ্ডারে। শ্বেতপদ্মের অমরাবতী আর সোনার পদ্মের অলকাপুরী ঠিক পাশা-পাশি নেই। উভয়ত্রই যাদের ট্যাক্সো দিতে হয়, এক জায়গায় খুশি হয়ে, আরেক জায়গায় দায়ে প'ড়ে, তাদের বড়ো মুশকিল। জীবিকা অর্জনের দিকে সময় দিলে ভিতরমহলের কাজ চলে না। যেখানে ট্রামের লাইন বসাতে হবে সেখানে ফুলের বাগানের আশা করা মিথ্যে। এই কারণে ফুলবাগানের সঙ্গে আপিসের রাস্তার একটি আপস হয়েছে এই যে, মালি জোগাবে ফুল আর ট্রামলাইনের মালেক জোগাবে অন্ন। দুর্ভাগ্যক্রমে যে-মানুষ অন্ন জোগায় মর্তলোকে তার প্রতাপ বেশি। কারণ, ফুলের শখ পেটের জ্বালার সঙ্গে জবরদস্তিতে সমকক্ষ নয়।

শুধু কেবল অন্ন-বস্ত্র আশ্রয়ের সুযোগটাই বড়ো কথা নয়। ধনীদের যে-টাকা তার জন্যে তাদের নিজের ঘরেই লোহার সিন্দুক আছে, কিন্তু গুণীদের যে-কীর্তি তার খনি যেখানেই থাক্ তার আধার তো তাদের নিজের মনের মধ্যেই নয়। সে-কীর্তি সকল কালের, সকল মানুষের। এইজন্য তার এমন একটি জায়গা পাওয়া চাই যেখান থেকে সকল দেশকালের সে গোচর হতে পারে। বিক্রমাদিত্যের রাজসভার মঞ্চের উপর যে-কবি ছিলেন সেদিনকার ভারতবর্ষে তিনি সকল রসিকমণ্ডলীর সামনে দাঁড়াতে পেরেছিলেন ; গোড়াতেই তাঁর প্রকাশ আচ্ছন্ন হয় নি। প্রাচীনকালে অনেক ভালো কবির ভালো কাব্যও দৈবক্রমে এইরকম উঁচু ডাঙাতে আশ্রয় পায় নি ব'লে কালের বন্যাস্রোতে ভেসে গেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ কথা মনে রাখতে হবে, যাঁরা যথার্থ গুণী তাঁরা একটি সহজ কবচ নিয়ে পৃথিবীতে আসেন। ফরমাশ তাঁদের গায়ে এসে পড়ে, কিন্তু মর্মে এসে বিদ্ধ হয় না। এইজন্যেই তাঁরা মারা যান না, ভাবীকালের জন্যে টিঁকে থাকেন। লোভে প'ড়ে ফরমাশ যারা সম্পূর্ণ স্বীকার করে নেয় তারা তখনই বাঁচে, পরে মরে। আজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অনেকগুলিকেই কালের ভাঙাকুলো থেকে খুঁটে বের করবার জো নেই। তাঁরা রাজার ফরমাশ পুরোপুরি খেটেছিলেন, এইজন্যে তখন হাতে হাতে তাঁদের নগদ পাওনা নিশ্চয়ই আর-সকলের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু, কালিদাস ফরমাশ খাটতে অপটু ছিলেন বলে দিঙ্‌নাগের স্থূল হস্তের মার তাঁকে বিস্তর খেতে হয়েছিল। তাঁকেও দায়ে পড়ে মাঝে মাঝে ফরমাশ খাটতে হয়েছে, তার প্রমাণ পাই মালবিকাগ্নিমিত্রে। যে দুই তিনটি কাব্যে কালিদাস রাজাকে মুখে বলেছিলেন "যে আদেশ, মহারাজ। যা বলছেন তা-ই করব" অথচ সম্পূর্ণ আরেকটা কিছু করেছেন, সেইগুলির জোরেই সেদিনকার রাজসভার অবসানে তাঁর কীর্তিকলাপের অন্ত্যেষ্টিসংকার হয়ে যায় নি— চিরদিনের রসিকসভায় তাঁর প্রবেশ অবারিত হয়েছে।

মানুষের কাজের দুটো ক্ষেত্র আছে— একটা প্রয়োজনের, আর-একটা লীলার। প্রয়োজনের তাগিদ সমস্তই বাইরের থেকে, অভাবের থেকে ; লীলার তাগিদ ভিতর থেকে, ভাবের থেকে। বাইরের ফরমাশে এই প্রয়োজনের আসর সরগরম হয়ে ওঠে, ভিতরের ফরমাশে লীলার আসর জমে। আজকের দিনে জনসাধারণ জেগে উঠেছে ; তার ক্ষুধা বিরাট, তার দাবি বিস্তর। সেই বহুরসনাধারী জীব তার বহুতরো ফরমাশে মানবসংসারকে রাত্রিদিন উদ্যত করে রেখেছে ; কত তার আস্‌বাব আয়োজন, পাইক বরকন্দাজ, কাড়া-নাকড়া-ঢাকঢোলের তুমুল কলরব— তার "চাই চাই" শব্দের গর্জনে স্বর্গমর্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এই গর্জনটা লীলার আসরেও প্রবেশ করে দাবি প্রচার

করতে থাকে যে, "তোমাদের বীণা, তোমাদের মৃদঙ্গও আমাদের জয়যাত্রার ব্যাণ্ডের সঙ্গে মিলে আমাদের কল্লোলকে ঘনীভূত করে তুলুক।" সেজন্যে সে খুব বড়ো মজুরি আর জাঁকালো শিরোপা দিতেও রাজি আছে। আগেকার রাজসভার চেয়ে সে হাঁকও দেয় বেশি দামও দেয় বেশি। সেইজন্যে ঢাকির পক্ষে এ সময়টা সুসময়, কিন্তু বীণকারের পক্ষে নয়। ওস্তাদ হাত জোড় করে বলে, "তোমাদের হট্টগোলের কাজে আমার স্থান নেই; অতএব বরঞ্চ আমি চুপ করে থাকতে রাজি আছি, বীণাটা গলায় বেঁধে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মরতেও রাজি আছি, কিন্তু আমাকে তোমাদের সদররাস্তায় গড়ের বাদ্যের দলে ডেকো না। কেননা, আমার উপরওয়ালার কাছ থেকে তাঁর গানের আসরের জন্যে পূর্ব হতেই বায়না পেয়ে বসে আছি।" এতে জনসাধারণ নানাপ্রকার কটু সম্ভাষণ করে, সে বলে, "তুমি লোকহিত মান না, দেশহিত মান না, কেবল আপন খেয়ালকেই মান।" বীণকার বলতে চেষ্টা করে, "আমি আমার খেয়ালকেও মানি নে, তোমার গরজকেও মানি নে, আমার উপরওয়ালাকে মানি।" সহস্ররসনাধারী গর্জন করে বলে ওঠে, "চুপ!"

জনসাধারণ বলতে যে প্রকাণ্ড জীবকে বোঝায় স্বভাবতই তার প্রয়োজন প্রবল এবং প্রভূত। এইজন্যে স্বভাবতই প্রয়োজনসাধনের দাম তার কাছে অনেক বেশি, লীলাকে সে অবজ্ঞা করে। ক্ষুধার সময়ে বকুলের চেয়ে বার্তাকুর দাম বেশি হয়। সেজন্যে ক্ষুধাতুরকে দোষ দিই নে; কিন্তু বকুলকে যখন বার্তাকুর পদ গ্রহণ করবার জন্যে করমাশ আসে তখন সেই ফরমাশকেই দোষ দিই। বিধাতা ক্ষুধাতুরের দেশেও বকুল ফুটিয়েছেন, এতে বকুলের কোনো হাত নেই। তার একটিমাত্র দায়িত্ব আছে এই যে, যেখানে যা-ই ঘটুক, তাকে কারো দরকার থাক্‌ বা না থাক্‌, তাকে বকুল হয়ে উঠতেই হবে; ঝরে পড়ে তো পড়বে, মালায় গাঁথা হয়তো তা-ই সই। এই কথাটাকেই গীতা বলেছেন, "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।" দেখা গেছে, স্বধর্মে জগতে খুব মহৎ লোকেরও নিধন হয়েছে, কিন্তু সে নিধন বাইরের, স্বধর্ম ভিতরের দিক থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছে। আর এও দেখা গেছে, পরধর্মে খুব ক্ষুদ্র লোকেও হঠাৎ বড়ো হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার নিধন ভিতরের থেকে, যাকে উপনিষদ্‌ বলেন "মহতী বিনষ্টিঃ"।

যে-ব্যক্তি ছোটো তারও স্বধর্ম বলে একটি সম্পদ আছে। তার সেই ছোটো কৌটোটির মধ্যেই সেই স্বধর্মের সম্পদটিকে রক্ষা করে সে পরিত্রাণ পায়। ইতিহাসে তার নাম থাকে না, হয়তো তার বদনাম থাকতেও পারে, কিন্তু তার অন্তর্যামীর খাস-দরবারে তার নাম থেকে যায়। লোভে পড়ে স্বধর্ম বিকিয়ে দিয়ে সে যদি পরধর্মের

ডঙ্কা বাজাতে যায় তবে হাটে বাজারে তার নাম হবে। কিন্তু, তার প্রভুর দরবার থেকে তার নাম খোওয়া যাবে।

এই ভূমিকার মধ্যে আমার নিজের কৈফিয়ত আছে। কখনো অপরাধ করি নি তা নয়। সেই অপরাধের লোকসান ও পরিতাপ তীব্র বেদনায় অনুভব করেছি ব'লেই সাবধান হই। ঝড়ের সময় ধ্রুবতারাকে দেখা যায় না ব'লে দিক্‌ভ্রম হয়। এক এক সময়ে বাহিরের কল্লোলে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে স্বধর্মের বাণী স্পষ্ট করে শোনা যায় না। তখন 'কর্তব্য' নামক দশমুখ-উচ্চারিত একটা শব্দের হুঙ্কারে মন অভিভূত হয়ে যায়; ভুলে যাই যে, কর্তব্য বলে একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থ নেই, আমার 'কর্তব্য'ই হচ্ছে আমার পক্ষে কর্তব্য। গাড়ির চলাটা হচ্ছে একটা সাধারণ কর্তব্য, কিন্তু ঘোরতর প্রয়োজনের সময়েও ঘোড়া যদি বলে "আমি সারথির কর্তব্য করব", বা চাকা বলে "ঘোড়ার কর্তব্য করব", তবে সেই কর্তব্যই ভয়াবহ হয়ে ওঠে। ডিমক্রেসির যুগে এই উড়ে-পড়া পড়ে-পাওয়া কর্তব্যের ভয়াবহতা চারি দিকে দেখতে পাই। মানবসংসার চলবে, তার চলাই চাই; কিন্তু তার চলার রথের নানা অঙ্গ— কর্মীরাও একরকম করে তাকে চালাচ্ছে, গুণীরাও একরকম ক'রে তাকে চালাচ্ছে, উভয়ের স্বানুবর্তিতাতেই পরস্পরের সহায়তা এবং সমগ্র রথের গতিবেগ, উভয়ের কর্ম একাকার হয়ে গেলেই মোট কর্মটাই পঙ্গু হয়ে যায়।

এই উপলক্ষে একটি কথা আমার মনে পড়ছে। তখন লোকমান্য টিলক বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর কোনো এক দূতের যোগে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন, আমাকে য়ুরোপে যেতে হবে। সে সময়ে নন্‌-কো-অপারেশন আরম্ভ হয় নি বটে কিন্তু পোলিটিকাল আন্দোলনের তুফান বইছে। আমি বললুম, "রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কাজে যোগ দিয়ে আমি য়ুরোপে যেতে পারব না।" তিনি বলে পাঠালেন, আমি রাষ্ট্রিক চর্চায় থাকি, এ তাঁর অভিপ্রায়বিরুদ্ধ। ভারতবর্ষের যে-বাণী আমি প্রচার করতে পারি সেই বাণী বহন করাই আমার পক্ষে সত্য কাজ, এবং সেই সত্য কাজের দ্বারাই আমি ভারতের সত্য সেবা করতে পারি। আমি জানতুম, জনসাধারণ টিলককে পোলিটিকাল নেতারূপেই বরণ করেছিল এবং সেই কাজেই তাঁকে টাকা দিয়েছিল। এইজন্য আমি তাঁর পঞ্চাশহাজার টাকা গ্রহণ করতে পারি নি। তার পরে, বোম্বাই-শহরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে পুনশ্চ বললেন, "রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপার থেকে নিজেকে পৃথক রাখলে তবেই আপনি নিজের কাজ সুতরাং দেশের কাজ করতে পারবেন; এর চেয়ে বড়ো আর কিছু আপনার কাছে প্রত্যাশাই করি নি।" আমি বুঝতে পারলুম, টিলক যে গীতার ভাষ্য করেছিলেন সে কাজের অধিকার তাঁর ছিল; সেই অধিকার মহৎ অধিকার।

অনেক ধনী আছে যারা নিজের ভোগেই নিজের অর্থের ব্যয় ও অপব্যয় করে থাকে। সাধারণের দাবি তাদের ভোগের তহবিলে যদি ভাঙন ধরাতে পারে তাতে দুঃখের কথা কিছুই নেই। অবকাশ পদার্থটা হচ্ছে সময়ধন— সংসারী এই ধনটাকে নিজের ঘরসংসারের চিন্তায় ও কাজে লাগায়, আর কুঁড়ে যে সে কোনো কাজেই লাগায় না। এই সংসারী বা কুঁড়ের অবকাশের উপর লোকহিতের দোহাই দিয়ে উপদ্রব করলে দোষের হয় না। আমার অবকাশের অনেকটা অংশ আমি কুঁড়েমিতেই খাটাই, বাইরে থেকে কেউ কেউ এমন সন্দেহ করে। এ কথাটা জানে না যে, কুঁড়েমিটাই আমার কাজের প্রধান অঙ্গ। পেয়ালার যতটা চীনেমাটি দিয়ে গড়া ততটাই তার প্রধান অংশ নয়, বস্তুত সেটাই তার গৌণ; যতটা তার ফাঁক ততটাই তার মুখ্য অংশ। ওই ফাঁকটাই রসে ভরতি হয়, পোড়া চীনেমাটি উপলক্ষ মাত্র। ঘরের খুঁটিটা যেমন, গাছ ঠিক তেমন জিনিস নয়। অর্থাৎ, সে কেবলমাত্র নিজের তলাটার মাটিতেই দাঁড়িয়ে থাকে না। তার দৃশ্যমান গুঁড়ি যতটুকু মাটি জুড়ে থাকে তার অদৃশ্য শিকড় তার চেয়ে অনেক বেশি মাটি অধিকার করে ব'লেই গাছটা রসের জোগান পায়। আমাদের কাজও সেই গাছের মতো; ফাঁকা অবকাশের তলা থেকে গোপনে সে রস আদায় করে নেয়। দশে মিলে তার সেই বিধিদত্ত অবকাশের লাখেরাজের উপর যদি খাজনা বসায় তা হলে তার সেই কাজটাকেই নিঃস্ব করা হতে থাকে। এইজন্যেই দেশের সমস্ত সাময়িক পত্রে হরির লুঠের জোগান দেবার জন্যে অন্য কোনো দেশেই কবিকে নিয়ে এমনতরো টানাহেঁচড়া করে না।

আমাদের দেশের গার্হস্থ্য ব্যাকরণে যাঁরা কর্তা তাঁদের প্রধান পরিচয় ক্রিয়াকর্মে। লোকে তাঁদের দশকর্মা বলে। সেই গার্হস্থ্যে আবার এমন সব লোক আছে যারা অকর্মা; তারা কেবল ফাইফরমাশ খাটে। কাজের চেয়ে অকাজে তাদের বেশি দরকার। অর্থাৎ, তাস খেলবার যখন জুড়ি না জোটে তখন তাদের ডাক পড়ে, আর দূর-সম্পর্কের জ্যাঠাইমার গঙ্গাযাত্রার সময় তারাই প্রধান সহায়।

আমাদের শাস্ত্রে গৃহস্থ-আশ্রমের উপর আরণ্য-আশ্রমের বিধি। বর্তমানকালে এই শেষের আশ্রম বাদ পড়েছে; আরণ্য-আশ্রম নেই, কিন্তু তার জায়গা জুড়েছে সাধারণ্য-আশ্রম। এখন দেশে আরণ্যক পাওয়া যায় না, কিন্তু সাধারণ্যকের সংখ্যা কম নয়। তাঁরা পাব্লিক নামক বৃহৎ সংসারের ঘোরতর সংসারী।

শেষোক্ত সংসারেও দুই দলের লোক আছেন। একদল দশকর্মা, আর-একদল অকর্মা; যাঁদের ইংরেজিতে লীডার বলে আমি তাঁদের বলতে চাই কর্তাব্যক্তি। কেউ বা বড়ো-কর্তা, কেউ বা মেজো-কর্তা, কেউ বা ছোটো-কর্তা। এই কর্তারা নিত্য-সভা,

নৈমিত্তিক-সভা, যুদ্ধ-সভা, শ্রাদ্ধ-সভা প্রভৃতিতেই সর্বদাই ব্যস্ত ; তা ছাড়া আছে সাময়িক পত্র, অসাময়িক পত্র, চাঁদার খাতা, বার্ষিক বিবরণী। আর, যাঁরা এই সাধারণ্য আশ্রমের কর্তাব্যক্তি নন, ক্রিয়াকর্ম তাঁদের অধীন নয়, তাঁরা থাকেন চ-বৈ-তু-হি নিয়ে ; যত রকম জোড়াতাড়া দেওয়ার কাজে তাঁদের ডাক ; হঠাৎ ফাঁক পড়লে সেই ফাঁক উপস্থিতমতো তাঁরা পূরণ করে থাকেন। তাঁরা ভলান্টীয়ারি করেন, চৌকি সাজান, চাঁদা সাধেন, করতালিঘাতে সভার উৎসাহবৃদ্ধি করেন, কখনো বা অপঘাতে সভার অকাল-সমাপ্তি-সাধনেও যোগ দেন।

পাব্লিক শহরে কর্তৃপদ হাটে ঘাটে মেলে না, আর সাবধানে তাদের ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু অব্যয় পদের ছড়াছড়ি— এই জন্যে অব্যয়ের অপব্যয় সর্বদাই ঘটে। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ ছন্দপূরণের কাজে তাদের অস্থানে তলব পড়ে ; তাতে মাত্রা রক্ষা হয় এই মাত্র, তার বেশি কিছু না ; যেন কুলীনকন্যার কলাগাছের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া।

বর্তমান বয়সে আমার জীবনের প্রধান সংকট এই যে, যদিচ স্বভাবত আমি আরণ্যক তবু আমার কর্মস্থানের কুগ্রহ সকৌতুকে আমাকে সাধারণ্যক করে দাঁড় করিয়েছেন। দীর্ঘকাল আমার জীবন কেটেছে কোণে, কাব্যরচনায় ; কখন একসময় বিধাতার খেয়ালের খেয়া আমাকে পৌঁছে দিয়েছে জনতার ঘাটে— এখন অকাব্যসাধনে আমার দিন কাটছে। এখন আমি পাব্লিকের কর্মক্ষেত্রে। কিন্তু হাঁস যখন চলে তখন তার নড়বড়ে চলন দেখেই বোঝা যায় তার পায়ের তেলো ডাঙায় চলবার জন্যে নয়, জলে সাঁতার দেবার জন্যেই। তেমনি পাব্লিক ক্ষেত্রে আমার পদচারণভঙ্গি আমার অভ্যাস-দোষে অথবা বিধাতার রচনাগুণে আজ পর্যন্ত বেশ সুসংগত হয় নি।

এখানে কর্তৃপদে আমার যোগ্যতা নেই, যাকে অব্যয়পদ বলেছি তার কাজেও পদে পদে বিপদ ঘটে। ভলান্টীয়ারি করবার বয়স গেছে ; দুর্দিনের তাড়নায় চাঁদার খাতা নিয়ে ধনপতিদের অর্গলবদ্ধ দ্বারে অনর্গল ঘুরে বেড়াতে হয়, তাতে অঙ্কপাত যা হয় তার চেয়ে অশ্রুপাত হয় অনেক বেশি। তার পরে, গ্রন্থের ভূমিকা লেখবার জন্যে অনুরোধ আসে ; গ্রন্থকার অভিমতের দাবি করে গ্রন্থ পাঠান ; কেউ বা অনাবশ্যক পত্র লেখেন, ভিতরে মাশুল দিয়ে দেন জবাব লেখবার জন্যে আমাকে দায়ী করবার উদ্দেশ্যে ; নবপ্রসূত কুমারকুমারীদের পিতামাতারা তাঁদের সন্তানদের জন্যে অভূতপূর্ব নূতন নাম চেয়ে পাঠান ; সম্পাদকের তাগিদ আছে ; পরিণয়োৎসুক যুবকদের জন্যে নূতন-রচিত গান চাই ; কী উপায়ে নোবেলপ্রাইজ অর্জন করতে হয় সে সম্বন্ধে পরামর্শের আবেদন আসে ; দেশের হিতচেষ্টায় পত্রলেখকের সঙ্গে কেন আমার মতের কিছুমাত্র পার্থক্য

ঘটে তার জবাবদিহির জন্যে সাক্রোশ তলব পড়ে। এই-সমস্ত উত্তেজনায় প্রতিনিয়ত যে সকল কর্ম জমিয়ে তুলছি আবর্জনামোচনে কালের সম্মার্জনী সুপটু বলেই বিধাতার কাছে সেজন্যে মার্জনা আশা করি। সভাকর্তৃত্বের কাজেও মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়ে। যখন একান্ত কাব্যরসে নিমগ্ন ছিলুম তখন এ বিপদ আমার ছিল না। রাখালকে কেউ ভুলেও রাজসিংহাসনে আমন্ত্রণ করে না, এইজন্যেই বটতলায় সে বাঁশি বাজাবার সময় পায়। কিন্তু, যদি দৈবাৎ কেউ করে বসে, তা হলে পাঁচনিকে রাজদণ্ডের কাজে লাগাতে গিয়ে রাখালি এবং রাজত্ব দুয়েরই বিঘ্ন ঘটে। কাব্যসরস্বতীর সেবক হয়ে গোলেমালে আজ গণপতির দরবারের তকমা পরে বসেছি; তার ফলে কাব্যসরস্বতী আমাকে প্রায় জবাব দিয়েছেন, আর গণপতির বাহনটি আমার সকল কাজেরই ছিদ্র অন্বেষণ করছেন।

ফরমাশের শরশয্যাশায়ী হবার ইচ্ছা আমার কেন নেই, সেই কথাটা এই উপলক্ষে জানালুম। যেখানে দশে মিলে কাজ সেখানে আমার অবকাশের সব গোরু বাছুর বেচে খাজনা জোগাবার তলবে কেন আমি সিভিল অথবা আন্‌সিভিল ডিস্‌-ওবিডিয়েন্সের নীতি অবলম্বন করতে চেষ্টা করি তার একটা কৈফিয়ত দেওয়া গেল। সব সময়ে অনুরোধ উপরোধ এড়িয়ে উঠতে পারি নি, তার কারণ আমার স্বভাব দুর্বল। পৃথিবীতে যাঁরা বড়োলোক তাঁরা রাশভারি শক্তলোক; মহৎ সম্পদ অর্জন করবার লক্ষ্যপথে যথাযোগ্য স্থানে যথোচিত দৃঢ়তার সঙ্গে "না" বলবার ক্ষমতাই তাঁদের পাথেয়। মহৎ সম্পদকে রক্ষা করবার উপলক্ষে রাশভারি লোকেরা "না"-মন্ত্রের গণ্ডিটা নিজের চারি দিকে ঠিক জায়গায় মোটা করে টেনে দিতে পারেন। আমার সে মহত্ত্ব নেই, পেরে উঠি নে; হাঁ-না দুই নৌকার উপর পা দিয়ে দুলতে দুলতে হঠাৎ অগাধ জলের মধ্যে গিয়ে পড়ি। তাই একান্ত মনে আজ প্রার্থনা করি, "ওগো না-নৌকোর নাবিক, আমাকে জোরের সঙ্গে তোমার নৌকোয় টেনে নিয়ে একেবারে মাঝদরিয়ায় পাড়ি দাও— অকাজের ঘাটে আমার তলব আছে, দোটানায় পড়ে যেন বেলা বয়ে না যায়!"

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪

কাল সমস্ত দিন জাহাজ মাল বোঝাই করছিল। রাত্রে যখন ছাড়ল তখন বাতাসের আক্ষেপ কিছু শান্ত। কিন্তু, তখনো মেঘগুলো দল পাকিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ সকালে একখানা ভিজে অন্ধকারে আকাশ ঢাকা। এবার আলোকের অভিনন্দন পেলুম না। শরীরমনও ক্লান্ত।

জাহাজটা তীর থেকে যেন একটুকরো সংসার ছিন্ন করে নিয়ে ভেসে চলেছে।

ডাঙায় মানুষে মানুষে ফাঁক থাকবার অবকাশ আছে ; এখানে জায়গা অল্প, ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে হয়। কিন্তু, তবু পরস্পর পরিচয় কত কঠিন। প্রত্যেকবার জাহাজে ওঠবার আগে এই চিন্তাটি মনকে পীড়া দেয়, এই নৈকট্যের দূরত্ব, এই সঙ্গবিহীন সাহচর্য।

আদিম অবস্থায় মানুষ যে-বাসা বাঁধে তার দেয়াল পাতলা ; তার ছিটে বেড়ায় যথেষ্ট ফাঁক, ঝাঁপটা ঠেলে ফেলে ঘরে ঢোকা সহজ। কালক্রমে বাসা বাঁধবার নৈপুণ্য তার যতই বেড়ে ওঠে, ততই ইঁটকাঠ লোহাপাথরে ঘরের দেয়াল পাকা হয়ে ওঠে, দরজা হয় মজবুত। তার মধ্যে মনের অভ্যেসগুলো হয়ে যায় পাঁচিলে ঘেরা। খাওয়া-পরা শোওয়া-বসা সব-কিছুর জন্যই আড়ালের দরকার হয়। এই আড়ালটা সভ্যতার সর্বপ্রধান অঙ্গ। এইটেকে রচনা ও রক্ষা করতে বিস্তর খরচ লাগছে। ঘর-বাহিরের মাঝখানে মানুষের সহজ-চলাচলের রাস্তায় পদে-পদে নিষেধ।

প্রত্যেক মানুষের একটা সহজ বেড়ার দরকার আছে, নইলে ভিড়ের টানে দশের সঙ্গে মিশে গেলে নিজের বিশেষত্বের সম্পদ ব্যর্থ হয়ে যায়। নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করলে নিজেকে প্রকাশ করাই যায় না। বীজ আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যই মাটির ভিতরে আড়াল খোঁজে ; ফল আপনাকে পরিণত করবার জন্যেই বাহিরের দিকে একটা খোসার পর্দা টেনে দেয়। বর্বর অবস্থায় মানুষের ব্যক্তিগত বিশেষত্বের জোর থাকে না, তার কাজও থাকে কম। এইজন্যেই ব্যক্তি বিশেষের গোপনতার পরিবেষ্টন সৃষ্ট হয়ে ওঠে তার সভ্যতার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু, এই বেড়া জিনিসটার আত্মপ্রাধান্যবোধ ক্রমেই অতিমাত্র বাড়তে থাকে। তখন মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে যে একান্ত প্রয়োজন আছে, সেটা বাধাগ্রস্ত হয়ে অনভ্যস্ত হয়ে ওঠে। সেই আতিশয্যটাই হল বিপদ।

এই মারাত্মক বিপদটা কোন্ অবস্থায় ঘটে। ভোগের আদর্শ অপরিমিত বেড়ে উঠে মানুষের যখন বিস্তর উপকরণের প্রয়োজন, যখন অন্যের জন্যে তার সময় ও সম্বল খরচ করবার বেলায় বিস্তর হিসেব করা অনিবার্য, যখন তার জীবিকার উপাদান উৎপাদন করবার জন্যে প্রভূত আয়োজন চাই, তখন তার সভ্যতার বাহন-বাহিনীর বিপুলতায় তার লোকালয় অতি প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে। জনতার পরিমিত আয়তনেই মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার ঐক্য সম্ভবপর। তাই পল্লীর অধিবাসীরা কেবল যে একত্র হয় তা নয়, তারা এক হয়। শহরের অতিবৃহৎ জনসমাবেশ আপন অতিবিস্তীর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এক-আত্মীয়তার রক্তস্রোত সঞ্চারিত করবার উপযুক্ত হৃৎপিণ্ড তৈরি করে উঠতে পারে না। প্রকাণ্ড জনসঙ্ঘ কাজ চালাবারই যোগ্য, আত্মীয়তা

চালাবার নয়। কারখানা ঘরে হাজার লোকের মজুরি দরকার, পরিবারের মধ্যে হাজার লোকের জটলা হলে তাকে আর গৃহ বলে না। যন্ত্রের মিলন যেখানে সেখানে অনেক লোক, আর অন্তরের মিলন যেখানে সেখানে লোকসংখ্যা কম। তাই শহর মানুষকে বাহিরের দিকে কাছে টানে, অন্তরের দিকে ফাঁক ফাঁক করে রাখে।

আমরা আজন্মকাল সেই দেয়াল-কোটরে ভাগে ভাগে বিভক্ত সভ্য মানুষ। হঠাৎ এসে ঠেসাঠেসি করে মিলেছি এক জাহাজে। মেলবার অভ্যেস মনের মধ্যে নেই। তীর্থে যারা দল বেঁধে রাস্তায় চলে মিলতে তাদের সময় লাগে না ; তারা গাঁয়ের লোক, মেলাই তাদের অভ্যেস। সার্থবাহ যারা মরুর মধ্য দিয়ে উটে চড়ে চলে তারাও মনকে নীরব আড়ালের বুর্‌খা দিয়ে ঢেকে চলে না ; তাদের সভ্যতা ইঁট-পাথরে অমিলকে পাকা করে গেঁথে তোলে নি। কিন্তু, স্টীমারের যাত্রী, রেলগাড়ির প্যাসেঞ্জার বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে আসে তাদের দেয়ালগুলোর সূক্ষ্ম শরীর তাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলতে থাকে।

তাই দেখি, শহরের কলেজে-পড়া ছেলে হঠাৎ দেশাত্মবোধের তাড়ায় যখন খামকা পল্লীর উপকার করতে ছোটে তখন তারা পল্লীবাসীর পাশে এসেও কাছে আসতে পারে না। তারা বেড়ার ভিতর দিয়ে কথা কয়, পল্লীর কানে বাজে যেন আরবি আওড়াচ্ছে।

যা হোক, যদিও শহরে সভ্যতার পাকে আমাদেরকেও খুব কষে টান দিয়েছে, তবু মনের গ্রাম্য অভ্যেস এখনো যায় নি। সময়কে বলতে আরম্ভ করেছি, মূল্যবান, কিন্তু কেউ যদি সে-মূল্য গ্রাহ্য না করে তাকে ঠেকিয়ে রাখবার কোনো ব্যবস্থা আজও তৈরি হয় নি। আমাদের আগন্তুকবর্গ অভিমন্যুর মতো অতি সহজেই ঘরে প্রবেশ করতে জানেন, কিন্তু নির্গমনের পথ যে তাঁরা জানেন সে তাঁদের ব্যবহারে বোঝা যায় না। অত্যন্ত বেগার লোককেও যদি বলা যায়, "কাজ আছে", সে বলে "ঈস ! লোকটা ভারি অহংকারী"। অর্থাৎ, তোমার কাজটা আমাকে দেখা দেওয়ার চেয়েও মহার্ঘ, এ কথা মনে করা স্পর্ধা।

অসুস্থ শরীরে একদিন আমার তিন-তলার ঘরে অর্ধশয়ান অবস্থায় একটা লেখায় নিযুক্ত আছি। আমি নিতান্তই মৃদুস্বভাবের মানুষ ব'লেই আমার সেই অন্দরের ঘরটাকেও আমার বন্ধু, অনতিবন্ধু ও অবন্ধুরা দুর্গম বলে গণ্য করেন না। এইটুকুমাত্র সুবিধা যে, পথটা পুরবাসীদের সকলেরই জানা নেই। খবর এল, একটি ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। অস্বাস্থ্য বা ব্যস্ততার ওজরকে আমাদের ভদ্রলোকেরা শ্রদ্ধা করেন না, তাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লেখা বন্ধ করে নীচে গেলুম। দেখি, একজন কাঁচা-

বয়সের যুবক ; হঠাৎ তার চাদরের অজ্ঞাতবাস থেকে একটা মোটা-গোছের খাতা বেরল। বুঝলুম, আমারই আপন সম্প্রদায়ের লোক। কবিকিশোর একটুখানি হেসে আমাকে বললে, "একটা অপেরা লিখেছি।" আমার মুখে বোধ হয় একটা পাংশুবর্ণ ছায়া পড়ে থাকবে, তাই হয়তো আশ্বাস দেবার জন্যে বলে উঠল, "আপনাকে আর কিছুই করতে হবে না, কেবল গানের কথাগুলোতে সুর বসিয়ে দেবেন, সবসুদ্ধ পঁচিশটা গান।" কাতর হয়ে বললুম, "সময় কই!" কবি বললে, "আপনার কতটুকুই বা সময় লাগবে। গান-পিছু বড়ো-জোর আধ ঘণ্টাই হোক।" সময় সম্বন্ধে এর মনের ঔদার্য দেখে হতাশ হয়ে বললুম, "আমার শরীর অসুস্থ।" অপেরা-রচয়িতা বললে, "আপনার শরীর অসুস্থ, এর উপরে আর কী বলব! কিন্তু যদি—"। বুঝলুম প্রবীণ ডাক্তারের সার্টিফিকেট আনলেও নবীন কবি বিচলিত হবে না। কোনো একজন ইংরেজ গ্রন্থকারের ঘরে এই নাট্যের অবতারণা হলে কোন্ ফৌজদারিতে তার যবনিকাপতন হত, সে-কথা মনে করলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

মানুষের ঘরে "দরওয়াজা বন্ধ্" এ কথাটিও কটু, আর তার ঘরে কোথাও পর্দা নেই এটাও বর্বরতা। মধ্যম পন্থাটাই দেখি সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। দুই বিরুদ্ধ শক্তির সমন্বয়েই সৃষ্টি, তাদের একান্ত বিচ্ছেদেই প্রলয়, মানুষ নিজের ব্যবহারক্ষেত্রে এইটেই কেবলই ভোলে আর মার খেয়ে মরে।

সূর্যের উদয়াস্ত আজও বাদলার ছায়ায় ঢাকা পড়ে রইল। মেঘের থলিটার মধ্যে কৃপণ আকাশ তার সমস্ত সোনার আলো এঁটে বন্ধ করে রেখেছে।

২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪

আজ ক্ষণে ক্ষণে রৌদ্র উঁকি মারছে, কিন্তু সে যেন তার গারদের গরাদের ভিতর থেকে। তার সংকোচ এখনো ঘুচল না। বাদল-রাজের কালো-উর্দি-পরা মেঘগুলো দিকে দিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

আচ্ছন্ন সূর্যের আলোয় আমার চৈতন্যের স্রোতস্বিনীতে যেন ভাঁটা পড়ে গেছে। জোয়ার আসবে রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে।

পশ্চিমে, বিশেষত আমেরিকায় দেখেছি, বাপমায়ের সঙ্গে অধিকাংশ বয়স্ক ছেলে-মেয়ের নাড়ীর টান ঘুচে গেছে। আমাদের দেশে শেষ পর্যন্তই সেটা থাকে। তেমনিই দেখেছি, সূর্যের সঙ্গে মানুষের প্রাণের যোগ সে-দেশে তেমন যেন অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করে না। সেই বিরলরৌদ্রের দেশে তারা ঘরে সূর্যের আলো ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে যখন পর্দা, কখনো বা অর্ধেক কখনো বা সম্পূর্ণ নামিয়ে দেয় তখন সেটাকে আমি ঔদ্ধত্য বলে মনে করি।

প্রাণের যোগ নয়তো কী। সূর্যের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে। আমাদের প্রাণমন, আমাদের রূপরস, সবই তো উৎসরূপে রয়েছে ওই মহা-জ্যোতিষ্কের মধ্যে। সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ণ হয়ে ছিল ওরই বহ্নিবাষ্পের মধ্যে। আমার দেহের কোষে কোষে ওই তেজই তো শরীরী, আমার ভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে ওই আলোই তো প্রবহমান। বাহিরে ওই আলোরই বর্ণচ্ছটায় মেঘে মেঘে পত্রে পুষ্পে পৃথিবীর রূপ বিচিত্র; অন্তরে ওই তেজই মানসভাব ধারণ করে আমাদের চিন্তায় ভাবনায় বেদনায় রাগে অনুরাগে রঞ্জিত। সেই এক জ্যোতিরই এত রঙ, এত রূপ, এত ভাব, এত রস। ওই যে-জ্যোতি আঙুরের গুচ্ছে গুচ্ছে এক-এক চুমুক মদ হয়ে সঞ্চিত সেই জ্যোতিই তো আমার গানে গানে সুর হয়ে পুঞ্জিত হল। এখনই আমার চিত্ত হতে এই যে চিন্তা ভাষার ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সে কি সেই জ্যোতিরই একটি চঞ্চল চিন্ময়স্বরূপ নয় যে-জ্যোতি বনস্পতির শাখায় শাখায় স্তব্ধ ওঙ্কারধ্বনির মতো সংহত হয়ে আছে।

হে সূর্য, তোমারই তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় প্রার্থনা ঘাস হয়ে, গাছ হয়ে আকাশে উঠছে, বলছে, জয় হোক! বলছে, অপাবৃণু, ঢাকা খুলে দাও! এই ঢাকা-খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা-খোলাই তার ফুলফলের বিকাশ। অপাবৃণু, এই প্রার্থনারই নির্ঝরধারা আদিম জীবাণু থেকে যাত্রা করে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত, প্রাণের ঘাট পেরিয়ে চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চলল। আমি তোমার দিকে বাহু তুলে বলছি, হে পূষন্, হে পরিপূর্ণ, অপাবৃণু, তোমার হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ খোলো, আমার মধ্যে যে গুহাহিত সত্য তোমার মধ্যে তার অবারিত জ্যোতিঃস্বরূপ দেখে নিই। আমার পরিচয় আলোকে আলোকে উদ্‌ঘাটিত হোক।

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪

আজ মেঘ সম্পূর্ণ কেটে গেছে। আলোকের দাক্ষিণ্য আজ আকাশে বিস্তীর্ণ, রৌদ্রচকিত সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে আজ আমন্ত্রণের ইঙ্গিত। সুরলোকের আতিথ্য থেকে আজ একটুও বঞ্চিত হতে ইচ্ছা করছে না।

আজকের দিনে কি ডায়ারি লিখতে একটুও মন সরে। ডায়ারি লেখাটা কৃপণের কাজ। প্রতিদিন থেকে ছোটোবড়ো কিছুই নষ্ট না হোক, সমস্তই কুড়িয়ে-কুড়িয়ে রাখি, এই ইচ্ছে ওতে প্রকাশ পায়। কৃপণ এগতে চায় না। আগলাতে চায়।

বিধাতা আমাকে মস্ত একটি বর দিয়েছেন, সে হচ্ছে আমার অসামান্য বিস্মরণ-শক্তি। সংবাদের ভাণ্ডারঘরের জিম্মে তিনি আমার হাতে দেন নি। প্রহরীর কাজ আমার নয়; আমাকে আমার মনিব প্রহরে প্রহরে ভুলে যাবার অধিকার দিয়েছেন।

ভুলে যেতে দেওয়া যদি হারিয়ে যেতে দেওয়া হত তা হলে তিনি তেমন বিষম ভুল করতেন না। বসন্ত বারে বারেই তার ফুলের সমারোহ ভুলে গিয়ে শূন্যসাজি হাতে অন্যমনস্ক হয়ে উত্তরের দিকে চলে যায়; সেই ভুলের ফাঁকা রাস্তা দিয়েই ফুলের দল তাদের নবজন্মের সিংহদ্বার খোলা পায়। আমার চৈতন্যের উপরের তলায় আমি এত বেশি ভুলি যে, তাতে আমার প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় ভারি অসুবিধা হয়। কিন্তু, আমার ভোলা সামগ্রীগুলো চৈতন্যের রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে নীচের তলায় নেপথ্যে এসে জড়ো হয়; সেখানে নতুন-নতুন বেশপরিবর্তনের সুযোগ ঘটে। আমার মনটাকে বিধাতা নাট্যশালা করতে ইচ্ছা করেছেন, তাকে তিনি জাদুঘর বানাতে চান না। তাই, জমা করে পাওয়া আমার লোকসান, হারিয়ে হারিয়ে পাওয়াই আমার লাভ। এই হারিয়ে-যাওয়ার ভিতর দিয়ে এক যখন আর সেজে এসে হাজির হয় তখন তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি-ওয়ালা বৈজ্ঞানিক যদি সওয়ালজবাব করতে শুরু করে, তা হলে মুশকিল। তখন বিশ্লেষণের চোটে বেরিয়ে পড়তে পারে, যেটাকে নতুন বলছি সেটা পুরোনো, যেটাকে আমার বলছি সেটা আর-কারো। কিন্তু, সৃষ্টির তো এই লীলা, এই জন্যেই তো তাকে মায়া বলে। কড়া পাহারা বসিয়ে শিশিরবিন্দুর যদি আঁচল ঝাড়া দেওয়া যায় তা হলে বেরিয়ে পড়বে দুটো অদ্ভুত বাষ্প, তাদের নাম যেমন কর্কশ তাদের মেজাজও তেমনি রাগী। কিন্তু, শিশির তবুও স্নিগ্ধ শিশির, তবুও সে মিলনের অশ্রুজলের মতোই মধুর।

কথায় কথায় কথা বেড়ে যায়। বলতে যাচ্ছিলুম, ডায়ারি লেখাটা আমার স্বভাব-সংগত নয়। আমি ভোলানাথের চেলা, ঝুলি বোঝাই করে আমি তথ্য সংগ্রহ করি নে। আমার জলাশয়ের যে-জলটাকে অন্যমনস্ক হয়ে উবে যেতে দিই সেইটেই অদৃশ্য শূন্যপথে মেঘ হয়ে আকাশে জমে, নইলে আমার বর্ষণ বন্ধ।

তা ছাড়া, আমার ব্যক্তিগত জীবনের সব সত্যকেই আমি একটিমাত্র সরকারি বাটখারা দিয়ে ওজন করতে চাই নে। কিন্তু, বিশেষ ঘটনার বিশেষ তুলাদণ্ড তৈরি হয়ে উঠতে সময় লাগে। ঘটনা যখনই ঘটে তখনই সেটাকে পাওয়া যায় না। তখন সরকারি পরিমাপের আদর্শ যেটাকে দেখায় ভারী সেটাই হয়তো হালকা, যেটাকে বুঝি হালকা সেটাই হয়তো ভারী। দীর্ঘকালে আনুষঙ্গিক অনেক বাজে জিনিস ভুলে যাওয়ার ভিতর দিয়েই বিশেষ জিনিসের বিশেষ ওজন পাওয়া যায়।

যারা জীবনচরিত লেখে তারা সমসাময়িক খাতাপত্র থেকে অতিবিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে লেখে; সেই অচল সংবাদগুলো নিজেকে না কমাতে না বাড়াতে পারে। অথচ, আমাদের প্রাণপুরুষ তার তথ্যগুলোকে পদে পদে বাড়িয়ে-কমিয়েই

এগিয়ে চলেছে। অতিবিশ্বাসযোগ্য তথ্য স্তূপাকার করে তা দিয়ে স্মরণস্তম্ভ হতে পারে, কিন্তু জীবনচরিত হবে কী করে। জীবনচরিত থেকে যদি বিস্মরণধর্মী জীবনটাই বাদ পড়ে তা হলে মৃতচরিতের কবরটাকে নিয়ে হবে কী। আমি যদি বোকামি করে প্রতিদিনের ডায়ারি লিখে যেতুম তা হলে তাতে করে হত আমার নিজের স্বাক্ষরে আমার নিজের জীবনের প্রতিবাদ। তা হলে আমার দৈনিক জীবনের সাক্ষ্য আমার সমগ্র-জীবনের সত্যকে মাটি করে দিত।

যে-যুগে রিপোর্টার ছিল না, মানুষ খবরের কাগজ বের করে নি, তখন মানুষের ভুলে যাবার স্বাভাবিক শক্তি কোনো কৃত্রিম বাধা পেত না। তাই তখনকার কালের মধ্যে থেকেই মানুষ আপন চিরস্মরণীয় মহাপুরুষদের পেয়েছে। এখন হতে আমরা তথ্য কুড়ুনে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিচারকদের হাত থেকে প্রতিদিনের মানুষকে পাব, চিরদিনের মানুষকে সহজে পাব না। বিস্মরণের বৃহৎ ভিতরের উপর স্থাপিত মহাসিংহাসনেই কেবল যাঁদের ধরে, সর্বসাধারণের ঠাসাঠাসি ভিড়ে তাঁদের জন্যে জায়গা হবে না। এখন ক্যামেরাওয়ালা, ডায়ারিওয়ালা, নোটটুকনেওয়ালা অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চারি দিকেই মাচা বেঁধে ব'সে।

ছেলেবেলায় আমাদের অন্তঃপুরের যে-বাগানে বিশ্বপ্রকৃতি প্রত্যহই এক-একটি সূর্যোদয়কে তার নীল থালায় সাজিয়ে এক-একটি বিশেষ উপহারের মতো আমার পুলকিত হৃদয়ের মাঝখানে রেখে দিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসত, ভয় আছে, একদিন আমার কোনো ভাবী চরিতকার ক্যামেরা হাতে সেই বাগানের ফোটোগ্রাফ নিতে আসবে। সে অরসিক জানবেই না, সে-বাগান সেইখানেই যেখানে আছে ইদেনের আদিম স্বর্গোদ্যান। বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের প্রতি উদাসীন আর্টিস্ট সেই স্বর্গে যেতেও পারে, কিন্তু কোনো ক্যামেরাওয়ালার সাধ্য নেই সেখানে প্রবেশ করে— দ্বারে দেবদূত দাঁড়িয়ে আছে জ্যোতির্ময় খড়্গ হাতে।

এত বুদ্ধি যদি আমার, আর এত ভয়, তবে কেন ডায়ারি লিখতে বসেছি। সে-কথা কাল বলব।

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪

যখন কলম্বোতে এসে পৌঁছলুম বৃষ্টিতে দিগদিগন্তর ভেসে যাচ্ছে। গৃহস্থের ঘরে যেদিন শোকের কান্না, যেদিন লোকসানের আলোড়ন, সেদিন তার বাড়িতে আগন্তুকদের অধিকার থাকে না। কলম্বোর অশান্ত আকাশের আতিথ্য সেদিন আমার কাছে তেমনি সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল; মনটা নিজেকে বেশ মেলে দিয়ে বসবার জায়গা পাচ্ছিল না। বাহির জগতের প্রথম গেটটার কাছেই অভ্যর্থনায় ঔদার্যের অভাব দেখে মনে

হল, আমার নিমন্ত্রণের ভূমিকাতেই কোন্ কুগ্রহ এমন করে কালি ঢেলে দিলে। দরজাটা খোলা থাকলে হবে কী, নিমন্ত্রণকর্তার মুখে যে হাসি নেই।

এমন সময়ে এই বিমর্ষ দিনের বিমুখতার মধ্যে একটি বাঙালি ঘরের বালিকার একখানি চিঠি পাওয়া গেল। এই বালিকাই কিছুকাল পূর্বে আমার শিলঙবাসের একটি পত্তময় বর্ণনার জরুরি দাবি করে তাড়া দিয়েছিল। সে দাবি আমি অগ্রাহ্য করি নি। এবার সে আমার এই প্রবাসযাত্রায় মঙ্গলকামনা জানিয়েছে। মনে হল, বাঙালি মেয়ের এই শুভ-ইচ্ছা আমার আজকের দিনের এই বদ্‌মেজাজি ভাগ্যটাকে অনুকূল করে তুলবে।

পুরুষের আছে বীর্য আর মেয়েদের আছে মাধুর্য, এ কথাটা সব দেশেই প্রচলিত। আমরা তার সঙ্গে আরো একটা কথা যোগ করেছি, আমরা বলি মেয়েদের মধ্যে মঙ্গল। অনুষ্ঠানের যে সকল আয়োজন, যে সকল চিহ্ন শুভ সূচনা করে, আমাদের দেশে তার ভার মেয়েদের উপর। নারীশক্তিতে আমরা মধুরের সঙ্গে মঙ্গলের মিলন অনুভব করি। প্রবাসে যাত্রায় বাপের চেয়ে মায়ের আশীর্বাদের জোর বেশি ব'লে জানি। মনে হয়, যেন ঘরের ভিতর থেকে মেয়েদের প্রার্থনা নিয়ত উঠছে দেবতার কাছে, ধূপপাত্র থেকে সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়ার মতো। সে-প্রার্থনা তাদের সিঁদুরের ফোঁটায়, তাদের কঙ্কণে, তাদের উলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনিতে, তাদের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছায়। ভাইয়ের কপালে মেয়েরাই দেয় ভাইফোঁটা। আমরা জানি, সাবিত্রীই মৃত্যুর হাত থেকে স্বামীকে ফিরিয়েছিল। নারীর প্রেমে পুরুষের কেবল যে আনন্দ তা নয়, তার কল্যাণ।

তার মানে, আমরা একরকম ক'রে এই বুঝেছি, প্রেম জিনিসটা কেবল যে একটা হৃদয়ের ভাব তা নয়, সে একটা শক্তি, যেমন শক্তি বিশ্বের ভারাকর্ষণ। সর্বত্রই সে আছে। মেয়েদের প্রেম সেই বিশ্বশক্তিকে সহজে নাড়া দিতে পারে। বিষ্ণুর প্রকৃতিতে যে প্রেমের শক্তি বিশ্বকে পালন করছে সেই শক্তিই তো লক্ষ্মী, বিষ্ণুর প্রেয়সী। লক্ষ্মী সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ভাবকল্পনা আছে তাকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখি নারীর আদর্শে।

লক্ষ্মীতে সৌন্দর্য হচ্ছে পরিপূর্ণতার লক্ষণ। সৃষ্টিতে যতক্ষণ দ্বিধা থাকে ততক্ষণ সুন্দর দেখা দেয় না। সামঞ্জস্য যখন সম্পূর্ণ হয় তখনই সুন্দরের আবির্ভাব।

পুরুষের কর্মপথে এখনো তার সন্ধানচেষ্টার শেষ হয় নি। কোনো কালেই হবে না। অজানার মধ্যে কেবলই সে পথ খনন করছে, কোনো পরিণামের প্রান্তে এসে আজও সে অবকাশ পেলে না। পুরুষের প্রকৃতিতে সৃষ্টিকর্তার তুলি আপন শেষ রেখাটা টানে নি। পুরুষকে অসম্পূর্ণই থাকতে হবে।

নারীপ্রকৃতি আপনার স্থিতিতে প্রতিষ্ঠ। সার্থকতার সন্ধানে তাকে দুর্গম পথে

ছুটতে হয় না। জীবপ্রকৃতির একটা বিশেষ অভিপ্রায় তার মধ্যে চরম পরিণতি পেয়েছে। সে জীবধাত্রী, জীবপালিনী ; তার সম্বন্ধে প্রকৃতির কোনো দ্বিধা নেই। প্রাণসৃষ্টি প্রাণপালন ও প্রাণতোষণের বিচিত্র ঐশ্বর্য তার দেহে মনে পর্যাপ্ত। এই প্রাণসৃষ্টি-বিভাগে পুরুষের প্রয়োজন অত্যল্প, এইজন্যে প্রকৃতির একটা প্রবল তাগিদ থেকে পুরুষ মুক্ত। প্রাণের ক্ষেত্রে ছুটি পেয়েছে ব'লেই চিত্তক্ষেত্রে সে আপন সৃষ্টি-কার্যের পত্তন করতে পারলে। সাহিত্যে কলায় বিজ্ঞানে দর্শনে ধর্মে বিধিব্যবস্থায় মিলিয়ে যাকে আমরা সভ্যতা বলি সে হল প্রাণপ্রকৃতির পালাতক ছেলে পুরুষের সৃষ্টি।

তানের বেগে চঞ্চল গান তার সুরসজ্জের প্রবাহ বহন করে ছোটবার সময় যেমন নিজের কল্যাণের জন্যেই একটা মূল লয়ের মূল সুরের স্থিতির দিকে সর্বদাই ভিতরে ভিতরে লক্ষ্য রাখে, তেমনি গতিবেগমত্ত পুরুষের চলমান সৃষ্টি সর্বদাই স্থিতির একটা মূল সুরকে কানে রাখতে চায় ; পুরুষের শক্তি তার অসমাপ্ত সাধনার ভার বহন ক'রে চলবার সময় সুন্দরের প্রবর্তনার অপেক্ষা রাখে। সেই স্থিতির ফুলই হচ্ছে নারীর মাধুর্য, সেই স্থিতির ফলই হচ্ছে নারীর মাঙ্গল্য, সেই স্থিতির সুরই হচ্ছে নারীর শ্রীসৌন্দর্য।

নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।

এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি ; ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে।

এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল ; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর ; প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারী-শক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।

যে কথাটা বলতে শুরু করেছিলুম সে হচ্ছে এই যে পুরুষের অধ্যবসায়ের কোথাও

সমাপ্তি নেই, এইজন্যেই সুসমাপ্তির সুধারসের জন্যে তার অধ্যবসায়ের মধ্যে একটা প্রবল তৃষ্ণা আছে। মেয়েদের হৃদয়ের মাধুর্য এই রসই তাকে পান করায়। পুরুষের সংসারে কেবলই চিন্তার দ্বন্দ্ব, সংশয়ের দোলা, তর্কের সংঘাত, ভাঙাগড়ার আবর্তন— এই নিরন্তর প্রয়াসে তার ক্ষুব্ধ দোলায়িত চিত্ত প্রাণলোকের সরল পরিপূর্ণতার জন্যে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হয়ে থাকে। মেয়েদের মধ্যে সেই প্রাণের লীলা। বাতাসে লতার আন্দোলনের মতো, বসন্তের নিকুঞ্জে ফুল ফোটবার মতোই এই লীলা সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত; চিন্তাক্লিষ্ট চিত্তের পক্ষে পূর্ণতার এই প্রাণময়ী মূর্তি নিরতিশয় রমণীয়। এই সুসমাপ্তির সৌন্দর্য, এই প্রাণের সহজ বিকাশ পুরুষের মনে কেবল যে তৃপ্তি আনে তা নয়, তাকে বল দেয়, তার সৃষ্টিকে অভাবনীয় রূপে উদ্‌ঘাটিত করে দিতে থাকে। আমাদের দেশে এইজন্যে পুরুষের সাধনায় মেয়েকে শক্তি বলে স্বীকার করে। কর্মের প্রকাশ্য ক্ষেত্রে এই শক্তিকে দেখি নে; ফুলকে দেখি প্রত্যক্ষ কিন্তু যে গূঢ় শক্তিতে সেই ফুল ফোটায় তাকে কোথাও ধরা-ছোঁওয়া যায় না। পুরুষের কীর্তিতে মেয়ের শক্তি তেমনি নিগূঢ়।

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪

যে মেয়েটি আমাকে শুভ-ইচ্ছা জানিয়ে চিঠি লিখেছিল তার চিঠিতে একটি অনুরোধ ছিল, "আপনি ডায়ারি লিখবেন।" তখনই জবাব দিলুম, "না, ডায়ারি লিখব না।" কিন্তু, মুখ দিয়ে একটা কথা বেরিয়ে গেছে ব'লেই যে সেই কথাটা অটল সত্যের গৌরব লাভ করবে এতবড়ো অহংকার আমার নেই।

তার পর চব্বিশে তারিখে জাহাজে উঠলুম। বাদলার হাওয়া আরো যেন রেগে উঠল; সে যেন একটা অদৃশ্য প্রকাণ্ড সাপের মতো জাহাজটার উপর ক্ষণে-ক্ষণে-ছোবল মেরে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। যখন দেখলুম দুর্দৈবের ধাক্কায় মনটা হার মানবার উপক্রম করছে তখন তেড়ে উঠে বললুম, "না, ডায়ারি লিখবই।" কিন্তু, লেখবার আছে কী। কিছুই না, যা-তা লিখতে হবে। সকল লেখার সেরা হচ্ছে যা-তা লেখা। যথেচ্ছাচারের অধিকার রাজার অধিকার।

বিশেষ কোনো-একজনকে চিঠি লেখবার একটা প্রচ্ছন্ন বীথিকা যদি সামনে পাওয়া যেত তা হলে তারই নিভৃতছায়ার ভিতর দিয়ে আমার নিরুদ্দেশ বাণীকে অভিসারে পাঠাতুম। কিন্তু সে বীথিকা আজ নেই। তাই অপরিচিত ক্যাবিনে আলো জেলে নিজের কাছেই নিজে বকতে বসলুম। আলাপের এই অদ্বৈতরূপ আমার পছন্দসই নয়। সংসারে যখন মনের মতো দ্বৈত দুর্লভ হয়ে ওঠে তখনই মানুষ অদ্বৈতসাধনায়

মনকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। কারণ, সকলের চেয়ে দুর্বিপাক হচ্ছে অ-মনের মতো দ্বৈত।

হারুনা-মারু জাহাজ
৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪

আমার ডায়ারিতে মেয়ে-পুরুষের কথা নিয়ে যে আলোচনা ছিল সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে এই যে, "আচ্ছা বোঝা গেল যে, প্রাণের টানে মেয়ে আটকা পড়েছে আর পুরুষ ছুটেছে মনের তাড়ায়। তার পরে, তারা যে প্রেমে মেলে সেটা কি ঠিক একজাতের।"

গোড়াতেই বলে রাখা ভালো যে, প্রাণই বল আর মনই বল, মেয়ে কিম্বা পুরুষের একেবারে নিজস্ব দখলে নেই। অবস্থাগতিকে পক্ষভেদে একটা মুখ্য, অন্যটা গৌণ।

মন জিনিসটা প্রাণের ঘরেই মানুষ, প্রাণের অন্ন খেয়ে; সেই জন্যেই অন্তরে অন্তরে তার একটা অকৃতজ্ঞতা আছে। প্রাণের আনুগত্য ছাড়িয়ে একাধিপত্য করবার জন্যে সে প্রায় মাঝে মাঝে আস্ফালন করে। এই বিদ্রোহটা ভিতরে ভিতরে কম বেশি পরিমাণে প্রায় সব পুরুষের মধ্যেই আছে। প্রাণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে তার কিছু-না-কিছু কসরত এবং কুচকাওয়াজ চলছেই। খামকা প্রাণটাকে ক্লিষ্ট করবার, বিপন্ন করবার লোভ পুরুষের। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার শখটা পুরুষের; তার একমাত্র কারণ ঘরের খাওয়াতে তাকে প্রাণের শাসন মানতে হয় কিন্তু বনের মোষ তাড়ানোতে, প্রাণের প্রতি তার যে রাজভক্তি নেই, এইটে প্রচার করবার একটা উপলক্ষ জোটে— সেটাকে সে পৌরুষ মনে করে। পুরুষ যুদ্ধ করে এসেছে সব সময়ে যে প্রয়োজন আছে বলে তা নয়, কেবল স্পর্ধা ক'রে এইটে দেখাবার জন্যে যে, প্রাণের তাগিদকে সে গ্রাহ্যই করে না। এই জন্যে যুদ্ধ করার মতো এত বড়ো একটা গোঁয়ারের কাজকে পুরুষ চিরকালই অত্যন্ত বেশি সমাদর করেছে; তার কারণ এ নয় যে, হিংসা করাটাকে সে ভালো মনে করে; তার কারণ এই যে, নানাপ্রকার লোভের ও ভয়ের বন্ধনে প্রাণ তাঁকে বেঁধে রাখবার যে বিস্তৃত আয়োজন করে রেখেছে সেইটেকে সে বিনা প্রয়োজনেও অস্বীকার করতে পারলে গর্ব বোধ করে। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের একটি শিশু বালক আছে, তাকে দেখি, আমাদের বাড়িতে যে জায়গাটা স্থিতির পক্ষে সবচেয়ে অযোগ্য, পৃথিবীর ভারাকর্ষণশক্তিটাকে অশ্রদ্ধা জানানো ছাড়া যেখানে ওঠবার আর কোনো হেতুই নেই, সেইখানেই সে চড়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে ভারাকর্ষণশক্তিও তাকে ছেড়ে কথা কয় নি, কিন্তু তবু তাকে দমিয়ে দিতে পারলে না। এমনি করে বিদ্রোহে সে হাত পাকাচ্ছে আর কি।

মনে আছে, ছেলেবেলায় আমাদের তেতালার ছাদের সংকীর্ণ কার্নিসটার উপর দিয়ে চলে যাওয়াটাকে উঁচুদরের খেলা বলে মনে করতুম। ভয় করত না বলে নয়, ভয় করত বলেই। ভয় নামক প্রাণের পাহারাওয়ালাটা ঠিক সেই মোড়ের মাথায় দেখা দিত বলেই তাকে ব্যঙ্গ করাটা মজা বলে মনে হত।

পুরুষের মধ্যে এই যে কাণ্ডটা হয়, এ সমস্তই মনের চক্রান্তে। সে বলে, "প্রাণের সঙ্গে আমার নন্‌-কো-অপারেশন যতই পাকা হবে ততই আমার মুক্তি হবে সহজ।" কেন রে বাপু, প্রাণ তোমার কী অপরাধটা করেছে, আর এই মুক্তি নিয়েই বা করবে কী। মন বলে, "আমি অশেষের রাজ্যে সন্ধান করতে বেরব, আমি দুঃসাধ্যের সাধনা করব, দুর্গমের বাধা কাটিয়ে দিয়ে দুর্লভকে উদ্ধার করে আনব। আমি একটু নড়ে বসতে গেলেই যে-দুঃশাসন নানারকম ভয় দেখিয়ে আমাকে পিছমোড়া করে বাঁধতে আসে তাকে আমি সম্পূর্ণ হার মানাব তবে ছাড়ব।" তাই পুরুষ তপস্বী বলে বসে, "না খেয়েই বা বাঁচা যাবে না কেন। নিশ্বাস বন্ধ করলেই যে মরতে হবে, এমন কী কথা আছে।" শুধু তাই নয়, এর চেয়েও শক্ত কথা বলে; বলে, "মেয়েদের মুখ দেখব না। তারা প্রকৃতির গুপ্তচর, প্রাণরাজত্বের যতসব দাস সংগ্রহ করবার তারাই আড়কাঠি।" যে সব পুরুষ তপস্বী নয় শুনে তারাও বলে, "বাহবা।"

প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সাধারণত কোনো মেয়ের দল বলে না, পুরুষকে সম্পূর্ণ বর্জন করাটাই তাদের জীবনের চরম এবং মহোচ্চ লক্ষ্য। সম্প্রতি কোথাও কোথাও কখনো এমন কথার আভাস শোনা যায়, কিন্তু সেটা হল আস্ফালন। প্রাণের রাজ্যে মেয়েদের যে চিরকেলে স্থান আছে সেখানকার বন্দরের নোঙর ছিঁড়ে মনটাকে নিয়ে তারা নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, এমন কথা দুই-একজন মেয়ে বলতেও পারে; কারণ, যাত্রারম্ভে ভাগ্যদেবতা যখন জীবনের সম্বল স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দেয় তখন প্যাক করবার সময় কিছু যে উলটোপালটা হয় না, তা নয়।

আসল কথা হচ্ছে, প্রকৃতির ব্যবস্থায় মেয়েরা একটা জায়গা পাকা করে পেয়েছে, পুরুষরা তা পায় নি। পুরুষকে চিরদিন জায়গা খুঁজতে হবে। খুঁজতে খুঁজতে সে কত নতুনেরই সন্ধান পাচ্ছে কিন্তু চরমের আহ্বান তাকে থামতে দিচ্ছে না, বলছে, "আরো এগিয়ে এসো।"

একজায়গায় এসে যে পৌঁচেছে তার একরকমের আয়োজন, আর যাকে চলতে হবে তার আর-একরকমের। এ তো হওয়াই চাই। স্থিতি যে পেয়েছে বসে বসে ক্রমে ক্রমে চারি দিকের সঙ্গে আপন সম্বন্ধকে সে সত্য করতে, পূর্ণ করতে চেষ্টা করে। কেননা, সম্বন্ধ সত্য হলে তবেই তার মধ্যে মুক্তি পাওয়া যায়। যার সঙ্গে ঘর করতে

হচ্ছে তার সঙ্গে যদি কেবলই খিটিমিটি বাধতে থাকে তা হলে তার মতো জীবনের বাধা আর কিছু নেই। যদি ভালোবাসা হয় তা হলেই তার সঙ্গে সম্বন্ধের মধ্যে মুক্তি ঘটে। সে মুক্তি বাইরের সমস্ত দুঃখ-অভাবের উপর জয়ী হয়। এইজন্যেই মেয়ের জীবনে সকলের চেয়ে বড়ো সার্থকতা হচ্ছে প্রেমে। এই প্রেমে সে স্থিতির বন্ধনরূপ ঘুচিয়ে দেয়; বাইরের অবস্থার সমস্ত শাসনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

মুক্তি না হলে কর্ম হতে পারে কিন্তু সৃষ্টি হতে পারে না। মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে চরমশক্তি হচ্ছে সৃষ্টিশক্তি। মানুষের সত্যকার আশ্রয় হচ্ছে আপনার সৃষ্টির মধ্যে; তার থেকে দৈন্যবশত যে বঞ্চিত সে 'পরাবসথশায়ী'। মেয়েকেও সৃষ্টি করতে হবে, তবে সে আপনার বাসা পাবে। তার পক্ষে এই সৃষ্টি প্রেমের দ্বারাই সম্ভব। যে-পুরুষসন্ন্যাসী নিজের কৃচ্ছ্রসাধনের প্রবল দম্ভে মনে করে যে, যেহেতু মেয়েরা সংসারে থাকে এই জন্যে তাদের মুক্তি নেই, সে সত্যকে জানে না। যে মেয়ের মধ্যে সত্য আছে সে আপন বন্ধনকে স্বীকার করেই প্রেমের দ্বারা তাকে অতিক্রম করে; বন্ধনকে ত্যাগ করার চেয়ে এই মুক্তি বড়ো। সব মেয়েই যে তার জীবনের সার্থকতা পায় তা নয়; সব পুরুষই কি পায়। অনুরাগের সত্যশক্তি সব মেয়ের নেই, বৈরাগ্যের সত্যশক্তি সব পুরুষে মেলে না।

কিন্তু, অন্তত আমাদের দেশে দেখা যায়, পুরুষ সাধক সংসারকে বন্ধনশালা বলেই জানে; তার থেকে উর্ধ্বশ্বাসে বহুদূরে পালিয়ে যাওয়াকেই মুক্তির উপায় মনে করে। তার মানে, আমরা যাকে সংসার বলি স্বভাবত সেটা পুরুষের সৃষ্টিক্ষেত্র নয়। এইজন্যে সেখানে পুরুষের মন ছাড়া পায় না। মেয়েরা যখনই মাতৃত্বের অধিকার পেয়েছে তখনই এমন-সকল হৃদয়বৃত্তি পেয়েছে যাতে করে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপন তাদের পক্ষে সহজ হতে পারে। এই জন্যে যে-মেয়ের মধ্যে সেই হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষ আছে সে আপনার ঘরসংসারকে সৃষ্টি করে তোলে। এ সৃষ্টি তেমনই যেমন সৃষ্টি কাব্য, যেমন সৃষ্টি সংগীত, যেমন সৃষ্টি রাজ্যসাম্রাজ্য। এতে কত সুবুদ্ধি, কত নৈপুণ্য, কত ত্যাগ, কত আত্মসংযম পরিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হয়ে অপরূপ সুসংগতি লাভ করেছে। বিচিত্রের এই সম্মিলন একটি অখণ্ডরূপের ঐক্য পেয়েছে; তাকেই বলে সৃষ্টি। এই কারণেই ঘরকন্নায় মেয়েদের এত একান্ত প্রয়োজন; নির্ভরের জন্যে নয়, আরামের জন্যে নয়, ভোগের জন্যে নয়— মুক্তির জন্যে। কেননা, আত্মপ্রকাশের পূর্ণতাতেই মুক্তি।

পূর্বেই বলেছি, মেয়েদের এই সৃষ্টির কেন্দ্রগত জ্যোতির উৎস হচ্ছে প্রেম। এই প্রেম নিজের স্ফূর্তির জন্যে, সার্থকতার জন্যে, যাকে চায় সেই জিনিসটি হচ্ছে মানুষের সঙ্গ। প্রেমের সৃষ্টিক্ষেত্র নিঃসঙ্গ নির্জনে হতেই পারে না, সে ক্ষেত্র সংসারে। ব্রহ্মার

সৃষ্টিক্ষেত্র হতে পারে শূন্যে, কিন্তু বিষ্ণুর শক্তি খাটে লোকজগতে। নারী সেই বিষ্ণুর শক্তি, তার সৃষ্টিতে ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য ; ব্যক্তিবিশেষের তুচ্ছতাও প্রেমের কাছে মূল্যবান। ব্যক্তিবিশেষের ছোটোবড়ো বিচিত্র দাবির সমস্ত খুঁটিনাটিতে সেই প্রেমের আত্মদানশক্তি নিজেকে বহুধারায় উন্মুক্ত করে। ব্যক্তিবিশেষের সেই নানা ক্ষুধার নানা চাওয়া মেয়ের প্রেমের উদ্যমকে কেবলই জাগিয়ে রেখে দেয়। যে পুরুষ আপন দাবিকে ছোটো করে সে খুব ভালো লোক হতে পারে, কিন্তু মেয়েকে সে পীড়া দেয়, অপূর্ণ করে রাখে। এই জন্যে দেখা যায়, যে পুরুষ দৌরাত্ম্য করে বেশি মেয়ের ভালোবাসা সেই পায় বেশি।

নারীর প্রেম যে পুরুষকে চায় তাকে প্রত্যক্ষ চায়, তাকে নিরন্তর নানা আকারে বেষ্টন করবার জন্যে সে ব্যাকুল। মাঝখানে ব্যবধানের শূন্যতাকে সে সইতে পারে না। মেয়েরাই যথার্থ অভিসারিকা। যেমন করেই হোক, যত দুর্গমই হোক, বিচ্ছেদ পার হবার জন্য তাদের সমস্ত প্রাণ ছটফট করতে থাকে। এই জন্যেই সাধনারত পুরুষ মেয়ের এই নিবিড় সঙ্গবন্ধনের টান এড়িয়ে অতি নিরাপদ দূরত্বের মধ্যে পালাতে ইচ্ছা করে।

পূর্বেই বলেছি, আপন পূর্ণতার জন্যে প্রেম ব্যক্তিবিশেষকে চায়। এই ব্যক্তিবিশেষ জিনিসটি অত্যন্ত বাস্তব জিনিস। তাকে পেতে গেলে তার সমস্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটির কোনোটাকে বাদ দেওয়া চলে না, তার দোষ ত্রুটিকেও মেনে নিতে হয়। ব্যক্তিরূপের উপর ভাবের আবরণ টেনে দিয়ে তাকে অপরূপ করে তোলা প্রেমের পক্ষে অনাবশ্যক। অভাবকে অসম্পূর্ণতাকে প্রেম কামনা করে, নইলে তার নিজের সম্পূর্ণতা সফল হবে কিসে।

দেবতার মনের ভাব ঠিকমতো জানি বলে অভিমান রাখি নে কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কার্তিকের চেয়ে গণেশের 'পরে দুর্গার স্নেহ বেশি। এমন-কি, লম্বোদরের অতি অযোগ্য ক্ষুদ্র বাহনটার 'পরে কার্তিকের খোশপোশাকি ময়ূর লোভদৃষ্টি দেয় বলে তার পেখমের অপরূপ সৌন্দর্য সত্ত্বেও তার উপরে তিনি বিরক্ত ; ওই দীনাত্মা ইঁদুরটা যখন তাঁর ভাণ্ডারে ঢুকে তাঁর ভাঁড়গুলোর গায়ে সিঁধ কাটতে থাকে তখন হেসে তিনি তাকে ক্ষমা করেন। শাস্ত্রনীতিজ্ঞ পুরুষবর নন্দী বলে, "মা, তুমি ওকে শাসন কর না, ও বড়ো প্রশ্রয় পাচ্ছে।" দেবী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলেন, "আহা, চুরি করে খাওয়াই যে ওর স্বধর্ম, তা ওর দোষ কী! ও যে চোরের দাঁত নিয়েই জন্মেছে, সে কি বৃথা হবে।"

বাক্যের অপূর্ণতাকে সংগীত যেমন আপন রসে পূর্ণ করে তোলে, প্রেম তেমনি সুযোগ্যতার অপেক্ষা করে না, অযোগ্যতার ফাঁকের মধ্যে সে নিজেকে ঢেলে দেবার সুযোগ পায়।

মেয়েদের সৃষ্টির আলো যেমন এই প্রেম তেমনি পুরুষের সৃষ্টির আলো কল্পনাবৃত্তি।

পুরুষের চিত্ত আপন ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে দেখে, আপন ধ্যানের শক্তি দিয়ে গড়ে তোলে। **We are the dreamers of dreams**— এ কথা পুরুষের কথা। পুরুষের ধ্যানই মানুষের ইতিহাসে নানা কীর্তির মধ্যে নিরন্তর রূপপরিগ্রহ করছে। এই ধ্যান সমগ্রকে দেখতে চায় বলেই বিশেষের অতিবাহুল্যকে বর্জন করে ; যে সমস্ত বাজে খুঁটিনাটি নিয়ে বিশেষ সেইগুলো সমগ্রতার পথে বাধার মতো জমে ওঠে। নারীর স্থষ্টি ঘরে, এই জন্যে সব-কিছুকেই সে যত্ন করে জমিয়ে রাখতে পারে ; তার ধৈর্য বেশি কেননা, তার ধারণার জায়গাটা বড়ো। পুরুষের স্থষ্টি পথে পথে, এই জন্যে সব-কিছুর ভার লাঘব করে দিয়ে সমগ্রকে সে পেতে ও রাখতে চায়। এই সমগ্রের তৃষ্ণা, এই সমগ্রের দৃষ্টি, নির্মম পুরুষের কত শত কীর্তিকে বহুব্যয়, বহুত্যাগ, বহু পীড়নের উপর স্থাপিত করেছে। পুরুষ অমিতব্যয়ী, সে দুঃসাহসিক লোকসানের ভিতর দিয়ে লাভ করতে কুণ্ঠিত হয় না। কারণ, তার ধ্যান সমস্ত লোকসানকে পেরিয়ে সমগ্র লাভটাকে সুস্পষ্ট দেখে ; ছোটো ছোটো ক্ষতি তার কাছে নগণ্য হয়ে যায়। পুরুষের কল্পনাবৃত্তির সাহস এত অত্যন্ত বেশি তার কারণ, স্থিতির ক্ষেত্রে স্থির হয়ে বসে বিচিত্রের সহস্র খুঁটিনাটিকে মমত্বের আঁকড়ি দিয়ে জড়িয়ে ধরবার দীর্ঘ সময় তার কখনো ছিল না। এই জন্যে স্থষ্টির প্রয়োজনে প্রলয় করতে তার দ্বিধা নেই।

মোট কথা বাস্তবের মধ্যে যেসব বিশেষের বাহুল্য আছে তাকে বাদ দিয়ে পুরুষ একের সম্পূর্ণতা খোঁজে। এই জন্যেই অধ্যাত্মরাজ্যে পুরুষেরই তপস্যা ; এই জন্যে সন্ন্যাসের সাধনায় এত পুরুষের এত আগ্রহ। এবং এই জন্যেই ভাবরাজ্যে পুরুষের স্থষ্টি এত বেশি উৎকর্ষ এবং জ্ঞানরাজ্যে এত বেশি সম্পদ লাভ করেছে।

পুরুষের এই সমগ্রতার পিপাসা তার প্রেমেও প্রকাশ পায়। সে যখন কোনো মেয়েকে ভালোবাসে তখন তাকে একটি সম্পূর্ণ অখণ্ডতায় দেখতে চায় আপনার চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে, ভাবের দৃষ্টি দিয়ে। পুরুষের কাব্যে বারবার তার পরিচয় পাওয়া যায়। শেলির এপিসিকীডিয়ন্ পড়ে দেখো। মেয়েরা এ কথা জানে। পুরুষের এই প্রার্থনা মেয়েদের বিশেষ করে স্থষ্টি করতে থাকে। কেননা, প্রার্থনার বেগ, প্রার্থনার তাপ, মানুষের সংসারে স্থষ্টির একটা প্রধান শক্তি। আমরা কী চাইব সেটা যদি ঠিকমতো ধরতে পারি তা হলে আমরা কী পাব সেটা নিয়ে ভাবতে হয় না। পুরুষেরা একরকম ক'রে চেয়ে চেয়ে মেয়েদের একরকম করে গড়ে তুলেছে। মেয়েরা আপনার জীবনে এত জায়গায় এত পর্দা খাটায় এই জন্যে ; আপনার থেকে সে কত কী বাদ দিয়ে চলে। আমরা বলি লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ। তার মানে, লজ্জা হচ্ছে সেই বৃত্তি যাতে করে মেয়েরা আপনার বাস্তবের বাহুল্যকে সরিয়ে রাখে ; মেয়ের রাজ্যে এই

জন্তে মস্ত একটা অগোচরতার ব্যবস্থা আছে। সে আপনার এতখানি বাকি রেখেছে যা পুরুষ আপনার মন দিয়ে পুরিয়ে নিতে পারে। সে আপনার খাওয়া-শোওয়া, চাল-চলন, বাসনা-সাধনা, সমস্ত থেকেই অতিবাস্তবের প্রত্যক্ষতা এতটা পরিমাণে ঢাকা দেয় যাতে পুরুষের ভাবের মধ্যে তার ছবি সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে বাধা না পায়।

মেয়েদের সঙ্গে পুরুষের ব্যবহারে সম্পূর্ণ এর উলটো দিকটাও দেখা যায়। পুরুষ কখনো কখনো এমন কাণ্ড করে যেন নারীর মধ্যে অনির্বচনীয়তার কোনো আভাস নেই, যেন তার মাটির প্রদীপে কোনো আলোই জ্বলে নি ; তখন লুব্ধ দাঁত দিয়ে তাকে সে আখের মতো চিবিয়ে আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেয়। সাত্ত্বিকের ঠিক উলটোপিঠেই থাকে তামসিক, পূর্ণিমারই অন্ত পারে অমাবস্যা। রাস্তার এ দিকটাতে যে সত্য থাকে ঠিক তার সামনের দিকেই তার বিপরীতের বাসা। ফেউ সাক্ষ্য দেয় বাঘেরই অস্তিত্বের। সেই একই কারণে মেয়ে সংসারস্থিতির লক্ষ্মী, আবার সংসার ছারখার করবার প্রলয়ংকরীও তার মতো কেউ নেই।

যা হোক, এটা দেখা যাচ্ছে, সর্বত্রই সর্বকালেই মেয়ে নিজের চার দিকেই একটা বিচিত্র চিত্রখচিত বেড়ার দূরত্ব তৈরি করে রেখেছে। দুর্গমকে পার হবার জন্তে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধ্যবসায় আছে সেইটেকে যতটা পারে সে জাগরূক করে রাখে। পড়ে-পাওয়া জিনিস মূল্যবান হলেও তাতে পুরুষের তৃপ্তি নেই ; যাকে সে জয় করে পায় তাকেই সে যথার্থ পায় বলে জানে ; কেননা, জয় করে পাওয়া হচ্ছে মন দিয়ে পাওয়া। এই জন্তে অনেক ছল-যুদ্ধের আয়োজনে মেয়েদের সময় কাটে।

নীতিনিপুণ বলে বসবে, এই মায়া তো ভালো নয়। পুরুষ নিজেই চিরকাল ধরে দাবি করলে এই মায়াকে ; এই মায়াসৃষ্টির বড়ো বড়ো উপকরণ সে জুগিয়ে দিলে নিজের কল্পরাজ্য থেকে ; কবিরা চিত্রীরা মিলে নারীর চার দিকে রঙবেরঙের মায়ামণ্ডল আপন ইচ্ছায় বানিয়ে দিলে— অবশেষে এই মায়ার কাছে পরাভবশঙ্কায় ত্রস্ত সাধুসজ্জন মেয়েজাতকে মায়াবিনী বলে গাল দিতে লেগেছে ; তার মায়াদুর্গের উপরে বহুকাল থেকে তারা নীরস শ্লোকের শতঘ্নী বর্ষণ করছে, কোথাও দাগ পড়ছে না।

যারা বাস্তবের উপাসক তারা অনেকে বলে, মেয়েরা অবাস্তবের কুয়াশা দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেলেছে— এ-সমস্তর ভিতর থেকে একেবারে খাঁটি সত্য মেয়েটিকে উদ্ধার করা চাই। তাদের মতে, সাহিত্যে শিল্পে সব জায়গাতেই এই অবাস্তব মেয়ের ভূতের উপদ্রব অত্যন্ত বেশি। এরা মনে করে, মায়া থেকে ছাড়িয়ে নিলেই বাস্তব সত্যকে পাওয়া যাবে।

কিন্তু, বাস্তব সত্য বলে কোনো জিনিস কি সৃষ্টিতে আছে। সে সত্য যদি বা

থাকে তবে এমন সম্পূর্ণ নির্বিকার মন কোথায় পাওয়া যাবে যার মধ্যে তার বিশুদ্ধ প্রতিবিম্ব পড়তে পারে ! মায়াই তো সৃষ্টি ; সেই সৃষ্টিকেই যদি অবাস্তব বল তা হলে অনাসৃষ্টি আছে কোন্ চুলোয় ? তার নাগাল পাবে কোন্ পণ্ডিত ?

নানা ছলা কলায় হাবে ভাবে সাজে-সজ্জায় নারী নিজের চার দিকে যে একটি রঙিন রহস্য সৃষ্টি করে তুলেছে সেই আবরণটা ছাড়িয়ে নিয়ে দেখাই তাকে সত্য দেখা, এ কথা মানি নে। গোলাপ ফুলের মায়ার পর্দাটা তুলে ফেলে তাকে কার্বন নাইট্রোজেন বলে দেখা যেমন সত্য দেখা নয়, এও তেমনি। তুমি বাস্তববাদী বলবে, গোলাপ ফুলের মায়া অকৃত্রিম, মেয়ের মায়া কৃত্রিম। একেবারেই বাজে কথা। মেয়ে নিজের হাতে রং বেঁটে যখন তার কাপড় রাঙায় তখন তার হাতের গোপনে সেই প্রকৃতিই থাকে যে প্রকৃতি সকলের অগোচরে প্রজাপতির পাখায় নিজের অদৃশ্য তুলি বুলিয়ে দেয়। প্রাণের রাজ্যে মায়ার খেলা কত বর্ণে গন্ধে রসে, কত লুকোচুরিতে, আভাসে ইশারায় দিনরাত প্রকাশ পাচ্ছে। প্রকৃতির সেই-সকল নিত্য অথচ অনিত্য চঞ্চলতায়, সেই-সব নিরর্থক হাব-ভাবেই তো বিশ্বের সৌন্দর্য। চিরপলাতকের এই চিরপরিবর্তনশীল লীলা থেকে বাদ দিয়ে যে অতি সারবান ভারবান নিশ্চল ধুলোমাটি লোহাপাথরের পিণ্ডটা বাকি থাকে তাকেই তুমি বাস্তবসত্য বল না-কি। বসনে ভূষণে, আড়ালে আবডালে, দ্বিধায় দ্বন্দ্বে, ভাবে ভঙ্গীতে মেয়ে তো মায়াবিনীই বটে। তার মায়ার জগতে সে ইন্দ্রজাল বিস্তার করেছে— যেমন মায়া যেমন ইন্দ্রজাল জলে স্থলে, ফুলে ফলে, সমুদ্র পর্বতে, ঝড়ে বন্যায়।

যাই হোক্, এই মায়াবিনীই চাঁদের সঙ্গে, ফুলের সঙ্গে, নববর্ষার মেঘের সঙ্গে, কলনৃত্যভঙ্গিনী নদীর সঙ্গে মিলে পুরুষের সামনে এসে দাঁড়াল। এই নারী একটা বাস্তবের পিণ্ডমাত্র নয় ; এর মধ্যে কলাসৃষ্টির একটা তত্ত্ব আছে ; অগোচর একটি নিয়মের বাঁধনে ছন্দের ভঙ্গীতে সে রচিত ; সে একটি অনির্বচনীয় সুসমাপ্তির মূর্তি। নানা বাজে খুঁটিনাটিকে সে মধুর নৈপুণ্যে সরিয়ে দিয়েছে ; সাজে-সজ্জায় চালে চলনে নানা ব্যঞ্জনা দিয়ে নিজেকে সে বস্তুলোকের প্রত্যন্তদেশে রসলোকের অধিবাসিনী করে দাঁড় করিয়েছে। "কাজ করে থাকি" এই কথাটা জানিয়ে পুরুষ হাত খালি রেখেছে ; মেয়ে সেই হাতে কাঁকন পরে জানিয়েছে, "আমি তো কাজ করি নে, আমি সেবা করি।" সেবা হল হৃদয়ের সৃষ্টি, শক্তির চালনা নয়। যে রাস্তায় চলবে সেই রাস্তাটাকে খুব স্পষ্ট করে নিরীক্ষণ করবার জন্যে পুরুষ তার চোখদুটো খুলে রেখেছে, ওটাকে সে গম্ভীর ভাষায় বলে দর্শনেন্দ্রিয়। মেয়ে সেই চোখে একটু কাজলের রেখা টেনে দিয়ে বলেছে, চোখ দিয়ে বাইরের জিনিস দেখা যায় এইটেই চরম কথা নয়— চোখের ভিতরেও দেখবার জিনিস আছে, হৃদয়ের বিচিত্র মায়া।

অন্তরে বাহিরে হৃদয়ের রাগরঞ্জিত লীলা নিয়ে পুরুষের জগতে নারী মূর্তিমতী কলালক্ষ্মী হয়ে এল। রস যেখানে রূপ গ্রহণ করে সেই কলামূর্তির গুণ হচ্ছে এই যে, তার রূপ তাকে অচল বাঁধনে বাঁধে না। খবরের কাগজের সংবাদ-লেখা প্যারাগ্রাফে ছন্দ নেই, রস নেই, সেই জন্যে সে একেবারে নিরেট, সে যা সে তাই মাত্র। মন তার মধ্যে ছুটি পায় না। ভালো কবিতা যে রূপ গ্রহণ করে সে রূপ নির্দিষ্ট হয়েও অনির্দিষ্ট, পাঠকের স্বাতন্ত্র্যকে সে হাঁকিয়ে দেয় না। মনে আছে, বহুকাল হল, রোগশয্যায় কালিদাসের কাব্য আগাগোড়া সমস্ত পড়েছিলুম। যে আনন্দ পেলুম সে তো আবৃত্তির আনন্দ নয়, সৃষ্টির আনন্দ। সেই কাব্যে আমার মন আপন বিশেষ স্বত্ব উপলব্ধি করবার বাধা পেল না। বেশ বুঝলুম, এ সব কাব্য আমি যে রকম করে পড়লুম দ্বিতীয় আর-কেউ তেমন করে পড়ে নি।

মেয়ের মধ্যেও পুরুষের কল্পনা তেমনি করেই আপন মুক্তি পায়। নারীর চারি দিকে যে-পরিমণ্ডল আছে তা অনির্বচনীয়তার ব্যঞ্জনা দিয়ে তৈরি; পুরুষের কল্পনা সেখানে আপনার রসের রং, আপনার ভাবের রূপ মিলিয়ে দিতে কঠিন বাধা পায় না। অর্থাৎ, সেখানে তার নিজের সৃষ্টি চলে, এই জন্যে তার বিশেষ আনন্দ। মোহমুক্ত মানুষ তাই দেখে হাসে; কিন্তু মোহমুক্ত মানুষের কাছে সৃষ্টি ব'লে কোনো বালাই নেই, সে প্রলয়ের মধ্যে বাস করে।

পূর্বেই বলেছি, মেয়ের প্রেম পুরুষের সমস্ত খুঁটিনাটি দোষত্রুটি সমেত বিশেষত্বকে প্রত্যক্ষ করে পেতে চায়। সঙ্গ তার নিতান্তই চাই। পুরুষও আপনাকে লুকিয়ে রাখে নি, ঢেকে রাখে নি; সে অত্যন্ত অসজ্জিত এলোমেলো আটপৌরে ভাবেই মেয়ের ভালোবাসার কাছে আগাগোড়া নিজেকে ফেলে রেখে দিয়েছে, এতেই মেয়ে যথার্থ সঙ্গ পায়, আনন্দ পায়।

কিন্তু, পুরুষের পক্ষে মেয়ে আপনার সঙ্গে সঙ্গেই একটা দূরত্ব নিয়ে আসে; তার মধ্যে খানিকটা পরিমাণে নিষেধ আছে, ঢাকা আছে। ফোটোগ্রাফের মধ্যে সব আছে, কিন্তু আর্টিস্টের ছবির মধ্যে সব নেই; এই জন্যে তাতে যে ফাঁকা থাকে সেইখানে রসজ্ঞের মন কাজ করতে পারে। সেইরকমের ফাঁকাটুকু মেয়েদের একটা সম্পদ, সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত করতে নেই। বিয়াত্রিচে দান্তের কল্পনাকে যেখানে তরঙ্গিত করে তুলেছে সেখানে বস্তুত একটি অসীম বিরহ। দান্তের হৃদয় আপনার পূর্ণচন্দ্রকে পেয়েছিল বিচ্ছেদের দূর আকাশে। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামীর হয়তো বাইরের বিচ্ছেদ ছিল না, কিন্তু কবি যেখানে তাকে ডেকে বলছে,

> তুমি বেদবাদিনী, হরের ঘরনী,
>
> তুমি সে নয়নের তারা—

সেখানে রজকিনী রামী কোন্ দূরে চলে গেছে তার ঠিক নেই। হোক-না সে নয়নের তারা তবুও যে নারী বেদবাদিনী, হরের ঘরনী, সে আছে বিরহলোকে। সেখানে তার সঙ্গ নেই, ভাব আছে। নারীর প্রেমে মিলনের গান বাজে, পুরুষের প্রেমে বিচ্ছেদের বেদনা।

২রা অক্টোবর ১৯২৪

আমি বলছিলুম, মেয়েরা পর্দানশিন। যে কৃত্রিম পর্দা দিয়ে কৃপণ পুরুষ তাদের অদৃশ্য করে লুকিয়ে রাখে আমি সেই বর্বর পর্দাটার কথা বলছি নে; নিজেকে সুসমাপ্তভাবে প্রকাশ করবার জন্যেই তারা যে সব আবরণকে সহজপটুত্বে আভরণ করে তুলেছে আমি তার কথাই বলছি। এই যে নিজের দেহকে, গৃহকে, আচরণকে, মনকে নানা বর্ণ দিয়ে, ভঙ্গী দিয়ে, সংযম দিয়ে, অনুষ্ঠান দিয়ে, নিজের বিচিত্র একটি বেষ্টনকে তারা সুসজ্জিত করতে পেরেছে, এর কারণ, তারা স্থিতির অবকাশ পেয়েছে। স্থিতির মূল্যই হচ্ছে তার আবরণের ঐশ্বর্যে, তার চারি দিকের দাক্ষিণ্যে, তার আভাসে, ব্যঞ্জনায়, তার হাতে যে সময় আছে সেই সময়টার মনোহর বৈচিত্র্যে। সবুরে মেওরা ফলে, কেননা, মেওয়া যে প্রাণের জিনিস, কলের ফরমাশে তাকে তাড়াহুড়ো করে গড়ে তোলা যায় না। সেই বহুমূল্য সবুরটা হচ্ছে স্থিতির ঘরের জিনিস। এই সবুরটাকে যদি সরস এবং সফল করতে না পারা গেল তবে তার মতো আপদ আর নেই। মরুভূমি অনাবৃত, তার অবকাশের অভাব নেই অথচ সেই অবকাশ রিক্ত; এই কঠিন নগ্নতা পীড়া দেয়। কিন্তু, যেখানে পোড়ো জমি পোড়ো হয়ে নেই সেখানে সে ফসলে ঢাকা, ফুলে বিচিত্র; সেখানে তার সবুজ ওড়না বাতাসে দুলে উঠছে। যে পথিক পথে চলে সেখানেই সে পায় তার তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার অন্ন, তার আরামের ছায়া, ক্লান্তির শুশ্রূষা। সেখানকার স্থিতির পূর্ণতাই তার গতির সহায়; অবারিত মরুভূমি সবচেয়ে বাধা। নারী স্বভাবতই যে স্থিতি পেয়েছে বসে বসে ধীরে ধীরে সেই স্থিতিকে রাঙিয়ে তুলে আপন হৃদয়রসে রসিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে আপন বুকের কাঁচলি আপন মুখের ঘোমটা বানিয়েছে। এই ঢাকাতেই সে আপনার ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছে পুষ্পপল্লবের আবরণেই যেমন লতার ঐশ্বর্য।

কিন্তু হঠাৎ আজকাল পাশ্চাত্যসমাজে শুনতে পাচ্ছি, নারী বলছে, "আমি মায়ার আবরণ রাখব না, পুরুষের সঙ্গে ব্যবধান ঘুচিয়ে দেব। আমি হব বিজ্ঞানের চাঁদ; তার চারি দিকে বায়ুমণ্ডল নেই, মেঘ নেই, রং নেই, কোমল শ্যামলের চঞ্চল বিচিত্রতা

নেই, তার কালো কালো ক্ষতগুলোর উপরে পর্দা নেই, আমিও হব তেমনি। এতদিন যাকে বলে এসেছি লজ্জা, যাকে বলে এসেছি শ্রী, আজ তাতে আমার পরাভব ঘটছে ; সে সব বাধা বর্জন করব। পুরুষের চালে তার সমান তালে পা ফেলে তার সমান রাস্তায় চলব।" এমন কথা যে একদল স্ত্রীলোকের মুখ দিয়ে বের হল, এটা সম্ভব হল কী করে। এতে বোঝা যায়, পুরুষের প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। মেয়েকে সে চাচ্ছে না। এমন নয় যে সে হঠাৎ সন্ন্যাসী হয়ে উঠেছে ; ঠিক তার উলটো— সে হয়েছে বিষয়ী ; মেয়েকে সে কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে চায় ; কড়ায় গণ্ডায় যার হিসাব মেলে না তাকে সে মনে করে বাজে জিনিস, তাকে সে মনে করে ঠকা। সে বলে, "আমি চোখ খুলে সব স্পষ্ট করে তন্ন তন্ন করে দেখব।" অর্থাৎ, ধ্যানের দেখায় যা মনকে ভরিয়ে তোলে সেটাকে সে জানে ফাঁকি। কিন্তু, পুরুষের সংসারে সত্যকার মেয়ে তো কেবলমাত্র চোখের দেখার নয়, সে তো ধ্যানের জিনিসও বটে। সে যে শরীরী অশরীরী দু'য়ে মিলিয়ে, পৃথিবী যেমন নিজের মাটি ধুলো এবং নিজের চার দিকের অসীম আকাশ ও বায়ুমণ্ডল মিলিয়ে। মেয়ের যা অশরীরী তা যে শরীরী মেয়েকে ঘিরে আছে ; তার ওজন নেই, কিন্তু তার বর্ণ আছে, ভঙ্গী আছে ; তা ঢাকে অথচ তা প্রকাশ করে।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় যারা উন্নতির বড়াই করে, তারা বলবে, এই মেয়েলির প্রতি অসহিষ্ণুতায় চলার উৎসাহ প্রকাশ পায়। আমার মনে হয়, এটাই থামবার পূর্বলক্ষণ। চলার ছন্দই থাকে না যদি স্থিতির সঙ্গে তার সমস্ত আপস একেবারে মিটে যায়। গাড়িটার ঘোড়াও চলছে, সারথিও চলছে, যাত্রীরাও চলছে, গাড়ির জোড় খুলে গিয়ে তার অংশপ্রত্যংশগুলোও চলছে, একে তো চলা বলে না ; এ হচ্ছে মরণোন্মুখ চলার উন্মত্ত প্রলাপ, সাংঘাতিক থামার ভূমিকা। মেয়েরা সমাজের চলাকেই স্থিতির ছন্দ দেয়— সে ছন্দ সুন্দর।

একদল মেয়ে বলতে শুরু করেছে যে, "মেয়ে হওয়াতে আমাদের অগৌরব, আমাদের ক্ষতি। অর্থাৎ, আমাদের আত্মপ্রকাশের ধারায় পুরুষের সঙ্গে প্রভেদটাতে পীড়া পাচ্ছি।" এর থেকে বোধ হচ্ছে, একদিন যে পুরুষ সাধক ছিল এখন সে হয়েছে বণিক। বণিক বাইরের দিকে যদিবা চলে, অন্তরের দিকে আপনার সঞ্চয়ের বোঝার কাছে সতর্ক হয়ে পড়ে আছে। তার স্থিতি সারবান কিন্তু সুন্দর নয়। তার কারণ, মানুষের সম্বন্ধকে হৃদয়মাধুর্যে সত্য ক'রে পূর্ণ ক'রে তোলা তার স্থিতির ধর্ম নয় ; ধনসঞ্চয়ের তলায় মানুষের সম্বন্ধকে চাপা দিয়ে চ্যাপটা করে দেওয়াই হয়েছে তার কাজ। সুতরাং, সে যে কেবল চলে না তা নয়, আপন স্থিতিকে ভারগ্রস্ত নীরস নির্মম

অসুন্দর করে। অঙ্কের কোঠার মধ্যে যাকে ধরে না তাকে সে আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেয়।

পুরুষ একদিন ছিল মিস্টিক্, ছিল অতল রসের ডুবারি, ছিল ধ্যানী। এখন সে হয়েছে মেয়েদের মতোই সংসারী। কেবল প্রভেদ এই যে, তার সংসারে আলো নেই, বাতাস নেই, আকাশ নেই; বস্তুপিণ্ডে সমস্ত নিরেট। সে ভারি ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার মধ্যে সেই আকাশ সে পায় না যে আকাশে আপন কল্পনাকে রূপে রসে মুক্তি দিতে পারে।

আজকালকার কবি আপন কাব্যে, শিল্পী আপন কারুতে, অনির্বচনীয়কে সুন্দরকে অবজ্ঞা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। এটা কি পৌরুষের উলটো নয়। পুরুষই তো চিরদিন সুন্দরের কাছ থেকে আপন শক্তির জয়মাল্য কামনা করেছে। মিস্টিক্ পুরুষ তার ধ্যানশক্তিতে, তার ফলাসক্তিবিহীন সাধনায়, বাস্তবের আবরণ একটার পর একটা যতই মোচন করেছে ততই রসের লোকে, অধ্যাত্মলোকে সে ভূমার পরিচয় পেয়েছে। আজ কেবলই সে থলির পর থলির মুখ বাঁধছে, সিন্দুকের পর সিন্দুকে তালা লাগাচ্ছে; আজ তার সে মুক্তি নেই যে মুক্তির মধ্যে সুন্দর আপন সিংহাসন রচনা করে। তাই তার মেয়েরা বলছে, "আমরা পুরুষ সাজব।" তাই তার কাব্যসরস্বতী বলছে, বীণার তারগুলোকে যত্ন করে না বাঁধলে যে-সুরটা ঝন্‌ঝন্ করতে থাকে সেইটেই খাঁটি বাস্তবের সুর, উপেক্ষার উচ্ছৃঙ্খল দুরন্তপনায় রূপের মধ্যে যে বিপর্যয় যে ছিন্নভিন্নতা ঘটে সেইটেই আর্ট।

দিন চলে গেল। ভুলে ছিলুম যে, সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে চলেছি। মন চলেছিল আপন রাস্তায়, এক ভাবনা থেকে আর-এক ভাবনায়। চলেছিল বললে বেশি বলা হয়। উট যেমন বোঝা পিঠে নিয়ে মরুর মধ্যে পথ আন্দাজ করে চলে এ তেমন চলা নয়; এ যেন পথের খেয়াল না রেখে ভেসে যাওয়া, কোনো বিশেষ ঘাটের কাছে বায়না না নিয়ে শুধু-শুধু বেরিয়ে পড়া, কথাগুলোকে নিজের চেষ্টায় চালনা না ক'রে দিকের হিসেব না রেখে তাদের আপনার ঝোঁকে চলতে দেওয়া। তার সুবিধা হচ্ছে এই যে, কথাগুলো নিজেরাই হয় বক্তা, আর মনটা হয় শ্রোতা। মন তখন অন্যকে কিছু দেবার কথা ভাবে না, নিজের কাছ থেকে নিজে পায়। মনের ভূগোলে অনাবিষ্কৃতের আর অন্ত নেই। সে-সব জায়গায় পৌঁছে দেবার পথগুলো সবই নদীর মতো, অর্থাৎ সে পথ নিজে চলে ব'লেই চালায়; তারই স্রোতে মন আপনাকে ভাসিয়ে দিতে পারলে নিজের মধ্যে অপরিচিতের পরিচয় পেতে থাকে। আর্যাবর্তের বুকের উপর দিয়ে যে গঙ্গা চলে গেছে সেই তো ভারতবর্ষের অপরিচিত পূর্বের সঙ্গে অপরিচিত

পশ্চিমকে সহজেই মুখোমুখি করে দিয়েছিল। তেমনি যে মানুষের মনের মাঝখান দিয়ে চলতি নদী থাকে সে মানুষ আপনার কাছ থেকে আপনি শিক্ষা করবার সুযোগ পায়। আমার মনে সেই নদীটা আছে। তারই ডাকে ছেলেবেলায় আমি ইস্কুল পালিয়েছিলুম। যে-সব জ্ঞান শিখে শিখতে হয় তার বিস্তর অভাব রয়ে গেল কিন্তু অন্যদিকে ক্ষতিপূরণ হয়েছে। সেজন্যে আমার মনের ভিতরকার ভাগীরথীকে আমি প্রণাম করি।

বাইরে ডেকে এসে দাঁড়ালুম। তখন সূর্য অল্পক্ষণ আগেই অস্ত গেছে। শান্ত সমুদ্র, মৃদু বাতাসটা যেন মুখচোরা। জল ঝিল্‌মিল্ করছে। পশ্চিমদিক্‌প্রান্তে দু-একটা মেঘের টুকরো সোনার ধারায় অভিষিক্ত হয়ে স্থির হয়ে পড়ে আছে। আর-একটু উপরে তৃতীয়ার চাঁদের কণা। সেখানকার আকাশে তখনো সন্ধ্যার ঘোর লাগে নি; দিনের সভা যদিও ভেঙে গেছে, তবু সেখানে তার সাদা জাজিমখানা পাতা। চাঁদটাকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন অসময়ে অজায়গায় এসে পড়েছে। যেন একদেশের রাজপুত্র আর-এক রাজার দেশে হঠাৎ উপস্থিত, যথোচিত অভ্যর্থনার আয়োজন হয় নি, তার নিজের অনুচর তারাগুলো পিছিয়ে পড়েছে। এদিকে ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম আকাশের সমস্ত সোনার মশাল, সমস্ত সমারোহ, সূর্যের অস্তযাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত; ওই চাঁদটুকুকে কেউ দেখতেই পাচ্ছে না।

এই জনশূন্য সমুদ্র ও আকাশের সঙ্গমস্থলে পশ্চিমদিগন্তে একখানি ছবি দেখলুম। অল্প কয়েকটি রেখা, অল্প কিছু উপকরণ; আকাশ এবং সমুদ্রের নীলের ভিতর দিয়ে অবসানদিনের শেষ আলো যেন তার শেষ কথাটি কোনো একটা জায়গায় রেখে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়, কিন্তু উদাস শূন্যের মধ্যে ধরে রাখবার জায়গা কোথাও না পেয়ে ম্লান হয়ে পড়ছে— এই ভাবটিই যেন সেই ছবিটির ভাব।

ডেকের ওপর স্তব্ধ দাঁড়িয়ে শান্ত একটি গভীরতার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে আমি যা দেখলুম তাকে আমি বিশেষ অর্থেই ছবি বলছি, যাকে বলে দৃশ্য এ তা নয়। অর্থাৎ, এর মধ্যে যা-কিছুর সমাবেশ হয়েছে কেউ যেন সেগুলিকে বিশেষভাবে বেছে নিয়ে পরস্পরকে মিলিয়ে, একটি সম্পূর্ণতার মধ্যে সাজিয়ে ধরেছে। এমন একটি সরল গভীর মহৎ সম্পূর্ণতার ছবি কলকাতার আকাশে একমুহূর্তে এমন সমগ্র হয়ে আমার কাছে হয়তো দেখা দিত না। এখানে চারি দিকের এই বিপুল রিক্ততার মাঝখানে এই ছবিটি এমন একান্ত এক হয়ে উঠে আমার কাছে প্রকাশ পেলে। একে সম্পূর্ণ করে দেখবার জন্যে এতবড়ো আকাশ এবং এত গভীর স্তব্ধতার দরকার ছিল।

জাপানের কথা আমার মনে পড়ে। ঘরের মধ্যে একেবারে কোনো আসবাব নেই একটি দেয়ালে একখানি ছবি ঝুলছে। ওই ছবি আমার সমস্ত চোখ একা

অধিকার ক'রে ; চারি পাশে কোথাও চিত্তবিক্ষেপ করবার মতো কিছুই নেই। রিক্ততার আকাশে তার সমস্ত অর্থটি জ্যোতির্ময় হয়ে প্রকাশ পায়। ঘরে যদি নানা জিনিস ভিড় করত তবে তাদের মধ্যে এই ছবি থাকত একটি আসবাবমাত্র হয়ে, তার ছবির মাহাত্ম্য ম্লান হত, সে আপনার সব কথা বলতে পারত না।

কাব্য সংগীত প্রভৃতি অন্য-সমস্ত রসসৃষ্টিও এইরকম বস্তুবাহুল্যবিরল রিক্ততার অপেক্ষা রাখে। তাদের চারি দিকে যদি অবকাশ না থাকে তা হলে সম্পূর্ণ মূর্তিতে তাদের দেখা যায় না। আজকালকার দিনে সেই অবকাশ নেই, তাই এখনকার লোকে সাহিত্য বা কলাসৃষ্টির সম্পূর্ণতা থেকে বঞ্চিত। তারা রস চায় না, মদ চায় ; আনন্দ চায় না, আমোদ চায়। চিত্তের জাগরণটা তাদের কাছে শূন্য, তারা চায় চমকলাগা। ভিড়ের ঠেলাঠেলির মধ্যে অন্যমনস্কের মন যদি কাব্যকে গানকে পেতে হয় তা হলে তার খুব আড়ম্বরের ঘটা করা দরকার। কিন্তু, সে আড়ম্বরে শ্রোতার কানটাকেই পাওয়া যায় মাত্র, ভিতরের রসের কথাটা আরো বেশি করে ঢাকাই পড়ে। কারণ, সরলতা স্বচ্ছতা আর্টের যথার্থ আভরণ। যেখানে কোলাহল বেশি, ভিড় বৃহৎ, মন নানা-কিছুতে বিক্ষিপ্ত, আর্ট সেখানে কসরত দেখাবার প্রলোভনে মজে, আপনাকে দেখাতে ভুলে যায়। আড়ম্বর জিনিসটা একটা চীৎকার ; যেখানে গোলমালের অন্ত নেই সেখানে তাকে গোচর হয়ে ওঠবার জন্যে চীৎকার করতে হয় ; সেই চীৎকারটাকেই ভিড়ের লোক শক্তির লক্ষণ জেনে পুলকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু, আর্ট তো চীৎকার নয়, তার গভীরতম পরিচয় হচ্ছে তার আত্মসংবরণে। আর্ট বরঞ্চ ঠেলা খেয়ে চুপ করে যেতে রাজি আছে, কিন্তু ঠেলা মেরে পালোয়ানি করার মতো লজ্জা তার আর নেই। হায় রে লোকের মন, তোমাকে খুশি করবার জন্যে রামচন্দ্র একদিন সীতাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন ; তোমাকে ভোলাবার জন্যেই আর্ট আজ আপনার শ্রী ও হ্রী বিসর্জন দিয়ে নৃত্য ভুলে পাঁয়তারা মেরে বেড়াচ্ছে।

হারুনা-মারু জাহাজ

৩রা অক্টোবর ১৯২৪

এখনো সূর্য ওঠে নি। আলোকের অবতরণিকা পূর্ব আকাশে। জল স্থির হয়ে আছে সিংহবাহিনীর পায়ের তলাকার সিংহের মতো। সূর্যোদয়ের এই আগমনীর মধ্যে মজে গিয়ে আমার মুখে হঠাৎ ছন্দে-গাঁথা এই কথাটা আপনিই ভেসে উঠল—

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড় বারে বারে।

বুঝতে পারলুম আমার কোনো একটি আগন্তুক কবিতা মনের মধ্যে এসে পৌঁছবার আগেই তার ধুয়োটা এসে পৌঁচেছে। এইরকমের ধুয়ো অনেক সময়ে উড়ো বীজের মতো মনে এসে পড়ে, কিন্তু সব সময়ে তাকে এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায় না।

সমুদ্রের দূর তীরে যে ধরণী আপনার নানা-রঙ আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়ে পুবের দিকে মুখ করে একলা বসে আছে, ছবির মতো দেখতে পেলুম, তার কোলের উপর একখানি চিঠি পড়ল খসে কোন্ উপরের থেকে। সেই চিঠিখানি বুকের কাছে তুলে ধরে সে একমনে পড়তে বসে গেল; তালতমালের নিবিড় বনচ্ছায়া পিছনে রইল এলিয়ে, নুয়ে-পড়া মাথার থেকে ছড়িয়ে-পড়া এলোচুল।

আমার কবিতার ধুয়ো বলছে, প্রতিদিন সেই একই চিঠি। সেই একখানির বেশি আর দরকার নেই; সেই ওর যথেষ্ট। সে এত বড়ো, তাই সে এত সরল। সেই একখানিতেই সব আকাশ এমন সহজে ভরে গেছে।

ধরণী পাঠ করছে কত যুগ থেকে। সেই পাঠ-করাটা আমি মনে মনে চেয়ে দেখছি। সুরলোকের বাণী পৃথিবীর বুকের ভিতর দিয়ে, কণ্ঠের ভিতর দিয়ে, রূপে রূপে বিচিত্র হয়ে উঠল। বনে বনে হল গাছ, ফুলে ফুলে হল গন্ধ, প্রাণে প্রাণে হল নিশ্বসিত। একটি চিঠির সেই একটি মাত্র কথা, সেই আলো। সেই সুন্দর, সেই ভীষণ; সেই হাসির ঝিলিকে ঝিকিমিকি, সেই কান্নার কাঁপনে ছলছল।

এই চিঠি-পড়াটাই সৃষ্টির স্রোত;-যে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে সেই দুজনের কথা এতে মিলেছে, সেই মিলনেই রূপের ঢেউ। সেই মিলনের জায়গাটা হচ্ছে বিচ্ছেদ। কেননা, দূর-নিকটের ভেদ না ঘটলে স্রোত বয় না, চিঠি চলে না। সৃষ্টি-উৎসের মুখে কী-একটা কাণ্ড আছে, সে এক ধারাকে দুই-ধারায় ভাগ করে। বীজ ছিল নিতান্ত এক, তাকে দ্বিধা করে দিয়ে দুখানি কচি পাতা বেরল, তখনই সেই বীজ পেল তার বাণী; নইলে সে বোবা, নইলে সে কৃপণ, আপন ঐশ্বর্য আপনি ভোগ করতে জানে না। জীব ছিল একা, বিদীর্ণ হয়ে স্ত্রী-পুরুষে সে দুই হয়ে গেল। তখনই তার সেই বিভাগের ফাঁকের মধ্যে বসল তার ডাকবিভাগ। ডাকের পর ডাক, তার অন্ত নেই। বিচ্ছেদের এই ফাঁক একটা বড়ো সম্পদ; এ নইলে সব চুপ, সব বন্ধ। এই ফাঁকটার বুকের ভিতর দিয়ে একটা অপেক্ষার ব্যথা, একটা আকাঙ্ক্ষার টান, টন্‌টন্ করে উঠল; দিতে-চাওয়ার আর পেতে-চাওয়ার উত্তর-প্রত্যুত্তর এ-পারে ও-পারে চালাচালি হতে লাগল। এতেই দুলে উঠল সৃষ্টিতরঙ্গ, বিচলিত হল ঋতুপর্যায়, কখনো বা গ্রীষ্মের তপস্যা, কখনো বর্ষার প্লাবন, কখনো বা শীতের সংকোচ, কখনো বা বসন্তের দাক্ষিণ্য। একে

যদি যায় বল তো দোষ নেই, কেননা, এই চিঠিলিখনের অক্ষরে আবছায়া, ভাষায় ইশারা ; এর আবির্ভাব-তিরোভাবের পুরো মানে সব সময়ে বোঝা যায় না। যাকে চোখে দেখা যায় না সেই উত্তাপ কখন আকাশপথ থেকে মাটির আড়ালে চলে যায় ; মনে ভাবি, একেবারেই গেল বুঝি। কিছু কাল যায়, একদিন দেখি, মাটির পর্দা ফাঁক করে দিয়ে একটি অঙ্কুর উপরের দিকে কোন্-এক আর-জন্মের চেনা-মুখ খুঁজছে। যে উত্তাপটা ফেরার হয়েছে ব'লে সেদিন রব উঠল সেই তো মাটির তলায় অন্ধকারে সেঁধিয়ে কোন্ ঘুমিয়ে-পড়া বীজের দরজায় বসে বসে ঘা দিচ্ছিল। এমনি করেই কত অদৃশ্য ইশারার উত্তাপ এক-হৃদয়ের থেকে আর-এক হৃদয়ের ফাঁকে ফাঁকে কোন্ চোরকোঠায় গিয়ে ঢোকে, সেখানে কার সঙ্গে কী কানাকানি করে জানি নে, তার পরে কিছুদিন বাদে একটি নবীন বাণী পর্দার বাইরে এসে বলে "এসেছি"।

আমার সহযাত্রী বন্ধু আমার ডায়ারি প'ড়ে বললেন, "তুমি ধরণীর চিঠি-পড়ায় আর মানুষের চিঠি-পড়ায় মিশিয়ে দিয়ে একটা যেন কী গোল পাকিয়েছ। কালিদাসের মেঘদূতে বিরহী-বিরহিণীর বেদনাটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তোমার এই লেখায় কোন্‌খানে রূপক কোন্‌খানে সাদা কথা বোঝা শক্ত হয়ে উঠেছে।" আমি বললুম, কালিদাস যে মেঘদূত কাব্য লিখেছেন সেটাও বিশ্বের কথা। নইলে তার একপ্রান্তে নির্বাসিত যক্ষ রামগিরিতে, আর-একপ্রান্তে বিরহিণী কেন অলকাপুরীতে। স্বর্গমর্তের এই বিরহই তো সকল সৃষ্টিতে। এই মন্দাক্রান্তাছন্দেই তো বিশ্বের গান বেজে উঠছে। বিচ্ছেদের ফাঁকের ভিতর দিয়ে অণু-পরমাণু নিত্যই যে অদৃশ্য চিঠি চালাচালি করে সেই চিঠিই সৃষ্টির বাণী। স্ত্রীপুরুষের মাঝখানেও, চোখে চোখেই হোক, কানে কানেই হোক, মনে মনেই হোক, আর কাগজে-পত্রেই হোক, যে চিঠি চলে সেও ওই বিশ্বচিঠিরই একটি বিশেষ রূপ।

৫ই অক্টোবর ১৯২৪

মানুষের আয়ুতে ষাটের কোঠা অস্তদিগন্তের দিকে হেলে-পড়া। অর্থাৎ, উদয়ের দিগন্তটা এই সময়ে সামনে এসে পড়ে, পূর্বে পশ্চিমে মুখোমুখি হয়।

জীবনের মাঝমহলে, যে কালটাকে বলে পরিণত বয়স, সেই সময়ে অনেক বড়ো বড়ো সংকল্প, অনেক কঠিন সাধনা অনেক মস্ত লাভ, অনেক মস্ত লোকসান এসে জমেছিল। সব জড়িয়ে ভেবেছি, এইবার আসা গেল পাকা-পরিচয়ের কিনারাটাতে। সেই সময়ে কেউ যদি হঠাৎ এসে জিজ্ঞাসা করত "তোমার বয়স কত।" তা হলে আমার গোড়ার দিকের ছত্রিশটা বছর সরিয়ে রেখে বলতুম, আমি হচ্ছি বাকিটুকু। অর্থাৎ,

আমার বয়স হচ্ছে কুষ্টির শেষদিকের সাতাশ। এই পাকা সাতাশের রকম-সকম দেখে গম্ভীর লোকে খুশি হল। তারা কেউ বললে "নেতা হও", কেউ বললে "সভাপতি হও", কেউ বললে "উপদেশ দাও।" আবার কেউ বা বললে, "দেশটাকে মাটি করতে বসেছ।" অর্থাৎ, স্বীকার করলে দেশটাকে মাটি করে দেবার মতো অসামান্য ক্ষমতা আমার আছে।

এমন সময়ে বাটে পড়লুম। একদিন বিকেলবেলায় সামনের বাড়ির ছাতে দেখি, দশ-বারো বছরের একটি ছেলে খালি-গায়ে যা-খুশি করে বেড়াচ্ছে। ঠিক সেই সময়ে চা খেতে-খেতে একটা জরুরি কথা ভাবছি।

ভাবনাটা একদমে এক-লাইন থেকে আর-এক লাইনে চলে গেল। হঠাৎ নিতান্ত এই একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা মনে উঠল যে, ওই ছেলেটা এই অপরাহ্নের আকাশের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ মিশ খেয়ে গেছে; কোনো একটা অন্যমনস্কতার ঠেলায় বিশ্ব-পৃথিবীর সঙ্গে ওর জোড় ভেঙে যায় নি। সমস্ত দিগ্‌দিগন্তরকে ওই ছেলে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে পেয়েছে, দিগম্বর শিবের মতো। কিসে যেন একটা ধাক্কা দিয়ে আমাকে মনে করিয়ে দিলে যে, অমনি করেই নগ্ন হয়ে সমস্তর মধ্যে মগ্ন হয়ে নিখিলের আঙিনায় আমিও একদিন এসে দাঁড়িয়েছিলুম। মনে হল, সেটা কম কথা নয়। অর্থাৎ, আজও যদি বিশ্বের স্পর্শ প্রত্যক্ষ প্রাণের মধ্যে তেমনি করে এসে লাগত তা হলে ঠকতুম না। তা হলে আমার জীবন-ইতিহাসের মধ্যযুগে অকালে যুগান্তর-অবতারণার যে সব আয়োজন করা গেছে তার ভার আমার চেয়ে যোগ্যতর লোকের হাতেই পড়ত, আর বাদশাই কুঁড়ের সিংহাসনটা আমি স্থায়ীরূপে দখল করে বসবার সময় পেতুম। সেই কুঁড়েমির ঐশ্বর্য আমি যে একলা ভোগ করতুম তা নয়, এই রসের রসিক যারা তাদের জন্যে ভাণ্ডারের দ্বার খুলে দিয়ে বলা যেত, পীয়তাং ভুজ্যতাম্।

চায়ের পাত্রটা ভুলে গিয়ে ভাবতে লাগলুম, যে পুলকটাতে আজ মন আবিষ্ট হয়েছে সেটার কথা সবাইকে বুঝিয়ে বলি কী করে। বয়স যখন ছত্রিশের নীচে ছিল তখন বলা-ই আমার কাজ ছিল, বুঝিয়ে বলার ধার ধারতুম না। কেননা, তখন তেপান্তর মাঠের মাঝখানটাতে আমার ঘোড়া ছুটছে, যারা না বুঝে কিছুতেই ছাড়ে না তারা আমার ঠিকানা পায় নি। আজ পনেরো-ষোলো বিশ-পঁচিশ আশি-পঁচাশি প্রভৃতি নানা-বয়সের প্রাচীন লোকের ঠেসাঠেসি ভিড়ের মধ্যে এসে পড়েছি। ওদের বোঝাব কী করে, এই দুর্ভাবনা এখন ভুলে থাকাই শক্ত। মুশকিল এই যে, পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ আছে, মশা আছে, পুলিস আছে, স্বরাজ পররাজ বৈরাজ নৈরাজ্যের ভাবনা আছে, এরই মধ্যে ওই গাখোলা ছেলেটা দিনের শেষ প্রহরের বেকার বেলাতে ছাদের উপরে ঘুরে

বেড়ায়। আকাশের আলিঙ্গনে-বাঁধা ওই ভোলা মন ছেলেটিতে একটি নিত্যকালের কথা আছে, সে আমি শুনেছি, কিন্তু সে আমি ভাষায় কেমন করে স্পষ্ট করে তুলব।

আজ মনে হচ্ছে, ওই ছেলেটার কথা আমারই খুব ভিতরের কথা, গোলেমালে অনেক কাল তার দিকে চোখ পড়ে নি। বারো বছরের সেই নিত্য-ভোলা ইস্কুল-পালানো লক্ষ্মী-ছাড়াটা গাম্ভীর্যের নিবিড় ছায়ায় কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে খেলা করছিল। এখন ভাবনা ধরিয়ে দিলে, আমার আসল পরিচয় কোন্ দিকটায়। সেই আরম্ভ-বেলাকার সাতাশের দিকে, না, শেষ-বেলাকার ?

দায়িত্বের বোঝা মাথায় করে ষাটের আরম্ভে একবার আমেরিকায় গিয়েছিলুম। তখন য়ুরোপের যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে, কিন্তু তারই নেশায় তখনো আমেরিকার চোখ যে রকম রক্তবর্ণ য়ুরোপেরও এমন নয়। তার উপর তখন ইংরেজ নানা উপায়ে আমেরিকার শ্রবণেন্দ্রিয়ের পথ জুড়ে নিজের ভেঁপুটা বাজাচ্ছে। ডিমক্রাসির গুণ এই যে, নিজে ভাববার না আছে তার উত্তম, না আছে তার শক্তি। যে চতুর লোক, কানে মন্ত্র দেবার ব্যবস্থা আয়ত্ত করেছে সে নিজের ভাবনা তাকে ভাবায়। ঠিক এখনকার খবর জানি নে, তখন ইংরেজ আমেরিকার বিপুলকায় ডিমক্রাসিকে কানে ধরে নিজের ভাবনা ভাবাচ্ছিল। সেই কানে মন্ত্র দেবার যন্ত্রটা আমার বিরুদ্ধে তার চাকা চালিয়ে দিলে। ভয় ছিল পাছে, আমি ইংরেজের অপযশ রটাই। তার আগেই জালিয়ানওয়ালাবাগের ব্যাপার ঘটেছিল।

যাই হোক, যে কয়টা মাস আমেরিকায় কাটিয়েছি, হাওয়ার মধ্যে যেন একটা বিরোধের ঠেলা ছিল। ভাবুক যেখানেই আছে সেখানেই মানুষের আপনার দেশ, কোনো দেশে সেই ভাবুকতার স্রোতে যখন কমতি পড়ে তখন পদে পদে পাঁকের বাধায় বিদেশী পথিককে গ্লানি দেয়। যেদিন ভাবুকতার ঔদার্য থেকে রিক্ত আমেরিকাকে দেখলুম সেদিন দেখি সে ভয়ংকর ধনী, ভয়ংকর কেজো, সিদ্ধির নেশায় তার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ। তারই পাশে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে চেয়ে দেখি, আমি নিতান্ত কাঁচা, জন্ম-গরিব, একেবারে অস্থিতে-মজ্জাতে বেহিসাবি। এও বুঝলুম, এ জগতে কাঁচা মানুষের খুব একটা পাকা জায়গা আছে, চিরকেলে জায়গা। ষাট বছরে পৌঁছে হঠাৎ দেখলুম, সেই জায়গাটা দূরে ফেলে এসেছি।

যতই বুঝতে পারি ততই দেখতে পাই, পাকা দেয়ালগুলোই মায়া, পাথরের কেল্লাই কয়েদখানা। মন কাঁদছে, মরবার আগে গাখোলা ছেলের জগতে আর-একবার শেষ ছেলেখেলা খেলে নিতে, দায়িত্ববিহীন খেলা। আর, কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল, হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে

ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটল। তারা মস্ত বড়ো কিছুই নয়; তারা দেখা দিয়েছে কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ বা নদীর ধারে, কেউ বা ঘরের কোণে, কেউ বা পথের বাঁকে। তারা স্থায়ী কীর্তি রাখবার দল নয়, ক্ষমতার ক্ষয়বৃদ্ধি নিয়ে তাদের ভাবনাই নেই; তারা চলতে চলতে দুটো কথা বলেছে, সব কথা বলবার সময় পায় নি; তারা কালস্রোতের মাঝখানে বাঁধ বাঁধবার চেষ্টা করে নি, তারই ঢেউয়ের উপর নৃত্য করে চলে গেছে, তারই কলস্বরে সুর মিলিয়ে; হেসে চলে গেছে, তারই আলোর ঝিলিমিলির-মতো। তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললুম, "আমার জীবনে যাতে সত্যিকার ফসল ফলিয়েছে সেই আলোর, সেই উত্তাপের দূত তোমরাই। প্রণাম তোমাদের। তোমাদের অনেকেই এসেছিল ক্ষণকালের জন্য, আধো-স্বপ্ন, আধো-জাগার ভোরবেলায় শুকতারার মতো। প্রভাত না হতেই অস্ত গেল।" মধ্যাহ্নে মনে হল তারা তুচ্ছ; বোধ হল, তাদের ভুলেই গেছি। তার পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন নক্ষত্রলোক সমস্ত আকাশ জুড়ে আমার মুখের দিকে চাইল তখন জানলুম, সেই ক্ষণিকা তো ক্ষণিকা নয়, তারাই চিরকালের; ভোরের স্বপ্নে বা সন্ধ্যাবেলার স্বপ্নাবেশে জানতে না-জানতে তারা যার কপালে একটুখানি আলোর টিপ পরিয়ে দিয়ে যায় তাদের সৌভাগ্যের সীমা নেই। তাই মন বলছে, একদিন যারা ছোটো হয়ে এসেছিল আজ আমি যেন ছোটো হয়ে তাদের কাছে আর-একবার যাবার অধিকার পাই; যারা ক্ষণকালের ভান করে এসেছিল, বিদায় নেবার দিনে আর-একবার যেন তারা আমাকে বলে "তোমাকে চিনেছি"; আমি যেন বলি "তোমাদের চিনলুম"।

৭ই অক্টোবর ১৯২৪

একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে একদিন এক-মোটরে নিমন্ত্রণসভায় যাচ্ছিলুম। তিনি আমাকে কথাপ্রসঙ্গে খবর দিলেন যে, আজকাল পদ্য আকারে যে-সব রচনা করছি সেগুলি লোকে তেমন পছন্দ করছে না। যারা পছন্দ করছে না তাদের সুযোগ্য প্রতিনিধিস্বরূপে তিনি উল্লেখ করলেন তাঁর কোনো কোনো আত্মীয়ের কথা, সেই আত্মীয়েরা কবি; আর, যে সব পদ্যরচনা লোকে পছন্দ করে না তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন আমার গানগুলো আর আমার 'শিশু ভোলানাথ' নামক আধুনিক কাব্যগ্রন্থ। তিনি বললেন, আমার বন্ধুরাও আশঙ্কা করছেন আমার কাব্য লেখবার শক্তি ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে।

কালের ধর্মই এই। মর্তলোকে বসন্তঋতু চিরকাল থাকে না। মানুষের ক্ষমতার ক্ষয় আছে, অবসান আছে। যদি কখনো কিছু দিয়ে থাকি, তবে মূল্য দেবার সময়

তারই হিসাবটা স্মরণ করা ভালো। রাত্রিশেষে দীপের আলো নেববার সময় যখন সে তার শিখার পাখাতে বার-কতক শেষ ঝাপটা দিয়ে লীলা সাঙ্গ করে, তখন আশা দিয়ে নিরাশ করবার দাবিতে প্রদীপের নামে নালিশ করাটা বৈধ নয়। দাবিটাই যার বেহিসাবি দাবি অপূরণ হবার হিসাবটাতেও তার ভুল থাকবেই। পঁচানব্বই বছর বয়সে একটা মানুষ ফস্ করে মারা গেল বলে চিকিৎসাশাস্ত্রটাকে ধিক্কার দেওয়া বৃথা বাক্যব্যয়। অতএব, কেউ যদি বলে আমার বয়স যতই বাড়ছে আমার আয়ু ততই কমে যাচ্ছে, তা হলে তাকে আমি নিন্দুক বলি নে, বড়ো জোর এই বলি যে, লোকটা বাজে কথা এমনভাবে বলে যেন সেটা দৈববাণী। কালক্রমে আমার ক্ষমতা হ্রাস হয়ে যাচ্ছে, এই বিধিলিপি নিয়ে যুবক হোক, বৃদ্ধ হোক, কবি হোক, অকবি হোক, কারো সঙ্গে তকরার করার চেয়ে ততক্ষণ একটা গান লেখা ভালো মনে করি, তা সেটা পছন্দসই হোক আর না হোক। এমন-কি, সেই অবসরে 'শিশু ভোলানাথ'-এর জাতের কবিতা যদি লিখতে পারি, তা হলেও মনটা খুশি থাকে। কারণটা কী বলে রাখি।

আজ-নাগাদ প্রায় পনেরো-ষোলো বছর ধরে খুব কষে গানই লিখছি। লোক-রঞ্জনের জন্যে নয়, কেননা, পাঠকেরা লেখায় ক্ষমতার পরিচয় খোঁজে। ছোটো ছোটো একটু একটু গানে ক্ষমতার কায়দা দেখাবার মতো জায়গাই নেই। কবিত্বকে যদি রীতিমতো তাল ঠুকে বেড়াতেই হয় তা হলে অন্তত একটা বড়ো আখড়া চাই। তা ছাড়া গান জিনিসে বেশি বোঝাই সয় না; যারা মালের ওজন ক'রে দরের যাচাই করে, তারা এরকম দশ-বারো লাইনের হালকা কবিতার বাজার মাড়াতে চায় না। তবু আমি এই কয় বছরে এত গান লিখেছি যে, অন্তত সংখ্যা হিসাবে লম্বা দৌড়ের বাজিতে আমি বোধ হয় পয়লা নম্বরের পুরস্কার পেতে পারি।

আর-একটা কথা বলে রাখি, গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয় এমন আর কিছুতে হয় না। এমন নেশায় ধরে যে, তখন গুরুতর কাজের গুরুত্ব একেবারে চলে যায়, বড়ো বড়ো দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়, কর্তব্যের দাবিগুলোকে মন এক-ধার থেকে নামঞ্জুর করে দেয়।

এর কারণ হচ্ছে, বিশ্বকর্মার লীলাখেলার স্রোতটার মধ্যে হঠাৎ পড়ে গেলে শুকনো ডাঙার কথাটা একেবারেই মনে থাকে-না। শরতের গাছতলা শিউলি ফুলের অপব্যয়ে ছেয়ে গেল, নিকেশ নেবার কোনো কথাই কেউ বলে না। যা হল কেবল তাই দেখেই বলি, যথেষ্ট হয়েছে। ঘোর গরমে ঘাসগুলো শুকিয়ে সব হলদে হয়ে গেল; বর্ষার প্রথম পসলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পরেই হঠাৎ দেখি, ঘাসে অতি ছোটো ছোটো

বেগনি ফুলে হলদে ফুলে মাতামাতি। কে দেখে কে না দেখে তার খেয়াল নেই। এটা হল রূপের লীলা, কেবলমাত্র হয়ে ওঠাতেই আনন্দ। এই মেঠো ফুলের একটি মঞ্জরী তুলে ধরে আমি বলি, বাহবা। কেন বলি। ও তো খাবার জিনিস নয়, বেচবার জিনিস নয়, লোহার সিন্দুকে তালা বন্ধ করে রাখবার জিনিস নয়। তবে ওতে আমি কী দেখলুম যাতে আমার মন বললে "সাবাস"। বস্তু দেখলুম ? বস্তু তো একটা মাটির ঢেলার মধ্যে ওর চেয়ে অনেক বেশি আছে। তবে ? আমি দেখলুম, রূপ। সে কথাটার অর্থ কী। রূপ ছাড়া আর কোনোই অর্থ নেই। রূপ শুধু বলে, "এই দেখো, আমি হয়ে উঠেছি।" যদি আমার মন সায় দিয়ে বলে "তাই তো বটে, তুমি হয়েছ, তুমি আছ" আর এই বলেই যদি সে চুপ করে যায়, তা হলেই সে রূপ দেখলে ; হয়ে-ওঠাকেই চরম বলে জানলে। কিন্তু, সজনে ফুল যখন অরূপসমুদ্রে রূপের ঢেউ তুলে দিয়ে বলে "এই দেখো আমি আছি", তখন তার কথাটা না বুঝে আমি যদি গোঁয়ারের মতো বলে বসি "কেন আছ"— তার মুখ থেকে যদি অত্যন্ত মিথ্যে জবাব আদায় করে নিই, যদি তাকে দিয়ে বলাই "তুমি খাবে বলেই আছি", তা হলে রূপের চরম রহস্যটা দেখা হল না। একটি ছোট্টো মেয়ে কোথা থেকে আমার যাত্রাপথে জুটে গেছে। তার বয়স আড়াই বছর। তার মধ্যে প্রাণের আনন্দ টলমল করে ওঠে, কত মধুর প্রলাপে, কত মন-ভোলানো ভঙ্গীতে ; আমার মন বলে, "মস্ত একটা পাওনা আমি পেলুম।" কী যে পেলুম তাকে হিসাবের অঙ্কে ছ'কে নেবার জো নেই। আর-কিছু নয়, একটি বিশেষ হয়ে-ওঠাকেই আমি চরম করে দেখলুম। ওই ছোট্ট মেয়ের হয়ে-ওঠাই আমার পরম লাভ। ও আমার ঘর ঝাঁট দেয় না, রান্না করে না, তাতে ওর ওই হয়ে-ওঠার হিসাবটাতে কিছুই কম পড়ছে না। বৈজ্ঞানিক এর হয়তো একটা মোটা কৈফিয়ত দেবে, বলবে, "জীবজগতে বংশরক্ষাটাই সবচেয়ে বড়ো দরকার ; ছোটো মেয়েকে সুন্দর না লাগলে সেই দরকারটাতে বাধা পড়ে।" মোটা কৈফিয়তটাকে আমি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করি নে, কিন্তু তার উপরেও একটা সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে যার কোনো কৈফিয়ত নেই। একটা ফলের ডালি দেখলে মন খুশি হয়ে ওঠে, আর মাছের ঝোলের পাত্র দেখলে যারা নিরামিষাশী নয় তাদের মন খুশি হতে পারে ; আহারের প্রয়োজনটা উভয়তই আছে ; সুতরাং খুশির একটা মোটা কৈফিয়ত উভয়তই পাওয়া যায়। তৎসত্ত্বেও ফলের ডালিতে এমন একটি বিশেষ খুশি আছে যা কোনো কৈফিয়ত তলবই করে না। সেইখানে ওই একটি মাত্র কথা, ফলগুলি বলছে "আমি আছি"— আর আমার মন বলে, সেইটেই আমার লাভ। আমার জীবনযাত্রার এই আড়াই বছরের ক্ষুদ্রতমা সহচরীটিও মানবের বংশরক্ষার কৈফিয়ত দাখিল করেও এমন কিছু বাকি রাখে যেটা বিশ্বের মর্মকুহর হতে

উত্থিত ওঙ্কারধ্বনিরই সুর। বিশ্ব বলছে ওঁ; বলছে, হাঁ; বলছে, অয়মহং ভোঃ, এই-যে আমি। ওই মেয়েটিও সেই ওঁ, সেই হাঁ, সেই এই-যে আমি। সত্তাকে সত্তা বলেই যেখানে মানি সেখানে তার মধ্যে আমি সেই খুশিকেই দেখি যে খুশি আমার নিজের মধ্যে চরমরূপে রয়েছে। দাসের মধ্যে সেই খুশিকে দেখি নে বলেই দাসত্ব এত ভয়ংকর মিথ্যে, আর মিথ্যে বলেই এত ভয়ংকর তার পীড়া।

সৃষ্টির মূলে এই লীলা, নিরন্তর এই রূপের প্রকাশ। সেই প্রকাশের অহৈতুক আনন্দে যখন যোগ দিতে পারি তখন সৃষ্টির মূল আনন্দে গিয়ে মন পৌঁছয়। সেই মূল আনন্দ আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত, কারো কাছে তার কোনো জবাবদিহি নেই।

ছোটো ছেলে ধুলোমাটি কাটাকুটো নিয়ে সারাবেলা বসে বসে একটা কিছু গড়ছে। বৈজ্ঞানিকের মোটা কৈফিয়ত হচ্ছে এই যে, গড়বার শক্তি তার জীবনযাত্রার সহায়, সেই শক্তির চালনা চাই। এ কৈফিয়ত স্বীকার করে নিলুম; তবুও কথাটার মূলের দিকে অনেকখানি বাকি থাকে। গোড়াকার কথা হচ্ছে এই যে, তার সৃষ্টিকর্তা মন বলে "হোক", "Let there be"— সেই বাণীকে বহন করে ধুলোমাটি কুটোকাটি সকলেই বলে ওঠে, "এই দেখো হয়েছে।"

এই হওয়ার অনেকখানিই আছে শিশুর কল্পনায়। সামনে যখন তার একটা ঢিবি তখন কল্পনা বলছে, "এই তো আমার রূপকথার রাজপুত্রের কেল্লা।" তার ওই ধুলোর স্তূপের ইশারার ভিতর দিয়ে শিশু সেই কেল্লার সত্তা মনে স্পষ্ট অনুভব করছে; এই অনুভূতিতেই তার আনন্দ। গড়বার শক্তিকে প্রকাশ করছি বলে আনন্দ নয়, কেননা, সে শক্তি এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রকাশ পাচ্ছে না। একটি রূপবিশেষকে চিত্তে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ব'লে আনন্দ। সেই রূপটাকে শেষলক্ষ্য করে দেখাই হচ্ছে সৃষ্টিকে দেখা; তার আনন্দই সৃষ্টির মূল আনন্দ।

গান জিনিসটা নিছক সৃষ্টিলীলা। ইন্দ্রধনু যেমন বৃষ্টি আর রৌদ্রের জাদু, আকাশের দুটো খামখেয়ালি মেজাজ-দিয়ে গড়া তোরণ, একটি অপূর্ব মুহূর্তকাল সেই তোরণের নীচে দিয়ে জয়যাত্রা করবে। হয়ে গেল এই খেলা, মুহূর্তটি তার রঙিন উত্তরীয় উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল— তার বেশি আর কিছু নয়। মেজাজের এই রঙিন খেলাই হচ্ছে গীতিকাব্য। ওই ইন্দ্রধনুর কবিটিকে পাকড়াও করে যদি জিজ্ঞাসা করা যেত "এটার মানে কী হল" সাফ জবাব পাওয়া যেত "কিছুই না"। "তবে?" "আমার খুশি।" রূপেতেই খুশি— সৃষ্টির সব প্রশ্নের এই হল শেষ উত্তর।

এই খুশির খেলাঘরে রূপের খেলা দেখে আমাদের মন ছুটি পায় বস্তুর মোহ থেকে; একেবারে পৌঁছয় আনন্দে, এমন কিছুতে যার ভার নেই, যার মাপ নেই, যা অনির্বচনীয়।

সেদিন সমুদ্রের মাঝে পশ্চিম আকাশে, 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতে' গড়া সূর্যাস্তের একখানি রূপসৃষ্টি দেখলুম। আমার যে পাকাবুদ্ধি সোনার খনির মুনফা গোনে সে বোকার মতো চুপ করে রইল, আর আমার যে কাঁচা মনটা বললে "দেখেছি" সে স্পষ্ট বুঝতে পারলে সোনার খনির মুনফাটাই মরীচিকা আর যার আবির্ভাবকে ক্ষণকালের জন্যে ওই চিহ্নহীন সমুদ্রে নামহীন আকাশে দেখা গেল তারই মধ্যে চিরকালের অফুরান ঐশ্বর্য, সেই হচ্ছে অরূপের মহাপ্রাঙ্গণে রূপের নিত্যলীলা।

সৃষ্টির অন্তরতম এই অহৈতুক লীলার রসটিকে যখন মন পেতে চায় তখনই বাদশাহি বেকারের মতো সে গান লিখতে বসে। চারখানি পাপড়ি নিয়ে একটি ছোটো জুঁইফুলের মতো একটুখানি গান যখন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তখন সেই মহা-খেলাঘরের মেজের উপরেই তার জন্যে জায়গা করা হয় যেখানে যুগ যুগ ধরে গ্রহনক্ষত্রের খেলা হচ্ছে। সেখানে যুগ আর মুহূর্ত একই, সেখানে সূর্য আর সূর্যমণি ফুলে অভেদাত্মা, সেখানে সাঁঝসকালে মেঘে মেঘে যে রাগরাগিণী আমার গানের সঙ্গে তার অন্তরের মিল আছে।

আজ পনেরো-ষোলো বছর ধরে কর্তব্যবুদ্ধি আমাকে নানা ভাবনা নানা ব্যস্ততার মধ্যে জোরে টেনে নিয়ে ফেলে আমার কাছ থেকে কষে কাজ আদায় করে নিচ্ছে। এখানকার সকল কাজই মোটা কৈফিয়তের অপেক্ষা রাখে। খোঁচা দিয়ে দিয়ে কেবলই জিজ্ঞাসা করে, "ফল হবে কি।" সেইজন্যে যার ফরমাশ কৈফিয়তের সীমানা পেরিয়ে আপন বেদরকারি পাওনা দাবি করে ভিতরে-ভিতরে সে আমাকে কেবলই প্রশ্ন করতে থাকে, "তুমি কবি, চির-ছুটির পরোয়ানা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছ, তার করলে কী। কাজের ভিড়ের টানাটানিতে পড়ে একেবারেই জাত খুইয়ে বোসো না।" নিশ্চয় ওরই এই তাগিদেই আমাকে গান লেখায়; হট্টগোলের মধ্যেও নিজের পরিচয়টা বজায় রাখবার জন্যে, লোকরঞ্জনের জন্যে নয়। কর্তব্যবুদ্ধি তার কীর্তি ফেঁদে গম্ভীরকণ্ঠে বলে, "পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে গুরুতর।" তাই আমার ভিতরকার বিধিদত্ত ছুটির খেয়াল বাঁশি বাজিয়ে বলে, "পৃথিবীতে আমিই সবচেয়ে লঘুতম।" লঘু নয় তো কী! সেই জন্যে সব জায়গাতেই হাওয়ায় হাওয়ায় তার পাখা চলে, তার রঙ-বেরঙের পাখা। ইমারতের মোটা ভিত ফেঁদে সময়ের সদ্‌ব্যয় করা তার জাত-ব্যাবসা নয়; সে লক্ষ্মীছাড়া ঘুরে বেড়ায় ফাঁকির পথে, যে পথে রঙের ঝরনা রসের ধারা ঝরে ঝরে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে বিপুল একটা বাজেখরচের মতো।

আমার কেজো পরিচয়টার প্রতি ঈর্ষা ক'রে অবজ্ঞা ক'রে আমার অকেজো পরিচয়টা আমাকে যখন-তখন গান লিখিয়ে লিখিয়ে নিজের দলিল ঠিক করে রাখছে। যখন বিরুদ্ধপক্ষে মাতব্বর সাক্ষী এসে জোটে, তখনই নিজের দাবির দলিল খুব বড়ো করে

ভুলতে হয়। যতদিন ধরে এক পক্ষে আমার কাজের রোকড় খুব মোটা হয়ে উঠছে ততদিন ধরেই অন্যপক্ষে আমার ছুটির নথিও অসম্ভব-রকম ভারী হয়ে উঠল। এই যে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছে, এটা আমার অন্তরের খাস-কামরায়। আমি আসলে কোন্ পক্ষের, সেইটের বিচার নিয়ে আমারই কাছে নালিশ।

তার পরে কথাটা এই যে, ওই 'শিশু ভোলানাথ'-এর কবিতাগুলো খামকা কেন লিখতে বসেছিলুম। সেও লোকরঞ্জনের জন্যে নয়, নিতান্ত নিজের গরজে।

পূর্বেই বলেছি, কিছুকাল আমেরিকার প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গে আটকা পড়েছিলুম। সেদিন খুব স্পষ্ট বুঝেছিলুম, জমিয়ে তোলবার মতো এত বড়ো মিথ্যে ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই। এই জমাবার জমাদারটা বিশ্বের চিরচঞ্চলতাকে বাধা দেবার স্পর্ধা করে; কিন্তু কিছুই থাকবে না, আজ বাদে কাল সব সাফ হয়ে যাবে। যে স্রোতের ঘূর্ণিপাকে এক-এক জায়গায় এই-সব বস্তুর পিণ্ড-গুলোকে স্তূপাকার করে দিয়ে গেছে সেই স্রোতেরই অবিরত বেগে ঠেলে ঠেলে সমস্ত ভাসিয়ে নীল সমুদ্রে নিয়ে যাবে— পৃথিবীর বক্ষ সুস্থ হবে। পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলা-শক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ; সে কিছু জমতে দেয় না, কেননা, জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়; সে যে নিত্যনূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্যে তার অবকাশকে নির্মল করে রেখে দিতে চায়। লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল জড়ো ক'রে সেইগুলোকে আগলে রাখবার জন্যে নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরি করে তুলছে। সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে; এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না। আকাশের উপর দিয়ে যেমন ধুলানিবিড় আঁধি ক্ষণকালের জন্যে সূর্যকে পরাভূত করে দিয়ে তার পরে নিজের দৌরাত্ম্যের কোনো চিহ্ন না রেখে চলে যায়, এসব তেমনি করেই শূন্যের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কিছুকালের জন্যে আমি এই বস্তু-উদ্গারের অন্ধযন্ত্রের মুখে এই বস্তুসঞ্চয়ের অন্ধ-ভাণ্ডারে বদ্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধপ্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম। তখন আমি এই ঘন দেয়ালের বাইরের রাস্তা থেকে চিরপথিকের পায়ের শব্দ শুনতে পেতুম। সেই শব্দের ছন্দই যে আমার রক্তের মধ্যে বাজে, আমার ধ্যানের মধ্যে ধ্বনিত হয়। আমি সেদিন স্পষ্ট বুঝেছিলুম, আমি ওই পথিকের সহচর।

আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে বসেছিলুম। বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে, তেমনি করে।

দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্যে এত বড়ো আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশু-লীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।

এ কথাটার এতক্ষণ ধরে আলোচনা করছি এইজন্যে যে, যে লীলালোকে জীবন-যাত্রা শুরু করেছিলুম, সে লীলাক্ষেত্রে জীবনের প্রথম অংশ অনেকটা কেটে গেল, সেই-খানেই জীবনটার উপসংহার করবার উদ্‌বেগে কিছুকাল থেকেই মনের মধ্যে একটা মন-কেমন-করার হাওয়া বইছে। একদা পদ্মার ধারে আকাশের পারে সংসারের পথে যারা আমার সঙ্গী ছিল তারা বলছে, সেদিনকার পালা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায় নি, বিদায়ের গোধূলিবেলায় সেই আরম্ভের কথাগুলো সাঙ্গ করে যেতে হবে। সেইজন্যেই সকাল-বেলাকার মল্লিকা সন্ধ্যাবেলাকার রজনীগন্ধা হয়ে তার গন্ধের দূত পাঠাচ্ছে। বলছে, "তোমার খ্যাতি তোমাকে না টানুক, তোমার কীর্তি তোমাকে না বাঁধুক, তোমার গান তোমাকে পথের পথিক ক'রে তোমাকে শেষযাত্রায় রওনা করে দিক। প্রথম বয়সের বাতায়নে বসে তুমি তোমার দূরের বঁধুর উত্তরীয়ের সুগন্ধি হাওয়া পেয়েছিলে। শেষ-বয়সের পথে বেরিয়ে গোধূলিরাগের রাঙা আলোতে তোমার সেই দূরের বঁধুর সন্ধানে নির্ভয়ে চলে যাও। লোকের ডাকাডাকি শুনো না। সুর যে দিক থেকে আসছে সেই দিকে কান পাতো— আর সেই দিকেই ডানা মেলে দাও সাগরপারের লীলালোকের আকাশপথে। যাবার বেলায় কবুল করে যাও যে, তুমি কোনো কাজের নও, তুমি অস্থায়ীদের দলে।"

ক্রাকোভিয়া জাহাজ

৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

মার্সেল্‌স্‌ বন্দরে নেমে রেলে চড়লেম। পশ্চিমদেশের একটা পরিচয় পেলেম ভোজন-কামরায়। আকাশে গ্রহমালার আবর্তনের মতো থালার পর থালা ঘুরে আসছে, আর ভোজ্যের পর ভোজ্য।

ঘরের দাবি পথের উপর চলে না। ঘরে আছে সময়ের অবসর, ঘরে আছে স্থানের অবকাশ। সেখানে জীবনযাত্রার আয়োজনের ভার বেশি করে জমে ওঠবার বাধা নেই। কিন্তু, চলতি পথে উপকরণভার যথাসম্ভব হালকা করাই সাধারণ লোকের

পক্ষে সংগত। হরিণের শিঙ বটগাছের ডাল-আবডালের মতো অত অধিক, অত বড়ো, অত ভারী হলে সেটা জঙ্গম প্রাণীর পক্ষে বেহিসাবি হয়।

চিরকাল, বিশেষত পূর্বকালে, রাজা-রাজড়া আমীর-ওমরাওরা ভোগের ও ঐশ্বর্যের বোঝাকে সর্বত্র সকল অবস্থাতেই ভরপুরভাবে টেনে বেড়িয়েছে। সংসারের উপর তাদের আবদার অত্যন্ত বেশি। সে আবদার সংসার মেনে নিয়েছে, কেননা, এদের সংখ্যা তেমন বেশি নয়। রেলগাড়ির ভোজনশালায় থালার সংখ্যা, ভোজ্যের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য, পরিচর্যার ব্যবস্থা, এত বাহুল্যময় যে, পূর্বকালের রাজকীয় সম্প্রদায়ই পথিক-অবস্থাতেও তা দাবি করতে পারত। এখন জনসাধারণের সকলের জন্যে এই আয়োজন।

ভোগের এত বড়ো বাহুল্যে সকল মানুষেরই অধিকার আছে, এই কথাটার আকর্ষণ অতি ভয়ানক। এই আকর্ষণে দেশজোড়া মানুষের সিঁধকাঠি বিশ্বভাণ্ডারের দেয়াল ফুটো করতে উদ্যত হয়। লুব্ধ সভ্যতার এই উপদ্রব সর্বনেশে।

যেটা বাহুল্য তাতে ছোটো বড়ো কোনো মানুষের কোনো অধিকার নেই, এই কথাটা গত যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্মনি প্রভৃতি যুদ্ধরত দেশকে অনেকদিন ধরেই স্বীকার করতে হল। তখন তারা আপনার সহজ আয়োজনের অনুপাতে নিজের ভোগকে সংযত করেছিল। তখন তারা বুঝেছিল, মানুষের আসল প্রয়োজনের ভার খুব বেশি নয়। যুদ্ধ-অবসানে সে কথাটা ভুলতে দেরি হয় নি।

অনতিপ্রয়োজনীয়কে প্রয়োজনীয় করে তোলা যখন দেশসুদ্ধ সকল লোকেরই নিত্য সাধনা হয় তখন বিশ্বব্যাপী দস্যুবৃত্তি অপরিহার্য হয়ে ওঠে। লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যা নিয়ে পাশ্চাত্যেরা অনেকেই উদ্‌বেগ প্রকাশ করে থাকেন। সমস্যাটি কঠিন হবার প্রধান কারণ হচ্ছে, সর্বসাধারণেরই ভোগবাহুল্যের প্রতি দাবি। এত বড়ো ব্যাপক দাবি মেটাতে গেলে ধর্মরক্ষা করা চলে না, মানুষকে মানুষপীড়ক হতেই হয়। সেই পীড়ন-কার্যে ভালো করে হাত পাকানো হয় দূরস্থ অনাত্মীয় জাতির উপর দিয়ে। এর বিপদ এই যে, জীবনক্ষেত্রের যে কিনারাতেই ধর্মবুদ্ধিতে আগুন লাগানো হোক-না, সে আগুন সেইখানেই থেমে থাকে না। ভোগী স্বভাবতই যে নিষ্ঠুরতার সাধনা করে তার সীমা নেই, কারণ, আত্মম্ভরিতা কোথাও এসে বলতে জানে না, "এইবার বস্‌ হয়েছে।" বস্তুগত আয়োজনের অসংগত বাহুল্যকেই যে সভ্যতার প্রধান লক্ষণ বলে মানা হয় সে সভ্যতা অগত্যাই নরভুক্‌। নররক্তশোষণের বিশ্বব্যাপী চর্চা একদিন আত্মহত্যায় ঠেকবেই, এতে আর সন্দেহ করা চলে না।

রেলগাড়ির ভোজনশালায় একদিকে যেমন দেখা গেল ভোগের বাহুল্য, আর-এক-দিকে তেমনি দেখলেম কর্মের গতিবেগ। সময় অল্প, আরোহী অনেক, ভোজ্যের

বৈচিত্র্য প্রচুর, ভোজের-উপকরণ বিস্তর— তাই পরিবেশনকর্মের অভ্যাস অতি আশ্চর্য দ্রুত হয়ে উঠেছে। পরিবেশনের যন্ত্রটাতে খুবই প্রবল জোরে দম দেওয়া হয়েছে। যেটা এই পরিবেশনে দেখা গেল পাশ্চাত্যের সমস্ত কর্মচালনার মধ্যেই সেই ক্ষিপ্রবেগ।

যে যন্ত্র বাহিরের ব্যবহারের জন্য তার গতির ছন্দ দম দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলা চলে। কিন্তু আমাদের প্রাণের, আমাদের হৃদয়ের ছন্দের একটা স্বাভাবিক লয় আছে; তার উপরে দ্রুত প্রয়োজনের জবরদস্তি খাটে না। দ্রুত-চলাই যে দ্রুত-এগনো সে কথা সত্য হতে পারে কলের গাড়ির পক্ষে, মানুষের পক্ষে না। মানুষের চলার সঙ্গে হওয়া আছে; সেই চলাতে হওয়াতে মিল ক'রে চলাই মানুষের চলা, কলের গাড়ির সে উপসর্গ নেই। আপিসের তাগিদে মুহূর্তের মধ্যে এক গ্রাসের জায়গায় চার গ্রাস খাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু, সেই চার গ্রাস ঘড়ি ধরে হজম করা কলের মনিবের হুকুমে হতে পারে না। গ্রামোফোনের কান যদি মলে দেওয়া যায় তবে যে গান গাইতে চার মিনিট লেগেছিল তাকে শুনতে আধ মিনিটের বেশি না লাগতে পারে, কিন্তু সংগীত হয়ে ওঠে চীৎকার। রসভোগ করবার জন্যে রসনার নিজের একটা নির্ধারিত সময় আছে; সন্দেশকে যদি কুইনিনের বড়ির মতো টপ্ করে গেলা যায় তা হলে বস্তুটাকে পাওয়া যায়, বস্তুর রস পাওয়া যায় না। তীরবেগে বাইসিক্‌ল্ ছুটিয়ে যদি পদাতিক বন্ধুর চাদর ধরি তা হলে বাইসিক্‌লের জয়পতাকা হাতে আসবে, কিন্তু বন্ধুকে বুকে পাবার উপায় সেটা নয়; কলের বেগ বাইরের দরকারে কাজে লাগে, অন্তরের দাবি মেটাবার বেলায় অন্তরের ছন্দ না মানলে চলে না।

বাইরের বেগ অন্তরের ছন্দকে অত্যন্ত বেশি পেরোয় কখন। যখন বাহ্য প্রয়োজনের বড়ো বাড় বাড়ে। তখন মানুষ পড়ে পিছিয়ে, কলের সঙ্গে সে তাল রাখতে পারে না। য়ুরোপে সেই মানুষ-ব্যক্তিটি দিনে দিনে বহু দূরে পড়ে গেল; কল গেল এগিয়ে; তাকেই সেখানকার লোকে বলে অগ্রসরতা, প্রোগ্রেস্।

সিদ্ধি, যাকে ইংরেজিতে বলে সাক্‌সেস্, তার বাহন যত দৌড়ে চলে ততই ফল পায়। য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্রনীতির যুদ্ধনীতির বাণিজ্যনীতির তুমুল ঘোড়-দৌড় চলছে জলে স্থলে আকাশে। সেখানে বাহ্য প্রয়োজনের গরজ অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠল, তাই মনুষ্যত্বের ডাক শুনে কেউ সবুর করতে পারছে না। বীভৎস সর্বভুক্ পেটুকতার উদ্যোগে পলিটিক্‌স্ নিয়ত ব্যস্ত। তার গাঁট-কাটা ব্যবসায়ের পরিধি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্বকালে যুদ্ধবিগ্রহের পদ্ধতিতে ধর্মবুদ্ধি যেখানে মাঝে মাঝে বাধা খাড়া করে রেখেছিল, ডিপ্লমাসি সেখানে আজ লাফ-মারা হার্ড্‌ল্ রেস্ খেলে চলেছে। সবুর সয় না যে! বিষবায়ুবাণ যুদ্ধের অস্ত্ররূপে যখন এক পক্ষ

ব্যবহার করলে তখন অন্য পক্ষ ধর্মবুদ্ধির দোহাই পাড়লে। আজ সকল পক্ষই বিষের সন্ধানে উঠে পড়ে লেগেছে; যুদ্ধকালে নিরস্ত্র পুরবাসীদের প্রতি আকাশ থেকে অগ্নিবাণ বর্ষণ নিয়ে প্রথমে শোনা গেল ধর্মবুদ্ধির নিন্দাবাণী। আজ দেখি, ধার্মিকেরা স্বয়ং সামান্য কারণে পল্লীবাসীদের প্রতি কথায় কথায় পাপবজ্র সন্ধান করছে। গত যুদ্ধের সময় শত্রুর সম্বন্ধে নানা উপায়ে সজ্ঞানে সচেষ্টভাবে সত্যগোপন ও মিথ্যা-প্রচারের শয়তানি অস্ত্র ব্যবহার প্রকাণ্ডভাবে চলল। যুদ্ধ থেমেছে কিন্তু সেই শয়তানি আজও থামে নি। এমন-কি, অক্ষম ভারতবর্ষকেও প্রবলের প্রপাগাণ্ডা রেয়াত করে না। এই সব নীতি হচ্ছে সবুর-না-করা নীতি; এরা হল পাপের দ্রুত চাল; এরা প্রতি পদেই বাহিরে জিতছে বটে কিন্তু সে জিত অন্তরের মানুষকে হারিয়ে দিয়ে। মানুষ আজ নিজের মাথা থেকে জয়মাল্য খুলে নিয়ে কলের গলায় পরিয়ে দিলে। রসাতল থেকে দানব বলছে, "বাহবা!"—

রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় উর্ধ্বস্বরে ডাকি,
"থামো, থামো কোথা তুমি রুদ্রবেগে রথ যাও হাঁকি,
সম্মুখে আমার গৃহ।"
রথী কহে, "ওই মোর পথ,
ঘুরে গেলে দেরি হবে, বাধা ভেঙে সিধা যাবে রথ।"
গৃহী কহে, "নিদারুণ ত্বরা দেখে মোর ডর লাগে—
কোথা যেতে হবে বলো।"
রথী কহে, "যেতে হবে আগে।"
"কোন্‌খানে" শুধাইল।
রথী বলে, "কোনোখানে নহে,
শুধু আগে।"
"কোন্‌ তীর্থে, কোন্‌ সে মন্দিরে" গৃহী কহে।
"কোথাও না, শুধু আগে।"
"কোন্‌ বন্ধু সাথে হবে দেখা।"
"কারো সাথে নহে, যাব সব আগে আমি মাত্র একা।"
ঘর্ঘরিত রথবেগ গৃহভিত্তি করি দিল গ্রাস;
হাহাকারে, অভিশাপে, ধূলিজালে ক্ষুভিল বাতাস
সন্ধ্যার আকাশে! আঁধারের দীপ্ত সিংহদ্বার-বাগে
রক্তবর্ণ অস্তপথে ছোটে রথ লক্ষ্যশূন্য আগে।

ক্রাকোভিয়া জাহাজ
৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

ক

বিষয়ী লোক শতদলের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে একটি একটি করে জমা করে আর বলে, "পেয়েছি!" তার সঞ্চয় মিথ্যে। সংশয়ী লোক শতদলের পাপড়ি একটি একটি করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তাকে কেটে কুটে নিঙরে মুচড়ে বলে, "পাই নি!" অর্থাৎ, সে উলটো দিকে চেয়ে বল্লে, "নেই।" রসিক লোক সেই শতদলের দিকে "আশ্চর্যবৎ পশ্যতি"। এই আশ্চর্যের মানে হল পেয়েছি পাই-নি দুই-ই সত্য। প্রেমিক বললে, "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।" অর্থাৎ, বললে লক্ষযুগের পাওয়া অল্পকালের মধ্যেই পেয়েছি আবার সেই সঙ্গেই লক্ষযুগের না-পাওয়াও লেগেই রইল। সময়টা যে আপেক্ষিক, রসের ভাষায় সে কথাটা অনেকদিন থেকে বলা চলছে, বিজ্ঞানের ভাষায় আজ বলা হল।

যখন ছোটো ছিলেম, মনে পড়ে, বিশ্বজগৎ আমার কাছে প্রতিদিন অন্ধকার রাত্রির গর্ভ থেকে নূতন দেহ ধরে জন্ম নিত। পরিচয় আর অপরিচয় আমার মনের মধ্যে এক হয়ে মিলেছিল। আর সেই শিশুকাল পথিকের কাল। তখন পথের শেষের দিকে লক্ষ্য খুঁজি নি, পথের আশেপাশে চেয়ে চেয়ে চলছি, যেন কোন্ আবছায়ার ভিতর থেকে আচমকা দেখা দেবে একটা "কী জানি", একটা "হয়তো"। বারান্দার কোণে খানিকটা ধুলো জড়ো করে আতার বিচি পুঁতে রোজ জল দিয়েছি। আজ যেটা আছে বীজ কাল সেটা হবে গাছ, ছেলেবেলায় সে একটা মস্ত "কী জানি"র দলে ছিল। সেই কী-জানিকে দেখাই সত্য দেখা। সত্যের দিকে চেয়ে যে বলে "জানি" সেও তাকে হারায়, যে বলে "জানি নে" সেও করে ভুল, আমাদের ঋষিরা এই বলেন। যে বলে "খুব জানি" সেই অবোধ সোনা ফেলে চাদরের গ্রন্থিকে পাওয়া মনে করে, যে বলে "কিছুই জানি নে" সে তো চাদরটাকে সুদ্ধ খুইয়ে বসে। আমি ঈশোপনিষদের এই মানেই বুঝি। "জানি না" যখন "জানি"র আঁচলে গাঁঠছড়া বেঁধে দেখা দেয় তখন মন বলে, "ধন্য হলেম।" পেয়েছি মনে করার মতো হারানো আর নেই।

খ

এই জন্যেই ভারতবর্ষকে ইংরেজ যেমন করে হারিয়েছে এমন আর য়ুরোপের কোনো জাত নয়। ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটা চিরকেলে রহস্য আছে সেটা তার কাছ থেকে সরে গেল। তার ফৌজের গাঁঠের মধ্যে যে বস্তুটাকে কষে বাঁধতে পারলে সেইটেকেই

সে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ বলে বুক ফুলিয়ে গরীয়ান হয়ে বসে রইল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তার বিস্ময় নেই, অবজ্ঞা যথেষ্ট আছে। রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বাইরে ইংরেজ ভারত সম্বন্ধে যত অল্প আলোচনা করেছে এমন ফ্রান্স করে নি, জর্মনি করে নি। পোলিটিশনের চশমার বাইরে ভারতবর্ষ ইংরেজজাতির গোচরে আছে, এ কথাটা তার দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক কাগজ পড়ে দেখলে বোঝা যায় না।

এর একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। প্রয়োজন-সাধনের দেখা নিছক পাওয়ারই দেখা, তার মধ্যে না-পাওয়ার আয়োজন নেই। এই জন্যেই একে সত্যের দেখা বলা যায় না। এই দেখায় সত্য নেই বলেই তাতে বিস্ময় নেই, শ্রদ্ধা নেই।

প্রয়োজনের সম্বন্ধ হচ্ছে কেবলই গ্রহণের সম্বন্ধ; তাতে লোভ আছে, আনন্দ নেই। সত্যের সম্বন্ধ হচ্ছে পাওয়া এবং দেওয়ার মিলিত সম্বন্ধ; কেননা, আনন্দই মন খুলে দিতে জানে। এই কারণেই দেখতে পাই; ভারতবর্ষের প্রতি ইংরেজের ব্যক্তিগত বদান্যতার অদ্ভুত অভাব। এ কথা নিয়ে নালিশ করা বৃথা, এইটেই স্বাভাবিক। ইংরেজের লোভ যে ভারতবর্ষকে পেয়েছে ইংরেজের আত্মা সেই ভারতবর্ষকে হারিয়েছে। এই-জন্যেই ভারতবর্ষে ইংরেজের লাভ, ভারতবর্ষে ইংরেজের গর্ব, ভারতবর্ষে ইংরেজের ক্লেশ। এইজন্যে ভারতবর্ষকে স্বাস্থ্য দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, মুক্তি দেওয়া সম্বন্ধে ইংরেজের ত্যাগ দুঃসাধ্য কিন্তু শাস্তি দেওয়া সম্বন্ধে ইংরেজের ক্রোধ অত্যন্ত সহজ। ইংরেজ-ধনী বাংলা-দেশের রক্ত-নেংড়ানো পাটের বাজারে শতকরা চার-পাঁচশো টাকা মুনফা শুষে নিয়েও যে দেশের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এক পয়সাও ফিরিয়ে দেয় না, তার দুর্ভিক্ষে বন্যায় মারী-মড়কে যার কড়ে আঙুলের প্রান্তও বিচলিত হয় না, যখন সেই শিক্ষাহীন স্বাস্থ্যহীন উপবাসক্লিষ্ট বাংলাদেশের বুকের উপর পুলিসের জাঁতা বসিয়ে রক্তচক্ষু কর্তৃপক্ষ কড়া আইন পাস করেন তখন সেই বিলাসী ধনী স্ফীত মুনফার উপর আরামের আসন পেতে বাহবা দিতে থাকে; বলে, "এই তো পাকা চালে ভারতশাসন।"

এইটেই স্বাভাবিক। কেননা, ওই ধনী বাংলাদেশকে একেবারেই দেখতে পায় নি, তার মোটা মুনফার ওপারে বাংলাদেশ আড়ালে পড়ে গেছে। বাংলাদেশের প্রাণের নিকেতনে যেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণার কান্না, বাংলাদেশের হৃদয়ের মাঝখানে যেখানে তার সুখ-দুঃখের বাসা, সেখানে মানুষের প্রতি মানুষের মৈত্রীর একটা বড়ো রাস্তা আছে, সেখানে ধর্মবুদ্ধির বড়ো দাবি বিষয়বুদ্ধির গরজের চেয়ে বেশি, এ কথা জানবার ও ভাববার মতো তার সময়ও নেই শ্রদ্ধাও নেই। তাই যখনই দেখে দরোয়ানির ব্যবস্থা কঠোরতর করা হচ্ছে তখনই মুনফা-বৎসলেরা পুলকিত হয়ে ওঠে। ল অ্যাণ্ড্ অর্ডার রক্ষা হচ্ছে

দরোয়ানিতন্ত্র, পালোয়ানের পালা ; সিম্প্যাথি অ্যাণ্ড রেস্পেক্ট্ হচ্ছে ধর্মতন্ত্র, মানুষের নীতি।

অবিচার করতে চাই নে, রাজ্যশাসন মাত্রেই ল অ্যাণ্ড অর্ডার চাই। নিতান্ত স্নেহপ্রেমের এলাকাতেও কানমলার বরাদ্দ থাকে। রাজ্যে ছটফটানি বৃদ্ধি হলে সাধারণ দণ্ডবিধি অসাধারণ অবৈধ হয়ে উঠলেও দোষ দিই নে। একপক্ষে দুরন্তপনা ঘটলে অন্যপক্ষে দৌরাত্ম্য ঘটা শক্তিমানের পক্ষে গৌরবের বিষয় না হলেও সেটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। আসল কথা, কোনো শাসনতন্ত্রকে বিচার করতে হলে সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি বিচার করা চাই। যদি দেখা যায়, দেশের সকল মহলেই দরোয়ানের ঠেসাঠেসি ভিড়, অথচ তৃষ্ণায় যখন ছাতি ফাটছে, ম্যালেরিয়ায় যখন নাড়ী ছেড়ে যায়, তখন জনপ্রাণীর সাড়া নেই— যখন দেখি দরোয়ানের তকমা শিরোপা বকশিশ বাহবা সম্বন্ধে দাক্ষিণ্যের অজস্রতা, কোতায়ালি থেকে শুরু করে দেওয়ানি ফৌজদারি কোনো বিভাগের কারো দুঃখ গায়ে সয় না, কারো আবদার ব্যর্থ হতে চায় না অথচ ঘরের ছেলের প্রাণ যখন কণ্ঠাগত তখন আত্মনির্ভর সম্বন্ধে সৎপরামর্শ ছাড়া আর কোনো কথা নেই— অর্থাৎ গলায় যখন ফাঁস তখন দুর্গানাম স্মরণ করা ছাড়া আর কোনো উপদেশ যেখান থেকে মেলে না সেখানে পরিমাণের অসংগতিতেই দরোয়ানটাকে যমদূত বলে সহজেই মনে হয়। যে পাকা বাড়িটাতে সুহৃদ্ সহায় আত্মীয়ের চেয়ে পাহারাওয়ালার প্রভাবই বেশি সেই জায়গাটাকেই তো চলতি ভাষায় জেলখানা বলে থাকে। বাগানে তো ইচ্ছে করেই লোকে কাঁটাগাছের বেড়া দেয়, সে কি আমরা জানি নে। কিন্তু, যেখানে কাঁটাগাছেরই যত আদর, ফুলগাছ শুকিয়ে মরে গেল, সে-বাগানে আমাদের মনে যদি উৎসাহ না হয় তা হলে মালী সেটাকে আমাদের অবিবেচনা মনে করে কেন। যদি শাসনকর্তা জিজ্ঞাসা করেন "তোমরা কি চাও না দেশে ল অ্যাণ্ড অর্ডার থাকে", আমি বলি, "খুবই চাই, কিন্তু লাইফ অ্যাণ্ড মাইণ্ড তার চেয়ে কম মূল্যবান নয়।" মানদণ্ডের একটা পাল্লায় বিশ পঁচিশ মণ বাটখারা চাপানো দোষের নয়, অন্য পাল্লাটাতে যে-মাল চাপানো হয় তাতে যদি আমাদের নিজের স্বত্ব কিছু থাকে। কিন্তু যখন দেখি এ-পক্ষের দিকটাতেই যত রাজ্যের ইঁটপাথর, আর মালের পনেরো আনাই হল অন্য পক্ষের দিকে, তখন ফৌজে-পুলিসে-গড়া মানদণ্ডটা অপমানদণ্ড বলেই ঠেকে। নালিশ আমাদের পুলিসের বিরুদ্ধে নয়, নালিশ আমাদের এই ওজনের বিরুদ্ধে ; নালিশ— আগুন জ্বলে ব'লে নয়, রান্না চড়ানো হয় না ব'লে। বিশেষত, সেই আগুনের বিল যখন আমাদেরই চোকাতে হয়। চুলিতে কাঠের খরচটাই এতে সর্বনেশে হয়ে ওঠে যে হাঁড়িতে চাল ডাল জোগাবার কড়ি বাকি থাকে না। সেই

অবস্থায় যখন পেটের জ্বালায় চোখে জল আসে তখন যদি কর্তা রাগ করে বলেন "তবে কি চুলোতে আগুন জ্বালব না", ভয়ে ভয়ে বলি, "জ্বালবে বই কি, কিন্তু ওটা-যে চিতার আগুন হয়ে উঠল।"

যে-দুঃখের কথাটা বলছি এটা জগৎ জুড়ে আজ ছড়িয়ে পড়েছে; আজ মুনফার আড়ালে মানুষের জ্যোতির্ময় সত্য রাহুগ্রস্ত। এইজন্যেই মানুষের প্রতি কঠিন ব্যবহার করা, তাকে বঞ্চনা করা, এত সহজ হল। তাই পাশ্চাত্যে পলিটিক্‌সই মানুষের সকল চেষ্টার সর্বোচ্চ চূড়া দখল করে বসেছে। অর্থাৎ, মানুষের ফুলে-ওঠা পকেটের তলায় মানুষের চুপসে-যাওয়া হৃদয় পড়েছে চাপা। সর্বভুক্‌ পেটুকতার এমন বিস্তৃত আয়োজন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো দিন এমন কুৎসিত আকারে দেখা দেয় নি।

গ

আমাদের রিপু সত্যের সম্পূর্ণ মূর্তিকে আচ্ছন্ন করে। কামে আমরা মাংসই দেখি, আত্মাকে দেখি নে; লোভে আমরা বস্তুই দেখি, মানুষকে দেখি নে; অহংকারে আমরা আপনাকেই দেখি, অন্যকে দেখি নে। একটা রিপু আছে যা এদের মতো উগ্র নয়, যা ফাঁকা। তাকে বলে মোহ; সে হচ্ছে জড়তা, অসাড়তা। আমাদের চৈতন্যের আলো ম্লান করে দিয়ে সে সত্যকে আবৃত করে। সে বিঘ্ন নয়, সে আবরণ। অভ্যাস অনেক সময় সেই মোহরূপে আমাদের মনকে আবিষ্ট করে।

কুয়াশায় পৃথিবীর বস্তুকে নষ্ট করে না, তার আকাশকে লুপ্ত করে। অসীমকে অগোচর করে দেয়। অভ্যাসের মোহ মনের সেই কুয়াশা। অনির্বচনীয়কে সে আড়াল করে, বিস্ময়রসকে সে শুকিয়ে ফেলে। তাতে সত্য পদার্থের গুরুত্ব কমে না, তার গৌরব কমে যায়। আমাদের মন তখন সত্যের অভ্যর্থনা করতে পারে না। বিস্ময় হচ্ছে সত্যের অভ্যর্থনা।

ডাক্তার বলে, প্রতিদিন একই অভ্যস্ত খাওয়া পরিপাকের পক্ষে অনুকূল নয়। ভোজ্য সম্বন্ধে রসনার বিস্ময় না থাকলে দেহ তাকে গ্রহণ করতে আলস্য করে। শিশু-ছাত্রদের একই ক্লাসে একই সময়ে একই বিষয় শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করামাত্রেই তাদের শিক্ষার আগ্রহ ঘুচিয়ে দেওয়া হয়।

প্রাণের স্বভাবই চির-উৎসুক। প্রকৃতি তাকে ক্ষণে ক্ষণে আকস্মিকের স্পর্শে চঞ্চল করে রাখে। এমন-কি, এই আকস্মিক যদি দুঃখ আকারেও আসে তাতেও চিত্তের বড়ো রকমের উদ্‌বোধন ঘটে। সীমার অতীত যা আকস্মিক হচ্ছে তারই দূত; অভাবনীয়ের বার্তা নিয়ে সে আসে, চেতনাকে জড়ত্ব থেকে মুক্তি দেয়।

আমাদের দেশে তীর্থযাত্রা ধর্মসাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। দেবতাকে যখন অভ্যাসের পর্দায় ঘিরে রাখে তখন আমরা সেই পর্দাকেই পূজা করি। যাদের মন স্বভাবতই বিষয়ী, ধর্মচর্চাতেও যারা বস্তুকে বেশি দাম দেয়, তারা দেবতার চেয়ে পর্দাকেই বেশি শ্রদ্ধা করে।

তীর্থযাত্রায় সেই পর্দা ঠেলে দিয়ে মন পথে বেরিয়ে পড়ে। তখন প্রতিদিনের সীমাবদ্ধ জানাকে চিরদিনের অসীম অজানার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা সহজ হয়। প্রতিদিন ও চিরদিনের সংগমস্থলেই সত্যের মন্দির।

এবারে তাই পথের দুই পাশে চাইতে চাইতে বেরিয়েছিলুম। অভ্যাসের জগতে যাকে দেখেও দেখি নে, মন জেগে উঠে বললে, সেই চির-অপরিচিত হয়তো কোথায় অজানা ফুলের মালা প'রে অজানা তারার রাত্রে দেখা দেবে। অভ্যাস বলে ওঠে, "সে নেই গো নেই, সে মরীচিকা।" গভীর বাইরেকার বিশ্ব বলে, "আছে বইকি, তাকিয়ে দেখো। দেখা হয়ে চুকেছে মনে ক'রে দেখা বন্ধ কর, তাই তো দেখা হয় না।" তখন ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, "দেখা হল বুঝি।" পথিকের প্রাণের উদ্‌বোধন সেই কী-জানি। সেই কী-জানির উদ্দেশে গান লিখেছি। জীবনের সকল নৈরাশ্য, সকল বিড়ম্বনা, সকল তুচ্ছতার অবসাদ অতিক্রম করেও সেই কী-জানির আভাস আলোতে-ছায়াতে ঝল্‌মল্ করে উঠছে, পথিক তারই চমক নেবার জন্যে তার জানা ঘরের কোণ ফেলে পথে বেরিয়েছে।

ক্রাকোভিয়া জাহাজ
১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

বৈষ্ণবী আমাকে বলেছিল, "কার বাড়িতে বৈরাগীর কখন অন্ন জোটে তার ঠিকানা নেই; সে-অন্নে নিজের জোর দাবি খাটে না, তাই তো বুঝি এ অন্ন তিনিই জুগিয়ে দিলেন।" এই কথাই কাল বলেছিলেম, বাঁধা পাওয়ায় পাওয়ার সত্য ম্লান হয়ে যায়। না-পাওয়ার রসটা তাকে ঘিরে থাকে না। ভোগের মধ্যে কেবলমাত্রই পাওয়া, পশুর পাওয়া; আর সম্ভোগের মধ্যে পাওয়া না-পাওয়া দুই-ই মিলেছে, সে হল মানুষের।

ছেলেবেলা হতেই বিস্তার পাকা বাসা থেকে বিধাতা আমাকে পথে বের করে দিয়েছেন। অকিঞ্চন বৈরাগীর মতো অন্তরের রাস্তায় একা চলতে চলতে মনের অন্ন যখন-তখন হঠাৎ পেয়েছি। আপন-মনে কেবলই কথা বলে গেছি, সেই হল লক্ষ্মীছাড়ার চাল। বলতে বলতে এমন কিছু শুনতে পাওয়া যায় যা পূর্বে শুনি নি। বন্যার স্রোতে যখন জোয়ার আসে তখন কোন্ গুহার ভিতরকার অজানা সামগ্রী ভেসে

ভেসে ঘাটে এসে লাগে। মনে হয় না, তাতে আমার বাঁধা বরাদ্দের জোর আছে। সেই আচমকা পাওয়ার বিস্ময়ই তাকে উজ্জ্বল করে তোলে, উল্কা যেমন হঠাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে আগুন হয়ে ওঠে।

পৃথিবীতে আমার প্রেয়সীদের মধ্যে যিনি সর্বকনিষ্ঠ তাঁর বয়স তিন। ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে যেতে তাঁর এক মুহূর্ত বিরাম নেই। শ্রোতা যারা তারা উপলক্ষ; বস্তুত কথাগুলো নিজেকেই নিজে শোনানো; যেমন বাষ্পরাশি ঘুরতে ঘুরতে গ্রহতারা-রূপে দানা বেঁধে ওঠে তেমনি কথা-বলার বেগে আপনিই তার সজাগ মনে চিন্তার সৃষ্টি হতে থাকে। বাইরে থেকে মাস্টারের বাচালতা যদি এই স্রোতকে ঠেকায় তা হলে তার আপন চিন্তাধারার সহজ পথ বন্ধ হয়ে যায়। শিশুর পক্ষে অতিমাত্রায় পুঁথিগত বিদ্যাটা ভাবনার স্বাভাবিক গতিকে আটকিয়ে দেওয়া। বিশ্বপ্রকৃতি দিনরাত্রি কথা কইছে, সেই কথা যখন শিশুর মনকে কথা কওয়ায় তখন তার সেই আপন কথাই তার সব চেয়ে ভালো শিক্ষাপ্রণালী। মাস্টার নিজে কথা বলে, আর ছেলেকে বলে "চুপ"। শিশুর চুপ-করা মনের উপর বাইরের কথা বোঝার মতো এসে পড়ে, খাদ্যের মতো নয়। যে-শিশুশিক্ষাবিভাগে মাস্টারের গলাই শোনা যায়, শিশুরা থাকে নীরব, সেখানে আমি বুঝি মরুভূমির উপর শিলবৃষ্টি হচ্ছে।

যাই হোক, মাস্টারের হাতে বেশি দিন ছিলেম না বলে আমি যা-কিছু শিখেছি সে কেবল বলতে-বলতে। বাইরে থেকেও কথা শুনেছি, বই পড়েছি; সে কোনোদিনই সঞ্চয় করবার মতো শোনা নয়, মুখস্থ করবার মতো পড়া নয়। কিছু-একটা বিশেষ ক'রে শেখবার জন্যে আমার মনের ধারার মধ্যে কোথাও বাঁধ বাঁধি নি। তাই সেই ধারার মধ্যে যা এসে পড়ে তা কেবলই চলাচল করে, ঠাঁই বদল করতে করতে বিচিত্র আকারে তারা মেলে মেশে। এই মনোধারার মধ্যে রচনার ঘূর্ণি যখন জাগে তখন কোথা হতে কোন্ সব ভাসা কথা কোন্ প্রসঙ্গমূর্তি ধরে এসে পড়ে তা কি আমি জানি।

অনেকে হয়তো ভাবেন, ইচ্ছা করলেই বিশেষ বিষয় অবলম্বন করে আমি বিশেষভাবে বলতে বা লিখতে পারি। যাঁরা পাকা বক্তা বা পাকা লেখক তাঁরা পারেন; আমি পারি নে। যার আছে গোয়াল, ফরমাশ করলেই বিশেষ বাঁধা গোরুটাকে বেছে এনে সে দুইতে পারে। আর যার আছে অরণ্য, যে-গোরুটা যখন এসে পড়ে তাকে নিয়েই তার উপস্থিতমত কারবার। আশু মুখুজ্জে মশায় বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে হবে। তখন তো ভয়ে ভয়ে বললেম, আচ্ছা। তার পরে যখন জিজ্ঞাসা করলেন বিষয়টা কী, তখন চোখ বুজে বলে দিলেম, সাহিত্য সম্বন্ধে। সাহিত্য সম্বন্ধে কী যে বলব আগেভাগে তা জানবার শক্তিই ছিল না। একটা অন্ধ ভরসা ছিল যে, বলতে

বলতেই বিষয় গড়ে উঠবে। তিনদিন ধরে বকেছিলেম। শুনেছি অনেক অধ্যাপকের পছন্দ হল না। বিষয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় দুইয়েরই মর্যাদা রাখতে পারি নি। তাঁদের দোষ নেই, সভাস্থলে যখন এসে দাঁড়ালেম তখন মনের মধ্যে বিষয় বলে কোনো বালাই ছিল না। বিষয় নিয়েই যাঁদের প্রতিদিনের কারবার বিষয়হীনের অকিঞ্চনতা তাঁদের কাছে ফস্ করে ধরা পড়ে গেল।

এবার ইটালিতে মিলান শহরে আমাকে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। অধ্যাপক ফর্মিকি বারবার জিজ্ঞাসা করলেন, বিষয়টা কী? কী করে তাঁকে বলি যে, যে-অন্তর্যামী তা জানেন তাঁকে প্রশ্ন করলে জবাব দেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল, যদি একটা চুম্বক পাওয়া যায় তবে আগেই সেটা তর্জমা করে ছাপিয়ে রাখবেন। আমি বলি, সর্বনাশ! বিষয় যখন দেখা দেবে চুম্বক তার পরেই সম্ভব। ফল ধরবার আগেই তার আঁঠি খুঁজে পাই কী উপায়ে। বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার ভদ্র অভ্যাস নেই, আমার অভ্যাস লক্ষ্মীছাড়া। ভেবে বলতে পারি নে, বলতে বলতে ভাবি, মৌমাছির পাখা যেমন উড়তে গিয়ে গুন্‌গুন্ করে। সুতরাং, অধ্যাপক হবার আশা আমার নেই, এমন-কি, ছাত্র হবারও ক্ষমতার অভাব।

এমনি করে দৈবক্রমে বৈরাগীর তত্ত্বকথাটা বুঝে নিয়েছি। যারা বিষয়ী তারা বিশ্বকে বাদ দিয়ে বিশেষকে খোঁজে। যারা বৈরাগী তারা পথে চলতে চলতেই বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে বিশেষকে চিনে নেয়। উপরি-পাওনা ছাড়া তাদের কোনো বাঁধাপাওনাই নেই। বিশ্বপ্রকৃতি স্বয়ং যে এই লক্ষ্যহীন বৈরাগী— চলতে চলতেই তার যা-কিছু পাওয়া। জড়ের রাস্তায় চলতে চলতে সে হঠাৎ পেয়েছে প্রাণকে, প্রাণের রাস্তায় চলতে চলতে সে হঠাৎ পেয়েছে মানুষকে। চলা বন্ধ করে যদি সে জমাতে থাকে তা হলেই সৃষ্টি হয়ে ওঠে জঞ্জাল। তখনই প্রলয়ের ঝাঁটার তলব পড়ে।

বিশ্বের মধ্যে একটা দিক আছে যেটা তার স্থাবর বস্তুর অর্থাৎ বিষয়সম্পত্তির দিক নয়; যেটা তার চলচ্চিত্তের নিত্য প্রকাশের দিক। যেখানে আলো ছায়া সুর, যেখানে নৃত্য গীত বর্ণ গন্ধ, যেখানে আভাস ইঙ্গিত। যেখানে বিশ্ববাউলের একতারার ঝংকার পথের বাঁকে বাঁকে বেজে বেজে ওঠে, যেখানে সেই বৈরাগীর উত্তরীয়ের গেরুয়া রং বাতাসে বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে উড়ে যায়। মানুষের ভিতরকার বৈরাগীও আপন কাব্যে গানে ছবিতে তারই জবাব দিতে দিতে পথে চলে, তেমনিতরোই গানের নাচের রূপের রসের ভঙ্গীতে। বিষয়ী লোক আপন খাতাঞ্চিখানায় বসে যখন তা শোনে তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "বিষয়টা কী। এতে মুনফা কী আছে। এতে কী প্রমাণ করে।" অধরকে ধরার জায়গা সে খোঁজে তার মুখবাঁধা থলিতে, তার চামড়াবাঁধানো খাতায়। নিজের মনটা যখন বৈরাগী হয় নি তখন বিশ্ববৈরাগীর বাণী কোনো কাজে লাগে না।

তাই দেখেছি, খোলা রাস্তার বাঁশিতে হঠাৎ-হাওয়ায় যে গান বনের মর্মরে নদীর কল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে বেজেছে, যে-গান ভোরের শুকতারার পিছে পিছে অরুণ-আলোর পথ দিয়ে চলে গেল, শহরের দরবারে ঝাড়লণ্ঠনের আলোতে তারা ঠাঁই পেল না; ওস্তাদেরা বললে "এ কিছুই না", প্রবীণেরা বললে "এর মানে নেই"! কিছু নয়ই তো বটে; কোনো মানে নেই, সে-কথা খাঁটি; সোনার মতো নিকষে কষা যায় না, পাটের বস্তার মতো দাঁড়িপাল্লায় ওজন চলে না। কিন্তু, বৈরাগী জানে, অধর রসেই ওর রস। কতবার ভাবি গান তো এসেছে গলায় কিন্তু শোনাবার লগ্ন রচনা করতে তো পারি নে; কান যদি-বা খোলা থাকে আনমনার মন পাওয়া যাবে কোথায়। সে-মন যদি তার গদি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে পারে তবেই-তো যা বলা যায় না তাই সে শুনবে, যা জানা যায় না তাই সে বুঝবে।

ক্রাকোভিয়া জাহাজ
১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জন নিঃসঙ্গতার ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তীরে দেখতে পাচ্ছি লোকালয়ের আলো, জনতার কোলাহল; ক্ষণে ক্ষণে ঘাটেও নামতে হয়েছে, কিন্তু কোনোখানে জমিয়ে বসতে পারি নি। বন্ধুরা ভাবে তাদের এড়িয়ে গেলুম; শত্রুরা ভাবে, অহংকারেই দূরে দূরে থাকি। যে-ভাগ্যদেবতা বরাবর আমাকে সরিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেল, পাল গোটাতে সময় দিলে না, রশি যতবার ডাঙার খোঁটায় বেঁধেছি টান মেরে ছিঁড়ে দিয়েছে, সে কোনো কৈফিয়ত দিলে না।

সুখদুঃখের হিসাবনিকাশ নিয়ে ভাগ্যের সঙ্গে তকরার করে লাভ নেই। যা হয়েছে তার একটা হেতু আছে, সেই হেতুর উপর রাগ করলে হাওয়ার উপরেই রাগতে হয়। ঘড়া রাগ করে ঠং ঠং শব্দে যদি বলে "আমাকে শূন্য করে গড়েছে কেন", তার জবাব হচ্ছে, "তোমাকে শূন্য করবে বলেই ঘড়া করে নি, ঘড়া করবে বলেই শূন্য করেছে।" ঘড়ার শূন্যতা পূর্ণতারই অপেক্ষায়। আমার একলা-আকাশের ফাঁকটাকে ভরতি করতে হবে, সেই প্রত্যাশাটা আমার সঙ্গে সঙ্গে লেগে আছে। দৈবের এই দাবিটিই আমার সম্মান; একে রক্ষা করতে হলে পুরাপুরি দাম দিতে হবে।

তাই শূন্য আকাশে একলা বসে ভাগ্যনির্দিষ্ট কাজ করে থাকি। তাতেই আমার হওয়ার অর্থটা বুঝি, কাজেই আনন্দও পাই। বাঁশির ফাঁকটা যখন সুরে ভরে ওঠে তখন তার আর-কোনো নালিশ থাকে না।

শরীরে মনে প্রাণের দক্ষিণ হাওয়া যখন জোরে বয় তখন আত্মপ্রকাশের দাক্ষিণ্যেই

আমার যথেষ্ট পুরস্কার মেলে। কিন্তু যখন ক্লান্তি আসে, যখন পথ ও পাথেয় দুই-ই যায় কমে অথচ সামনে পথটা দেখতে পাই সুদীর্ঘ, তখন ছেলেবেলা থেকে যে-ঘর বাঁধবার সময় পাই নি সেই ঘরের কথা মন জিজ্ঞাসা করতে থাকে। তখনই আকাশের তারা ছেড়ে দীপের আলোর দিকে চোখ পড়ে। জীবলোকে ছোটো ছোটো মাধুরীর দৃশ্য যা তীরের থেকে দেখা দিয়ে সরে সরে গিয়েছে, চোখের উপরকার আলো ম্লান হয়ে এলে সেই অন্ধকারে তাদের ছবি ফুটে ওঠে; তখন বুঝতে পারি, সেই-সব ক্ষণিকের দেখা প্রত্যেকেই মনের মধ্যে কিছু-না-কিছু ডাক দিয়ে গেছে। তখন মনে হয়, বড়ো বড়ো কীর্তি গড়ে তোলাই-যে বড়ো কথা তা নয়, পৃথিবীতে যে-প্রাণের যজ্ঞ সম্পন্ন করবার জন্যে নিমন্ত্রণ পেয়েছি তাতে উৎসবের ছোটো পেয়ালাগুলি রসে ভরে তোলা শুনতে সহজ, আসলে দুঃসাধ্য।

এবারে ক্লান্ত দুর্বল শরীর নিয়ে বেরিয়েছিলুম। তাই, অন্তরে যে-নারীপ্রকৃতি অন্তঃপুর-চারিণী হয়ে বাস করে ক্ষণে ক্ষণে সে আপন ঘরের দাবি জানাবার সময় পেয়েছিল। এই দাবির মধ্যে আমার পক্ষে কেবল যে আরামের লোভ তা নয়, সার্থকতার আশাও রয়েছে। জীবনপথের শেষদিকে বিশ্বলক্ষ্মীর আতিথ্যের জন্যে শ্রান্ত চিত্তের যে ঔৎসুক্য সে কেবল শক্তির অপচয় নিবারণের আগ্রহে, পাথেয় পূর্ণ করে নেবার জন্যে। কাজের হুকুম এখনো মাথার উপর অথচ উদ্যম এখন নিস্তেজ, মন তাই প্রাণশক্তির ভাণ্ডারীর খোঁজ করে। শুষ্ক তপস্যার পিছনে কোথায় আছে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার।

দিনের আলো যখন নিবে আসছে, সামনের অন্ধকারে যখন সন্ধ্যার তারা দেখা দিল, যখন জীবনযাত্রার বোঝা খালাস করে অনেকখানি বাদ দিয়ে অল্প-কিছু বেছে নেবার জন্যে মনকে তৈরি হতে হচ্ছে, তখন কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা নেবার জন্যে মনের ব্যগ্রতা আমি তাই লক্ষ্য করে দেখছি। সমস্ত দিন প্রাণপণ চেষ্টায় যা-কিছু সে জমিয়েছিল, গড়ে তুলেছিল, সংসারের হাটে যদি তার কিছু দাম থাকে তবে তা সেইখানেই থাক্, যারা আগলে রাখতে চায় তারাই তার খবরদারি করুক; রইল টাকা, রইল খ্যাতি, রইল কীর্তি, রইল পড়ে বাইরে; গোধূলির আঁধার যতই নিবিড় হয়ে আসছে ততই তারা ছায়া হয়ে এল; তারা মিলিয়ে গেল মেঘের গায়ে সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটার সঙ্গে। কিন্তু, যে-অনাদি অন্ধকারের বুকের ভিতর থেকে একদিন এই পৃথিবীতে বেরিয়ে এসেছি সেখানকার প্রচ্ছন্ন উৎস থেকে উৎসারিত জলধারা ক্ষণে ক্ষণে আমার যাত্রাপথের পাশে পাশে মধুর কলস্বরে দেখা দিয়ে আমার তৃষ্ণা মিটিয়েছে, আমার তাপ জুড়িয়েছে, আমার ধুলো ধুয়ে দিয়েছে, সেই তীর্থের জল ভরে রইল আমার স্মৃতির পাত্রখানি। সেই অন্ধকার অপরিসীমের হৃদয়কন্দর থেকে বারবার যে-বাঁশির ধ্বনি আমার প্রাণে এসে

পৌঁচেছিল, কত মিলনে, কত বিরহে, কত কান্নায়, কত হাসিতে ; শরতের ভোরবেলায়, বসন্তের সায়াহ্নে, বর্ষার নিশীথরাত্রে ; কত ধ্যানের শান্তিতে, পূজার আত্মনিবেদনে, দুঃখের গভীরতায় ; কত দানে, কত গ্রহণে, কত ত্যাগে, কত সেবায়— তারা আমার দিনের পথে সুর হয়ে বেজেছিল, আজ তারাই আমার রাত্রের পথে দীপ হয়ে জ্বলে উঠছে। সেই অন্ধকারের ঝরনা থেকেই আমার জীবনের অভিষেক, সেই অন্ধকারের নিস্তব্ধতার মধ্যে আমার মৃত্যুর আমন্ত্রণ ; আজ আমি তাকে বলতে পারব, হে চির-প্রচ্ছন্ন, আমার মধ্যে যা-কিছু তুমি তোমার গভীরের ভিতর থেকে তারার মতো প্রকাশ করেছ রূপে ও বাণীতে, তাতেই নিত্যকালের অমৃত ; আমি খুঁজে খুঁজে পাথর কুড়িয়ে কুড়িয়ে কীর্তির যে-জয়স্তম্ভ গেঁথেছি, কালস্রোতের ভাঙনের উপরে তার ভিত। সেই-জন্যেই আজ গোধূলির ধূসর আলোয় একলা বসে ভাবছিলুম, রঙিন রসের অক্ষরে লেখা যে-লিপি তোমার কাছ থেকে ক্ষণে ক্ষণে এসেছিল ভালো করে তা পড়া হয় নি, ব্যস্ত ছিলুম। তার মধ্যে নিমন্ত্রণ ছিল। কোথায়। কারখানাঘরে নয়, খাতাঞ্চিখানায় নয়, ছোটো ছোটো কোণে যেখানে ধরণীর ছোটো সুখগুলি লুকানো। তাই আজ পিছন ফিরে তাকিয়ে মনে মনে ভেবে দেখছি, কতবার বঞ্চিত হলুম। জনতার জয়ধ্বনির ডাকে কতবার অন্যমনে গভীর নিভৃতের পাশ দিয়ে চলে এসেছি ; মায়ামৃগের অনুসরণে কতবার সরল সুন্দরের দিকে চোখ পড়ল না। জীবনপথে আশে পাশে সুধার-কণা-ভরা যে বিনামূল্যের ফলগুলি পাতার আড়ালে ঢাকা ছিল, তাদের এড়িয়ে উপবাসী হয়ে চলে এসেছি বলেই এত শ্রান্তি, এত অবসাদ। প্রভাত যেখান থেকে আপন পেয়ালা আলোতে ভরে নেয়, রাত্রি যার আঙিনায় বসে প্রাণের ছিন্ন সূত্রগুলি বারে বারে জুড়ে তোলে, ওই লুকিয়ে-থাকা ছোটো ফলগুলি সেই মহান্ধকারেরই রহস্য-গর্ভ থেকে রস পেয়ে ফলে উঠছে, সেই অন্ধকার— যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ।

ক্রাকোভিয়া জাহাজ

১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

বাংলা ভাষায় প্রেম অর্থে দুটো শব্দের চল আছে ; ভালোলাগা আর ভালোবাসা। এই দুটো শব্দে আছে প্রেমসমুদ্রের দুই উলটোপারের ঠিকানা। যেখানে ভালোলাগা সেখানে ভালো আমাকে লাগে, যেখানে ভালোবাসা সেখানে ভালো অন্যকে বাসি। আবেগের মুখটা যখন নিজের দিকে তখন ভালোলাগা, যখন অন্যের দিকে তখন ভালোবাসা। ভালোলাগায় ভোগের তৃপ্তি, ভালোবাসায় ত্যাগের সাধন।

সংস্কৃত ভাষায় অনুভব বলতে যা বুঝি তার খাঁটি বাংলা প্রতিশব্দ একদিন ছিল।

এতবড়ো একটা চলতি ব্যবহারের কথা হারালো কোন্ ভাগ্যদোষে বলতে পারি নে। এমন দিন ছিল যখন লাজবাসা ভয়বাসা বলতে বোঝাত লজ্জা অনুভব করা, ভয় অনুভব করা। এখন বলি, লজ্জা পাওয়া, ভয় পাওয়া। কিল খাওয়া, গাল খাওয়া, যেমন ভাষার বিকার— লজ্জা পাওয়া, ভয় পাওয়াও তেমনি।

কারো 'পরে আমাদের অনুভব যখন সম্পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে, ভালো-ভাবায় ভালো-ইচ্ছায় মন কানায় কানায় ভরতি হয় তখন তাকেই বলি ভালোবাসা। পূর্ণ উৎকর্ষের ভাবকেই বলা যায় ভালো। স্বাস্থ্য যেমন প্রাণের পূর্ণতা, সৌন্দর্য যেমন রূপের পূর্ণতা, সত্য যেমন জ্ঞানের পূর্ণতা, ভালোবাসা তেমনি অনুভূতির পূর্ণতা। ইংরেজিতে গুড্ ফীলিং বলে এ তা নয়, একে বলা যেতে পারে পারফেক্ট্ ফীলিং।

শুভ-ইচ্ছার পূর্ণতা হচ্ছে নৈতিক, তার ক্রিয়া ব্যবহারের উপর ; ভালোবাসার পূর্ণতা আত্মিক, সে হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের (personalityর) পরম প্রকাশ ; শুভ-ইচ্ছা অন্ধকারে যষ্টি, প্রেম অন্ধকারে চাঁদ। মায়ের স্নেহ মায়ের শুভ-ইচ্ছা মাত্র নয়, তা তাঁর পূর্ণতার ঐশ্বর্য। তা অন্নের মতো নয়, তা অমৃতের মতো। এই অনুভূতির পূর্ণতা একটি শক্তি। ভালোবাসার বিষয়ের মধ্যে অসীমকে বোধ করবার শক্তি ; ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে অপরিমেয়কে দেখতে পাওয়া এবং স্বীকার করাই অপরিমেয়কে সীমার মন্দিরে জাগিয়ে তোলবার শক্তি।

নিজের অস্তিত্বের মূল্য যে-মানুষ ছোটো করে দেখে আত্ম-অবিশ্বাসের অবসাদেই সে নিজের সম্পদ উদ্‌ঘাটিত করতে ভরসা পায় না। বিশ্ব আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রত্যেক মানুষকে গ্রহণ ও ধারণ করে, মানুষের অন্তরে এই মস্ত সত্যটির অনুভব হচ্ছে প্রেম। ব্যক্তিবিশেষকে সে ডাক দিয়ে বলে, "তুমি কারোর চেয়ে কম নও, তোমার মধ্যে এমন মূল্য আছে যার জন্যে প্রাণ দেওয়া চলে।" মানুষ যেখানে আপন সীমা টেনে দিয়ে নিজেকে সাধারণের সামিল করে অলস হয়ে বসে থাকে প্রেম ব্যক্তিবিশেষের সেই সাধারণ সীমাকে মানে না, তাকে অর্ঘ্য দিয়ে বলে, "তোমার কপালে আমি তিলক দিয়েছি, তুমি অসাধারণ।" সূর্যের আলো বৃষ্টির জল যেমন নির্বিচারে সর্বত্রই মাটির জড়তা ও দৈন্য অস্বীকার করে, মরুকে বারবার স্পর্শ করে, তাকে শ্যামলতায় পুলকিত করে তোলে, যে-ভূমি রিক্ত তারও সফলতার জন্যে যেমন তাদের নিরন্তর প্রতীক্ষা, তার কাছেও যেমন পূর্ণতার দাবি, মানুষের সমাজে প্রেম তেমনি সব জায়গাতেই অসীম প্রত্যাশা জাগিয়ে রাখে। ব্যক্তিকে সে যে মূল্য দেয় সে মূল্য মহিমার মূল্য। অন্তর্নিহিত এই মহিমার আশ্বাসে মানুষের সৃষ্টিশক্তি নানাদিকে পূর্ণ হয়ে ওঠে ; তার কর্মের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

এই ব্যক্তিগত প্রেমের বাহন নারী। ইতিহাসের অপ্রকাশিত লিখন যদি বের করা

যেঁত তা হলে দেখতে পেতেম নারীর প্রেমের প্রেরণা মানুষের সমাজে কী কাজ করেছে। শক্তির যে-ক্রিয়া উদ্যত চেষ্টারূপে চঞ্চল আমরা তাকেই শক্তির প্রকাশরূপে দেখি, কিন্তু যে-ক্রিয়া গূঢ় উদ্দীপনারূপে পরিব্যাপ্ত তার কথা মনেই আনি নে। বিস্ময়ের কথা এই যে, বিশ্বের স্ত্রীপ্রকৃতিকেই ভারতবর্ষ শক্তি বলে জেনেছে।

সকলেই জানে, এই শক্তিরই বিকারের মতো এমন সর্বনেশে বিপদ আর কিছুই নেই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীমের হৃদয়ের মধ্যে অদৃশ্য থেকে দ্রৌপদী তাঁকে বল জুগিয়েছেন। বীর আণ্টনির হৃদয় অধিকার করে ক্লিওপাট্রা তাঁর বল হরণ করে নিল। সত্যবানকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করেন সাবিত্রী, কিন্তু কত নারী পুরুষের সত্য নষ্ট করে তাকে মৃত্যুর মুখে নিয়ে গেছে তার সংখ্যা নেই।

তাই তো গোড়ায় বলেছি, প্রেমের দুই বিরুদ্ধ পার আছে। এক পারে চোরাবালি, আর-এক পারে ফসলের খেত। এক পারে ভালোলাগার দৌরাত্ম্য, অন্য পারে ভালো-বাসার আমন্ত্রণ। মাতৃস্নেহের মধ্যেও এই দুই জাতের প্রেম। একটাতে প্রধানত আসক্তি নিজের পরিতৃপ্তি খোঁজে; সেই অন্ধ মাতৃস্নেহ আমাদের দেশে বিস্তর দেখতে পাই। তাতে সন্তানকে বড়ো ক'রে না তুলে তাকে অভিভূত করে। তাতে কোনো পক্ষেরই কল্যাণ নেই। যে-প্রেম ত্যাগের দ্বারা মানুষকে মুক্তি দিতে জানে না পরন্তু ত্যাগের বিনিময়ে মানুষকে আত্মসাৎ করতে চায় সে-প্রেম তো রিপু। এক পক্ষকে ক্ষুধার দাহে সে দগ্ধ করে, অন্য পক্ষকে লালায়িত আসক্তি দ্বারা লেহন করে জীর্ণ করে দেয়। এই মাতৃলালনপাশের পরিবেষ্টনের মধ্যে যারা চির-অবরুদ্ধ আমাদের দেশে তাদের সংখ্যা বিস্তর; তাদের শৈশব আর ছাড়তে চায় না। আসক্তি-পরায়ণ মাতার মূঢ় আদেশপালনের অনর্থ বহন করে অপমানের মধ্যে অভাবের মধ্যে চিরজীবনের মতো মাথা হেঁট হয়ে গেছে, এমন-সকল বয়স্ক নাবালকের দল আমাদের দেশে ঘরে ঘরে। আমাদের দেশে মাতার ক্রোড়রাজত্ববিস্তারে পৌরুষের যত হানি হয়েছে এমন বিদেশি শাসনের হাতকড়ির নির্মমতার দ্বারাও হয় নি।

স্ত্রীপুরুষের প্রেমেও সেই একই কথা। নারীর প্রেম পুরুষকে পূর্ণশক্তিতে জাগ্রত করতে পারে; কিন্তু সে-প্রেম যদি শুক্লপক্ষের না হয়ে কৃষ্ণপক্ষের হয় তবে তার মালিন্যের আর তুলনা নেই। পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্যায়; নারীর প্রেমে ত্যাগধর্ম সেবাধর্ম সেই তপস্যারই সুরে সুর-মেলানো; এই দুয়ের যোগে পরস্পরের দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নারীর প্রেমে আর-এক সুরও বাজতে পারে, মদনধনুর জ্যায়ের টঙ্কার— সে মুক্তির সুর না, সে বন্ধনের সংগীত। তাতে তপস্যা ভাঙে, শিবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হয়।

কেন বলি, পুরুষের ধর্ম তপস্যা। কারণ, জীবলোকের কাজে প্রকৃতি তাকে নারীর

তুলনায় অনেক পরিমাণে অবকাশ দিয়েছে। সেই অবকাশটাকে নষ্ট করলেই তার সবচেয়ে ফাঁকি। পুরুষ সেই অবকাশকে আপন সাধনার ক্ষেত্র করেছে বলেই মানুষের উৎকর্ষ জৈব প্রকৃতির সীমানা অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেল। প্রকৃতির দাবি থেকে মুক্তি নিয়েই পুরুষ জ্ঞানকে ধ্যানকে শক্তিকে অসীমের মধ্যে অনুসরণ করে চলছে। সেইজন্যে পুরুষের সাধনায় চিরকালই প্রকৃতির সঙ্গে বিরুদ্ধতা আছে। নারীর প্রেম যেখানে এই বিরোধের সমন্বয় করে দেয়, কঠোর জ্ঞানের বেদিপ্রাঙ্গণে সে যখন পূজামাধুর্যের আসন রচনা করে— পুরুষের মুক্তিকে যখন সে লুপ্ত করে না, তাকে সুন্দর করে তোলে— তার পথকে অবরুদ্ধ করে না, পথের পাথেয় জুগিয়ে দেয়— ভোগবতীর জলে ডুবিয়ে দেয় না, সুরধুনীর জলে স্নান করায়— তখন বৈরাগ্যের সঙ্গে অনুরাগের, হরের সঙ্গে পার্বতীর, শুভপরিণয় সার্থক হয়।

বিচ্ছেদের ভিতর দিয়েই শক্তি কাজ করবার ক্ষেত্র পায়। চাঁদ ও পৃথিবীর মাঝখানে যে-বিরহ আছে তারই অবকাশে পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রকে চাঁদ কথা কওয়ায়। স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের মাঝে বিধাতা একটি দূরত্ব রেখে দিয়েছেন। এই দূরত্বের ফাঁকটাই কেবলই সেবায় ক্ষমায় বীর্যে সৌন্দর্যে কল্যাণে ভরে ওঠে; এইখানেই সীমায় অসীমে শুভদৃষ্টি। জৈবক্ষেত্রে প্রকৃতির অধিকারের মধ্যে মানুষের অনেক সৃষ্টি আছে, কিন্তু চিত্তক্ষেত্রে তার সৃষ্টির অন্ত নেই। চিত্তের মহাকাশ স্থূল আসক্তির দ্বারা জমাট হয়ে না গেলে তবেই সেই সৃষ্টির কাজ সহজ হয়। দীপশিখাকে দুই হাতে আঁকড়ে ধরে যে-মাতাল বেশি করে পেতে চায়, সে নিজেও পোড়ে, আলোটিকেও নিবিয়ে দেয়।

মুক্ত অবকাশের মধ্যে পুরুষ মুক্তিসাধনার যে-মন্দির বহুদিনের তপস্যায় গেঁথে তুলেছে পূজারিনী নারী সেইখানে প্রেমের প্রদীপ জ্বালবার ভার পেল। সে-কথা যদি সে ভুলে যায়, দেবতার নৈবেদ্যকে যদি সে মাংসের হাটে বেচতে কুণ্ঠিত না হয়, তা হলে মর্তের মর্মস্থানে যে-অমরাবতী আছে তার পরাভব ঘটে; পুরুষ যায় প্রমত্ততার রসাতলে, আর নারীর হৃদয়ে যে রসের পাত্র আছে তা ভেঙে গিয়ে সে-রস ধুলাকে পঙ্কিল করে।

ক্রাকোভিয়া

১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

ফুলের মধ্যে যে-আনন্দ সে প্রধানত ফলের প্রত্যাশার আনন্দ, এটা অত্যন্ত মোটা কথা। বিশ্বসৃষ্টিতে দেখতে পাই সৃষ্টিতেই আনন্দ, হওয়াটাই চরম কথা। তার ফুলেও আছে হওয়া, ফলেও আছে হওয়া। ফুলটা হল উপায় আর ফলটা হল উদ্দেশ্য, তাই বলে উভয়ের মধ্যে মূল্যের কোনো ভেদ দেখতে পাই নে।

আমার তিন বছরের প্রিয়সখী, যাকে নাম দিয়েছি নন্দিনী, তার হওয়ার উদ্দেশ্য কী এ প্রশ্নের কোনো জবাব-তলবের কথা মনে আসে না। সে-যে কুলরক্ষার সেতু, সে-যে পিণ্ড-জোগানের হেতু, সে-যে কোনো এক ভাবীকালে প্রজনার্থং মহাভাগা, এ-সব হল শাস্ত্রসংগত বিজ্ঞানসম্মত মূল্যের কথা। ফলের দরে ফুলের বিচার ব্যাবসাদারের। কিন্তু, ভগবান তো সৃষ্টির ব্যাবসা ফাঁদেন নি। তাঁর সৃষ্টি একেবারেই বাজে খরচ; অর্থাৎ, আয় করবার জন্যে খরচ করা নয়, এইজন্যই আয়োজনে প্রয়োজনে সমান হয়ে মিশে গেছে। এইজন্য যে-শিশু জীবলোকের প্রয়োজনসাধনের পক্ষে অপূর্ণ, সেই তিন বছরের শিশুর অপূর্ণতাই সৃষ্টির আনন্দগৌরবে পূর্ণ। আমি তো দেখি বিশ্ব-রচনায় মুখ্যের চেয়ে গৌণটাই বড়ো। ফুলের রঙের মুখ্য কথাটা হতে পারে পতঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা; গৌণ কথাটা হচ্ছে সৌন্দর্য। মানুষ যখন ফুলের বাগান করে তখন সেই গৌণের সম্পদই সে খোঁজে। বস্তুত, গৌণ নিয়েই মানুষের সভ্যতা। মানুষ কবি যখন প্রেয়সীর মুখের একটি তিলের জন্য সমরখন্দ বোখারা পণ করতে বসে তখন সে প্রজনার্থং মহাভাগার কথা মনেই রাখে না। এই বে-হিসাবি সৃষ্টিতে বে-হিসাবি আনন্দরূপকেই সে সৃষ্টির ঐশ্বর্য বলে জানে।

প্রাণীসংসারে জৈবপ্রকৃতিই সকলের গোড়ায় আপন ভিত ফেঁদে, জাজিম পেতে, আলো জেলে, পৃথিবীর ভাণ্ডার থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র মালমসলা নিজের ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করে নিয়ে সংসার পেতে বসেছিল। ভোরের বেলায় সে মুখ্য জায়গাটা দখল করে বসল। তারই বচন হচ্ছে, সা ভার্যা যা প্রজাবতী। অর্থাৎ, যদি কাজে লাগল তবেই তার দাম।

চিৎপ্রকৃতি এসে জুটলেন কিছু দেরিতে। তাই, জৈবপ্রকৃতির আশ্রয়ে তাঁকে পরাভূত হতে হল। পুরানো পথে পুরানো ঘাটে পুরানো কালের মালমসলা নিয়েই সে ফাঁদলে তার নিজের ব্যাবসা। তখন সে সাবেক আমলের মুখ্য থেকে হাল আমলের গৌণ ফলিয়ে তুলতে বসল। আহারকে করে তুললে ভোজ, শব্দকে করে তুললে বাণী, কান্নাকে করে তুললে কাব্য। মুখ্যভাবে যেটা ছিল আঘাত গৌণভাবে সেটা হল আবেদন; যেটা ছিল বন্দিনীর শৃঙ্খল, সেটা হল বধূর কঙ্কণ; যেটা ছিল ভয় সেটা হল ভক্তি; যেটা ছিল দাসত্ব সেটা হল আত্মনিবেদন। যারা উপরের স্তরের চেয়ে নীচের স্তরকে বিশ্বাস করে বেশি তারা মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করতে গেলেই পুরাতন তাম্রশাসন বেরিয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিকের চশমায় ধরা পড়ে যে, খেতের মালিক জৈবপ্রকৃতি; অতএব ফসলের অধিকার নির্ণয় করতে গেলে বৈজ্ঞানিকের কাছে চিৎপ্রকৃতির দাবি অগ্রাহ্য হয়ে আসে। আপিলে সে যতই

বলে "প্রণালী আমার, প্ল্যান আমার, হাললাঙল আমার, চাষ আমার" কিছুতেই অপ্রমাণ করতে পারে না যে, মাটির তলাকার তাম্রশাসনে মোটা অক্ষরে খোদা আছে 'জৈবপ্রকৃতি'। মোটা অক্ষরের উপরে বিচারকের নজরও পড়ে বেশি। কাজেই রায় যখন বেরয় তখন পাকা প্রমাণসহ প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, সাবেক আমলের ভূতই বর্তমান আমলে ভগবান সেজে এসেছে।

জৈবপ্রকৃতিতে শিশুর একটা অর্থ আছে। সেই অর্থ টাকেই যদি সম্পূর্ণ বলে স্বীকার করে নিই তা হলে বলতে হয়, মাছের ছানার সঙ্গে মানুষের শিশুর কোনো প্রভেদ নেই। অর্থাৎ, তার একমাত্র অর্থ বংশবৃদ্ধি।

কিন্তু, চিৎপ্রকৃতি সেই অর্থ টাকে নিয়ে যখন আপনার চিন্ময় জিনিস করে তুললে, তখন তাকে চোর বদনাম দিয়ে মূলকেই মালেক স্বীকার করি যদি তা হলে শেক্স্‌-পিয়ারেরও মাল থানায় আটক করতে হয়। মসলা আর মাল তো একই জিনিস নয়; মাটির মালেক যদি হয় ভূপতি ভাঁড়ের মালেক তো কুমোর।

আমাদের চিত্ত শিশুর মধ্যে সৃষ্টির অহৈতুক আনন্দটি দেখতে পায়। বয়স্ক মানুষের মধ্যে উদ্দেশ্য-উপায়-ঘটিত নানা তর্ক আছে; কেউ বা কাজের কেউ বা অকাজের, কারো বা অর্থ আছে কারো বা নেই। কিন্তু শিশুকে যখন দেখি তখন কোনো প্রত্যাশার দ্বারা আচ্ছন্ন করে দেখি নে। সে-যে আছে, এই সত্যটাই বিশুদ্ধ-ভাবে আমাদের মনকে টানে। সেই অপরিণত মানুষটির মধ্যে একটি পূর্ণতার ছবি দেখা দেয়। শিশুর মধ্যে মানুষের প্রাণময় রূপটি স্বচ্ছ অনাবিল আকাশে সুপ্রত্যক্ষ। নানা কৃত্রিম সংস্কারের ষড়যন্ত্রে তার সহজ আত্মপ্রকাশে একটুও দ্বিধা ঘটিয়ে দেয় না। প্রাণের বেগে নন্দিনী যে-রকম সহজে নেচেকুঁদে গোলমাল করে বেড়ায় আমি যদি তা করতে যাই, তা হলে যে-প্রভূত সংস্কারের পরিমণ্ডল আমাকে নিবিড় করে ঘিরে আছে সে-সুদ্ধ নড়্‌চড়্‌ করতে থাকে, সেটা একটা অসংগত ব্যাপার হয়ে ওঠে। শিশু যা-তা নিয়ে যেমন-তেমন করে খেলে, তাতেই খেলার বিশুদ্ধ রূপটি দেখি। খেলার উপকরণের কৃত্রিম মূল্য, খেলার লক্ষ্যের কৃত্রিম উত্তেজনা, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে না। নন্দিনী যখন লুব্ধভাবে কমলালেবু খায় তখন সেই অসংকোচ লোভটিকে সুন্দর ঠেকে। সহজ প্রাণের রসবোধের সঙ্গে কমলালেবুর যে মধুর সম্বন্ধ, ভদ্রতার কোনো বিধানের দ্বারা সেটা ক্ষুণ্ণ হয় নি। ঝগড়ু-বেহারাটার প্রতি নন্দিনীর যে বন্ধুত্বের টান সেটা দেখতে ভালো লাগে, কেননা, যে-কোনো দুই মানুষের মধ্যে এই সম্বন্ধটি সত্য হওয়ার কোনো বাধা থাকা উচিত না। কিন্তু, সামাজিক ভেদবুদ্ধির নানা অভ্যস্ত সংস্কারকে যেমনি আমি স্বীকার করেছি অমনি ঝগড়ু-বেহারার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা আমার পক্ষে

দুঃসাধ্য হয়েছে ; অথচ এমন ভদ্রবেশধারীকে আমি সমকক্ষভাবে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারি যার মনুষ্যত্বের আন্তরিক মূল্য ঝগড়ুর চেয়ে অনেক কম। জাহাজে তার সমবয়স্ক য়ুরোপীয় বালিকার সঙ্গে নন্দিনীর ঝগড়াও হয়, ভাবও হয়, পরস্পরের মধ্যে সম্পত্তির বিনিময়ও চলছে। য়ুরোপীয় পুরুষযাত্রীর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার মাথা-নাড়ানাড়ি হয়ে থাকে, শরীরের স্বাস্থ্য ও আবহাওয়া নিয়ে বাজে কথা বলাবলিও হয় ; সংস্কারের বেড়া ডিঙিয়ে তার বেশি আর সহজে এগোতে পারি নে। সহজ মানুষের সত্যটি সামাজিক মানুষের কুয়াশায় ঢেকে রেখে দেয়। অর্থাৎ আমরা নানা অবান্তর তথ্যের অস্বচ্ছতার মধ্যে বাস করি। শিশুর জীবনের যে সত্য তার সঙ্গে অবান্তরের মিশোল নেই। তাই, তার দিকে যখন চেয়ে দেখবার অবকাশ পাই তখন প্রাণলীলার প্রত্যক্ষ স্বরূপটি দেখি ; তাতে সংস্কারভারে পীড়িত চিন্তাক্লিষ্ট মন গভীর তৃপ্তি পায়।

শিশুর মধ্যে আমরা মুক্তির সহজ ছবি দেখতে পাই। মুক্তি বলতে কী বোঝায়। প্রকাশের পূর্ণতা। ভগবান সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরছলে ঋষি একটি চরম কথা বলেছেন : স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্নি। সেই ভগবান কিসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। তার উত্তর, নিজের মহিমাতেই। অর্থাৎ, তিনি স্বপ্রকাশ। শিশুরও সেই কথা। সে আপনাতে আপনি পরিব্যক্ত। তাকে দেখে আমাদের যে-আনন্দ সে তার বাধামুক্ত সহজ প্রকাশে। য়ুরোপে আজকাল চিত্রকলার ইতিহাসে একটা বিপ্লব এসেছে, দেখতে পাই। এতকাল ধরে এই ছবি-আঁকার চার দিকে— হিন্দুস্থানি গানের তানকর্তবের মতো —যে-সমস্ত প্রভূত ওস্তাদি জমে উঠেছিল আজ সকলে বুঝেছে, তার বারো-আনাই অবান্তর। তা সুঠাম হতে পারে, কোনো-না-কোনো কারণে মনোহর হতেও পারে, তার আড়ম্বর-বাহুল্যে বিশেষ-একটা শক্তিসম্পদও প্রকাশ করতে পারে, অর্থাৎ ঝড়ের মেঘের মতো তার আশ্চর্য রঙের ঘটা থাকতে পারে, কিন্তু আসল যে জিনিসটি পড়েছে ঢাকা সে হচ্ছে সরল সত্যের সূর্য, যাকে স্বচ্ছ আকাশে তার আপন নির্মল মহিমায় দেখে বিশ্ব আনন্দিত হয়।

গান বল, চিত্র বল, কাব্য বল, ওস্তাদি প্রথমে নম্রশিরে, মোগল দরবারে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মতো, তাদের পিছনে থাকে। কিন্তু, যেহেতু প্রভুর চেয়ে সেবকের পাগড়ির রং কড়া, তার তকমার চোখ-ধাঁধানি বেশি, এই কারণে তারা ভিড়ের উৎসাহ যতই পায় ততই পিছন ছেড়ে সামনে এসে জমে যায়। যথার্থ আর্ট তখন হার মানে, তার স্বাধীনতা চলে যায়। যথার্থ আর্টের মধ্যে সহজ প্রাণ আছে বলেই তার বৃদ্ধি আছে, গতি আছে ; কিন্তু, যেহেতু কারুনৈপুণ্যটা অলংকার, যেহেতু তাতে প্রাণের

ধর্ম নেই, তাই তাকে প্রবল হতে দিলেই আভরণ হয়ে ওঠে শৃঙ্খল ; তখন সে আর্টের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বন্ধ করে দেয়, তার গতি রোধ করে। তখন যেটা বাহাদুরি করতে থাকে সেটা আত্মিক নয়, সেটা বৈষয়িক ; অর্থাৎ, তার মধ্যে প্রাণগত বৃদ্ধি নেই, বস্তুগত সঞ্চয় আছে। তাই আমাদের হিন্দুস্থানি গানে বৃদ্ধি দেখতে পাই নে। তানসেন প্রভৃতির অক্ষয় কমণ্ডলু থেকে যে-ধারা প্রবাহিত হয়েছিল ওস্তাদ প্রভৃতি জহ্নুমুনি কারদানি দিয়ে সেটি গিলে খেয়ে বসে আছে। মোট কথা, সত্যের রসরূপটি সুন্দর ও সরল করে প্রকাশ করা যে-কলাবিদ্যার কাজ অবান্তরের জঞ্জাল তার সবচেয়ে শত্রু। মহারণ্যের শ্বাস রুদ্ধ করে দেয় মহাজঙ্গল।

আধুনিক কলারসজ্ঞ বলছেন, আদিকালের মানুষ তার অশিক্ষিতপটুত্বে বিরলরেখায় যে-রকম সাদাসিধে ছবি আঁকত, ছবির সেই গোড়াকার ছাঁদের মধ্যে ফিরে না গেলে এই অবান্তরভারপীড়িত আর্টের উদ্ধার নেই। মানুষ বারবার শিশু হয়ে জন্মায় বলেই সত্যের সংস্কারবর্জিত সরলরূপের আদর্শ চিরন্তন হয়ে আছে; আর্টকেও তেমনি শিশুজন্ম নিয়ে অতি-অলংকারের বন্ধনপাশ থেকে বারে বারে মুক্তি পেতে হবে।

এই অবান্তরবর্জন কি শুধু আর্টেরই পরিত্রাণ। আজকের দিনের ভারজর্জর সভ্যতারও এই পথে মুক্তি। মুক্তি যে সংগ্রহের বাহুল্যে নয়, ভোগের প্রাচুর্যে নয়, মুক্তি যে আত্মপ্রকাশের সত্যতায়, আজকের দিনে এই কথাই মানুষকে বারবার স্মরণ করাতে হবে। কেননা, আজ মানুষ যেরকম বন্ধনজালে জড়িত, এমন কোনো দিনই ছিল না।

লোভমোহের বন্ধন থেকে মানুষ কবেই বা মুক্ত ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির সাধনা ছিল সজাগ। বৈষয়িকতার বেড়ায় তখন ফাঁক ছিল ; সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে সত্যের আলো আসত বলে সেই আলোর প্রতি কোনো দিন বিশ্বাস যায় নি। আজ জটিল অবান্তরকে অতিক্রম করে সরল চিরন্তনকে অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করবার সাহস মানুষের চলে গেছে।

আজ কত পণ্ডিত তথ্যের গভীর অন্ধকূপে ঢুকে টুকরো-টুকরো সংবাদের কণা খুঁটে খুঁটে জমাচ্ছেন। য়ুরোপে যখন বিদ্বেষের কলুষে আকাশ আবিল তখন এই-সকল পণ্ডিতদেরও মন দেখি বিষাক্ত। সত্যসাধনার যে-উদার বৈরাগ্য ক্ষুদ্রতা থেকে ভেদবুদ্ধি থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, তাঁরা তার আহ্বান শুনতে পান নি। তার প্রধান কারণ, জ্ঞানসাধনায় উপরের দিকে খাড়া হয়ে মানুষের যে-মাথা একদিন বিশ্ব-দেখা দেখত আজ সেই মাথা নীচে ঝুঁকে পড়ে দিনরাত টুকরো-দেখা দেখছে।

ভারতের মধ্যযুগে যখন কবীর দাদূ প্রভৃতি সাধুদের আবির্ভাব হয়েছিল তখন

ভারতের সুখের দিন না। তখন রাষ্ট্রনৈতিক ভাঙাগড়ায় দেশের অবস্থার কেবলই উলটপালট চলছিল। তখন শুধু অর্থ বিরোধ নয়, ধর্মবিরোধের তীব্রতাও খুব প্রবল। যখন অন্তরে বাহিরে নানা বেদনা সেই অস্থিরতার কালে স্বভাবত মানুষের মন ছোটো হয়, তখন রিপুর সংঘাতে রিপু্ জেগে ওঠে। তখন বর্তমানের ছায়াটাই কালো হয়ে নিত্যকালের আলো আচ্ছন্ন করে, কাছের কান্নাই বিশ্বের সকল বাণী ছাপিয়ে কানে বাজে। কিন্তু, সেই বড়ো কৃপণ সময়েই তাঁরা মানুষের ভেদের চেয়ে ঐক্যকে সত্য করে দেখেছিলেন। কেননা, তাঁরা সকলেই ছিলেন কবি, কেউ পণ্ডিত ছিলেন না। শব্দের জালে তাঁদের মন জড়িয়ে যায় নি, তথ্যের খুঁটিনাটির মধ্যে উঞ্ছবৃত্তি করতে তাঁরা বিরত ছিলেন। তাই, হিন্দুমুসলমানের অতিপ্রত্যক্ষ বিরোধ ও বিদ্বেষবুদ্ধির মধ্যে থেকেও তাদের মনুষ্যত্বের অন্তরে একের আবির্ভাব তাঁরা বিনা বাধায় স্পষ্ট করে দেখেছিলেন। সেই দেখাতেই দেখার মুক্তি।

এর থেকেই বুঝতে পারি, তখনো মানুষ শিশুর নবজন্ম নিয়ে সত্যের মুক্তিরাজ্যে সহজে সঞ্চরণ করবার অবকাশ ও অধিকার হারায় নি। এইজন্যেই আকবরের মতো সম্রাটের আবির্ভাব তখন সম্ভবপর হয়েছিল, এইজন্যেই যখন ভ্রাতৃরক্তপঙ্কিল পথে অওরংজেব গোঁড়ামির কঠোর শাসন বিস্তার করেছিলেন তখন্ তাঁরই ভাই দারাশিকো সংস্কারবর্জিত অসাম্প্রদায়িক সত্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তখন বড়ো দুঃখের দিনেও মানুষের পথ ছিল সহজ। আজ সে-পথ বড়ো দুর্গম। এখনকার দিনে প্রবীণেরা পথের প্রত্যেক কাঁকর গুনে বাধারই হিসাবকে প্রকাণ্ড করে তোলে; মৃত্যুঞ্জয় মানবাত্মার অপরাহত শক্তিকে তারা উপস্থিতের ছোটো ছোটো বিরুদ্ধসাক্ষ্যের জোরে অবজ্ঞা করে। তাই, তারা এত কৃপণ, এত সন্দিগ্ধ, এত নিষ্ঠুর, এত আত্মম্ভরি। বিশ্বাস যার নেই সে কখনো সৃষ্টি করতে পারে না, সে কেবলই সংগ্রহ করতে পারে; অবশেষে এই সংগ্রহ নিয়েই যত মারামারি কাটাকাটি।

আজকের এই বিশ্বাসহীন আনন্দহীন অন্ধযুগ কবির বাণীকে প্রার্থনা করছে এই কথা শোনাবার জন্যে যে, আত্মম্ভরিতায় বন্ধন, আত্মপ্রকাশেই মুক্তি; আত্মম্ভরিতায় জড় বস্তুরাশির জটিলতা, আত্মপ্রকাশে বিরলভূষণ সত্যের সরল রূপ।

হারুনা-মারু জাহাজ থেকে নেমে প্যারিসে কয়েক দিন মাত্র ভূমিমাতার শুশ্রূষা ভোগ করতে পেরেছিলাম। হঠাৎ খবর এল, যথাসময়ে পেরুতে পৌঁছতে হলে অবিলম্বে জাহাজ ধরা চাই। তাড়াতাড়ি শের্‌বুর্‌গ্‌-বন্দর থেকে আণ্ডেস্‌ জাহাজে উঠে

পড়লুম। লম্বায় চওড়ায় জাহাজটা খুব মস্ত কিন্তু আমার শরীরের বর্তমান অবস্থায় আরামের পক্ষে যে-সব সুবিধার প্রয়োজন ছিল, তা পাওয়া গেল না। জাপানি জাহাজে আতিথ্যের প্রচুর দাক্ষিণ্যে আমার অভ্যাসটাও কিছু খারাপ করে দিয়েছিল। সেইজন্যে এখানে ক্যাবিনে প্রবেশ করেই মনটা অপ্রসন্ন হল। কিন্তু, যেটা অনিবার্য নিজের গরজেই মন তার সঙ্গে যত শীঘ্র পারে রফা করে নিতে চায়। অত্যন্ত দুষ্পাচ্য জিনিসও পেটে পড়লে পাকযন্ত্র হাল ছেড়ে দিয়ে জারকরস প্রয়োগ বন্ধ করে না। মনেরও জারকরস আছে; অনভ্যস্ত কোনো দুঃখকে হজম করে নিয়ে তাকে সে আপনার অভ্যস্ত বিশ্বের সামিল করে নিশ্চিন্ত হতে চায়। অসুবিধাগুলো একরকম সহ্য হয়ে এল, আর দিনের-পর-দিন চরকার একঘেয়ে সুতো কাটার মতো একটানে চলতে লাগল।

বিষুবরেখা পার হয়ে চলেছি, এমন সময় হঠাৎ কখন শরীর গেল বিগড়ে; বিছানা ছাড়া গতি রইল না। ক্যাবিন জিনিসটাই একটা স্থায়ী ব্যাধি, ইন্দ্রিয়গুলো যদি তার সঙ্গে যোগ দিয়ে জুলুম শুরু করে তা হলে পুলিসের আকস্মিক বন্ধনের বিরুদ্ধে আদালতে পর্যন্ত আপিল বন্ধ হয়, কোথাও কিছুই সান্ত্বনা থাকে না। শান্তিহীন দিন আর নিদ্রাহীন রাত আমাকে পিঠমোড়া করে শিকল কষতে লাগল। বিদ্রোহের চেষ্টা করতে গেলে শাসনের পরিমাণ বাড়তেই থাকে। রোগ-গারদের দারোগা আমার বুকের উপর দুর্বলতার বিষম একটা বোঝা চাপিয়ে রেখে দিলে; মাঝে মাঝে মনে হত, এটা স্বয়ং যমরাজের পায়ের চাপ। দুঃখের অত্যাচার যখন অতিমাত্রায় চ'ড়ে ওঠে তখন তাকে পরাভূত করতে পারি নে; কিন্তু, তাকে অবজ্ঞা করবার অধিকার তো কেউ কাড়তে পারে না— আমার হাতে তার একটা উপায় আছে, সে হচ্ছে কবিতা-লেখা। তার বিষয়টা যা-ই হোক-না কেন, লেখাটাই দুঃখের বিরুদ্ধে সিডিশন-বিশেষ। সিডিশনের দ্বারা প্রতাপশালীর বিশেষ অনিষ্ট হয় না, তাতে পীড়িত চিত্তের আত্মসম্ভ্রম রক্ষা হয়।

আমি সেই কাজে লাগলুম, বিছানায় পড়ে পড়ে কবিতা লেখা চলল। ব্যাধিটা-যে ঠিক কী তা নিশ্চিত বলতে পারি নে, কেবল এই জানি, সে একটা অনির্বচনীয় পীড়া। সে-পীড়া শুধু আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নয়, ক্যাবিনের সমস্ত আসবাবপত্রের মধ্যে সর্বত্র সঞ্চারিত— আমি আর আমার ক্যাবিন সমস্তটা মিলে যেন একটা অখণ্ড রুগ্নতা।

এমনতরো অসুখের সময় স্বভাবতই দেশের জন্যে ব্যাকুলতা জন্মে। ক্যাবিনের জঠরের মধ্যে দিবারাত্রি জীর্ণ হতে হতে আমারও মন ভারতবর্ষের আকাশের উদ্দেশে উৎসুক হয়ে উঠল। কিন্তু, অল্প উত্তাপের পরিমাণ বেড়ে বেড়ে ক্রমে যেমন তা

আলোকিত হয়, দুঃখের তেমনি পরিমাণভেদে প্রকাশভেদ হয়ে থাকে। যে-দুঃখ প্রথমে কারাগারের মতো বিশ্ব থেকে পৃথক করে মনকে কেবলমাত্র নিজের ব্যথার মধ্যেই বদ্ধ করে, সেই দুঃখেরই বেগ বাড়তে বাড়তে অবশেষে অবরোধ ভেঙে পড়ে এবং বিশ্বের দুঃখসমুদ্রের কোটালের বানকে অন্তরে প্রবেশ করবার পথ ছেড়ে দেয়। তখন নিজের ক্ষণিক ছোটো দুঃখটা মানুষের চিরকালীন বড়ো দুঃখের সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়; তার ছট্‌ফটানি চলে যায়। তখন দুঃখের দণ্ডটা একটা দীপ্ত আনন্দের মশাল হয়ে জ্বলে ওঠে। প্রলয়কে ভয় যেই না-করা যায় অমনি দুঃখবীণার সুর বাঁধা সাঙ্গ হয়। গোড়ায় ওই সুর-বাঁধবার সময়টাই হচ্ছে বড়ো কর্কশ, কেননা, তখনো যে দ্বন্দ্ব ঘোচে নি। এই অভিজ্ঞতার সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের অবস্থা কল্পনা করতে পারি। বোধ হয়, প্রথম অবস্থায় ভয়ে ভরসায় যতক্ষণ টানাটানি চলতে থাকে ততক্ষণ ভারি কষ্ট। যতক্ষণ ভীষণকেই একমাত্র করে দেখি নে, যতক্ষণ তাকে অতিক্রম করেও জীবনের চিরপরিচিত ক্ষেত্রটা দেখা যায়, ততক্ষণ সেই দ্বন্দ্বের টানে ভয় কিছুতেই ছাড়তে চায় না। অবশেষে তাপের তীব্রতা বাড়তে বাড়তে রুদ্র যখন অদ্বিতীয় হয়ে দেখা দেন, প্রলয়ের গর্জন তখন সংগীত হয়ে ওঠে; তখন তার সঙ্গে নির্বিচারে সম্পূর্ণভাবে যোগ দেবার নিরতিশয় আগ্রহে মরিয়া করে তোলে। মৃত্যুকে তখন সত্য বলে জেনে গ্রহণ করি; তার একটা পূর্ণাত্মক রূপ দেখতে পাই বলে তার শূন্যাত্মকতার ভয় চলে যায়।

কয়দিন রুদ্ধকক্ষে সংকীর্ণ শয্যায় পড়ে পড়ে মৃত্যুকে খুব কাছে দেখতে পেয়েছিলাম, মনে হয়েছিল প্রাণকে বহন করবার যোগ্য শক্তি আমার শেষ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় প্রথম ইচ্ছার ধাক্কাটা ছিল দেশের আকাশে প্রাণটাকে মুক্ত করে দেওয়া। ক্রমে সেই ইচ্ছার বন্ধন শিথিল হয়ে এল। তখন মৃত্যুর পূর্বেই ঘরের বাইরে নিয়ে যাবার যে-প্রথা আমাদের দেশে আছে, তার অর্থ টা মনে জেগে উঠল। ঘরের ভিতরকার সমস্ত অভ্যস্ত জিনিস হচ্ছে প্রাণের বন্ধনজাল। তারা সকলে মিলে মৃত্যুকে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করতে থাকে। জীবনের শেষ ক্ষণে মনের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের কোলাহল যদি জেগে ওঠে তবে তাতেই বেসুর কর্কশ হয়; মৃত্যুর সম্পূর্ণ সংগীত শুনতে পাই নে, মৃত্যুকে সত্য বলে স্বীকার করে নেবার আনন্দ চলে যায়।

বহুকাল হল আমি যখন প্রথম কাশীতে গিয়েছিলাম তখন মৃত্যুকালের যে-একটি মনোহর দৃশ্য চোখে পড়েছিল, তা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। ঠিক মনে নেই, বোধ করি তখন শরৎকাল; নির্মল আকাশ থেকে প্রভাতসূর্য জীবধাত্রী বসুন্ধরাকে আলোকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে। এপারের লোকালয়ের বিচিত্র চাঞ্চল্য,

ওপারের প্রান্তরের সুদূরবিস্তীর্ণ নিস্তব্ধতা, মাঝখানে জলধারা— সমস্তকে দেবতার পরশমণি ছোঁয়ানো হল। নদীর ঠিক মাঝখানে দেখি একটি ডিঙি নৌকা খরস্রোতে ছুটে চলেছে। আকাশের দিকে মুখ করে মুমূর্ষু শুক্ক হয়ে শুয়ে আছে, তারই মাথার কাছে করতাল বাজিয়ে উচ্চস্বরে কীর্তন চলছে। নিখিল বিশ্বের বক্ষের মাঝে মৃত্যুর যে-পরম আহ্বান, আমার কাছে তারই সুগম্ভীর সুরে আকাশ পূর্ণ হয়ে উঠল। যেখানে তার আসন সেখানে তার শান্তরূপ দেখতে পেলে মৃত্যু যে কত সুন্দর, তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়। ঘরের মধ্যে সমস্তই তাকে উচ্চৈঃস্বরে অস্বীকার করে ; সেইজন্য সেখানকার খাটপালঙ সিন্দুক চৌকি দেওয়াল কড়ি বরগা, সেখানকার প্রাত্যহিক ক্ষুধাতৃষ্ণা কর্ম ও বিশ্রামের ছোটোখাটো সমস্ত দাবিতে মুখর চঞ্চল ঘরকরনার ব্যস্ততার মাঝখানে সমস্ত ভিড় ঠেলে, সমস্ত আপত্তি অতিক্রম ক'রে, মৃত্যু যখন চিরন্তনের লিপি হাতে নিয়ে প্রবেশ করে তখন তাকে দস্যু বলে ভ্রম হয় ; তখন তার হাতে মানুষ আত্মসমর্পণ করবার আনন্দ পায় না। মৃত্যু বাঁধন ছিন্ন করে দেবে, এইটেই কুৎসিত। আপনি বাঁধন আলগা করে দিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে তার হাত ধরব, এইটেই সুন্দর।

হিন্দু কাশীকে পৃথিবীর বাহিরের স্থান বলেই বিশ্বাস করে। তার কাছে কাশীর ভৌগোলিক সীমানা একটা মায়া, পরমার্থত সেখানে নিখিল বিশ্বের পরিচয়, সেখানে বিশ্বেশ্বরের আসন। অতএব, বিশেষ দেশবাসীর কাছে বিশেষ দেশের যে আকর্ষণবেগ তার প্রাণকে সেখানকার মাটি জল আকাশের সঙ্গে নানা বিশেষ সূত্রে বাঁধে, কাশীর মধ্যে যেন পৃথিবীর সেই বিশেষ দেশগত বন্ধনও নেই। অতএব, যথার্থ হিন্দুর কানে মৃত্যুর মুক্তিবাণী কাশীতে বিশুদ্ধ সুরে প্রবেশ করে।

বর্তমান যুগে ন্যাশনাল বৈষয়িকতা বিশ্বব্যাপী হয়ে স্বদেশগত অহমিকাকে সুতীব্র-ভাবে প্রবল করে তুলেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সংঘ-আশ্রিত অতি প্রকাণ্ডকায় রিপুই বর্তমান যুগের সমস্ত দুঃখ ও বন্ধনের কারণ। তাই, সেদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার মনে হল, আমিও যেন মুক্তির তীর্থক্ষেত্রে মরতে পারি ; শেষ মুহূর্তে যেন বলতে পারি, সকল দেশই আমার এক দেশ, সর্বত্রই এক বিশ্বেশ্বরের মন্দির, সকল দেশের মধ্য দিয়েই এক মানবপ্রাণের পবিত্র জাহ্নবীধারা এক মহাসমুদ্রের অভিমুখে নিত্যকাল প্রবাহিত।

ক্রাকোভিয়া স্টিমার
১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

পূর্বেই বলেছি, নন্দিনী তার নাম, তিন বছর তার বয়স, সে তৃতীয়ার চাঁদটুকুর মতো। আধুনিক নবেল পড়বার সময় তার এখনো হয় নি। ঘুম-পাড়াবার আগে তাকে গল্প শোনাবার লোক চাই। তাই, যে-আমি এতকাল জনসাধারণকে ঘুম পাড়াবার বায়না নিয়েছিলুম, দায়ে পড়ে সেই-আমার পদবৃদ্ধি হল। আজকাল এই ক্ষুদ্র মহারানীর শয্যাপার্শ্বে আমার তলব হচ্ছে।

কাল রাত্রে আহার সেরে জাহাজের কামরায় এসে বসেছি। হুকুম হল, "দাদামশায়, বাঘের গল্প বলো।" আমি কবি ভবভূতির মতো বিনয় করে বললুম, "আমার সমযোগ্য লোক হয়তো জাহাজে এক-আধজন মিলতেও পারে, কারণ, যাত্রী অনেক এবং বিপুলা চ তরণী।" কিন্তু, নিষ্কৃতি পেলুম না। তখন শুরু করে দিলুম—

এক যে ছিল বাঘ,
তার সর্ব অঙ্গে দাগ।
আয়নাতে তাই হঠাৎ দেখে
হল বিষম রাগ।
ঝগড়ুকে সেই বললে ডেকে,
"এখ্‌খনি তুই ভাগ,
যা চলে তুই প্রাগ্‌,
সাবান যদি না মেলে তো
যাস হাজারিবাগ।"

বীণাপাণির কৃপা এইখানে এসে থেমে গেল, ছড়া আর এগোল না। তখন ছন্দের বেড়া ডিঙিয়ে গদ্যের মধ্যে নেমে পড়লুম। পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারছেন গল্পের মূল ধারাটা হচ্ছে, বাঘের সর্বাঙ্গীণ কলঙ্কমোচনের জন্যে সাবান-অন্বেষণের দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে ঝগড়ু-নামধারী বেহারার যাত্রা।

কথা উঠবে, ঝগড়ুর তাগিদটা কিসের। দয়ারও নয়, মৈত্রীরও নয়, ভয়ের তাগিদ। বাঘ শাসিয়েছিল, সাবান না আনতে পারলে তার কান ছিঁড়ে নেবে। এতে বাস্তব-বিলাসীরা আশ্বস্ত হবেন, বুঝবেন, তা হলে গল্পটা নেহাত আজগুবি নয়।

প্রথমে দেখাতে হল, পাথেয় এবং সাবানের মূল্যের জন্যে কী অসম্ভব উপায়ে ঝগড়ু একেবারে পাঁচ তিন নয় সাত দশ পয়সা সংগ্রহ করলে। টেঁকে গুঁজে গোরুর গাড়ি করে সে বৃহস্পতিবারের বারবেলায় চেকোস্লোভাকিয়ায় রওনা হল। বোলপুরের কাছে

ধোবাপাড়ার রাস্তায় আসতেই থামকা একটা ব্রাউন রঙের গাধা সাদারঙের গোরুটার গা চেটে দিলে। বর্ণভেদে শ্রদ্ধাবান গোরুটা জাতিচ্যুতির ক্ষোভে গাড়িটা উলটিয়ে দিয়ে বন্ধনমুক্তভাবে চার পা তুলে সংসার ত্যাগ করে যাওয়াতে, সেই অপঘাতে ঝগড়ুর পা ভেঙে তাকে রাস্তায় পড়ে থাকতে হল। বেলা বয়ে যায়, দূর থেকে ক্ষণে-ক্ষণে বাঘের ডাকও শোনা যাচ্ছে। এখন হতভাগার কান বাঁচে কী করে। এমন সময় ঝুড়িকাঁখে জোড়াসাঁকোর মোক্ষদা চলেছে হাটে লাউশাক কিনতে। ঝগড়ু বললে, "মোক্ষদা, ও মোক্ষদা, তোমার ঝুড়িতে করে আমাকে ইস্টিশনে পৌঁছিয়ে দাও।" মোক্ষদা যদি তখনই দয়া করে সহজে রাজি হত, তা হলে বাস্তবওয়ালার মতে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হত না। তাই দেখাতে হল, ঝগড়ু যখন ট্যাঁকের থেকে দু-পয়সা নগদ দেবে কবুল করলে তখনই মোক্ষদা তাকে ঝুড়িতে তুলে নিলে। আশা করেছিলুম, গল্পের এই সন্ধিস্থলে এসে পৌঁছোবার পূর্বেই শ্রোত্রীর ঘুম আসবে। তার পরে, কাল আবার যদি আমাকে ধরে তা হলে উপসংহারে দেখাতে হবে, ভালোমানুষ ঝগড়ুর কানের তো কোনো অপচয় হলই না, বরঞ্চ পূর্বের চেয়ে এই প্রত্যঙ্গটা দীর্ঘতর হয়ে উঠে কানের বানানে দন্ত্য 'ন'কে মাত্রাছাড়া মূর্ধন্য 'ণ'য়ে খাড়া করে তোলবার পক্ষে সাক্ষ্য দিলে। কেবল কাটা গেল ওই দুষ্ট বাঘের লেজটা। সংসারে ধর্মের পুরস্কার ও অধর্মের তিরস্কার -মূলক উপদেশের সাহায্যে কলুষিত বঙ্গসাহিত্যে স্বাস্থ্যকর হাওয়া বইয়ে দেবার ইচ্ছাটাও আমার মনে ছিল।

কিন্তু, গল্পের গোড়ায় নন্দিনীর চোখে যে-একটু ঘুমের আবেশ ছিল সেটা কেটে গিয়ে তার দৃষ্টি শরৎকালের আকাশের মতো জ্বল্‌জ্বল্‌ করতে লাগল। ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক, বাঘ যদি বা ঝগড়ুর কানটা ছেড়ে দিতে রাজি হয়, নন্দিনী গল্পটাকে ছাড়তে কিছুতেই রাজি হল না। অবশেষে দুই-চার জন আত্মীয়স্বজনের মধ্যস্থতায় কাল রাত্রির মতো ছুটি পেয়েছি।

আর্টিস্ট বললেন, গল্পের প্রবাহে নানারকম ভেসে-আসা ছবি ওর মনকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে রাখছিল। তা হলেই তর্ক ওঠে, ছবির এমন কী গুণ আছে যাতে ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখে। কোনো দৃশ্য যখন বিশেষ করে আমাদের চোখ ভোলায় তখন কেন আমরা বলি, যেন ছবিটি।

মুখ্যত ছবির গুণ হচ্ছে দৃশ্যতা। তাকে আহার করা নয়, ব্যবহার করা নয়, তাকে দেখা ছাড়া আর কোনো লক্ষ্যই নেই। তা হলেই বলতে হবে, যাকে আমরা পুরোপুরি দেখতে পাই তাকে আমাদের ভালো লাগে। যাকে উদাসীনভাবে দেখি তাকে পুরো দেখি নে; যাকে প্রয়োজনের প্রসঙ্গে দেখি তাকেও না; যাকে দেখার জন্যেই দেখি

তাকেই দেখতে পাই। বোলপুরের রাস্তায় গোরু, গাধা, গাড়ি উলটে ঝগড়ুর পা-ভাঙা প্রভৃতি দৃশ্যের দাম কিসেরই বা। চলতি ভাষায় যাকে মনোহর বলে এ তো তা নয়। কিন্তু, গল্পের বেগে তারা মনের সামনে এসে হাজির হচ্ছিল; শিশুর মন তাদের প্রত্যেককেই স্বীকার করে নিয়ে বললে, "হাঁ, এরা আছে।" এই বলে স্বহস্তে এদের কপালে অস্তিত্বগৌরবের টীকা পরিয়ে দিলে। এই দৃশ্যগুলি গল্প-বলার বেষ্টনীর মধ্যে একটি বিশেষ ঐক্য লাভ করেছিল। বিশ্বের ছাড়া-ছাড়া সমস্ত ছড়ানো তথ্যের অস্পষ্টতা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে তারা সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই জোরে তারা কেবলই দাবি করতে লাগল "আমাকে দেখো!" সুতরাং, নন্দিনীর চোখের ঘুম আর টিঁকল না।

কবি বল, চিত্রী বল, আপনার রচনার মধ্যে সে কী চায়। সে বিশেষকে চায়। বাতাসে যে-অঙ্গারবাষ্প সাধারণভাবে আছে গাছ তাকে আত্মসাৎ ক'রে আপন ডালে-পালায় ফলে ফুলে আপন ছন্দে রঙে অত্যন্ত বিশেষ করে যখন তোলে, তখনই তাতে সৃষ্টিলীলা প্রকাশ পায়। নীহারিকায় জ্যোতির্বাষ্প একটা একাকার ব্যাপার, নক্ষত্র-আকারে বিশেষত্ব লাভ করায় তার সার্থকতা। মানুষের সৃষ্টিচেষ্টাও সেইরকম অনির্দিষ্ট সাধারণ থেকে সুনির্দিষ্ট বিশেষকে জাগাবার চেষ্টা। আমাদের মনের মধ্যে নানা হৃদয়াবেগ ঘুরে বেড়ায়। ছন্দে সুরে কথায় যখন সে বিশেষ হয়ে ওঠে তখন সে হয় কাব্য, সে হয় গান। হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করা হল বলেই-যে আনন্দ তা নয়। তাকে বিশিষ্টতা দেওয়া হল বলেই আনন্দ। সেই বিশিষ্টতার উৎকর্ষেই তার উৎকর্ষ। মানুষের যে-কোনো রচনা সেই উৎকর্ষ পেয়েছে তাকেই আর্ট-সৃষ্টিরূপে দেখি; সেই একান্ত দেখাতেই আনন্দ।

ইংরেজি ভাষায় ক্যারেকটার শব্দের একটা অর্থ, স্বভাব, নৈতিক চরিত্র; আর-একটা অর্থ, চরিত্ররূপ। অর্থাৎ, এমন কতকগুলি গুণের এমন সমাবেশ যাতে এই সমাবেশটি বিশেষভাবে লক্ষ্যগোচর হয়। পূর্বেই বলেছি, এইরকম বিশেষ গোচরতাই আর্টের ধর্ম। নাট্যে কাব্যে চিত্রে নৈতিক সদ্‌গুণের চেয়ে এই ক্যারেক্‌টারের মূল্য বেশি।

সৃষ্টির দিকে বিশেষত্ব এই তো আছে ক্যারেক্‌টার, সৃষ্টিকর্তার দিকে বিশেষত্ব প্রতিভায়। সেটা হচ্ছে দৃষ্টির বিশেষত্ব, অনুভূতির বিশেষত্ব, রচনার বিশেষত্ব নিয়ে। ভক্ত সমুদ্র-পর্বত-অরণ্যে সৃষ্টিকর্তার একটি স্বরূপ দেখতে পান, তাতেই সে-দৃশ্যগুলি বিশেষভাবে তাঁর অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। রূপকারের রচনাতেও তেমনি করেই স্রষ্টাব্যক্তিটি আপন প্রতিভার স্বরূপ দিয়ে আপন সৃষ্টির রূপটিকে দ্রষ্টাব্যক্তিটির কাছে সুনির্দিষ্ট করে দেয়। তাতে যে-আনন্দ পাই সে সৌন্দর্যের বা স্বার্থবুদ্ধির শুভবুদ্ধির আনন্দ নয়, বিশেষকে ব্যক্ত দেখার আনন্দ। আমার ভিতরকার ব্যক্তি সেই পরিব্যক্তিতে নিজেরই

বিস্তার দেখে। বস্তুতত্ত্ব (physics) সমস্ত বস্তুর মধ্যে সাধারণ, সেটা হল বিজ্ঞানের ; আর, চেহারা পদার্থটা বিশেষের, সেটা হল আর্টের। বিশেষের বেড়া ভাঙতে ভাঙতে বিজ্ঞান যখন ব্যাপককে পায় তখন তার সার্থকতা ; আর, ব্যাপকের পর্দাটা তুলে ধরে আর্ট যখন বিশেষকে পায় তখন সে হয় খুশি।

সুন্দর সেই বিশেষের কোঠায় এসে পড়ে তো ভালো, নইলে সুন্দর বলেই তার গুমোর নেই। আর্টের এলেকায় সাহেবপাড়ার সরকারি বাগানের স্থান নেই, আছে চিৎপুর রোডের। সরকারি বাগানের অনেক সদ্‌গুণ আছে, তাকে সুন্দর বললে লক্ষণে মেলে ; সে-বাগানে সাধারণ উপকার আছে, কিন্তু বিশেষ স্বাদ নেই। চিৎপুর রোডের স্বাদ আছে, উপকার নেই বললেই হয়। কলকাতার ইডেন-গার্ডেন ফোটো-গ্রাফের অন্ত্যজ পংক্তিতে স্থান পেতে পারে, কিন্তু চিৎপুর রোডের পংক্তি আর্টের অভিজাতবর্গের কোঠায়। কুলীনের মেয়ের মতোই চিৎপুর রোড আর্টিস্টের তুলিতে আপন পর্যায় পাবার জন্যে আজ পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছে। কোনো কালে না-ও যদি পায় তবু তার কৌলীন্য ঘুচবে না!

হেডমাস্টার তাঁর ইস্কুলের সবচেয়ে শিষ্টশান্ত অধ্যয়নরত ভালো ছেলেটির প্রতি তর্জনী নির্দেশ করে তাকে আমাদের দৃষ্টান্তগোচর করে রাখবার চেষ্টা করেন। কিন্তু, তর্জনীর জোরেও আমরা তাকে স্পষ্ট দেখতে পাই নে। যাকে খুবই দেখতে পাওয়া যায় সে হেডমাস্টারের আদর্শ ছেলে নয়, ছাত্রবৃত্তি তার কপালে প্রায়ই জোটে না। সেটা ডানপিটে ইস্কুলপালানো ছেলে, আপন প্রাণপূর্ণ বিশেষত্ব দ্বারা সে খুবই স্ব-প্রকাশ। ব্যবহারের দিক থেকে তাকে অবজ্ঞা করা চলে, কিন্তু প্রয়োজননিরপেক্ষ প্রকাশের দিক থেকে সে-ছেলে সেরা ছেলে। সে হেডমাস্টারের বর্জনীয়, কিন্তু আর্টিস্টবিধাতার বরণীয়। চরিত্রনীতিবিলাসী ঐতিহাসিক তাঁর মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মরাজ নাম দিয়ে সদ্‌গুণের উচ্চ পীঠের উপর দাঁড় করিয়ে সর্বদা আমাদের চোখের উপর ধরে রেখেছেন, কিন্তু তবু যুধিষ্ঠির স্পষ্ট করে চোখে পড়েন না ; আর চরিত্রচিত্র-বিলাসী কবি তাঁর ভীমসেনকে নানা অবিবেচনা ও অসংযমের অপবাদে লাঞ্ছিত করেও আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। যারা সত্য কথা বলতে ভয় করে না তারা স্বীকার করবেই যে, সর্বগুণের যুধিষ্ঠিরকে ফেলে দোষগুণে-জড়িত ভীমসেনকেই তারা ভালোবাসে। তার একমাত্র কারণ, ভীমসেন সুস্পষ্ট। শেক্‌স্‌পিয়রের ফল্‌স্‌টাফ্‌ও স্বাস্থ্যকর দৃষ্টান্ত বলে সমাজে আদরণীয় নয়, স্পষ্ট প্রত্যক্ষ বলেই সাহিত্যে আদরণীয়। রামচন্দ্রের ভক্তদের আমি ভয় করি ; তাই খুব চুপিচুপি বলছি, সাহিত্যে রামের চেয়ে লক্ষ্মণ বড়ো। বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিশ্চয়ই মানবেন যে, রামকে তিনি ভালো বলেন, কিন্তু লক্ষ্মণকে তিনি ভালোবাসেন।

আমরা হাজার প্রমাণ দেখাতে পারি যে, আর্টে আমরা গুণবানকে চাই নে, রূপবানকে চাই। এখানে রূপবান বলতে সুন্দরকে বলছি নে। রূপের স্পষ্টতায় যে সুপ্রত্যক্ষ সেই রূপবান। শ্রীমন্ত সদাগরের চেয়ে রূপবান ভাঁড়ুদত্ত। বিষবৃক্ষে অনেক নামজাদা নায়কনায়িকা আছেন, অনেক সাধু লেখক তাদের চরিত্র বিচার করেছেন, তার উপরে আমি আর কিছু বলতে চাই নে, কেবল এইটুকু বলে রাখি, বিষবৃক্ষে হীরা রূপবান। হীরা আমাদের ঘুমোতে দেয় না, সে সুন্দর বলে নয়, গুণবান বলে নয়, রূপবান বলে ; সাধারণ অস্পষ্টতার মাঝখানে সে বিশেষ বলে সুপ্রত্যক্ষ বলে।

এ কথা মানতে হবে, চলতি ভাষায় যাকে সুন্দর বলে তাকে নিয়ে কবি কিম্বা রূপকার আপনাদের রচনায় খুব ব্যবহার করে থাকেন। তার প্রধান কারণ, সৌন্দর্য হচ্ছে একটা বিশিষ্টতা। জীবনের পথে চলতে চলতে অগণ্য বস্তুর ভিড়কে আমরা পাশ কাটিয়ে যাই। সুন্দর হঠাৎ বলে ওঠে, "চেয়ে দেখো।" প্রতিদিন হাজার হাজার জিনিসকে যা না বলি তাকে তাই বলি ; বলি, "তুমি আছ।" ওইটেই হল আসল কথা। সে-যে নিশ্চিত আছে, এই বার্তাটাই তার সৌন্দর্য আমার কাছে উপস্থিত করলে। সে-যে সৎ, এইটে একান্ত উপলব্ধি করতে পারলুম বলেই সে এত আনন্দ দিলে। শিশুর কাছে তার খেলার জিনিস মহার্ঘ্য বলেই দামি নয়, সুন্দর বলেই প্রিয় নয়। আপন কল্পনাশক্তি দিয়ে তাকে স্পষ্ট উপলব্ধি করে বলেই ছেঁড়া নেকড়ায় তৈরি হলেও সে তার কাছে সত্য, এবং সত্য বলেই আনন্দময় ; কারণ, সত্যের রসই হচ্ছে আনন্দ।

এক রকমের গায়ে-পড়া সৌন্দর্য আছে যা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সঙ্গে যোগ দিয়ে অতি-লালিত্যগুণে সহজে আমাদের মন ভোলায়। চোর যেমন দ্বারীকে ঘুষ দিয়ে চুরি করতে ঘরে ঢোকে। সেইজন্যে যে-আর্ট আভিজাত্যের গৌরব করে সে-আর্ট এই সৌন্দর্যকে আমল দিতেই চায় না। একজাতের বাইজিমহলে চলতি খেলো সংগীত তার হালকা চালের সুরতালের উত্তেজনায় সাধারণ লোকের মনে নেশা ধরিয়ে দেয়। বড়ো ওস্তাদেরা এই নেশাধরানো কানভোলানো ফাঁকিকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করেন। তাতে তাঁরা সাধারণ লোকের শস্তা বকশিশ থেকে বঞ্চিত হওয়াকেই পুরস্কার বলে মেনে নেন। তাঁরা যে বিশিষ্টতাকে আর্টের সম্পদ বলে জানেন সে-বিশিষ্টতা প্রলোভননিরপেক্ষ উৎকর্ষ। তাকে দেখাতে গেলে যেমন সাধনা, তাকে পেতে গেলেও তেমনি সাধনা চাই। এইজন্যেই তার মূল্য। নিরলংকার হতে তার ভয় নেই। সরলতার অভাবকে, আড়ম্বরকে সে ইতর বলে ঘৃণা করে। সুললিত বলে নিজের পরিচয় দিতে সে লজ্জা বোধ করে, সুসংগত বলেই তার গৌরব।

গীতায় আছে, কর্মের বিশুদ্ধ মুক্তরূপ হচ্ছে তার নিষ্কামরূপ। অর্থাৎ, ত্যাগের দ্বারা

নয়, বৈরাগ্যের দ্বারাই কর্মের বন্ধন চলে যায়। তেমনি ভোগেরও বিশুদ্ধরূপ আছে, সেই রূপটি পেতে গেলে বৈরাগ্য চাই। বলতে হয়, মা গৃধঃ, লোভ কোরো না। সৌন্দর্য-ভোগ মনকে জাগাবে, এইটেই তার স্বধর্ম; তা না করে মনকে যখন সে ভোলাতে বসে তখন সে আপনার জাত খোয়ায়, তখন সে হয়ে যায় নীচ। উচ্চ-অঙ্গের আর্ট এই নীচতা থেকে বহু যত্নে আপনাকে বাঁচাতে চায়। লোভীর ভিড় তাড়াবার জন্যে সে অনেক সময়ে কঠোরকে দ্বারের কাছে বসিয়ে রাখে, এমন-কি, অনেক সময় কিছু বিশ্রী, কিছু বেসুর তার রচনার সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। কেননা, তার সাহস আছে; সে জানে, যে-বিশিষ্টতা আর্টের প্রাণ তার সঙ্গে গায়ে পড়ে মিষ্টি মিশোল করবার কোনো দরকার নেই। উমার হৃদয় পাবার জন্যে শিবকে কন্দর্প সাজতে হয় নি।

বিশেষকে দেখবার আর-একটা কৌশল আছে, সে হচ্ছে নূতনত্ব। অতিপরিচয়ের আবরণে বিশেষ ঢাকা পড়ে, এইজন্যে অনভ্যস্তকেই বিশেষ বলে খাড়া করবার দিকে দুর্বল আর্টিস্টের প্রলোভন আসতে পারে। এই প্রলোভন আর্টিস্টের তপোভঙ্গের কারণ। অতিপরিচয়ের ম্লানতার মধ্যেই চির-বিশেষের উজ্জ্বলরূপ দেখাতে পারে যে-গুণী সেই তো গুণী। যেখানটা সর্বদা আমাদের চোখে পড়ে অথচ দেখতে পাই নে, সেইখানেই দেখবার জিনিসকে দেখানো হচ্ছে আর্টিস্টের কাজ। সেইজন্যেই তো বড়ো বড়ো আর্টিস্টের রচনার বিষয় চিরকালের জিনিস। আর্ট পুরাতনকে বারে বারে নূতন করে। বিশেষকে সে দেখতে পায় হাতের কাছে, ঘরের কাছে। সৃষ্টি তো খনির জিনিস নয় যে খুঁড়তে খুঁড়তে তার পুঁজি ফুরিয়ে যাবে। সে-যে ঝরনা; তার প্রাচীন ধারা-যে চিরদিনই নবীন হয়ে বইছে, এইটে প্রমাণ করবার জন্যে তাকে কোনো অদ্ভুত ভঙ্গী করতে হয় না। অশোকের মঞ্জরী কালিদাসের আমলেও যে-রঙে বসন্তের শ্যামল বক্ষ রাঙিয়ে দিয়েছে আজও নূতনত্বের ভান করে সেই রং বদল করবার তার দরকার হয় নি। নির্ভয়ে সে বর্ষে বর্ষে পুরাতনের বাসরঘরেই নবীনের ঘোমটা খুলে দিচ্ছে। বারে বারেই চোখের উপর থেকে জড়তার মোহ কেটে যাচ্ছে, আর চির-বিশেষকে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু, ইটের ঢেলার চেয়ে অশোকমঞ্জরীকেই বিশেষ করে দেখি কেন, এইটেই দাঁড়ায় প্রশ্ন। এর উত্তর এই যে, আপন অংশ-প্রত্যংশের সমাবেশ নিয়ে অশোক আপনার মধ্যে একটি সুসংগত বিশেষ ঐক্যকে প্রকাশ করে বলেই তার মধ্যে আমাদের মন একটি পুরো দেখাকে দেখে। ইটের ঢেলায় আমাদের কাছে সত্তার সেই চরমতা নেই। একটা স্টিম ইঞ্জিনের মধ্যে প্রয়োজনঘটিত সুষমার ঐক্য আছে। কিন্তু, সেই ঐক্য প্রয়োজনেরই অনুগত। সে নিজেকেই চরম বলে প্রকাশ করে না, আর-কিছুকে প্রকাশ করে। সেই ইঞ্জিনের মধ্যে ব্যবহারের আনন্দ, তার মধ্যে

কৌতূহলের বিষয় থাকতে পারে। কিন্তু তাতে বিশুদ্ধ দেখার অহৈতুক বিষয় নেই।

সত্তাকে সকলের চেয়ে অব্যবহিত করে অনুভব করি নিজের মধ্যে। আমার মধ্যে একটি এক নিয়ত বলছে "আছি"। গানের মধ্যে, ছবির মধ্যে, এক যদি তেমনি জোরে বলে উঠতে পারে "এই-যে আমি", তা হলেই তাতে-আমাতে মিলনের সুর পূর্ণ হয়ে বাজল। একেই বলে শুভদৃষ্টি ; ঐক্যের উপলব্ধিতে দেখবার বিষয় চোখে-পড়া

আর্টিস্ট প্রশ্ন করছে, আর্টের সাধনা কী। আমি বলি "দেখো", তবেই দেখাতে পারবে। সত্তার প্রবাহিনী ঝরে পড়ছে ; তারই স্রোতের জলে মনের অভিষেক হোক ; ছোটো-বড়ো সুন্দর-অসুন্দর সব নিয়ে তার নৃত্য। সেই প্রকাশধারার বেগ চিত্তকে স্পর্শ করলে চিত্তের মধ্যেও প্রকাশের বেগ প্রবল হয়ে ওঠে। সৃষ্টির লীলা চার দিকেই আছে, এই সহজ সত্যটি যদি আর্টিস্ট আজও আবিষ্কার করতে না পেরে থাকে, পুরাণ-কাহিনীর পুঁথির মধ্যে, প্রাচীন রাজপুতানার পটের মধ্যে, যদি সে দেখার জিনিস খুঁজে বেড়ায় তা হলে বুঝব, কলাসরস্বতীর পদ্মাসন তার মনের মধ্যে বিকশিত হয় নি। তাই সে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড আসবাবের দোকানে নির্জীব কাঠের চৌকি খুঁজতে বেরিয়েছে।

পরিশিষ্ট

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৪

মানুষ যে মানুষের পক্ষে কত সুদূরের জীব তা য়ুরোপে আমেরিকায় গেলে বুঝতে পারা যায়। সেখানকার সমাজ হচ্ছে দ্বীপশ্রেণী— ছোটো এক এক দল জ্ঞাতির চারি দিকে বৃহৎ অজ্ঞাতির লবণসমুদ্র; পরস্পরসংলগ্ন মহাদেশের মতো নয়। জ্ঞাতি শব্দটা তার ধাতুগত বিশেষ অর্থে আমি ব্যবহার করছি; অর্থাৎ, যে-কয়জনের মধ্যে জানাশোনা আছে, আনাগোনা চলে; আমাদের দেশে পরস্পর আনাগোনার জন্য জানাশোনার দরকার হয় না। আমরা তো খোলা জায়গায় রাস্তার চৌমাথায় বাস করি। একে আমাদের আয়ু কম, তার উপরে অবাধ সামাজিকতায় পরস্পরের সময় নষ্ট ও কাজ নষ্ট করতে আমাদের সংকোচমাত্র নেই।

আবার অন্যপক্ষে, ভোগের আদর্শ যেখানে অত্যন্ত বেশি ব্যয়সাধ্য, সুতরাং যেখানে সময়-জিনিসটাকে মানুষ টাকার দরে যাচাই করতে বাধ্য, সেখানে মানুষে মানুষে মিল কেবলই বাধাগ্রস্ত হবেই, আর সেই মিল যতই প্রতিহত ও অনভ্যস্ত হতে থাকবে ততই মানুষের সর্বনাশের দিন ঘনিয়ে আসবেই। একদিন দেখা যাবে, মানুষ বিস্তর জিনিস সংগ্রহ করেছে, বিস্তর বই লিখেছে, বিস্তর দেয়াল গেঁথে তুলেছে, কেবল নিজে গেছে হারিয়ে। মানুষ আর মানুষের কীর্তির মধ্যে সামঞ্জস্য ভেঙে গিয়েছে বলেই আজ মানুষ খুব সমারোহ করে আপন গোরস্থান তৈরি করতে বসেছে।

২৬ সেপ্টেম্বর

একজন আধুনিক জাপানি রূপদক্ষের রচিত একটি ছবি আমার কাছে আছে। সেটি যতবার দেখি আমার গভীর বিস্ময় লাগে। দিগন্তে রক্তবর্ণ সূর্য— শীতের বরফ-চাপা শাসন সবে-মাত্র ভেঙে গেছে, প্লাম গাছের পত্রহীন শাখাগুলি জয়ধ্বনির বাহু-ভঙ্গীর মতো সূর্যের দিকে প্রসারিত, সাদা সাদা ফুলের মঞ্জরীতে গাছ ভরা। সেই প্লাম গাছের তলায় একটি অন্ধ দাঁড়িয়ে তার আলোকপিপাসু দুই চক্ষু সূর্যের দিকে তুলে প্রার্থনা করছে।

আমাদের ঋষি প্রার্থনা করেছেন : তমসো মা জ্যোতির্গময়, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও। চৈতন্যের পরিপূর্ণতাকে তাঁরা জ্যোতি বলেছেন। তাঁদের ধ্যানমন্ত্রে সূর্যকে তাঁরা বলেছেন : ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ, আমাদের চিত্তে তিনি ধীশক্তির ধারাগুলি প্রেরণ করছেন।

ঈশোপনিষদে বলেছেন, হে পূষন্‌, তোমার ঢাকা খুলে ফেলো, সত্যের মুখ দেখি ; আমার মধ্যে যিনি সেই পুরুষ তোমার মধ্যে।

এই বাদলার অন্ধকারে আজ আমার মধ্যে যে ছায়াচ্ছন্ন বিষাদ সে ওই ব্যাকুলতারই একটি রূপ। সেও বলছে, হে পূষন্‌, তোমার ওই ঢাকা খুলে ফেলো, তোমার জ্যোতির মধ্যে আমার আত্মাকে উজ্জ্বল দেখি। অবসাদ দূর হোক। আমার চিত্তের বাঁশিতে তোমার আলোকের নিশ্বাস পূর্ণ করো— সমস্ত আকাশ আনন্দের গানে জাগ্রত হয়ে উঠুক। আমার প্রাণ-যে তোমার আলোকেরই একটি প্রকাশ, আমার দেহও তাই। আমার চিত্তকে তোমার জ্যোতিরঙ্গুলি যখনই স্পর্শ করে তখনই তো ভূর্ভুবস্বঃ দীপ্যমান হয়ে ওঠে। মেঘে মেঘে তোমার যেমন নানা রং আমার ভাবনায় ভাবনায় তোমার তেজ তেমনি সুখদুঃখের কত রং লাগিয়ে দিচ্ছে। একই জ্যোতি বাইরের পুষ্পপল্লবের বর্ণে গন্ধে এবং অন্তরের রাগে অনুরাগে বিচিত্র হয়ে ঠিকরে পড়ছে। প্রভাতে সন্ধ্যায় তোমার গান দিকে দিগন্তে বেজে ওঠে ; তেমনি তোমারই গান আমার কবির চিত্ত গলিয়ে দিয়ে ভাষার স্রোতে ছন্দের নাচে বয়ে চলল। এক জ্যোতির এত রং, এত রূপ, এত ভাব, এত রস! অন্ধকারের সঙ্গে নিত্য ঘাতে প্রতিঘাতে তার এত নৃত্য, এত গান, তার এত ভাঙা, এত গড়া— তারি সারথ্যে যুগযুগান্তরের এমন রথযাত্রা! তোমার তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় প্রার্থনাই তো গাছ হয়ে, ঘাস হয়ে আকাশে উঠছে, বলছে, অপাবৃণু— ঢাকা খুলে দাও। এই ঢাকা খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা খোলা থেকেই তার ফুল ফল। এই প্রার্থনাই আদিম জীবাণুর মধ্যে দিয়ে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত। মানুষের প্রাণের ঘাট পেরিয়ে মানুষের চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চলল। মানুষের ইতিহাস বলছে, অপাবৃণু, ঢাকা খোলো। জীব বলছে, আমার মধ্যে যে-সত্য আছে তার জ্যোতির্ময় পূর্ণস্বরূপ দেখি। হে পূষন্‌, হে পরিপূর্ণ, তোমার হিরণ্ময় পাত্রের মুখের আবরণ ঘুচুক, তার অন্তরের রহস্য প্রকাশিত হোক— সেই রহস্য আমার মধ্যে তোমার মধ্যে একই।

প্রাণ যখন ক্লান্ত হয় তখন বলি, সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাক, সৃষ্টির লীলাতরঙ্গে আর উঠতে নামতে পারি নে ; পাত্রের ঢাকা কেবল খুলে যাক তা নয় পাত্রটাই যাক ভেঙে, একের বক্ষে বিরাজ না করে একের মধ্যে বিলুপ্ত হই। ভারতবর্ষে এই প্রার্থনা ক্ষণে ক্ষণে শুনতে পাই।

কিন্তু আমি বলি, অপাবৃণু ; সত্যের মুখ খুলে দাও— একেকে অন্তরে বাহিরে ভালো করে দেখি, তা হলেই অনেককে ভালো করে বুঝতে পারব। গানের মধ্যে আগাগোড়া যে একটি আনন্দময় এক আছে তাকে যতক্ষণ বুঝতে না পারি ততক্ষণ সুরের সঙ্গে

সুরের দ্বন্দ্ব আমাকে সুখ দেয় না, আমাকে পীড়া দেয়। তাই বলে আমি বলব না, গান যাক লুপ্ত হয়ে; আমি বলব, পূর্ণ গানটাকে অন্তরে যেন জানি, তা হলেই খণ্ড সুরের দ্বন্দ্বটা বাহিরে আমাকে আর বাজবে না, সেটাকেও অখণ্ড আনন্দের মধ্যে বিধৃত করে দেখব।

২৭ সেপ্টেম্বর

বয়স যখন অল্প ছিল তখন অনেক ঘটনা ঘটেছে যা মনকে খুব নাড়া দিয়েছে। এই ঘটনাগুলোর সত্যের গৌরব যদি যাচাই করতে চাই তবে দেখতে পাব, দুই বড়ো বড়ো সাক্ষী দুই-রকমের বাটখারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে ওজনের মিল নেই। বৈজ্ঞানিক পুরাতাত্ত্বিক যে-প্রমাণকে সব-চেয়ে খাঁটি বলে মানে সে হচ্ছে, যাকে বলা যেতে পারে সাধারণ প্রমাণ, সে হচ্ছে নির্বিশেষ। কিন্তু, মানুষ যেহেতু একান্ত বৈজ্ঞানিক নয়, সেইজন্যে মানুষের জগতে যে-সকল ঘটনা ঘটে সেগুলি যদি নিতান্ত তুচ্ছ না হয় তা হলে তাদের ওজন সাধারণ বাটখারার ওজন মানে না। তাদের বেলায় বিজ্ঞানকে হটিয়ে দিয়ে কোথা থেকে একটা অসাধারণ তুলাদণ্ড এসে খাড়া হয়। বৈজ্ঞানিক সেই ওজনটাকে সাধারণ ওজনের সঙ্গে মিল করতে গিয়ে ভারি গোলমাল করতে থাকে। একটা খুব বড়ো দৃষ্টান্ত দেখা যাক, বুদ্ধদেব। যদি তাঁর সময়ে সিনেমাওয়ালা এবং খবরের কাগজের রিপোর্টারের চলন থাকত তা হলে তাঁর খুব একটা সাধারণ ছবি পাওয়া যেত। তাঁর চেহারা, চালচলন, তাঁর মেজাজ, তাঁর ছোটোখাটো ব্যক্তিগত অভ্যাস, তাঁর রোগ তাপ ক্লান্তি ভ্রান্তি সব নিয়ে আমাদের অনেকের সঙ্গে মিল দেখতুম। কিন্তু, বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এই সাধারণ প্রমাণটাকেই যদি প্রামাণিক বলে গণ্য করা যায় তা হলে একটা মস্ত ভুল করি। সে ভুল হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিতের— ইংরেজিতে যাকে বলে পার্‌স্‌পেক্‌টিভ্‌। যে-জনতাকে আমরা সর্বসাধারণ বলি, সে কেবল ক্ষণকালের জন্যে মানুষের মনে ছায়া ফেলে মুহূর্তে মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। অথচ, এমন সব মানুষ আছেন যাঁরা শত শত শতাব্দী ধরে মানুষের চিত্তকে অধিকার করে থাকেন। যে-গুণে অধিকার করেন সেই গুণটাকে ক্ষণকালের জাল দিয়ে ধরাই যায় না। ক্ষণকালের জাল দিয়ে যেটা ধরা পড়ে সেই হল সাধারণ মানুষ; তাকে ডাঙায় তুলে মাছকোটার মতো কুটে বৈজ্ঞানিক যখন তার সাধারণত্ব প্রমাণ ক'রে আনন্দ করতে থাকেন তখন দামি জিনিসের বিশেষ দামটা থেকেই তাঁরা মানুষকে বঞ্চিত করতে চান। সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষ অসামান্য মানুষকে এই বিশেষ দামটা দিয়ে এসেছে! সাধারণ সত্য মত্ত হস্তীর মতো এসে এই বিশেষ সত্যের পদ্মবনটাকে দলন করলে সেটা কি সহ্য করা যাবে। সিনেমা-ছবিতে গ্রামোফোনের ধ্বনিতে যে-বুদ্ধকে পাওয়া যেতে পারে সে তো ক্ষণকালের বুদ্ধ;

সুদীর্ঘকাল মানুষের সজীব চিত্তের সিংহাসনে ব'সে যিনি অসংখ্য নরনারীর ভক্তিপ্রেমের অর্ঘ্যে অলংকৃত হয়েছেন তিনি চিরকালের বুদ্ধ। তাঁর ছবি সুদীর্ঘ যুগযুগান্তরের পটে আঁকা হয়েই চলেছে। তাঁর সত্য কেবলমাত্র তাঁকে নিয়ে নয়, তাঁর সত্য বহু দেশকাল-পাত্রের বিপুলতাকে নিয়ে; সেই বৃহৎ পরিমণ্ডলের মধ্যে তাঁর দৈনিক ঘটনা, তাঁর সাময়িক মানসিক অবস্থার চঞ্চল ছায়ালোকপাত চোখে দেখতেই পাওয়া যাবে না। যদি কোনো অণুবীক্ষণ নিয়ে সেইগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি তা হলে তাঁর বৃহৎ রূপটাকে দেখা অসম্ভব হবে। যে-মানুষ আপন সাধারণ-ব্যক্তিগত পরিধির মধ্যে বিশেষ দিনে জন্মলাভ করে বিশেষ দিনে মরে গেছেন তিনি বুদ্ধই নন। মানুষের ইতিহাস সেই আপন বিস্মরণশক্তির গুণেই সেই ছোটো বুদ্ধের প্রতিদিনের ছোটো ছোটো ব্যাপার ভুলে যেতে পেরেছে, তবেই একটি বড়ো বুদ্ধকে পেয়েছে। মানুষের স্মরণশক্তি যদি ফোটোগ্রাফের প্লেটের মতো সম্পূর্ণ নির্বিকার হত তা হলে সে আপন ইতিহাস থেকে উঞ্ছবৃত্তি করে মরত, বড়ো জিনিস থেকে বঞ্চিত হত।

বড়ো জিনিস যেহেতু দীর্ঘকাল থাকে এইজন্যে তাকে নিয়ে মানুষ অকর্মকভাবে থাকতেই পারে না। তাকে নিজের সৃষ্টিশক্তি নিজের কল্পনাশক্তি দিয়ে নিয়তই প্রাণ জুগিয়ে চলতে হয়। কেননা, বড়ো জিনিসের সঙ্গে তার-যে প্রাণের যোগ, কেবলমাত্র জ্ঞানের যোগ নয়। এই যোগের পথ দিয়ে মানুষ আপন প্রাণের মানুষদের কাছ থেকে যেমন প্রাণ পায় তেমনি তাদের প্রাণ দেয়।

এই প্রসঙ্গে একটি অপেক্ষাকৃত ছোটো দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়ছে। ম্যাক্সিম গোর্কি টলস্টয়ের একটি জীবনচরিত লিখেছেন। বর্তমানকালের প্রখরবুদ্ধি পাঠকেরা বাহবা দিয়ে বলছেন, এ-লেখাটা আর্টিস্টের যোগ্য লেখা বটে। অর্থাৎ, টলস্টয় দোষে গুণে ঠিক যেমনটি সেই ছবিতে তীক্ষ্ণ রেখায় তেমনটি আঁকা হয়েছে; এর মধ্যে দয়ামায়া ভক্তি-শ্রদ্ধার কোনো কুয়াশা নেই। পড়লে মনে হয়, টলস্টয় যে সর্বসাধারণের চেয়ে বিশেষ কিছু বড়ো তা নয়, এমন-কি, অনেক বিষয়ে হেয়। এখানে আবার সেই কথাটাই আসছে। টলস্টয়ের কিছুই মন্দ ছিল না, এ কথা বলাই চলে না; খুঁটিনাটি বিচার করলে তিনি-যে নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতোই এবং অনেক বিষয়ে তাদের চেয়েও দুর্বল, এ কথা স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু, যে-সত্যের গুণে টলস্টয় বহু-লোকের এবং বহুকালের, তাঁর ক্ষণিকমূর্তি যদি সেই সত্যকে আমাদের কাছ থেকে, আচ্ছন্ন করে থাকে তা হলে এই আর্টিস্টের আশ্চর্য ছবি নিয়ে আমার লাভ হবে কী। প্রথম যখন আমি দার্জিলিং দেখতে গিয়েছিলুম দিনের পর দিন কেবলই দেখেছিলুম মেঘ আর কুয়াশা। কিন্তু জানা ছিল, এগুলো সাময়িক এবং যদিও হিমালয়কে আচ্ছন্ন

করবার এদের শক্তি আছে তবুও এরা কালো বাষ্পমাত্র, কাঞ্চনজঙ্ঘার ধ্রুব শুভ্র মহত্ত্বকে এরা অতিক্রম করতে পারে না। আর যাই হোক, হিমালয়কে এই কুয়াশার দ্বারা তিরস্কৃত দেখে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে মূঢ়তা হত। ক্ষণকালের মায়ার দ্বারা চিরকালের স্বরূপকে প্রচ্ছন্ন করে দেখাই আর্টিস্টের দেখা, এ কথা মানতে পারি নে। তা ছাড়া, গোর্কির আর্টিস্ট-চিত্ত তো বৈজ্ঞানিক হিসাবে নির্বিকার নয়। তাঁর চিত্তে টলস্টয়ের যে-ছায়া পড়েছে সেটা একটা ছবি হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবেও সেটা-যে সত্য তা কেমন করে বলব। গোর্কির টলস্টয়ই কি টলস্টয়। বহুকালের ও বহু লোকের চিত্তকে যদি গোর্কি নিজের চিত্তের মধ্যে সংহত করতে পারতেন তা হলেই তাঁর দ্বারা বহুকালের ও বহুলোকের টলস্টয়ের ছবি আঁকা সম্ভবপর হত। তার মধ্যে অনেক ভোলবার সামগ্রী ভুলে যাওয়া হত; আর তবেই যা না-ভোলবার তা বড়ো হয়ে, সম্পূর্ণ হয়ে, দেখা দিত।

জাহাজ ক্রাকোভিয়া। ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

মানুষের মধ্যে মন প্রাণ দেহ এই তিনে মিলে কাজ চালায়, এই তিনের আপসে আমাদের কর্মবেগের একটা ছন্দ তৈরি করে। শীতের দেশে দেহ সহজেই ছুটে চলতে চায়; তারই সঙ্গে তাল রাখবার জন্যে মনেরও তাড়াতাড়ি ভাবা দরকার। গরম দেশে আমরা ধীরে সুস্থে চলি, ধীরে সুস্থে ভাবি, কোনো বিষয়ে মন স্থির করতে বিলম্ব ঘটে। শীতের দেশে যে-তেজকে দেহের মধ্যেই জাগিয়ে তুলতে হয় গরম দেশে সেই তেজ দেহের বাইরে; সেই আকাশব্যাপী তেজ শরীরের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি; সেইজন্যে আভ্যন্তরিক উত্তেজনা যাতে বেড়ে না ওঠে আমাদের শরীরের সেই অভিপ্রায়। চলাফেরার দম সর্বদাই তাকে কমিয়ে রাখতে হয়; তাই আমাদের মনের মধ্যে কর্মচিন্তার ছন্দ মন্দাক্রান্তা।

মনের ভাবনা ও হুকুমের অপেক্ষায় যখন দেহকে কাজ চালাবার জন্যে পথ চেয়ে থাকতে হয় না তখন তাকেই বলে অভ্যাস, সেই অভ্যাসেই নৈপুণ্য। কর্মের তাল যতই দ্রুত হয়, দেহের পক্ষে ততই দ্বিধাবিহীন হওয়া দরকার। ভাবতে মনের যে-সময় লাগে তার জন্যে সবুর করতে গেলেই দ্বিধা ঘটে। বাহিরে কর্মের ফল সেই সবুরের জন্যে যদি অপেক্ষা করতে না পারে তা হলেই বিভ্রাট। মোটরগাড়ির একটা বিশেষ বেগ আছে, কখন তার হাল বাঁয়ে ফেরাব, কখন ডাইনে, তা ঠিক করতে হলে সেই কলের বেগের দ্রুত ছন্দেই ঠিক করতে হয়, নইলে বিপদ ঘটে। সেই দ্রুততা বারবার অভ্যাসের জোরেই সহজ হয়। অভ্যাসের বাহিরে কোনো নূতন অবস্থা এসে

পড়লে অপঘাত ঘটায়, অর্থাৎ যেখানে মনের দরকার সেখানে মনকে প্রস্তুত না পেলেই মুশকিল।

দম দিয়ে কলের তাল দুন চৌদুন করা শক্ত নয়, সেই সঙ্গে অভ্যাসের বেগও অনেক পরিমাণে বাড়ানো চলে। কিন্তু এই দ্রুত অভ্যাসের নৈপুণ্যে সেই-সব কাজই সম্ভবপর হয় যা 'বস্তুগত'। অর্থাৎ, এক বস্তা বাঁধবার জায়গায় দুই বস্তা বাঁধা যায়। কিন্তু, যা কিছু প্রাণগত ভাবগত তা কলের ছন্দের অনুবর্তী হতে চায় না।

যারা পালোয়ান প্রকৃতির লোক সংগীতে তারা দুন চৌদুনের বেগ দেখে পুলকিত হয়ে ওঠে; কিন্তু পদ্মবনের তরঙ্গদোলায় যারা বীণাপাণির মাধুর্যে মুগ্ধ, ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে তাঁর মোটরযাত্রার প্রস্তাবে তাদের মন হায়-হায় করতে থাকে।

পশ্চিমমহাদেশে মানুষের জীবনযাত্রার তাল কেবলই দুন থেকে চৌদুনের অভিমুখে চলেছে। কেননা, জীবনের সার্থকতার চেয়ে বস্তুর প্রয়োজন অত্যন্ত বেড়ে উঠেছে। ঘর ভেঙে হাট তৈরি হল, রব উঠল: Time is Money। এই বেগের পরিমাপ সহজ। সেইজন্যে সেখানে একটা জিনিস সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে, যেটা সকলেরই কাছে সুস্পষ্ট, যেটা বুঝতে কারো মুহূর্তকাল দেরি হয় না, সে হচ্ছে পাখোয়াজির হাত দুটোর দুড় দাড় তাণ্ডবনৃত্য। গান বুঝতে যে সবুর করা অত্যাবশ্যক, সেটা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও রক্ত গরম হয়ে ওঠে, ভিড়ের লোকে বলে, "সাবাস! এ একটা কাণ্ড বটে!"

এবার জাহাজে সিনেমা অভিনয় দেখা আমার ভাগ্যে ঘটেছিল। দেখলুম, তার প্রধান জিনিসটাই হচ্ছে দ্রুত লয়। ঘটনার দ্রুততা বারে বারে চমক লাগিয়ে দিচ্ছে। এই সিনেমা আজকালকার দিনে সর্বসাধারণের একটা প্রকাণ্ড নেশা। ছেলে বুড়ো সকলকেই প্রতিদিন এতে মাতিয়ে রেখেছে। তার মানে হচ্ছে সকল বিভাগেই বর্তমান যুগে কলার চেয়ে কারদানি বড়ো হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনসাধনের মুগ্ধদৃষ্টি কারদানিকেই পছন্দ করে। সিদ্ধি, ইংরেজিতে যাকে সাক্‌সেস্‌ বলে, তার প্রধান বাহন হচ্ছে দ্রুত নৈপুণ্য। পাপকর্মের মধ্য দিয়েও সেই নৈপুণ্যের লীলাদৃশ্য আজ সকলের কাছে উপাদেয়। সুষমাকে কল্যাণকে উপলব্ধি করবার মতো শান্তি ও অবকাশ প্রতিদিন প্রতিহত হতে চলল; সিদ্ধির ঘোড়দৌড়ে জুয়োখেলার উত্তেজনা পশ্চিমদিগন্তে কেবলই ঘূর্ণি হাওয়া বইয়ে দিচ্ছে।

পশ্চিমমহাদেশের অন্ধকার পটের উপর আবর্তমান পলিটিক্সের দৃশ্যটাকে একটা সিনেমার বিপুলাকার চলচ্ছবির মতো দেখতে হয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে, দ্রুতলয়ের প্রতিযোগিতা। জলে স্থলে আকাশে কে একটুমাত্র এগিয়ে যেতে পারে তারই উপর হারজিত নির্ভর করছে। গতি কেবলই বাড়ছে, তার সঙ্গে শান্তির কোনো সমন্বয় নেই।

ধর্মের পথে ধৈর্য চাই, আত্মসংবরণ চাই ; সিদ্ধির পথে চাতুরীর ধৈর্য নেই, সংযম নেই, তার হস্তপদচালনা যতই দ্রুত হবে ততই তার ভেলকি বিস্ময়কর হয়ে উঠবে— তাই জাদুকরের সভ্যতায় বেগের পরিমাণ সকল দিকেই এত বেশি ত্বরান্বিত যে, মানুষের মন অসত্যে লজ্জিত ও অপঘাতসম্ভাবনায় শঙ্কিত হবার সময় পাচ্ছে না।

ক্রাকোভিয়া। এডেন বন্দর
১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

ঘর বলে, পেয়েছি ; পথ বলে, পাই নি। মানুষের কাছে "পেয়েছি" তারও একটা ডাক আছে, আর "পাই নি" তারও ডাক প্রবল। ঘর আর পথ নিয়েই মানুষ। শুধু ঘর আছে পথ নেই সেও যেমন মানুষের বন্ধন, শুধু পথ আছে ঘর নেই সেও তেমনি মানুষের শাস্তি। শুধু "পেয়েছি" বদ্ধ গুহা, শুধু "পাই নি" অসীম মরুভূমি।

যাকে আমরা ভালোবাসি তারই মধ্যে সত্যকে আমরা নিবিড় করে উপলব্ধি করি। কিন্তু, সেই সত্য-উপলব্ধির লক্ষণ হচ্ছে পাওয়ার সঙ্গে না-পাওয়াকে অনুভব করা। সত্যের মধ্যে এই একান্ত বিরুদ্ধতার সমন্বয় আছে বলেই সত্য-উপলব্ধির জবানবন্দি এমন হয় যে, আদালতে তা গ্রাহ্যই হতে পারে না। সুন্দরকে দেখে আমাদের ভাষায় যখন বলি "আ মরি", তখন বাহিরের দাঁড়িপাল্লার ওজনে তাকে অত্যুক্তি বলা চলে, কিন্তু অন্তর্যামী তাকে বিশ্বাস করেন। সুন্দরের মধ্যে অনন্তের স্পর্শ যখন পাই তখন আমার মধ্যে যে-অন্ত আছে সে বলে, "আমি নেই। কেবল ওই আছে।" অর্থাৎ যাকে আমি অত্যন্ত পেয়েছি সে নেই, আর যাকে আমি পেয়েও পাই নে সেই অত্যন্ত আছে।

ঘড়ি-ধরা অবিশ্বাসী, সময়কে আপেক্ষিক অর্থাৎ মায়া বলে মানতে চায় না, সে জানে না— নিমেষই বল আর লক্ষ যুগই বল, দুয়ের মধ্যেই অসীম সমানভাবেই আছেন, শুধু কেবল উপলব্ধির অপেক্ষা। এইজন্যই কবি প্রেমের ভাষায় অর্থাৎ নিবিড় সত্য উপলব্ধির ভাষায় বলেছেন, "নিমিষে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।" যারা আয়তনকে ঐকান্তিক সত্য বলে মনে করে তারাই অসীমের সীমা শুনলে কানে হাত দেয়। কিন্তু, দেশই বল, আর কালই বল, যাতে করে সৃষ্টির সীমা নির্দেশ করে দেয়, দুইই আপেক্ষিক, দুইই মায়া। সিনেমাতে কালের পরিমাণ বদল করে দিয়ে যে ব্যায়াম-ক্রীড়া দেখানো হয় তাতে দেখি যে ঘড়ি-ধরা কালে যা একভাবে প্রত্যক্ষ, কালকে বিলম্বিত করে দিলে তাকেই অন্যভাবে দেখা যায়, অর্থাৎ স্বল্পকালের সংহতিতে যা চঞ্চল, বৃহৎ কালের ব্যাপ্তিতে তাই স্থির। শুধু কাল কেন, আকাশ সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। আমাদের দৃষ্টির আকাশে গোলাপফুলকে যে-আয়তনে দেখছি অণুবীক্ষণের আকাশে তাকে

সে-আয়তনে দেখি নে। আকাশকে আরো অনেক বেশি আণুবীক্ষণিক করে দেখতে পারলে গোলাপের পরমাণুপুঞ্জকে বৈদ্যুতিক যুগলমিলনের নৃত্যলীলারূপে দেখতে পারি, সে-আকাশে গোলাপ একেবারে গোলাপই থাকে না। অথচ, সে-আকাশ দূরস্থ নয়, স্বতন্ত্র নয়, এই আকাশেই। তাই পরম সত্যকে উপনিষৎ বলেছেন: তদেজতি তন্নৈজতি, একই কালে তিনি চলেনও তিনি চলেনও না।

সংস্কৃত ভাষায় ছন্দ শব্দের একটা অর্থ হচ্ছে কাব্যের মাত্রা, আর-একটা অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা। মাত্রা আকারে কবির সৃষ্টি-ইচ্ছা কাব্যকে বিচিত্র রূপ দিতে থাকে। বিশ্ব-সৃষ্টির বৈচিত্র্যও দেশকালের মাত্রা-অনুসারে। কালের বা দেশের মাত্রা বদল করবা-মাত্রই সৃষ্টির রূপ এবং ভাব বদল হয়ে যায়। এই বিশ্বছন্দের মাত্রাকে আমরা আরো গভীর করে দেখতে পারি; তা হলে চরম বিশ্বকবির ইচ্ছাশক্তির মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে হবে। মাত্রা সেখানে মাত্রার অতীতের মধ্যে; সীমার বৈচিত্র্য সেখানে অসীমের লীলা অর্থে প্রকাশ পায়।

দেশকালের মধ্যেই দেশকালের অতীতকে উপলব্ধি করে তবেই আমরা বলতে পারি "মরি-মরি"। সেই আনন্দ না হলে মরা সহজ হবে কেমন করে। তাল আর সা-রে-গ-ম যখন কেবলমাত্র বাহিরের তথ্যরূপে কানের উপর মনের উপর পড়তে থাকে তখন তার থেকে মুক্তি পাবার জন্যে চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কিন্তু যখন সেই তাল আর সা-রে-গ-মের ভিতর থেকেই সংগীতকে দেখতে পাই তখন মাত্রায় অমাত্রকে, সীমায় অসীমকে, পাওয়ায় অপাওয়াকে জানি; তখন সেই আনন্দে মনে হয় এর জন্যে সব দিতে পারি। কার জন্যে। ঐ সা-রে-গ-মের জন্যে? ওই ঝাঁপতাল-চৌতালের জন্যে, দুন-চৌদুনের কসরতের জন্যে? না; এমন-কিছুর জন্যে যা অনির্বচনীয়, যা পাওয়া না-পাওয়ায় এক হয়ে মেশা; যা সুর নয়, তাল নয়, সুরতালে ব্যাপ্ত হয়ে থেকে সুর-তালের অতীত যা, সেই সংগীত।

প্রয়োজনের জানা নিতান্তই জানার সীমানার মধ্যে বদ্ধ, তার চার দিকে না-জানার আকাশমণ্ডলটা চাপা; সেইজন্যে তাকে সত্যরূপে দেখা হয় না, সেইজন্যে তার মধ্যে যথার্থ আনন্দ নেই, বিস্ময় নেই, শ্রদ্ধা নেই। সেইজন্যে তার উদ্দেশ্যে যথার্থ ত্যাগ স্বীকার সম্ভব হতে পারে না। এই কারণেই ভারতবর্ষের প্রতি ইংরেজের ব্যক্তিগত বদান্যতার অদ্ভুত অভাব। অথচ, এ সম্বন্ধে তার সংগতির বোধ এতই অল্প যে, ভারতবর্ষের জন্যে তার ত্যাগের তালিকা হিসাব করবার বেলায় সর্বদাই সে অহংকার করে বলে যে, তার সিভিল সার্ভিস, তার ফৌজের দল ভারতবর্ষের সেবায় গরমে দগ্ধ হয়ে, লিভার বিকৃত ক'রে, প্রবাসের দুঃখ মাথায় নিয়ে কী কষ্টই না পাচ্ছে। বিষয়কর্মের আনুষঙ্গিক দুঃখকে

ত্যাগের দুঃখ নাম দেওয়া, রাষ্ট্রনীতির আইন ও ব্যবস্থা-রক্ষার উপলক্ষে যে-কৃচ্ছ্রসাধন তাকে সত্যের তপস্যা, ধর্মের সাধনা, বলাটা হয় গুপ্ত পরিহাস নয় মিথ্যা অহংকার।

বাসনার চোখে বা বিদ্বেষের চোখে বা অহংকারের চোখে যাকে দেখি তাকে সীমায় বেঁধে দেখি; তার প্রতি পূর্ণ সত্যের ব্যবহার কোনোমতেই হতে পারে না ব'লে তার থেকে এত দুঃখের উৎপত্তি হয়। মুনফার লোভে, ক্ষমতার অত্যাকাঙ্ক্ষায়, মানুষের সত্য আজ সর্বত্র যেমন আচ্ছন্ন হয়েছে এমন আর কখনোই হয় নি। মানুষের মধ্যে সত্যকে না দেখতে পাওয়ার নিরানন্দ এবং অন্যায়, বিশ্বের পূর্ণ অধিকার থেকে বিশ্বজিগীষু কুস্তিগিরদের আজ যেমন বঞ্চিত করেছে এমন কোনোদিন করে নি। সেইজন্যেই বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে মানুষ এ কথা বলতে লজ্জাও করছে না যে, মানুষকে শাসন করবার অধিকারই শ্রেষ্ঠ অধিকার; অর্থাৎ, তাকে পৃথক করে রাখবার নীতিই বড়ো নীতি।...

বহু অল্পসংখ্যক য়ুরোপীয় বালকবালিকার শিক্ষার জন্য তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ গবর্নমেণ্ট ব্যয় করতে সম্মত হয়েছেন বলে দেশি লোকেরা যে নালিশ করে থাকে, শুনলুম, তার জবাবে আমাদের শাসনকর্তা বলেছেন, যেহেতু অনেক মিশনারি বিদ্যালয় ভারতের জন্য আত্মসমর্পণ করেছে সেই কারণে এই নালিশ অসংগত। আমি নিজে এই নালিশ করি নে, যে-কোনো সমাজের লোকের জন্য যত অধিক পরিমাণ অর্থব্যয় করা হোক আমার তাতে আপত্তি নেই। য়ুরোপীয় বালকবালিকারা যদি অশিক্ষিতভাবে মানুষ হয় তাতে আমাদেরও মন্দ ছাড়া ভালো হবার আশা নেই। কিন্তু, মিশনারি বিদ্যালয়ের ওজর দিয়ে আত্মগ্লানি দূর করবার চেষ্টা ঠিক নয়। এ কথা স্বীকৃত যে, এই পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর শতকরা দশ অংশও শিক্ষিত নয়; আজ প্রায় শতাব্দীকাল ইংরেজ-শাসনে শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নি ব'লেই এটা ঘটেছে। সেটার প্রধান কারণ, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব। কিন্তু য়ুরোপীয় বালকবালিকার প্রতি সে-অভাব নেই। আমাদের পক্ষে শতকরা পাঁচভাগ শিক্ষাই যথেষ্ট, কিন্তু য়ুরোপীয় ছাত্রদের জন্য শতকরা নিরানব্বই ভাগ শিক্ষার ব্যবস্থা হলেও ওই একভাগের জন্য খুঁৎখুঁৎ থেকে যায়। জাপান তো জাপানি ছেলেদের জন্যে এমন কথা বলে নি, সেখানেও তো মিশনারি বিদ্যালয় আছে। যে-কারণে ভারতের অর্থে পুষ্ট ইংরেজধনীর মধ্যে প্রায়ই কেউ ভারতের দৈন্যদুঃখলাঘবের জন্য মুনফার সামান্য অংশও দিতে পারে নি, সেই কারণেই ভারত-গবর্নমেণ্ট ভারতের অজ্ঞতা-অপমানলাঘবের জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষার ব্যয় বহন করতে পারে নি, সহজ বদান্যতার অভাবে। ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের অস্বাভাবিক সম্বন্ধ— এই কারণেই ইংলণ্ডের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় রাজামহারাজার দান দেখতে পাওয়া

যায়, কিন্তু ইংলণ্ডের কোনো ধনী ভারতের কোনো অনুষ্ঠানে দানের মতো কোনো দান করেছে শুনতে পাই নি। অথচ, ভারত নিঃস্ব, ইংরেজ ধনী।

মিশনারি বিদ্যালয়ে ইংরেজের অর্থ আছে এমন কথা উঠবে। কিন্তু, সে কি ইংরেজের অর্থ। সে-যে খৃস্টিয়ানের অর্থ। সে-যে ধর্মফলকামী সমস্ত ইউরোপের অর্থ। ধার্মিকের দান, আত্মীয়তার দান নয়, অধিকাংশ সময়েই তা পারলৌকিক বৈষয়িকতার দান। ভারতীয় খৃস্টিয়ানের সঙ্গে ইংরেজ খৃস্টিয়ানের যে কি সম্বন্ধ তা সকলেই জানে। ভারতের কোনো একটি পাহাড়ের শহরে চার্চ্ অফ ইংলণ্ডের সম্প্রদায়গত একজন ভারতীয় ভক্ত খৃস্টিয়ান ছিলেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টিসংকারের অনুষ্ঠান নির্বাহের জন্য তাঁর বিধবা স্ত্রী সেখানকার একমাত্র স্বসাম্প্রদায়িক পাদ্রিকে অনুরোধ করেন। পাদ্রি আপন মর্যাদা-হানি করতে সম্মত হলেন না ; বোধ করি এতে পোলিটিকাল প্রেস্টিজেরও খর্বতাসম্ভাবনা আছে। অগত্যা বিধবা প্রেস্‌বিটেরিয়ান পাদ্রির শরণাপন্ন হলেন ; তিনি ভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেওয়া অকর্তব্য বোধ করলেন। ভারতে কোনো যথার্থ ভক্ত ইংরেজ মিশনারি নেই, এ কথা আমি বলি নে। কিন্তু, মিশনারি অনুষ্ঠানের যে-অংশে সাধারণ ইংরেজ ধার্মিকের অর্থ আছে সেখানে শ্রদ্ধা আছে এ কথা মানব না। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। আমরা তো এই জানি, ভারতীয় চরিত্র ও ভারতীয় ধর্ম ও সমাজনীতির প্রতি সত্য মিথ্যা নানা উপায়ে অশ্রদ্ধা জাগিয়ে দিয়ে এই অর্থ সংগ্রহ হয়ে থাকে। অর্থাৎ, ভারতের প্রতি ইংরেজের যে-অবজ্ঞা ইংরেজ ধর্মব্যবসায়ীরা সর্বদাই তার ভূমিকা পত্তন ও ভিত্তি দৃঢ় করে এসেছে, সেখানকার শিশুদের মনে তারা খৃস্টের নাম করে ভারতীয়ের প্রতি অপ্রীতির বীজ বপন করেছে। সেই বড়ো হয়ে যখন শাসনকর্তা হয় তখন জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডকেও ন্যায়সংগত বলে বিচারকের আসন থেকে ঘোষণা করতে লজ্জা বোধ করে না। যেমন অশ্রদ্ধা তেমনি কার্পণ্য।...

আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে প্রধান ও সাধারণ আবরণ হচ্ছে অভ্যাসের মোহ। এই অভ্যাসে চেতনায় যে-জড়তা আসে তাতে সত্যের অনন্তরূপ আনন্দরূপ দেখতে দেয় না। শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে এই তত্ত্বটাকে আমরা একেবারেই অগ্রাহ্য করেছি। ছাত্রদের প্রতিদিন একই ক্লাসে একই সময়ে একই বিষয়ে শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করানোর চেয়ে মনের জড়ত্বের কারণ আর কিছুই হতে পারে না। শিক্ষা সম্বন্ধে ছাত্রদের প্রধানত যে-বিতৃষ্ণা জন্মে শিক্ষার বিষয় কঠিন বলেই যে তা ঘটে তা সম্পূর্ণ সত্য নয় ; শিক্ষাবিধি অত্যন্ত একঘেয়ে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। মানুষের প্রাণ যন্ত্রকে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু যন্ত্রকে আত্মীয় করতে পারে না ; শিক্ষাকে যন্ত্র করে তুললে তার থেকে কোনো বাহ্য ফলই হয় না তা নয়, কিন্তু সে শিক্ষা আত্মগত হতে গুরুতর বাধা পায়।

আকস্মিক হচ্ছে সীমার বাইরেকার দূত, অভাবনীয়ের বার্তা নিয়ে সে আসে। তাতেই আমাদের চেতনা জড়তা থেকে মুক্তির আনন্দ পায়। অভাবনীয়কে অনুভব করাতেই তার মুক্তি। বিশ্বের সর্বত্রই সেই অভাবনীয়। এই অভাবনীয়কে বোধের মধ্যে আনতে গেলে চিত্তকে প্রাণবান করে রাখা চাই, অর্থাৎ তাকে উৎসুক করে তুলতে হয়। এই ঔৎসুক্যই তাকে বদ্ধতার সীমার দিক থেকে বৃদ্ধির অসীমতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। অথচ, প্রাণের এই ঔৎসুক্য নষ্ট করে দিয়ে পুনরাবৃত্তির অন্ধ প্রদক্ষিণের জোয়ালে জোর করে চিত্তকে জুড়ে দেওয়াকেই অনেকে ডিসিপ্লিন বলে গৌরব করেন। অর্থাৎ, বিধাতা যে-মানুষকে প্রাণী করেছে সেই মানুষকেই তাঁরা যন্ত্র করতে চান। সেটা হয় সিদ্ধির লোভে। যন্ত্র হচ্ছে সিদ্ধিদেবীর বাহন, প্রাণকে পিষে সে প্রবল হয়। বিশেষ নির্দিষ্ট কোনো-একটা সংকীর্ণ ফল দেওয়াই তার কাজ। বিশ্বসত্যে নির্দিষ্টের চারি দিকে যে অসীম অনির্দিষ্ট আছে তাকে সে দেখতে পারে না, কেননা, প্রাণকে সে কেবলই গণ্ডীর বাহিরে আহ্বান করে। গণ্ডীর বাহিরে বিধাতার বাঁশি বাজে; ফলকামী সেই ধ্বনি রুদ্ধ করে প্রাচীর তোলে।

আমার মতে শিক্ষার প্রণালী হচ্ছে বৈরাগীর রাস্তায়। ছাত্রদের নিয়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। চলতে চলতে নিয়ত নব নব বিস্ময়ে অজানার ভিতর দিয়ে জেনে চলাই হচ্ছে প্রাণবান শিক্ষা। প্রাণের ছন্দের সঙ্গে এই শিক্ষাপ্রবাহের তাল মেলে। বদ্ধ ক্লাস হচ্ছে প্রাণধর্মী চিত্তের সহজজ্ঞানের পথে কঠিন বাধা। খাঁচায় মধ্যে পাখিকে বাঁধা খোরাক খাওয়ানো যায়, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ পাখি হতে শেখানো যায় না। বনের পাখি ওড়ার সঙ্গে খাওয়ার মিল করে আনন্দিত হয়। প্রকৃতির অভিপ্রায় ছিল চলার সঙ্গে পাওয়ার মিল করে মানুষকে শেখানো। কিন্তু, হতভাগ্য মানবসন্তানের পক্ষে চলা বন্ধ করে দিয়ে শেখানোই শিক্ষাপ্রণালী বলে গণ্য হয়েছে। তাতে কত ব্যর্থতা, কত দুঃখ তার হিসেব কে রাখে। আমি তো পথ-চলা শিক্ষাব্যবস্থার কথা অনেকবার প্রস্তাব করেছি, কিন্তু কারো মন পাই নে। কারণ, যারা ভদ্রশিক্ষা পেয়েছে তারা বাঁধনের শিক্ষাকেই বিশ্বাস করতে শিখেছে। আমার ভাগ্য আমাকে শিক্ষায় বিবাগী করেছে বলেই খোলা পথের শিক্ষার ধারাকেই আমি সব চেয়ে সম্মান দিই।

ক্রাকোভিয়া। ভারতসাগর
১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

শিশু যে-জগতে সঞ্চরণ করে তার প্রায় সমস্তই সে প্রবল করে দেখে। জীবনে নানা অবান্তর বিষয় জমে উঠে তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নি। যখন আমি শিশু ছিলুম

তখন আমাদের ছাদের উপর দিয়ে গয়লাপাড়ার দৃশ্য প্রতিদিনই দেখেছি ; প্রতিদিনই তা সম্পূর্ণ চোখে পড়েছে, প্রতিদিনই তা ছবি ছিল। আমার দৃষ্টি আর আমার দৃষ্টির বিষয়ের মাঝখানে কোনো ভাবনা, অভ্যাসের কোনো জীর্ণতা আড়াল করে নি। আজ সেই গোয়ালপাড়া কতকটা তেমনি করে দেখতে হলে সুইজর্ল্যাণ্ডে যেতে হয়। সেখানে মন ভালো করে স্বীকার করে, হাঁ, আছে।

শিশুর কাছে বিশ্ব খুব করে আছে, আমরা বয়স্কেরা সে-কথা ভুলে যাই। এইজন্যে, শিশুকে কোনো ডিসিপ্লিনের ছাঁচে ঢালবার জন্যে যখন তাকে জগৎ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের নিজের বানানো কলের মধ্যে বন্ধ করি তখন তাকে যে কতখানি বঞ্চিত করি তা নিজের অভ্যাসদোষেই বুঝতে পারি নে। বিশ্বের প্রতি তার এই একান্ত স্বাভাবিক ঔৎসুক্যের ভিতর দিয়েই যে তাকে শিক্ষা দিতে হবে, নিতান্ত গোঁয়ারের মতো সে-কথা আমরা মানি নে। তার ঔৎসুক্যের আলো নিবিয়ে তার মনটা অন্ধকার করে দিয়ে শিক্ষার জন্যে তাকে এডুকেশন-জেলখানার দারোগার হাতে সমর্পণ করে দেওয়াই আমরা পন্থা বলে জেনেছি। বিশ্বের সঙ্গে মানুষের মনের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ এই উপায়ে সেটাকে কঠোর শাসনে শিশুকাল থেকেই নষ্ট ও বিকৃত করে দিই।...

ছবি বলতে আমি কী বুঝি সেই কথাটাই আর্টিস্টকে খোলসা করে বলতে চাই।

মোহের কুয়াশায়, অভ্যাসের আবরণে, সমস্ত মন দিয়ে জগৎটাকে "আছে" বলে অভ্যর্থনা করে নেবার আমরা না পাই অবকাশ, না পাই শক্তি। সেইজন্য জীবনের অধিকাংশ সময়ই আমরা নিখিলকে পাশ কাটিয়েই চলেছি। সত্তার বিশুদ্ধ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েই মারা গেলুম।

ছবি, পাশ কাটিয়ে যেতে আমাদের নিষেধ করে। যদি সে জোর গলায় বলতে পারে "চেয়ে দেখো", তা হলেই মন স্বপ্ন থেকে সত্যের মধ্যে জেগে ওঠে। কেননা, যা আছে তাই সৎ ; যেখানেই সমস্ত মন দিয়ে তাকে অনুভব করি সেখানেই সত্যের স্পর্শ পাই।

কেউ না ভেবে বসেন, যা চোখে ধরা পড়ে তাই সত্য। সত্যের ব্যাপ্তি অতীতে ভবিষ্যতে দৃশ্যে অদৃশ্যে, বাহিরে অন্তরে। আর্টিস্ট সত্যের সেই পূর্ণতা যে-পরিমাণে সামনে ধরতে পারে "আছে" ব'লে মনের সায় সেই পরিমাণে প্রবল, সেই পরিমাণে স্থায়ী হয় ; তাতে আমাদের ঔৎসুক্য সেই পরিমাণে অক্লান্ত, আনন্দ সেই পরিমাণে গভীর হয়ে ওঠে।

আসল কথা, সত্যকে উপলব্ধির পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে একটা অনুভূতি আছে, সেই অনুভূতিকেই আমরা সুন্দরের অনুভূতি বলি। গোলাপফুলকে সুন্দর বলি এই-

জন্তেই যে, গোলাপ ফুলের দিকে আমার মন যেমন করে চেয়ে দেখে ইটের ঢেলার দিকে তেমন করে চায় না। গোলাপফুল আমার কাছে তার ছন্দের রূপে সহজেই সত্তা-রহস্তের কী একটা নিবিড় পরিচয় দেয়। সে কোনো বাধা দেয় না। প্রতিদিন হাজার জিনিসকে যা না বলি, তাকে তাই বলি; বলি, "তুমি আছ।"

একদিন আমার মালী ফুলদানি থেকে বাসি ফুল ফেলে দেবার জন্তে যখন হাত বাড়ালো, বৈষ্ণবী তখন ব্যথিত হয়ে বলে উঠল, "লিখতে পড়তেই তোমার সমস্ত মন লেগে আছে, তুমি তো দেখতে পাও না।" তখনই চমকে উঠে আমার মনে পড়ে গেল, হাঁ, তাই তো বটে। ওই 'বাসি' বলে একটা অভ্যস্ত কথার আড়ালে ফুলের সত্যকে আর আমি সম্পূর্ণ দেখতে পাই নে। যে আছে সেও আমার কাছে নেই; নিতান্তই অকারণে, সত্য থেকে, সুতরাং আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলুম। বৈষ্ণবী সেই বাসি ফুল-গুলিকে অঞ্চলের মধ্যে সংগ্রহ করে তাদের চুম্বন করে নিয়ে চলে গেল।

আর্টিস্ট তেমনি করে আমাদের চমক লাগিয়ে দিক। তার ছবি বিশ্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দিয়ে বলুক, "ওই দেখো, আছে।" সুন্দর বলেই আছে তা নয়, আছে বলেই সুন্দর।

সত্তাকে সকলের চেয়ে অব্যবহিত ও সুস্পষ্ট করে অনুভব করি আমার নিজের মধ্যে। "আছি" এই ধ্বনিটি নিয়তই আমার মধ্যে বাজছে। তেমনি স্পষ্ট করে যেখানেই আমরা বলতে পারি "আছে" সেখানেই তার সঙ্গে, কেবল আমার ব্যবহারের অগভীর মিল নয়, আত্মার গভীরতম মিল হয়। "আছি" অনুভূতিতে আমার যে-আনন্দ, তার মানে এ নয় যে, আমি মাসে হাজার টাকা রোজগার করি বা হাজার লোকে আমাকে বাহবা দেয়। তার মানে হচ্ছে এই যে, আমি যে সত্য এটা আমার কাছে নিঃসংশয়, তর্ক করা সিদ্ধান্তের দ্বারা নয়, নির্বিচার একান্ত উপলব্ধির দ্বারা। বিশ্বে যেখানে তেমনি একান্তভাবে "আছে" এই উপলব্ধি করি সেখানে আমার সত্তার আনন্দ বিস্তীর্ণ হয়। সত্যের ঐক্যকে সেখানে ব্যাপক করে জানি।

কোনো ফরাসি দার্শনিক অসীমের তিনটি ভাব নির্ণয় করেছেন— **the True, the Good, the Beautiful**। ব্রাহ্মসমাজে তারই একটি সংস্কৃত তর্জমা খুব চলতি হয়েছে— সত্যং শিবং সুন্দরম্। এমন-কি, অনেকে মনে করেন, এটি উপনিষদের বাণী। উপনিষৎ সত্যের স্বরূপ যে ব্যাখ্যা করেছেন সে হচ্ছে, শান্তং শিবং অদ্বৈতম্। শান্তং হচ্ছে সেই সামঞ্জস্য যার যোগে সমস্ত গ্রহতারা নিয়ে বিশ্ব শান্তিতে বিধৃত, যার যোগে কালের গতি চিরন্তন ধৃতির মধ্যে নিয়মিত: নিমেষা মুহূর্তাণ্যর্ধমাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি।— শিবং হচ্ছে মানবসমাজের মধ্যে সেই সামঞ্জস্য যা নিয়তই

কল্যাণের মধ্যে বিকাশ লাভ করছে, যার অভিমুখে মানুষের চিত্তের এই প্রার্থনা যুগে যুগে সমস্ত বিরোধের মধ্য দিয়েও গূঢ়ভাবে ও প্রকাশ্যে ধাবিত হচ্ছে : অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়। আর, অদ্বৈতং হচ্ছে আত্মার মধ্যে সেই ঐক্যের উপলব্ধি যা বিচ্ছেদের ও বিদ্বেষের মধ্য দিয়েও আনন্দে প্রেমে নিয়ত আত্মীয়তাকে ব্যাপ্ত করছে।

যাঁদের মন খৃস্টিয়ানতত্ত্বের আবহাওয়াতে অত্যন্ত অভ্যস্ত তাঁরা উপনিষৎ সম্বন্ধে ভয়ে ভয়ে থাকেন, খৃস্টিয়ান দার্শনিকদের নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে উপনিষদের বাণীকে কিছু-না-কিছু বদল করে চালিয়ে দেওয়া তাঁদের ভিতরকার ইচ্ছা। কিন্তু, শান্তং শিবং অদ্বৈতম্ এই মন্ত্রটিকে চিন্তা করে দেখলেই তাঁরা এই আশ্বাস পাবেন যে, অসীমের মধ্যে দ্বন্দ্বের অভাবের কথা বলা হচ্ছে না, অসীমের মধ্যে দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য এইটেই তাৎপর্য। কারণ, বিপ্লব না থাকলে শান্তির কোনো মানেই নেই, মন্দ না থাকলে ভালো একটা শব্দমাত্র, আর বিচ্ছেদ না থাকলে অদ্বৈত নিরর্থক। তাঁরা যখন সত্যের ত্রিগুণাত্মক ধ্যানের মন্ত্র-স্বরূপে 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' বাক্যটি ব্যবহার করেন তখন তাঁদের বোঝা উচিত যে, সত্যকে সত্য বলাই বাহুল্য এবং সুন্দর সত্যের একটা তত্ত্ব নয়, আমাদের অনুভূতিগত বিশেষণমাত্র, সত্যের তত্ত্ব হচ্ছে অদ্বৈত। যে-সত্য বিশ্বপ্রকৃতি লোকসমাজ ও মানবাত্মা পূর্ণ করে আছেন তাঁর স্বরূপকে ধ্যান করবার সহায়তাকল্পে 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্' মন্ত্রটি যেমন সম্পূর্ণ উপযোগী এমন আমি তো আর কিছুই জানি নে। মানবসমাজে যখন শিবকে পাবার সাধনা করি তখন কল্যাণের উপলব্ধিকে শান্তং আর অদ্বৈতং এই দুই-এর মাঝখানে রেখে দেখি, অর্থাৎ ইংরেজিতে বলতে গেলে, ল এবং লভ্‌এর পূর্ণতাই হচ্ছে সমাজের ওয়েল্‌ফেয়ার্।

আমাদের চিত্তের মধ্যে তামসিকতা আছে, সেইজন্য বিশ্বকে দেখার বাধা হচ্ছে। কিন্তু, মানুষের মন তো বাধাকে মেনে বসে থাকবে না। এই বাধার ভিতর দিয়ে কেবলই দেখার পথ করতে হবে। মানুষ যতদিন আছে ততদিনই এই পথ-খোদা চলে আসছে। মানুষ অন্ন বস্ত্র সংগ্রহ করছে, মানুষ বাসা বাঁধছে, তার সঙ্গে-সঙ্গেই কেবলমাত্র সত্তার গভীর টানে আত্মা দিয়ে দেখার দ্বারা বিশ্বকে আপন করে চলছে। তাকে জানার দ্বারা নয়, ব্যবহারের দ্বারা নয়, সম্পূর্ণ করে দেখার দ্বারা; ভোগের দ্বারা নয়, যোগের দ্বারা।

আর্টিস্ট আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর্টের সাধনা কী। আর্টের একটা বাইরের দিক আছে সেটা হচ্ছে আঙ্গিক, টেক্‌নিক্, তার কথা বলতে পারি নে। কিন্তু ভিতরের কথা জানি। সেখানে জায়গা পেতে চাও যদি তা হলে সমস্ত চিত্ত দিয়ে দেখো, দেখো, দেখো।

অর্থাৎ, বিশ্বের যেখানে প্রকাশের ধারা, প্রকাশের লীলা, সেখানে যদি মনটাকে সম্পূর্ণ করে ধরা দিতে পার তা হলেই অন্তরের মধ্যে প্রকাশের বেগ সঞ্চারিত হয়— আলো থেকেই আলো জ্বলে। দেখতে-পাওয়া মানে হচ্ছে প্রকাশকে পাওয়া। সংবাদ গ্রহণ করা এক জিনিস আর প্রকাশকে গ্রহণ করা আর-এক জিনিস। বিশ্বের প্রকাশকে মন দিয়ে গ্রহণ করাই হচ্ছে আর্টিস্টের সাধনা ; তাতেই প্রকাশের শক্তি সচেষ্ট হয়ে ওঠে, প্রকাশের আঙ্গিকপদ্ধতি তার সঙ্গে-সঙ্গেই অনেকটা আপনি এসে পড়ে, কতকটা শিক্ষা ও চর্চার দ্বারা নৈপুণ্যকে পাকিয়ে তোলা যায়। এইটুকু সাধনা করতে হবে, হাতিয়ারের বোঝা যেন হাতটার উপর দৌরাত্ম্য না করে, সহজ-স্রোতকে আটক করে রেখে কষ্টকল্পিত পন্থাটাই যেন বাহবা নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে না ওঠে। বিশ্বপ্রবাহের প্রবাহিণীর মধ্যে গলা ডুবিয়ে তারই কলধ্বনি থেকে প্রকাশের মন্ত্র অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করো, তারই ধারার ছন্দ তোমার রক্তের স্রোতে আপন তাল বেঁধে দেবে— এই হল গোড়াকার কথা ; এই হল বর্ষণ, তার পরে তোমার যদি আধার থাকে তো ভরে উঠবে ; এই হল আগুন, প্রদীপ বের করতে পার যদি তো শিখা জ্বলবার জন্যে ভাবনা থাকবে না।

২২ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

২২ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

বোরোবুদুরে রবীন্দ্রনাথ

জাভাযাত্রীর পত্র

জাভাযাত্রীর পত্র

১

কল্যাণীয়াসু

যাত্রা যখন আরম্ভ করা গেল আকাশ থেকে বর্ষার পর্দা তখন সরিয়ে দিয়েছে ; সূর্য আমাকে অভিনন্দন করলেন। কলকাতা থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত যতদূর গেলুম রেল-গাড়ির জানলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে মনে হল, পৃথিবীতে সবুজের বান ডেকেছে ; শ্যামলের বাঁশিতে তানের পর তান লাগছে, তার আর বিরাম নেই। খেতে খেতে নতুন ধানের অঙ্কুরে কাঁচা রং, বনে বনে রসপরিপুষ্ট প্রচুর পল্লবের ঘন সবুজ। ধরণীর বুকের থেকে অহল্যা জেগে উঠেছেন ; নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের পায়ের স্পর্শ লাগল।

প্রকৃতির এই নব জীবনের উৎসবে রূপের উত্তরে রসের গান গাবার জন্যেই আমি এসেছিলুম ; এই কথাই কেবল মনে পড়ে। কাজের লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, তার দরকার কী। বলে, ওটা শৌখিনতা। অর্থাৎ, এই প্রয়োজনের সংসারে আমরা বাহুল্যের দলে। তাতে লজ্জা পাব না। কেননা, এই বাহুল্যের দ্বারাই আত্মপরিচয়।

হিসাবি লোকেরা একটা কথা বারবার ভুলে যায় যে, প্রচুরের সাধনাতেই প্রয়োজনের সিদ্ধি ; এই আষাঢ়ের পৃথিবীতে সেই কথাটাই জানালো। আমি চাই ফসল, যেটুকুতে আমার পেট ভরবে। সেই স্বল্প প্রত্যাশাকে মূর্তিমান দেখি তখনই যখন বর্ষণে অভিষিক্ত মাটির ভাণ্ডারে শ্যামল ঐশ্বর্য আমার প্রয়োজনকে অনেক বেশি ছাপিয়ে পড়ে। মুষ্টিভিক্ষাও জোটে না যখন ধনের সংকীর্ণতা সেই মুষ্টিকে না ছাড়িয়ে যায়। প্রাণের কারবারে প্রাণের মুনফাটাই লক্ষ্য, এই মুনফাটাই বাহুল্য। আমাদের সন্ন্যাসী মানুষেরা এই বাহুল্যটাকে নিন্দা করে ; এই বাহুল্যকেই নিয়ে কবিদের উৎসব। খরচপত্র বাদেও যথেষ্ট উদ্‌বৃত্ত যদি থাকে তবেই সাহস করে খরচপত্র চলে, এই কথাটা মানি বলে আমরা মুনফা চাই। সেটা ভোগের বাহুল্যের জন্যে নয়, সেটা সাহসের আনন্দের জন্যে। মানুষের বুকের পাটা যাতে বাড়ে তাতেই মানুষকে কৃতার্থ করে।

বর্তমান যুগে য়ুরোপেই মানুষকে দেখি যার প্রাণের মুনফা নানা খাতায় কেবলই বেড়ে চলেছে। এই জন্যেই পৃথিবীতে এত ঘটা করে সে আলো জ্বালল। সেই আলোতে সে সকল দিকে প্রকাশমান। অল্প তেলে কেবল একটি মাত্র প্রদীপে ঘরের কাজ চলে যায়, কিন্তু পুরো মানুষটা তাতে অপ্রকাশিত থাকে। এই অপ্রকাশ অস্তিত্বের কার্পণ্য, কম করে থাকা। এটা মানবসত্যের অবসাদ। জীবলোকে

মানুষরা জ্যোতিষ্কজাতীয়; জন্তুরা কেবলমাত্র বেঁচে থাকে, তাদের অস্তিত্ব দীপ্ত হয়ে ওঠে নি। কিন্তু, মানুষ কেবল-যে আত্মরক্ষা করবে তা নয়, সে আত্মপ্রকাশ করবে। এই প্রকাশের জন্যে আত্মার দীপ্তি চাই। অস্তিত্বের প্রাচুর্য থেকে, অস্তিত্বের ঐশ্বর্য থেকেই এই দীপ্তি। বর্তমান যুগে য়ুরোপই সকল দিকে আপনার রশ্মি বিকীর্ণ করেছে; তাই মানুষ সেখানে কেবল-যে টিঁকে আছে তা নয়, টিঁকে থাকার চেয়ে আরো অনেক বেশি করে আছে। পর্যাপ্তে চলে আত্মরক্ষা, অপর্যাপ্তে আত্মপ্রকাশ। য়ুরোপে জীবন অপর্যাপ্ত।

এটাতে আমি মনে দুঃখ করি নে। কারণ, যে-দেশেই যে-কালেই মানুষ কৃতার্থ হোক-না কেন, সকল দেশের সকল কালের মানুষকেই সে কৃতার্থ করে। য়ুরোপ আজ প্রাণপ্রাচুর্যে সমস্ত পৃথিবীকেই স্পর্শ করেছে। সর্বত্রই মানুষের সুপ্ত শক্তির দ্বারে তার আঘাত এসে পড়ল। প্রভুত্বের দ্বারাই তার প্রভাব।

য়ুরোপ সর্বদেশ সর্বকালকে যে স্পর্শ করেছে সে তার কোন্ সত্য দ্বারা। তার বিজ্ঞান সেই সত্য। তার যে-বিজ্ঞান মানুষের সমস্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রকে অধিকার করে কর্মের ক্ষেত্রে জয়ী হয়েছে সে একটা বিপুল শক্তি। এইখানে তার চাওয়ার অন্ত নেই, তার পাওয়াও সেই পরিমাণে। গত বছর য়ুরোপ থেকে আসবার সময় একটি জর্মন যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি তাঁর অল্পবয়সের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে আসছিলেন। মধ্যভারতের আরণ্য প্রদেশে যে-সব জাতি প্রায় অজ্ঞাতভাবে আছে দুবৎসর তাদের মধ্যে বাস করে তাদের রীতিনীতি তন্ন তন্ন করে জানতে চান। এরই জন্যে তাঁরা দুজনে প্রাণপণ করতে কুন্ঠিত হন নি। মানুষসম্বন্ধে মানুষকে আরো জানতে হবে, সেই আরো জানা বর্বর জাতির সীমার কাছে এসেও থামে না। সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়কে এই রকম সংঘবদ্ধ করে জানা, ব্যূহবদ্ধ করে সংগ্রহ করা, জানবার সাধনায় মনকে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত করা, এতে করে মানুষ যে কত প্রকাণ্ড বড়ো হয়েছে য়ুরোপে গেলে তা বুঝতে পারা যায়। এই শক্তি দ্বারা পৃথিবীকে য়ুরোপ মানুষের পৃথিবী করে সৃষ্টি করে তুলছে। যেখানে মানুষের পক্ষে যা-কিছু বাধা আছে তা দূর করবার জন্যে সে যে-শক্তি প্রয়োগ করছে তাকে যদি আমরা সামনে মূর্তিমান করে দেখতে পেতুম তা হলে তার বিরাট রূপে অভিভূত হতে হত।

এইখানে য়ুরোপের প্রকাশ যেমন বড়ো, যাকে নিয়ে সকল মানুষ গর্ব করতে পারে, তেমনি তার এমন একটা দিক আছে যেখানে তার প্রকাশ আচ্ছন্ন। উপনিষদে আছে, যে-সাধকেরা সিদ্ধিলাভ করেছেন— তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি: তাঁরা সর্বগামী সত্যকে সকল দিক থেকে লাভ করে যুক্তাত্মভাবে সমস্তের

মধ্যে প্রবেশ করেন। সত্য সর্বগামী বলেই মানুষকে সকলের মধ্যে প্রবেশাধিকার দেয়। বিজ্ঞান বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মানুষের প্রবেশপথ খুলে দিচ্ছে; কিন্তু আজ সেই য়ুরোপে এমন একটি সত্যের অভাব ঘটেছে যাতে মানুষের মধ্যে মানুষের প্রবেশ অবরুদ্ধ করে। অন্তরের দিকে য়ুরোপ মানুষের পক্ষে একটা বিশ্বব্যাপী বিপদ হয়ে উঠল। এইখানে বিপদ তার নিজেরও।

এই জাহাজেই একজন ফরাসি লেখকের সঙ্গে আমার আলাপ হল। তিনি আমাকে বলছিলেন, যুদ্ধের পর থেকে য়ুরোপের নবীন যুবকদের মধ্যে বড়ো করে একটা ভাবনা ঢুকেছে। এই কথা তারা বুঝেছে, তাদের আইডিয়ালে একটা ছিদ্র দেখা দিয়েছিল যে-ছিদ্র দিয়ে বিনাশ ঢুকতে পারলে। অর্থাৎ কোথাও তারা সত্যভ্রষ্ট হল এতদিনে সেটা ধরা পড়েছে।

মানুষের জগৎ অমরাবতী, তার যা সত্য-ঐশ্বর্য তা দেশে কালে পরিমিত নয়। নিজের জন্য নিয়ত মানুষ এই-যে অমরলোক সৃষ্টি করছে তার মূলে আছে মানুষের আকাঙ্ক্ষা করবার অসীম সাহস। কিন্তু, বড়োকে গড়বার উপকরণ মানুষের ছোটো যেই চুরি করতে শুরু করে অমনি বিপদ ঘটায়। মানুষের চাইবার অন্তহীন শক্তি যখন সংকীর্ণ পথে আপন ধারাকে প্রবাহিত করতে থাকে তখনই কূল ভাঙে, তখনই বিনাশের বন্যা দুর্দাম হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, মানুষের বিপুল চাওয়া ক্ষুদ্র-নিজের জন্যে হলে তাতেই যত অশান্তির সৃষ্টি। যেখানে তার সাধনা সকলের জন্যে সেইখানেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা কৃতার্থ হয়। এই সাধনাকেই গীতা যজ্ঞ বলেছেন; এই যজ্ঞের দ্বারাই লোকরক্ষা। এই যজ্ঞের পন্থা হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম। সে-কর্ম দুর্বল হবে না, সে-কর্ম ছোটো হবে না, কিন্তু সে-কর্মের ফলকামনা যেন নিজের জন্যে না হয়।

বিজ্ঞান যে বিশুদ্ধ তপস্যার প্রবর্তন করেছে সে সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের— এই জন্যেই মানুষকে তাতে দেবতার শক্তি দিয়েছে, সকলরকম দুঃখ দৈন্য পীড়াকে মানবলোক থেকে দূর করবার জন্যে সে অস্ত্র গড়ছে; মানুষের অমরাবতী নির্মাণের বিশ্বকর্মা এই বিজ্ঞান। কিন্তু, এই বিজ্ঞানই কর্মের রূপে যেখানে মানুষের ফল-কামনাকে অতিকায় করে তুললে সেইখানেই সে হল যমের বাহন। এই পৃথিবীতে মানুষ যদি একেবারে মরে তবে সে এই জন্যেই মরবে— সে সত্যকে জেনেছিল কিন্তু সত্যের ব্যবহার জানে নি। সে দেবতার শক্তি পেয়েছিল, দেবত্ব পায় নি। বর্তমান যুগে মানুষের মধ্যে সেই দেবতার শক্তি দেখা দিয়েছে য়ুরোপে। কিন্তু সেই শক্তি কি মানুষকে মারবার জন্যেই দেখা দিল। গত য়ুরোপের যুদ্ধে এই প্রশ্নটাই ভয়ংকর মূর্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। য়ুরোপের বাইরে সর্বত্রই য়ুরোপ বিভীষিকা হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ

আজ এসিয়া আফ্রিকা জুড়ে। য়ুরোপ আপন বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের মধ্যে আসে নি, এসেছ আপন কামনা নিয়ে। তাই এসিয়ার হৃদয়ের মধ্যে য়ুরোপের প্রকাশ অবরুদ্ধ। বিজ্ঞানের স্পর্ধায়, শক্তির গর্বে, অর্থের লোভে, পৃথিবী জুড়ে মানুষকে লাঞ্ছিত করবার এই-যে চর্চা বহুকাল থেকে য়ুরোপ করছে, নিজের ঘরের মধ্যে এর ফল যখন ফলল তখন আজ সে উদ্‌বিগ্ন। তৃণে আগুন লাগাচ্ছিল, আজ তার নিজের বনস্পতিতে সেই আগুন লাগল। সে ভাবছে, থামব কোথায়। সে থামা কি যন্ত্রকে থামিয়ে দিয়ে। আমি তা বলি নে। থামাতে হবে লোভ। সে কি ধর্ম-উপদেশ দিয়ে হবে। তাও সম্পূর্ণ হবে না। তার সঙ্গে বিজ্ঞানেরও যোগ চাই। যে-সাধনায় লোভকে ভিতরের দিক থেকে দমন করে সে-সাধনা ধর্মের, কিন্তু যে-সাধনায় লোভের কারণকে বাইরের দিক থেকে দূর করে সে-সাধনা বিজ্ঞানের। দুইয়ের সম্মিলনে সাধনা সিদ্ধ হয়, বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে ধর্মবুদ্ধির আজ মিলনের অপেক্ষা আছে।

জাভায় যাত্রাকালে এই-সমস্ত তর্ক আমার মাথায় কেন এল জিজ্ঞাসা করতে পার। এর কারণ হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষের বিদ্যা একদিন ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বাইরের লোক তাকে স্বীকার করেছে। তিব্বত মঙ্গোলিয়া মালয়দ্বীপসকলে ভারতবর্ষ জ্ঞানধর্ম বিস্তার করেছিল, মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিক সত্যসম্বন্ধের পথ দিয়ে। ভারতবর্ষের সেই সর্বত্র-প্রবেশের ইতিহাসের চিহ্ন দেখবার জন্যে আজ আমরা তীর্থযাত্রা করেছি। সেই সঙ্গে এই কথাও দেখবার আছে, সেদিনকার ভারতবর্ষের বাণী শুষ্কতা প্রচার করে নি। মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্যকে সকল দিকে উদ্‌বোধিত করেছিল, স্থাপত্যে ভাস্কর্যে চিত্রে সংগীতে সাহিত্যে; তারই চিহ্ন মরুভূমে অরণ্যে পর্বতে দ্বীপে দ্বীপান্তরে, দুর্গম স্থানে দুঃসাধ্য কল্পনায়। সন্ন্যাসীর যে-মন্ত্র মানুষকে রিক্ত ক'রে নগ্ন করে, মানুষের যৌবনকে পঙ্গু করে, মানবচিত্তবৃত্তিকে নানাদিকে খর্ব করে, এ সে-মন্ত্র নয়। এ জরাজীর্ণ কৃশপ্রাণ বৃদ্ধের বাণী নয়, এর মধ্যে পরিপূর্ণপ্রাণ বীর্যবান যৌবনের প্রভাব। ১ শ্রাবণ ১৩৩৪।[১]

২

কল্যাণীয়াসু

দেশ থেকে বেরবার মুখে আমার উপর ফরমাশ এল কিছু-কিছু লেখা পাঠাতে হবে। কাকে পাঠাব লেখা, কে পড়বে। সর্বসাধারণ? সর্বসাধারণকে বিশেষ করে চিনি নে,

১ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত।

এই জন্যে তার ফরমাশে যখন লিখি তখন শক্ত করে বাঁধানো খুব একটা সাধারণ খাতা খুলে লিখতে হয়; সে-লেখার দাম খতিয়ে হিসেব কষা চলে।

কিন্তু, মানুষের একটা বিশেষ খাতা আছে; তার আলগা পাতা, সেটা যা-তা লেখবার জন্যে, সে লেখার দামের কথা কেউ ভাবেও না। লেখাটাই তার লক্ষ্য, কথাটা উপলক্ষ। সে-রকম লেখা চিঠিতে ভালো চলে; আটপৌরে লেখা— তার না আছে মাথায় পাগড়ি, না আছে পায়ে জুতো। পরের কাছে পরের বা নিজের কোনো দরকার নিয়ে সে যায় না— সে যায় যেখানে বিনা-দরকারে গেলেও জবাবদিহি নেই, যেখানে কেবলমাত্র বকে যাওয়ার জন্যেই যাওয়া-আসা।

স্রোতের জলের যে-ধ্বনি সেটা তার চলারই ধ্বনি, উড়ে-চলা মৌমাছির পাখার যেমন গুঞ্জন। আমরা যেটাকে বকুনি বলি সেটাও সেই মানসিক চলে যাওয়ারই শব্দ। চিঠি হচ্ছে লেখার অক্ষরে বকে যাওয়া।

এই বকে-যাওয়াটা মনের জীবনের লীলা। দেহটা কেবলমাত্র চলবার জন্যেই বিনা-প্রয়োজনে মাঝে মাঝে এক-একবার ধাঁ করে চলে ফিরে আসে। বাজার করবার জন্যেও নয়, সভা করবার জন্যেও নয়, নিজের চলাতেই সে নিজে আনন্দ পায় বলে। তেমনি নিজের বকুনিতেই মন জীবনধর্মের তৃপ্তি পায়। তাই বকবার অবকাশ চাই, লোক চাই। বক্তৃতার জন্যে লোক চাই অনেক, বকার জন্যে এক-আধজন।

দেশে অভ্যস্ত জায়গায় থাকি নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মধ্যে, জানা অজানা লোকের ভিড়ে। নিজের সঙ্গে নিজের আলাপ করবার সময় থাকে না। সেখানে নানা লোকের সঙ্গে নানা কেজো কথা নিয়ে কারবার। সেটা কেমনতরো। যেন বাঁধা পুকুরের ঘাটে দশজনে জটলা করে জল ব্যবহার। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা চাতকের ধর্ম আছে; হাওয়ায় উড়ে-আসা মেঘের বর্ষণের জন্যে সে চেয়ে থাকে একা একা। মনের আকাশে উড়ো ভাবনাগুলো সেই মেঘ— সেটা খামখেয়ালের ঝাপটা লেগে; তার আবির্ভাব তিরোভাব সবই আকস্মিক। প্রয়োজনের তাগিদমতো তাকে বাঁধা-নিয়মে পাওয়া যায় না বলেই তার বিশেষ দাম; পৃথিবী আপনারই বাঁধা জলকে আকাশে উড়ো জল করে দেয়; নিজের ফসলখেতকে সরস করবার জন্যে সেই জলের দরকার। বিনা প্রয়োজনে নিজের মনকে কথা বলাবার সেই প্রয়োজন, সেটাতে মন আপন ধারাতেই আপনাকে অভিষিক্ত করে।

জীবনযাত্রার পরিচিত ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এলে মন আজ যা-তা ভাববার সময় পেল। তাই ভেবেছি, কোনো সম্পাদকি বৈঠক স্মরণ করে প্রবন্ধ আওড়াব না, চিঠি লিখব তোমাকে। অর্থাৎ, পাত পেড়ে ভোজ দেওয়া তাকে বলা চলবে না; সে হবে

গাছতলায় দাঁড়িয়ে হাওয়ায় পড়ে-যাওয়া ফল আঁচলে ভরে দেওয়া। তার কিছু পাকা, কিছু কাঁচা; তার কোনোটাতে রং ধরেছে, কোনোটাতে ধরে নি। তার কিছু রাখলেও চলে, কিছু ফেলে দিলেও নালিশ চলবে না।

সেই ভাবেই চিঠি লিখতে শুরু করেছিলুম। কিন্তু, আকাশের আলো দিলে মুখ-ঢাকা। বৈঠকখানার আসর বন্ধ হয়ে গেলে ফরাশ বাতি নিবিয়ে দিয়ে যেমন ঝাড়লণ্ঠনে ময়লা রঙের ঘেরাটোপ পরিয়ে দেয়, দ্যুলোকের ফরাশ সেই কাণ্ডটা করলে; একটা ফিকে ধোঁয়াটে রঙের আবরণ দিয়ে আকাশসভার তৈজসপত্র দিলে মুড়ে। এই অবস্থায় আমার মন তার হালকা কলমের খেলা আপনিই বন্ধ করে দেয়। বকুনির কূলহারা ঝরনা বাক্যের নদী হয়ে কখন একসময় গভীর খাদে চলতে আরম্ভ করে; তখন তার চলাটা কেবলমাত্র সূর্যের আলোয় কলধ্বনির নূপুর বাজানোর জন্যে নয়, একটা কোনো লক্ষ্যে পৌঁছবার সাধনায়। আনমনা সাহিত্য তখন লোকালয়ের মাঝখানে এসে প'ড়ে সমনস্ক হয়ে ওঠে। তখন বাণীকে অনেক বেশি অতিক্রম করে ভাবনাগুলো মাথা তুলে দাঁড়ায়।

উপনিষদে আছে: স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা; তিনি ভালোবাসেন, তিনি সৃষ্টি করেন, আবার তিনিই বিধান করেন। সৃষ্টি-করাটা সহজ আনন্দের খেয়ালে, বিধান-করায় চিন্তা আছে। যাকে খাস সাহিত্য বলে সেটা হল সেই সৃষ্টিকর্তার এলেকায়, সেটা কেবল আপন মনে। যদি কোনো হিসাবি লোক স্রষ্টাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে "কেন সৃষ্টি করা হল" তিনি জবাব দেন, "আমার খুশি!" সেই খুশিটাই নানা রঙে নানা রসে আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত হয়ে ওঠে। পদ্মফুলকে যদি জিজ্ঞাসা করো "তুমি কেন হলে" সে বলে, "আমি হবার জন্যেই হলুম।" খাঁটি সাহিত্যেরও সেই একটিমাত্র জবাব।

অর্থাৎ, সৃষ্টির একটা দিক আছে যেটা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার বিশুদ্ধ বকুনি। সেদিক থেকে এমনও বলা যেতে পারে, তিনি আমাকে চিঠি লিখছেন। আমার কোনো চিঠির জবাবে নয়, তাঁর আপনার বলতে ইচ্ছে হয়েছে বলে; কাউকে তো বলা চাই। অনেকেই মন দিয়ে শোনে না, অনেকে বলে, "এ তো সারবান নয়; এ তো বন্ধুর আলাপ, এ তো সম্পত্তির দলিল নয়।" সারবান থাকে মাটির গর্ভে, সোনার খনিতে; সে নেই ফুলের বাগানে, নেই সে উদয়দিগন্তে মেঘের মেলায়। আমি একটা গর্ব করে থাকি, ওই চিঠিলিখিয়ের চিঠি পড়তে পারৎপক্ষে কখনো ভুলি নে। বিশ্ববকুনি যখন-তখন আমি শুনে থাকি। তাতে বিষয়কাজের ক্ষতি হয়েছে, আর যারা আমাকে দলে ভিড়িয়ে কাজে লাগাতে চায় তাদের কাছ থেকে নিন্দাও শুনেছি; কিন্তু আমার এই দশা।

অথচ, মুশকিল হয়েছে এই যে, বিধাতাও আমাকে ছাড়েন নি। সৃষ্টিকর্তার লীলাঘর থেকে বিধাতার কারখানাঘর পর্যন্ত যে-রাস্তাটা গেছে সে-রাস্তায় দুই প্রান্তেই আমার আনাগোনার কামাই নেই।

এই দোটানায় পড়ে আমি একটা কথা শিখেছি। যিনি সৃষ্টিকর্তা স এব বিধাতা; সেই জন্যেই তাঁর সৃষ্টি ও বিধান এক হয়ে মিশেছে, তাঁর লীলা ও কাজ এই দুয়ের মধ্যে একান্ত বিভাগ পাওয়া যায় না। তাঁর সকল কর্মই কারুকর্ম; ছুটিতে খাটুনিতে গড়া; কর্মের রূঢ় রূপের উপর সৌন্দর্যের আব্রু টেনে দিতে তাঁর আলস্য নেই। কর্মকে তিনি লজ্জা দেন নি। দেহের মধ্যে যন্ত্রের ব্যবস্থাকৌশল আছে কিন্তু তাকে আবৃত করে আছে তার সুষমাসৌষ্ঠব, বস্তুত সেইটেই প্রকাশমান।

মানুষকেও তিনি সৃষ্টি করবার অধিকার দিয়েছেন; এইটেই তার সব চেয়ে বড়ো অধিকার। মানুষ যেখানেই আপনার কর্মের গৌরব বোধ করেছে সেখানেই কর্মকে সুন্দর করবার চেষ্টা করেছে। তার ঘরকে বানাতে চায় সুন্দর করে; তার পানপাত্র অন্নপাত্র সুন্দর; তার কাপড়ে থাকে শোভার চেষ্টা। তার জীবনে প্রয়োজনের চেয়ে সজ্জার অংশ কম থাকে না। যেখানে মানুষের মধ্যে স্বভাবের সামঞ্জস্য আছে সেখানে এইরকমই ঘটে।

এই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, যেখানে কোনো একটা রিপু, বিশেষত লোভ অতি প্রবল হয়ে ওঠে। লোভ জিনিসটা মানুষের দৈন্য থেকে, তার লজ্জা নেই; সে আপন অসংযমকে নিয়েই বড়াই করে। বড়ো বড়ো মুনফাওয়ালা পাটকল চটকল গঙ্গার ধারের লাবণ্যকে দলন করে ফেলেছে দম্ভভরেই। মানুষের রুচিকে সে একেবারেই স্বীকার করে নি; একমাত্র স্বীকার করেছে তার পাওনার ফুলে-ওঠা থলিটাকে।

বর্তমান যুগের বাহ্যরূপ তাই নির্লজ্জতায় ভরা। ঠিক যেন পাকযন্ত্রটা দেহের পর্দা থেকে সর্বসম্মুখে বেরিয়ে এসে আপন জটিল অন্ত্রতন্ত্র নিয়ে সর্বদা দোলায়মান। তার ক্ষুধার দাবি ও সুনিপুণ পাকপ্রণালীর বড়াইটাই সর্বাঙ্গীণ দেহের সম্পূর্ণ সৌষ্ঠবের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। দেহ যখন আপন স্বরূপকে প্রকাশ করতে চায় তখন সুসংযত সুষমার দ্বারাই করে; যখন সে আপন ক্ষুধাকেই সব ছাড়িয়ে একান্ত করে তোলে তখন বীভৎস হতে তার কিছুমাত্র লজ্জা নেই। লালায়িত রিপুর নির্লজ্জতাই বর্বরতার প্রধান লক্ষণ, তা সে সভ্যতার গিলটি-করা তকমাই পরুক কিম্বা অসভ্যতার পশুচর্মেই সেজে বেড়াক— ডেভিল্ ডান্সই নাচুক কিম্বা জাজ্ ডান্স্।

বর্তমান সভ্যতায় রুচির সঙ্গে কৌশলের যে বিচ্ছেদ চার দিক থেকেই দেখতে পাই তার একমাত্র কারণ, লোভটাই তার অন্য-সকল সাধনাকে ছাড়িয়ে লম্বোদর হয়ে

উঠেছে। বস্তুর সংখ্যাধিক্যবিস্তারের প্রচণ্ড উন্মত্ততায় সুন্দরকে সে জায়গা ছেড়ে দিতে চায় না। সৃষ্টিপ্রেমের সঙ্গে পণ্যলোভের এই বিরোধে মানবধর্মের মধ্যে যে-আত্মবিপ্লব ঘটে তাতে দাসেরই যদি জয় হয়, পেটুকতারই যদি আধিপত্য বাড়ে, তা হলে যম আপন সশস্ত্র দূত পাঠাতে দেরি করবে না; দলবল নিয়ে নেমে আসবে দ্বেষ হিংসা মোহ মদ মাৎসর্য, লক্ষ্মীকে দেবে বিদায় করে।

পূর্বেই বলেছি, দীনতা থেকে লোভের জন্ম; সেই লোভের একটি স্থূলতনু সহোদরা আছে তার নাম জড়তা। লোভের মধ্যে অসংযত উদ্যম; সেই উদ্যমেই তাকে অশোভন করে। জড়তায় তার উলটো, সে নড়ে বসতে পারে না; সে না পারে সজ্জাকে গড়তে, না পারে আবর্জনাকে দূর করতে; তার অশোভনতা নিরুদ্যমের। সেই জড়তার অশোভনতায় আমাদের দেশের মানসম্ভ্রম নষ্ট করেছে। তাই আমাদের ব্যবহারে আমাদের জীবনের অনুষ্ঠানে সৌন্দর্য বিদায় নিতে বসল; আমাদের ঘরে-দ্বারে বেশে-ভূষায় ব্যবহারসামগ্রীতে রুচির স্বাধীন প্রকাশ রইল না; তার জায়গায় এসে পড়েছে চিত্তহীন আড়ম্বর— এতদূর পর্যন্ত শক্তির অসাড়তা এবং আপন রুচি সম্বন্ধেও নির্লজ্জ আত্ম-অবিশ্বাস যে, আমাদের সেই আড়ম্বরের সহায় হয়েছে চৌরঙ্গির বিলিতি দোকানগুলো।

বারবার মনে করি, লেখাগুলোকে করব বঙ্কিমবাবু যাকে বলেছেন 'সাধের তরণী।' কিন্তু, কোথা থেকে বোঝা এসে জমে, দেখতে দেখতে সাধের তরী হয়ে ওঠে বোঝাই-তরী। ভিতরে রয়েছে নানাপ্রকারের ক্ষোভ, লেখনীর আওয়াজ শুনেই তারা স্থানে অস্থানে বেরিয়ে পড়ে; কোনো বিশেষ প্রসঙ্গ যার মালেক নয় এমন একটা রচনা পেলেই সেটাকে অগ্নিবাস গাড়ি করে তোলে। কেউ-বা ভিতরেই ঢুকে বেঞ্চির উপর পা তুলে বসে যায়, কেউ-বা পায়দানে চড়ে চলতে থাকে; তার পরে যেখানে-খুশি অকস্মাৎ লাফ দিয়ে নেমে পড়ে।

আজ শ্রাবণমাসের পয়লা। কিন্তু ঝাঁকড়া-ঝুঁটিওয়ালা শ্রাবণ এক ভবঘুরে বেদের মতো তার কালো মেঘের তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে কোথায় যে চলে গেছে তার ঠিকানা নেই। আজ যেন আকাশসরস্বতী নীলপদ্মের দোলায় দাঁড়িয়ে। আমার মন ওই সঙ্গে সঙ্গে দুলছে সমস্ত পৃথিবীটাকে ঘিরে। আমি যেন আলোতে তৈরি, বাণীতে গড়া, বিশ্ব-রাগিণীতে ঝংকৃত, জলে স্থলে আকাশে ছড়িয়ে যাওয়া। আমি শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রটা কোন্ কাল থেকে কেবলই ভেরী বাজাচ্ছে, আর পৃথিবীতে তারই উত্থানপতনের ছন্দে জীবের ইতিহাসযাত্রা চলেছে আবির্ভাবের অস্পষ্টতা থেকে তিরোভাবের অদৃশ্যের মধ্যে। একদল বিপুলকায় বিকটাকার প্রাণী যেন সৃষ্টিকর্তার দুঃস্বপ্নের মতো দলে দলে এল, আবার মিলিয়ে গেল। তার পরে মানুষের ইতিহাস কবে শুরু হল প্রদোষের ক্ষীণ

আলোতে, গুহাগহ্বর-অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায়। দুই পায়ের উপর খাড়া-দাঁড়ানো ছোটো ছোটো চটুল জীব, লাফ দিয়ে চড়ে চড়ে বসল মহাকায় বিপদবিভীষিকার পিঠের উপর, বিষ্ণু যেমন চড়েছেন গরুড়ের পিঠে। অসাধ্যের সাধনায় চলল তারা জীর্ণ যুগান্তরের ভগ্নাংশবিকীর্ণ দুর্গম পথে। তারই সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীকে ঘিরে ঘিরে বরুণের মৃদঙ্গ বাজতে লাগল দিনে রাত্রে, তরঙ্গে তরঙ্গে। আজ তাই শুনছি আর এমন-কোনো একটা কথা ছন্দে আবৃত্তি করতে ইচ্ছা করছে যা অনাদিকালের। আজকের দিনের মতোই এইরকম আলো-ঝল্‌মলানো কলকল্লোলিত নীলজলের দিকে তাকিয়ে ইংরেজ কবি শেলি একটি কবিতা লিখেছেন—

The sun is warm, the sky is clear,
The waves are dancing fast and bright.

কিন্তু, এ তাঁর ক্লান্ত জীবনের অবসাদের বিলাপ। এর সঙ্গে আজ ভিতরে বাইরে মিল পাচ্ছি নে। একটা জগৎজোড়া কলক্রন্দন শুনতে পাচ্ছি বটে, সেই ক্রন্দন ভরিয়ে তুলছে অন্তরীক্ষকে, যে-অন্তরীক্ষের উপর বিশ্বরচনার ভূমিকা, যে-অন্তরীক্ষকে বৈদিক ভারত নাম দিয়েছে ক্রন্দসী। এ কিন্তু শ্রান্তিভারাতুর পরাভবের ক্রন্দন নয়। এ নবজাত শিশুর ক্রন্দন, যে-শিশু উর্ধ্বস্বরে বিশ্বদ্বারে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা ক'রে তার প্রথমক্রন্দিত নিশ্বাসেই জানায়, "অয়মহং ভোঃ।" অসীম ভাবীকালের দ্বারে সে অতিথি। অস্তিত্বের ঘোষণায় একটা বিপুল কান্না আছে। কেননা, বারে বারে তাকে ছিন্ন করতে হয় আবরণ, চূর্ণ করতে হয় বাধা। অস্তিত্বের অধিকার পড়ে-পাওয়া জিনিস নয়, প্রতি মুহূর্তেই সেটা লড়াই-করে-নেওয়া জিনিস। তাই তার কান্না এত তীব্র, আর জীবলোকে সকলের চেয়ে তীব্র মানবসত্তার নবজীবনের কান্না। সে যেন অন্ধকারের গর্ভ বিদারণ-করা নবজাত আলোকের ক্রন্দনধ্বনি। তারই সঙ্গে সঙ্গে নব নব জন্মে নব নব যুগে দেবলোকে বাজে মঙ্গলশঙ্খ, উচ্চারিত হয় বিশ্বপিতামহের অভিনন্দনমন্ত্র।

আজকের দিনে এই আমার শেষ উপলব্ধি নয়। সকালে দেখলুম, সমুদ্রের প্রান্ত-রেখায় আকাশ তার জ্যোতির্ময়ী চিরন্তনী বাণীটি লিখে দিলে; সেটি পরম শান্তির বাণী, তা মর্তলোকের বহু যুগের বহু দুঃখের আর্তকোলাহলের আবর্তকে ছাড়িয়ে ওঠে, যেন অশ্রুর ঢেউয়ের উপরে শ্বেতপদ্মের মতো। তার পরে দিনশেষের দিকে দেখলুম একটি অখ্যাত ব্যক্তিকে, যার মধ্যে মনুষ্যত্ব অপমানিত— যদি সময় পাই তার কথা পরে বলব। তখন মানব-ইতিহাসের দিগন্তে দিগন্তে দেখতে পেলুম বিরোধের কালো মেঘ, অশান্তির প্রচ্ছন্ন বজ্রগর্জন, আর লোকালয়ের উপর রুদ্রের ভ্রূকুটিচ্ছায়া। ইতি ২ শ্রাবণ ১৩৩৪।[১]

১ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত।

৩

বুনো হাতি মূর্তিমান উৎপাত, বজ্রবৃংহিত ঝড়ের মেঘের মতো। এতটুকু মানুষ, হাতির একটা পায়ের সঙ্গেও যার তুলনা হয় না, সে ওকে দেখে খামখা বলে উঠল, "আমি এর পিঠে চড়ে বেড়াব।" এই প্রকাণ্ড দুর্দাম প্রাণপিণ্ডটাকে গাঁ গাঁ করে শুঁড় তুলে আসতে দেখেও এমন অসম্ভবপ্রায় কথা কোনো একজন ক্ষীণকায় মানুষ কোনো এককালে ভাবতেও পেরেছে, এইটেই আশ্চর্য। তার পরে "পিঠে চড়ব" বলা থেকে আরম্ভ করে পিঠে চড়ে-বসা পর্যন্ত যে-ইতিহাস সেটাও অতি অদ্ভুত। অনেকদিন পর্যন্তই সেই অসম্ভবের চেহারা সম্ভবের কাছ দিয়েও আসে নি— পরম্পরাক্রমে কত বিফলতা কত অপঘাত মানুষের সংকল্পকে বিদ্রূপ করেছে তার সংখ্যা নেই; সেটা গণনা করে করে মানুষ বলতে পারত, এটা হবার নয়। কিন্তু তা বলে নি। অবশেষে একদিন সে হাতির মতো জন্তুরও পিঠে চড়ে ফসলখেতের ধারে লোকালয়ের রাস্তায়-ঘাটে ঘুরে বেড়ালো। এটা সাংঘাতিক অধ্যবসায়, সেই জন্যেই গণেশের হাতির মুণ্ডে মানুষের সিদ্ধির মূর্তি। এই সিদ্ধির দুই দিকে দুই জন্তুর চেহারা, এক দিকে রহস্যসন্ধানকারী সূক্ষ্মঘ্রাণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি খরদন্ত চঞ্চল কৌতূহল, সেটা ইঁদুর, সেইটেই বাহন; আর-একদিকে বন্ধনে বশীভূত বন্যশক্তি যা দুর্গমের উপর দিয়ে বাধা ডিঙিয়ে চলে, সেই হল যান— সিদ্ধির যান-বাহনযোগে মানুষ কেবলই এগিয়ে চলছে। তার ল্যাবরেটরিতে ছিল ইঁদুর, আর তার এরোপ্লেনের মোটরে আছে হাতি। ইঁদুরটা চুপিচুপি সন্ধান বাতলিয়ে দেয়, কিন্তু ওই হাতিটাকে কায়দা করে নিতে মানুষের অনেক দুঃখ। তা হোক, মানুষ দুঃখকে দেখে হার মানে না, তাই সে আজ দ্যুলোকের রাস্তায় যাত্রা আরম্ভ করলে। কালিদাস রাঘবদের কথায় বলেছেন, তাঁরা 'আনাকরথবর্ত্মনাম্'— স্বর্গ পর্যন্ত তাঁদের রথের রাস্তা। যখন এ কথা কবি বলেছেন তখন মাটির মানুষের মাথায় এই অদ্ভুত চিন্তা ছিল যে, আকাশে না চললে মানুষের সার্থকতা নেই। সেই চিন্তা ক্রমে আজ রূপ ধরে বাইরের আকাশে পাখা ছড়িয়ে দিলে। কিন্তু, রূপ যে ধরল সে মৃত্যুঞ্জয়কারী ভীষণ তপস্যায়। মানুষের বিজ্ঞানবুদ্ধি সন্ধান করতে জানে, এই যথেষ্ট নয়; মানুষের কীর্তি-বুদ্ধি সাহস করতে জানে, এইটে তার সঙ্গে যখন মিলেছে তখনই সাধকদের তপঃসিদ্ধির পথে পথে ইন্দ্রদেব যে-সব বাধা রেখে দেন সেগুলো ধূলিসাৎ হয়।

তীরে দাঁড়িয়ে মানুষ সামনে দেখলে সমুদ্র। এত বড়ো বাধা কল্পনা করাই যায় না। চোখে দেখতে পায় না এর পার, তলিয়ে পায় না এর তল। যমের মোষের মতো কালো, দিগন্তপ্রসারিত বিরাট একটা নিষেধ কেবলই তরঙ্গতর্জনী তুলছে। চিরবিদ্রোহী মানুষ বললে, "নিষেধ মানব না।" বজ্রগর্জনে জবাব এল, "না মান তো মরবে।" মানুষ

তার এতটুকুমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে বললে, "মরি তো মরব!" এই হল জাত-বিদ্রোহীদের উপযুক্ত কথা। জাত-বিদ্রোহীরাই চিরদিন জিতে এসেছে। একেবারে গোড়া থেকেই প্রকৃতির শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষ নানা ভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিলে। আজ পর্যন্ত তাই চলছে। মানুষদের মধ্যে যারা যত খাঁটি বিদ্রোহী, যারা বাহ্য শাসনের সীমা-গণ্ডি যতই মানতে চায় না, তাদের অধিকার ততই বেড়ে চলতে থাকে।

যেদিন সাড়ে তিনহাত মানুষ স্পর্ধা করে বললে "এই সমুদ্রের পিঠে চড়ব" সেদিন দেবতারা হাসলেন না; তাঁরা এই বিদ্রোহীর কানে জয়মন্ত্র পড়িয়ে দিয়ে অপেক্ষা করে রইলেন। সমুদ্রের পিঠ আজ আয়ত্ত হয়েছে, সমুদ্রের তলটাকেও কায়দা করা শুরু হল। সাধনার পথে ভয় বারবার ব্যঙ্গ করে উঠছে; বিদ্রোহীর অন্তরের মধ্যে উত্তরসাধক অবিচলিত ব'সে প্রহরে প্রহরে হাঁক দিচ্ছে, "মা ভৈঃ।"

কালকের চিঠিতে ক্রন্দসীর কথা বলেছি, অন্তরীক্ষে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে সত্তার ক্রন্দন গ্রহে নক্ষত্রে। এই সত্তা বিদ্রোহী, অসীম অব্যক্তের সঙ্গে তার নিরন্তর লড়াই। বিরাট অপ্রকাশের তুলনায় সে অতি সামান্য, কিন্তু অন্ধকারের অন্তহীন পারাবারের উপর দিয়ে ছোটো ছোটো কোটি কোটি আলোর তরী সে ভাসিয়ে দিয়েছে—দেশ-কালের বুক চিরে অতলস্পর্শের উপর দিয়ে তার অভিযান। কিছু ডুবছে, কিছু ভাসছে, তবু যাত্রার শেষ নেই।

প্রাণ তার বিদ্রোহের ধ্বজা নিয়ে পৃথিবীতে অতি দুর্বলরূপে একদিন দেখা দিয়েছিল। অতি প্রকাণ্ড, অতি কঠিন, অতি গুরুভার অপ্রাণ চারি দিকে গদা উদ্যত করে দাঁড়িয়ে, আপন ধুলোর কয়েদখানায় তাকে দ্বার জানলা বন্ধ করে প্রচণ্ড শাসনে রাখতে চায়। কিন্তু, বিদ্রোহী প্রাণ কিছুতেই দমে না; দেয়ালে দেয়ালে কত জায়গায় কত ফুটোই করছে তার সংখ্যা নেই, কেবলই আলোর পথ নানা দিক দিয়েই খুলে দিচ্ছে।

সত্তার এই বিদ্রোহমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যতদূর এগিয়েছে এমন আর-কোনো জীব না। মানুষের মধ্যে যার বিদ্রোহশক্তি যত প্রবল, যত দুর্দমনীয়, ইতিহাসকে ততই সে যুগ হতে যুগান্তরে অধিকার করছে, শুধু সত্তার ব্যাপ্তি দ্বারা নয়, সত্তার ঐশ্বর্য দ্বারা।

এই বিদ্রোহের সাধনা দুঃখের সাধনা; দুঃখই হচ্ছে হাতি, দুঃখই হচ্ছে সমুদ্র। বীর্যের দর্পে এর পিঠে যারা চড়ল তারাই বাঁচল; ভয়ে অভিভূত হয়ে এর তলায় যারা পড়েছে তারা মরেছে। আর, যারা একে এড়িয়ে শস্তায় ফল লাভ করতে চায় তারা নকল ফলের ছদ্মবেশে ফাঁকির বোঝার ভারে মাথা হেঁট করে বেড়ায়। আমাদের ঘরের কাছে সেই জাতের মানুষ অনেক দেখা যায়। বীরত্বের হাঁকডাক করতে তারা শিখেছে, কিন্তু সেটা যথাসম্ভব নিরাপদে করতে চায়। যখন মার আসে তখন নালিশ করে বলে,

বড়ো লাগছে। এরা পৌরুষের পরীক্ষাশালায় বসে বিলিতি বই থেকে তার বুলি চুরি করে, কিন্তু কাগজের পরীক্ষা থেকে যখন হাতের পরীক্ষার সময় আসে তখন প্রতিপক্ষের অনৌদার্য নিয়ে মামলা তুলে বলে, "ওদের স্বভাব ভালো নয়, ওরা বাধা দেয়।"

মানুষকে নারায়ণ সখা বলে তখনই সম্মান করেছেন যখন তাকে দেখিয়েছেন তাঁর উগ্ররূপ, তাকে দিয়ে যখন বলিয়েছেন: দৃষ্ট্বাদ্ভুতংরূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্— মানুষ যখন প্রাণমন দিয়ে স্তব করতে পেরেছে:

অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ।

তুমিই অনন্তবীর্য, তুমিই অমিতবিক্রম, তুমিই সমস্তকে গ্রহণ করো, তুমিই সমস্ত। ইতি ৩রা শ্রাবণ ১৩৩৪।[১]

৪

কাল সকালেই পৌঁছব সিঙাপুরে। তার পর থেকে আমার ডাঙার পালা। এই-যে চলছে আমার মনে মনে বকুনি, এটাতে খুবই বাধা হবে। অবকাশের অভাব হবে বলে নয়, মন এই কদিন যে-কক্ষে চলছিল সে-কক্ষ থেকে ভ্রষ্ট হবে বলে। কিসের জন্যে। সর্বসাধারণ বলে যে একটি মনুষ্যসমষ্টি আছে তারই আকর্ষণে।

লেখবার সময় তার কোনো আকর্ষণ যে একটুও মনের মধ্যে থাকবে না, তা হতেই পারে না। কিন্তু, তার নিকটের আকর্ষণটা লেখার পক্ষে বড়ো ব্যাঘাত। কাছে যখন সে থাকে তখন সে কেবলই ঠেলা দিয়ে দিয়ে দাবি করতে থাকে। দাবি করে তারই নিজের মনের কথাটাকে। প্রকাণ্ড একটা বাইরের ফরমাশ কলমটাকে ভিতরে ভিতরে টান মারে। বলতে চাই বটে "তোমাকে গ্রাহ্য করি নে", কিন্তু হেঁকে উঠে বলার মধ্যেই গ্রাহ্য করাটা প্রমাণ হয়।

আসল কথা সাহিত্যের শ্রোতৃসভায় আজ সর্বসাধারণই রাজাসনে। এ সত্যটাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে লিখতে বসা অসম্ভব। প্রশ্ন উঠতে পারে উড়িয়ে দেবেই বা কেন। এমন সময় কবে ছিল যখন সাহিত্য সমস্ত মানবসাধারণের জন্যেই ছিল না।

কথাটা একটু ভেবে-দেখবার। কালিদাসের মেঘদূত মানবসাধারণের জন্যেই লেখা, আজ তার প্রমাণ হয়ে গেছে। যদি কোনো বিশিষ্ট দলের জন্যে লেখা হত তা হলে সে দলও থাকত না আর মেঘদূতও যেত তারই সঙ্গে অনুমরণে। কিন্তু, এখন

১ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত।

যাকে পাবলিক বলছি কালিদাসের সময় সেই পাবলিক অত্যন্ত গা-ঘেঁষা হয়ে শ্রোতারূপে ছিল না। যদি থাকত তা হলে যে-মানবসাধারণ শত শত বৎসরের মহাক্ষেত্রে সমাগত তাদের পথ তারা অনেকটা পরিমাণে আটকে দিত।

এখনকার পাবলিক একটা বিশেষ কালের দানাবাঁধা সর্বসাধারণ। তার মধ্যে খুব নিরেট হয়ে তাল-পাকিয়ে আছে এখনকার কালের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, এখনকার কালের বিশেষ রুচি প্রবৃত্তি এবং আরো কত কী। এই সর্বসাধারণ যে মানবসাধারণের প্রতিরূপ, তা বলা চলবে না। এর ফরমাশ যে একশো বছর পরের ফরমাশের সঙ্গে মিলবে না, সে-কথা জোর করেই বলতে পারি। কিন্তু, এই উপস্থিত-কালের সর্বসাধারণ কানের খুব কাছে এসে জোর গলায় দুয়ো দিচ্ছে, বাহবা দিচ্ছে।

উপস্থিতকালের সংকীর্ণ পরিধির তুলনাতেও এই দুয়ো-বাহবার স্থায়িত্ব অকিঞ্চিৎকর। পাবলিক-মহারাজ আজ দুই চোখ লাল করে যে-কথাটাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আসছে-কাল সেইটেকেই এমনি চড়া গলায় ব্যবহার করে যেন সেটা তার নিজেরই চিরকালের চিন্তিত কথা। আজ যে-কথা শুনে তার দুই গাল বেয়ে চোখের জল বয়ে গেল, আসছে-কাল সেটাকে নিয়ে হাসাহাসি করবার সময় নিজের গদ্‌গদচিত্তের পূর্ব ইতিহাসটি সম্পূর্ণ বে-কবুল যায়।

ইংরেজ বেনের আপিসঘর-গুদামঘরের আশে-পাশে হঠাৎ যখন কলকাতা শহরটা মাথাঝাড়া দিয়ে উঠল তখন সেখানে এই নতুন-গড়া দোকানপাড়ার এক পাবলিক দেখা দিলে। অন্তত, তার এক ভাগের চেহারা হুতুম পেঁচার নকশায় উঠেছে। তারই ফরমাশের ছাপ পড়েছে দাশুরায়ের পাঁচালিতে। ঘন ঘন অনুপ্রাস তপ্ত-খোলার উপরকার খইয়ের মতো পট্‌পট্‌ শব্দে ফুটে ফুটে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল—

> ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে,
> নিতান্ত কৃতান্ত-ভয়ান্ত হবে ভবে।

চারি দিকে হায়-হায় শব্দে সভা তোলপাড়। দুই কানে হাত-চাপা, তারস্বরে দ্রুত লয়ে গান উঠল—

> ওরে রে লক্ষ্মণ, এ কী অলক্ষণ,
> বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।
> অতি নগণ্য কাজে, অতি জঘন্য সাজে
> ঘোর অরণ্য-মাঝে কত কাঁদিলাম। ইত্যাদি।

দোকানপাড়ার জনসাধারণ খুশি হয়ে নগদ বিদায় করলে। অবকাশের সম্পদকে অবকাশের শিক্ষাযোগে ভোগ করবার শক্তি যার ছিল না সেই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির

হাটের পাবলিককে মাথা-গুনতির জোরে মানবসাধারণের প্রতিনিধি বলে মেনে নিতে হবে নাকি। বস্তুত, এই জনসাধারণই দাশুরায়ের প্রতিভাকে বিশ্বসাধারণের মহাসভায় উত্তীর্ণ হতে বাধা দিয়েছিল।

অথচ, মৈমনসিং থেকে যে-সব গাথা সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে সহজেই বেজে উঠছে বিশ্বসাহিত্যের সুর। কোনো শহুরে পাবলিকের দ্রুত ফরমাশের ছাঁচে ঢালা সাহিত্য তো সে নয়। মানুষের চিরকালের সুখদুঃখের প্রেরণায় লেখা সেই গাথা। যদি-বা ভিড়ের মধ্যে গাওয়া হয়েও থাকে, তবু এ ভিড় বিশেষ কালের বিশেষ ভিড় নয়। তাই এ সাহিত্য সেই ফসলের মতো যা গ্রামের লোক আপন মাটির বাসনে ভোগ করে থাকে বটে তবুও তা বিশ্বেরই ফসল — তা ধানের মঞ্জরী।

যে-কবিকে আমরা কবি বলে সম্মান করে থাকি তার প্রতি সম্মানের মধ্যে এই সাধুবাদটুকু থাকে যে, তার একলার কথাই আমাদের সকলের কথা। এই জন্যেই কবিকে একলা বলতে দিলেই সে সকলের কথা সহজে বলতে পারে। হাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেইদিনকার হাটের লোকের মনের কথা যেমন-তেমন করে মিলিয়ে দিয়ে তাদের সেইদিনকার বহু-মুণ্ডের মাথা-নাড়া-গুনতির জোরে আমরা যেন আপন রচনাকে কৃতার্থ মনে না করি, যেন আমাদের এই কথা মনে করবার সাহস থাকে যে, সাহিত্যের গণনাতত্ত্বে এক অনেক সময়েই হাজারের চেয়ে সংখ্যায় বেশি হয়ে থাকে।

এইবার আমার জাহাজের চিঠি তার অন্তিম পংক্তির দিকে হেলে পড়ল। বিদায় নেবার পূর্বে তোমার কাছে মাপ চাওয়া দরকার মনে করছি। তার কারণ, চিঠি লিখব বলে বসলুম কিন্তু কোনোমতেই চিঠি লেখা হয়ে উঠল না। এর থেকে আশঙ্কা হচ্ছে, আমার চিঠি লেখবার বয়স পেরিয়ে গেছে। প্রতিদিনের স্রোতের থেকে প্রতি দিনের ভেসে-আসা কথা ছেঁকে তোলবার শক্তি এখন আমার নেই। চলতে চলতে চার দিকের পরিচয় দিয়ে যাওয়া এখন আমার দ্বারা আর সহজে হয় না। অথচ, এক সময়ে এ শক্তি আমার ছিল। তখন অনেককে অনেক চিঠিই লিখেছি। সেই চিঠিগুলি ছিল চলতি কালের সিনেমা ছবি। তখন ছিল মনের পটটা বাইরের সমস্ত আলোছায়ার দিকে মেলে দেওয়া। সেই সব ছাপের ধারায় চলত চিঠি। এখন বুঝিবা বাইরের ছবির ফোটোগ্রাফটা বন্ধ হয়ে গিয়ে মনের ধ্বনির ফোনোগ্রাফটাই সজাগ হয়ে উঠেছে। এখন হয়তো দেখি কম, শুনি বেশি।

মানুষ তো কোনো একটা জায়গায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। এই জন্যেই চলচ্চিত্র ছাড়া তার যথার্থ চিত্র হতেই পারে না। প্রবহমান ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চলমান আপনার পরিচয় মানুষ দিতে থাকে। যারা আপনলোক, নিয়ত তারা সেই পরিচয়টা

পেতে ইচ্ছে করে। বিদেশে নূতন নূতন ধাবমান অবস্থা ও ঘটনার চঞ্চল ভূমিকার উপরে প্রকাশিত আত্মীয়-লোকের ধারাবাহিক পরিচয়ের ইচ্ছা স্বাভাবিক। চিঠি সেই ইচ্ছা পূরণ করবার জন্যেই।

কিন্তু, সকলপ্রকার রচনাই স্বাভাবিক শক্তির অপেক্ষা করে। চিঠি-রচনাও তাই। আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ, আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে-ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তালভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্বব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ বলে কিছুই নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণত, এ কথা বলা চলে যে শব্দতত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে গেছে শব্দচিত্র তাদের এলেকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটা একেবারে উপরের তলায়। কিন্তু, সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারে নি এই বড়ো অপূর্ব। সুনীতির নীরন্ধ্র চিঠিগুলি তোমরা যথাসময়ে পড়তে পাবে— দেখবে এগুলো একেবারে বাদশাই চিঠি। এতে চিঠির ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম; বর্ণনাসাম্রাজ্য সর্বগ্রাহী, ছোটো বড়ো কিছুই তার থেকে বাদ পড়ে নি। সুনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত, লিপিবাচস্পতি কিম্বা লিপিসার্বভৌম কিম্বা লিপি-চক্রবর্তী। ইতি ৩রা শ্রাবণ ১৩৩৪। নাগপঞ্চমী।[১]

৫

সামনে সমুদ্রের অর্ধচন্দ্রাকার তটসীমা। অনেক দূর পর্যন্ত জল অগভীর, জলের রঙে মাটির আভাস, সে যেন ধরণীর গেরুয়া আঁচল এলিয়ে পড়েছে। ঢেউ নেই, সমস্ত-দিন জলরাশি এগোয় আর পিছোয় অতি ধীর গমনে। অপ্সরী আসছে চুপি চুপি পিছন থেকে পৃথিবীর চোখ টিপে ধরবে বলে— সোনার রেখায় রেখায় কৌতুকের মুচকে-হাসি।

সামনে বাঁ-দিকে একদল নারকেলগাছ, সুদীর্ঘ গুঁড়ির উপর সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারে নি, পরস্পরের দিকে তাদের হেলাহেলি। নিত্যদোলায়িত শাখায় শাখায়

১ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত

সূর্যের আলো ওরা ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে, চঞ্চল ছেলেরা যেমন নদীর ঘাটে জল-ছোঁড়াছুঁড়ি করে। সকালের আকাশে ওদের এই অবগাহনস্নান।

এটা একজন চিনীয় ধনীর বাড়ি। আমরা তাঁর অতিথি। প্রশস্ত বারান্দায় বেতের কেদারায় বসে আছি। সমুদ্রের দিক থেকে বুক ভরে বইছে পশ্চিমে হাওয়া। চেয়ে দেখছি, আকাশের কোণে কোণে দলভাঙা মেঘগুলি শ্রাবণের কালো উর্দি ছেড়ে ফেলেছে, এখন কিছুদিনের জন্যে সূর্যের আলোর সঙ্গে ওদের সন্ধি। আমার অস্পষ্ট ভাবনাগুলোর উপর ঝরে পড়ছে কম্পমান নারকেলপাতার ঝরঝর শব্দের বৃষ্টি, বালির উপর দিয়ে ভাঁটার সমুদ্রের পিছু-হটার শব্দ ওরই সঙ্গে একই মৃদুস্বরে মেলানো। ওদিকে পাশের ঘরে ধীরেন এসরাজ নিয়ে আপন মনে বাজিয়ে চলেছে— ভৈরোঁ থেকে রাম-কেলি, রামকেলি থেকে ভৈরবী; আস্তে আস্তে অকেজো মেঘের মতো খেয়ালের হাওয়ায় বদল হচ্ছে রাগিণীর আকৃতি।

আজ সকালে মনটা যেন ভাঁটার সমুদ্র, তীরের দিক টানছে তাকে কোন্ দিকে তার ঠিকানা নেই। আপনাকে আপন সর্বাঙ্গে সর্বান্তঃকরণে ভরপুর মেলে দিয়ে বসে আছি, নিবিড় তরুপল্লবের শ্যামলতায় আবিষ্ট রোদ-পোয়ানো ওই ছোটো দ্বীপটির মতো।

আমার মধ্যে এই ঘনীভূত অনুভবটিকে বলা যেতে পারে হওয়ার আনন্দ। রূপে রঙে আলোয় ধ্বনিতে আকাশে অবকাশে ভরে-ওঠা একটি মূর্তিমান সমগ্রতা আমার চিত্তের উপরে ঘা দিয়ে বলছে "আছি"; তারই জগতে আমার চৈতন্য উছলে উঠছে; সমুদ্রকল্লোলেরই মতো একতান শব্দ জাগছে, ওম্, অর্থাৎ এই-যে আমি। বিরাট একটা "না", হাঁ-করা তার মুখগহ্বর, প্রকাণ্ড তার শূন্য— তারই সামনে ওই নারকেল-গাছ দাঁড়িয়ে, পাতা নেড়ে নেড়ে বলছে, এই-যে আমি। দুঃসাহসিক সত্তার এই স্পর্ধা গভীর বিস্ময়ে বাজছে আমার মনে, আর ধীরেন ওই-যে ভৈরবীতে মীড় লাগিয়েছে সেও যেন বিশ্বসত্তার আত্মঘোষণা, আপন কম্পমান সুরের ধ্বজাটিকে অসীম শূন্যের মাঝখানে তুলে ধরেছে।

এই তো হল "হওয়া"। এইখানেই শেষ নেই। এর সঙ্গে আছে করা। সমুদ্র আছে অন্তরে অন্তরে নিস্তব্ধ, কিন্তু তার উপরে উপরে উঠছে ঢেউ, চলছে জোয়ার ভাঁটা। জীবনে করার বিরাম নেই। এই করার দিকে কত প্রয়াস, কত উপকরণ, কত আবর্জনা। এরা সব জমে জমে কেবলই গণ্ডী হয়ে ওঠে, দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। এরা বাহিরে সমগ্রতার ক্ষেত্রকে, অন্তরে পরিপূর্ণতার উপলব্ধিকে, টুকরো টুকরো করতে থাকে। অহমিকার উত্তেজনায় কর্ম উদ্ধত হয়ে, একান্ত হয়ে, আপনাকে সকলের আগে ঠেলে তোলে; হওয়ার চেয়ে করা বড়ো হয়ে উঠতে চায়। এতে ক্লান্তি, এতে অশান্তি,

এতে মিথ্যা। বিশ্বকর্মার বাঁশিতে নিয়তই যে ছুটির সুর বাজে এই কারণেই সেটা শুনতে পাই নে; সেই ছুটির সুরেই বিশ্বকাজের ছন্দ বাঁধা।

সেই সুরটি আজ সকালের আলোতে ওই নারকেলগাছের তানপুরায় বাজছে। ওখানে দেখতে পাচ্ছি, শক্তির রূপ আর মুক্তির রূপ অনবচ্ছিন্ন এক। এতেই শান্তি, এতেই সৌন্দর্য। জীবনের মধ্যে এই মিলনটিই তো খুঁজি— করার চিরবহমান নদীধারায় আর হওয়ার চিরগম্ভীর মহাসমুদ্রে মিলন। এই আত্মপরিতৃপ্ত মিলনটিকে লক্ষ্য করেই গীতা বলেছেন, "কর্ম করো, ফল চেয়ো না।" এই চাওয়ার রাহুটাই কর্মের পাত্র থেকে তার অমৃত ঢেলে নেবার জন্যে লালায়িত। ভিতরকার সহজ হওয়াটি সার্থক হয় বাইরেকার সহজ কর্মে। অন্তরের সেই সার্থকতার চেয়ে বাইরের স্বার্থ প্রবল হয়ে উঠলেই কর্ম হয় বন্ধন; সেই বন্ধনেই জড়িত যত হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা, নিজেকে ও অন্যকে প্রবঞ্চনা। এই কর্মের দুঃখ, কর্মের অগৌরব, যখন অসহ্য হয়ে ওঠে তখন মানুষ বলে বসে "দূর হোক গে, কর্ম ছেড়ে দিয়ে চলে যাই।" তখন আবার আহ্বান আসে, কর্ম ছেড়ে দিয়ে কর্ম থকে নিষ্কৃতি নেই; করাতেই হওয়ার আত্মপ্রকাশ। বাহ্য ফলের দ্বারা নয়, আপন অন্তর্নিহিত সত্যের দ্বারাই কর্ম সার্থক হোক, তাতেই হোক মুক্তি।

ফল-চাওয়া কর্মের নাম চাকরি, সেই চাকরির মনিব আমি নিজেই হই বা অন্যেই হোক। চাকরিতে মাইনের জন্যেই কাজ, কাজের জন্যে কাজ নয়। কাজ তার নিজের ভিতর থেকে নিজে যখন কিছুই রস জোগায় না, সম্পূর্ণ বাইরে থেকেই যখন আপন দাম নেয়, তখনই মানুষকে সে অপমান করে। মর্তলোকে প্রয়োজন বলে জিনিসটাকে একেবারেই অস্বীকার করতে পারি নে। বেঁচে থাকবার জন্যে আহার করতেই হবে। বলতে পারব না, "নেই বা করলেম।" সেই আবশ্যকের তাড়াতেই পরের দ্বারে মানুষ উমেদারি করে, আর সেই সঙ্গেই তত্ত্বজ্ঞানী ভাবতে থাকে কী করলে এই কর্মের জড় মারা যায়। বিদ্রোহী মানুষ বলে বসে, বৈরাগ্যমেবাভয়ম্। অর্থাৎ, এতই কম খাব, কম পরব, রৌদ্রবৃষ্টি এমন করে সহ্য করতে শিখব, দাসত্বে প্রবৃত্ত করবার জন্যে প্রকৃতি আমাদের জন্যে যতরকম কানমলার ব্যবস্থা করেছে সেগুলোকে এতটা এড়িয়ে চলব যে, কর্মের দায় অত্যন্ত হালকা হয়ে যাবে। কিন্তু, প্রকৃতির কাজে শুধু কানমলার তাড়া নেই, সেই সঙ্গে রসের জোগান আছে। এক দিকে ক্ষুধায় দেয় দুঃখ, আর-এক দিকে রসনায় দেয় সুখ— প্রকৃতি একই সঙ্গে ভয় দেখিয়ে আর লোভ দেখিয়ে আমাদের কাজ করায়। সেই লোভের দিক থেকে আমাদের মনে জন্মায় ভোগের ইচ্ছা। বিদ্রোহী মানুষ বলে, ওই ভোগের ইচ্ছাটা প্রকৃতির চাতুরী, ওইটেই মোহ, ওটাকে তাড়াও, বলো, বৈরাগ্যমেবাভয়ম্— মানব না দুঃখ, চাইব না সুখ।

দু-চারজন মানুষ এমনতরো স্পর্ধা করে ঘরবাড়ি ছেড়ে বনে জঙ্গলে ফলমূল খেয়ে কাটাতে পারে, কিন্তু সব মানুষই যদি এই পন্থা নেয় তা হলে বৈরাগ্য নিয়েই পরস্পর লড়াই বেধে যাবে— তখন বল্কলে কুলোবে না, গিরিগহ্বরে ঠেলাঠেলি ভিড় হবে, ফলমূল যাবে উজাড় হয়ে। তখন কপ্‌নিপরা ফৌজ মেশিন-গান বের করবে।

সাধারণ মানুষের সমস্যা এই যে, কর্ম করতেই হবে। জীবনধারণের গোড়াতেই প্রয়োজনের তাড়া আছেই। তবুও কী করলে কর্ম থেকে প্রয়োজনের চাপ যথাসম্ভব হালকা করা যেতে পারে। অর্থাৎ, কী করলে কর্মে পরের দাসত্বের চেয়ে নিজের কর্তৃত্বটা বড়ো হয়ে দেখা দেয়। কর্ম থেকে কর্তৃত্বকে যতই দূরে পাঠানো যাবে কর্ম ততই মজুরির বোঝা হয়ে মানুষকে চেপে মারবে; এই শূদ্রত্ব থেকে মানুষকে উদ্ধার করা চাই।

একটা কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন যখন শিলঙে ছিলেম, নন্দলাল কার্সিয়ঙ থেকে পোস্টকার্ডে একটি ছবি পাঠিয়েছিলেন। স্যাকরা চার দিকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে চোখে চশমা এঁটে গয়না গড়ছে। ছবির মধ্যে এই কথাটি পরিস্ফুট যে, এই স্যাকরার কাজের বাইরের দিকে আছে তার দর, ভিতরের দিকে আছে তার আদর। এই কাজের দ্বারা স্যাকরা নিছক নিজের অভাব প্রকাশ করছে না, নিজের ভাবকে প্রকাশ করছে; আপন দক্ষতার গুণে আপন মনের ধ্যানকে মূর্তি দিচ্ছে। মুখ্যত এ-কাজটি তার আপনারই, গৌণত যে-মানুষ পয়সা দিয়ে কিনে নেবে তার। এতে করে ফলকামনাটা হয়ে গেল লঘু, মূল্যের সঙ্গে অমূল্যতার সামঞ্জস্য হল, কর্মের শূদ্রত্ব গেল ঘুচে। এককালের বণিককে সমাজ অবজ্ঞা করত, কেননা, বণিক কেবল বিক্রি করে, দান করে না। কিন্তু, এই স্যাকরা এই যে গয়নাটি গড়লে তার মধ্যে তার দান এবং বিক্রি একই কালে মিলে গেছে। সে ভিতর থেকে দিয়েছে, বাইরে থেকে জোগায় নি।

ভৃত্যকে রেখেছি তাকে দিয়ে ঘরের কাজ করাতে। মনিবের সঙ্গে তার মনুষ্যত্বের বিচ্ছেদ একান্ত হলে সেটা হয় ষোলো-আনা দাসত্ব। যে-সমাজ লোভে বা দাম্ভিকতায় মানুষের প্রতি দরদ হারায় নি সে-সমাজ ভৃত্য আর আত্মীয়ের সীমারেখাটাকে যতদূর সম্ভব ফিকে করে দেয়। ভৃত্য সেখানে দাদা খুড়ো জেঠার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছয়। তখন তার কাজটা পরের কাজ না হয়ে আপনারই কাজ হয়ে ওঠে। তখন তার কাজের ফলকামনাটা যায় যথাসম্ভব ঘুচে। সে দাম পায় বটে, তবুও আপনার কাজ সে দান করে, বিক্রি করে না।

গুজরাটে কাঠিয়াবাড়ে দেখেছি, গোয়ালা গোরুকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে।

সেখানে তার দুধের ব্যবসায়ে ফলকামনাকে তুচ্ছ করে দিয়েছে তার ভালোবাসায়; কর্ম করেও কর্ম থেকে তার নিত্য মুক্তি। এ গোয়ালা শূদ্র নয়। যে-গোয়ালা দুধের দিকে দৃষ্টি রেখেই গোরু পোষে, কসাইকে গোরু বেচতে যার বাধে না, সেই হল শূদ্র; কর্মে তার অগৌরব, কর্ম তার বন্ধন। যে-কর্মের অন্তরে মুক্তি নেই, যেহেতু তাতে কেবল লোভ, তাতে প্রেমের অভাব, সেই কর্মেই শূদ্রত্ব। জাত-শূদ্রেরা পৃথিবীতে অনেক উঁচু উঁচু আসন অধিকার করে বসে আছে। তারা কেউ-বা শিক্ষক, কেউ-বা বিচারক, কেউ-বা শাসনকর্তা, কেউ-বা ধর্মযাজক। কত ঝি, দাই, চাকর, মালী, কুমোর, চাষি আছে যারা ওদের মতো শূদ্র নয়— আজকের এই রৌদ্রে-উজ্জ্বল সমুদ্রতীরের নারকেল-গাছের মর্মরে তাদের জীবনসংগীতের মূল স্বরটি বাজছে।

মলাক্কা
২৮শে জুলাই ১৯২৭

৬

কল্যাণীয়াসু

এখনই দুশো মাইল দূরে এক জায়গায় যেতে হবে। সকলেই সাজসজ্জা করে জিনিসপত্র বেঁধে প্রস্তুত; কেবল আমিই তৈরি হয়ে নিতে পারি নি। এখনই রেল-গাড়ির উদ্দেশে মোটরগাড়িতে চড়তে হবে। দ্বারের কাছে মোটরগাড়ি উচ্চ তারস্বরে মাঝে মাঝে শৃঙ্গধ্বনি করছে— আমাদের সঙ্গীদের কণ্ঠে তেমন জোর নেই, কিন্তু তাদের উৎকণ্ঠা কম প্রবল নয়। অতএব, এইখানেই উঠতে হল। দিনটি চমৎকার। নারকেলগাছের পাতা ঝিল্‌মিল্ করছে, ঝর্‌ঝর্ করছে, দুলে দুলে উঠছে, সামনেই সমুদ্র স্বগত-উক্তিতে অবিশ্রাম কলধ্বনিমুখরিত।

মলাক্কা
৩০শে জুলাই ১৯২৭[১]

৭

কল্যাণীয়াসু

রানী, এসেছি গিয়ানয়ার রাজবাড়িতে। মধ্যাহ্নভোজনের পূর্বে সুনীতি রাজবাড়ির ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নিয়ে খুব আসর জমিয়ে তুলেছিলেন। খেতে বসে রাজা আমাকে বললেন একটু সংস্কৃত আওড়াতে। দু-চার রকমের শ্লোক আওড়ানো গেল। সুনীতি

১ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত।

একটি শ্লোকের পরিচয় দিতে গিয়ে যেমনি বললেন "শার্দূলবিক্রীড়িত" অমনি রাজা সেটা উচ্চারণ করে জানালেন, তিনিও জানেন। এখানকার রাজার মুখে অত বড়ো একটা কড়া সংস্কৃত শব্দ শুনে আমি তো আশ্চর্য। তার পরে রাজা বলে গেলেন, শিখরিণী, স্রগ্ধরা, মালিনী, বসন্ততিলক, আরো কতকগুলো নাম যা আমাদের অলংকারশাস্ত্রে কখনো পাই নি। বললেন, তাঁদের ভাষায় এ-সব ছন্দ প্রচলিত। অথচ, মন্দাক্রান্তা বা অনুষ্টুভ এঁরা জানেন না। এখানে ভারতীয় বিদ্যার এই-সব ভাঙাচোরা মূর্তি দেখে মনে হয় যেন ভূমিকম্প হয়ে একটা প্রাচীন মহানগরী ধ্বসে গিয়েছে, মাটির নীচে বসে গিয়েছে— সেই-সব জায়গায় উঠেছে পরবর্তী কালের ঘরবাড়ি চাষ-আবাদ ; আবার অনেক জায়গায় সেই পুরোনো কীর্তির অবশেষ উপরে জেগে, এই দুইয়ে মিলে জোড়া-তাড়া দিয়ে এখানকার লোকালয়।

সেকালের ভারতবর্ষের যা-কিছু বাকি আছে তার থেকে ভারতের তখনকার কালের বিবরণ অনেকটা আন্দাজ করা যায়। এখানে হিন্দুধর্ম প্রধানতই শৈব। দুর্গা আছেন কিন্তু কপালমালিনী লোলরসনা উলঙ্গিনী কালী নেই। কোনো দেবতার কাছে পশুবলি এরা জানে না। কিছুকাল আগে অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ উপলক্ষে পশুবধ হত, কিন্তু দেবীর কাছে জীবরক্ত নৈবেদ্য দেওয়া হত না। এর থেকে বোঝা যায়, তখনকার ভারতবর্ষে ব্যাধ-শবরদের উপাস্য দেবতা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুমন্দিরে প্রবেশ করে রক্তাভিষিক্ত দেবপূজা প্রচার করেন নি।

তার পরে রামায়ণ-মহাভারতের যে-সকল পাঠ এ দেশে প্রচলিত আমাদের দেশের সঙ্গে তার অনেক প্রভেদ। যে যে স্থানে এদের পাঠান্তর তার সমস্তই যে অশুদ্ধ, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। এখানকার রামায়ণে রাম সীতা ভাই-বোন ; সেই ভাই-বোনে বিবাহ হয়েছিল। একজন ওলন্দাজ পণ্ডিতের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল ; তিনি বললেন, তাঁর মতে এই কাহিনীটাই প্রাচীন, পরবর্তীকাল এই কথাটাকে চাপা দিয়েছে।

এই মতটাকে যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় তা হলে রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে মস্ত কয়েকটি মিল দেখতে পাই। দুটি কাহিনীরই মূলে দুটি বিবাহ। দুটি বিবাহই আর্যরীতি অনুসারে অসংগত। ভাই-বোনে বিবাহ বৌদ্ধ ইতিহাসে কোনো কোনো জায়গায় শোনা যায়, কিন্তু সেটা আমাদের সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অন্য দিকে এক স্ত্রীকে পাঁচ ভাইয়ে মিলে বিবাহও তেমনি অদ্ভুত ও অশাস্ত্রীয়। দ্বিতীয় মিল হচ্ছে দুই বিবাহেরই গোড়ায় অস্ত্রপরীক্ষা, অথচ সেই পরীক্ষা বিবাহযোগ্যতা প্রসঙ্গে নিরর্থক। তৃতীয় মিল হচ্ছে, দুটি কন্যাই মানবীগর্ভজাত নয় ; সীতা পৃথিবীর কন্যা, হলরেখার

মুখে কুড়িয়ে-পাওয়া ; কৃষ্ণা যজ্ঞসম্ভবা। চতুর্থ মিল হচ্ছে, উভয়ত্রই প্রধান নায়কদের রাজ্যচ্যুতি ও স্ত্রীকে নিয়ে বনগমন। পঞ্চম মিল হচ্ছে, দুই কাহিনীতেই শত্রুর হাতে স্ত্রীর অবমাননা ও সেই অবমাননার প্রতিশোধ।

সেই জন্যে আমি পূর্বেই অন্যত্র এই মত প্রকাশ করেছি যে, দুটি বিবাহই রূপক-মূলক। রামায়ণের রূপকটি খুবই স্পষ্ট। কৃষির হলবিদারণরেখাকে যদি কোনো রূপ দিতেই হয় তবে তাকে পৃথিবীর কন্যা বলা যেতে পারে। শস্যকে যদি নবদূর্বাদলশ্যাম রাম বলে কল্পনা করা যায় তবে সেই শস্যও তো পৃথিবীর পুত্র। এই রূপক অনুসারে উভয়ে ভাইবোন, আর পরস্পর পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ।

হরধনুভঙ্গের মধ্যেই রামায়ণের মূল অর্থ। বস্তুত সমস্তটাই হরধনুভঙ্গের ব্যাপার— সীতাকে গ্রহণ রক্ষণ ও উদ্ধারের জন্যে। আর্যাবর্তের পূর্ব অংশ থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত কৃষিকে বহন করে ক্ষত্রিয়দের যে-অভিযান হয়েছিল সে সহজ হয় নি ; তার পিছনে ঘরে-বাইরে মস্ত একটা দ্বন্দ্ব ছিল। সেই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস রামায়ণের মধ্যে নিহিত, অরণ্যের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব।

মহাভারতে খাণ্ডববন-দাহনের মধ্যেও এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের আভাস পাই। সেও বনের গাছপালা পোড়ানো নয়, সেদিন বন যে প্রতিকূল মানবশক্তির আশ্রয় ছিল তাকে ধ্বংস করা। এর বিরুদ্ধে কেবল-যে অনার্য তা নয়, ইন্দ্র যাঁদের দেবতা তাঁরাও ছিলেন। ইন্দ্র বৃষ্টিবর্ষণে খাণ্ডবের আগুন নেবাবার চেষ্টা করেছিলেন।

মহাভারতেরও অর্থ পাওয়া যায় লক্ষ্যবেধের মধ্যে। এই শূন্যস্থিত লক্ষ্যবেধের মধ্যে এমন একটি সাধনার সংকেত আছে যে, একাগ্রসাধনার দ্বারা কৃষ্ণাকে পাওয়া যায় ; আর এই যজ্ঞসম্ভবা কৃষ্ণা এমন একটি তত্ত্ব যাকে নিয়ে একদিন ভারতবর্ষে বিষম দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছিল। একে একদল স্বীকার করেছিল, একদল স্বীকার করে নি। কৃষ্ণাকে পঞ্চ পাণ্ডব গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কৌরবেরা তাঁকে অপমান করতে ত্রুটি করেন নি। এই যুদ্ধে কুরুসেনাপতি ছিলেন ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য, আর পাণ্ডববীর অর্জুনের সারথি ছিলেন কৃষ্ণ। রামের অস্ত্রদীক্ষা যেমন বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে, অর্জুনের যুদ্ধদীক্ষা তেমনি কৃষ্ণের কাছ থেকে। বিশ্বামিত্র স্বয়ং লড়াই করেন নি, কিন্তু লড়াইয়ের প্রেরণা তাঁর কাছ থেকে ; কৃষ্ণও স্বয়ং লড়াই করেন নি কিন্তু কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রবর্তন করেছিলেন তিনি ; ভগবদ্গীতাতেই এই যুদ্ধের সত্য, এই যুদ্ধের ধর্ম, ঘোষিত হয়েছে— সেই ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণ একাত্মক, যে-কৃষ্ণ কৃষ্ণার সখা, অপমানকালে কৃষ্ণা যাঁকে স্মরণ করেছিলেন বলে তাঁর লজ্জা রক্ষা হয়েছিল, যে-কৃষ্ণের সম্মাননার জন্যেই পাণ্ডবদের রাজসূয়যজ্ঞ। রাম দীর্ঘকাল সীতাকে নিয়ে যে-বনে ভ্রমণ করেছিলেন সে ছিল অনার্যদের বন, আর

কৃষ্ণাকে নিয়ে পাণ্ডবেরা ফিরেছিলেন যে-বনে সে হচ্ছে ব্রাহ্মণ ঋষিদের বন। পাণ্ডবদের সাহচর্যে এই বনে কৃষ্ণার প্রবেশ ঘটেছিল। সেখানে কৃষ্ণা তাঁর অক্ষয় অন্নপাত্র থেকে অতিথিদের অন্নদান করেছিলেন। ভারতবর্ষে একটা দ্বন্দ্ব ছিল অরণ্যের সঙ্গে কৃষি-ক্ষেত্রের, আর-একটা দ্বন্দ্ব বেদের ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণের ধর্মের। লঙ্কা ছিল অনার্যশক্তির পুরী, সেইখানে আর্যের হল জয়; কুরুক্ষেত্র ছিল কৃষ্ণবিরোধী কৌরবের ক্ষেত্র, সেইখানে কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডব জয়ী হলেন। সব ইতিহাসেই বাইরের দিকে অন্ন নিয়ে যুদ্ধ, আর ভিতরের দিকে তত্ত্ব নিয়ে যুদ্ধ। প্রজা বেড়ে যায়, তখন খাদ্য নিয়ে স্থান নিয়ে টানাটানি পড়ে, তখন নব নব ক্ষেত্রে কৃষিকে প্রসারিত করতে হয়। চিত্তের প্রসার বেড়ে যায়, তখন যারা সংকীর্ণ প্রথাকে আঁকড়ে থাকে তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধে যারা সত্যকে প্রশস্ত ও গভীর ভাবে গ্রহণ করতে চায়। এক সময়ে ভারতবর্ষে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ প্রবল হয়েছিল; এক পক্ষ বেদমন্ত্রকেই ব্রহ্ম বলতেন, অন্য পক্ষ ব্রহ্মকে পরমাত্মা বলে জেনেছিলেন। বুদ্ধদেব যখন তাঁর ধর্মপ্রচার শুরু করেন তার পূর্বেই ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে মতের দ্বন্দ্ব তাঁর পথ অনেকটা পরিষ্কার করে দিয়েছে।

রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে ভারতবর্ষের যে মূল ইতিহাস নানা কাহিনীতে বিজড়িত, তাকে স্পষ্টতর করে দেখতে পাব যখন এখানকার পাঠগুলি মিলিয়ে দেখবার সুযোগ হবে। কথায় কথায় এখানকার একজনের কাছে শোনা গেল যে, দ্রোণাচার্য ভীমকে কৌশলে বধ করবার জন্যে কোনো-এক অসাধ্য কর্মে পাঠিয়েছিলেন। দ্রুপদ-বিদ্বেষী দ্রোণ যে পাণ্ডবদের অনুকূল ছিলেন না, তার হয়তো প্রমাণ এখানকার মহাভারতে আছে।

রামায়ণের কাহিনী সম্বন্ধে আর-একটি কথা আমার মনে আসছে, সেটা এখানে বলে রাখি। কৃষির ক্ষেত্র দুরকম করে নষ্ট হতে পারে— এক বাইরের দৌরাত্ম্যে, আর-এক নিজের অযত্নে। যখন রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গেল তখন রামের সঙ্গে সীতার আবার মিলন হতে পেরেছিল। কিন্তু, যখন অযত্নে অনাদরে রামসীতার বিচ্ছেদ ঘটল তখন পৃথিবীর কন্যা সীতা পৃথিবীতেই মিলিয়ে গেলেন। অযত্নে নির্বাসিতা সীতার গর্ভে যে-যমজ সন্তান জন্মেছিল তাদের নাম লব কুশ। লবের মূল ধাতুগত অর্থ ছেদন, কুশের অর্থ জানাই আছে। কুশ ঘাস একবার জন্মালে ফসলের খেতকে-যে কিরকম নষ্ট করে সেও জানা কথা। আমি যে-মানেটা আন্দাজ করছি সেটা যদি একেবারেই অগ্রাহ্য না হয় তা হলে লবের সঙ্গে কুশের একত্র জন্মানোর ঠিক তাৎপর্য কী হতে পারে, এ কথা আমি পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করি।

অন্যদের চিঠি থেকে খবর পেয়ে থাকবে যে, এখানে আমরা প্রকাণ্ড একটা অন্ত্যেষ্টিসংকারের অনুষ্ঠান দেখতে এসেছি। মোটের উপরে এটা কতকটা চীনেদের

মতো— তারাও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এইরকম ধুমধাম সাজসজ্জা বাজনাবাদ্য করে থাকে। কেবল মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতির ভঙ্গিটা হিন্দুদের মতো। দাহক্রিয়াটা এরা হিন্দুদের কাছ থেকে নিয়েছে। কিন্তু, কেমন মনে হয়, ওটা যেন অন্তরের সঙ্গে নেয় নি। হিন্দুরা আত্মাকে দেহের অতীত করে দেখতে চায়, তাই মৃত্যুর পরেই পুড়িয়ে ফেলে দেহের মমতা থেকে একেবারে মুক্তি পাবার চেষ্টা করে। এখানে মৃতদেহকে অনেক সময়েই বহু বৎসর ধরে রেখে দেয়। এই রেখে দেবার ইচ্ছেটা কবর দেবার ইচ্ছেরই সামিল। এদের রীতির মধ্যে এরা দেহটাকে রেখে দেওয়া আর দেহটাকে পোড়ানো, এই দুই উলটো প্রথার মধ্যে যেন রফানিষ্পত্তি করে নিয়েছে। মানুষের মনঃপ্রকৃতির বিভিন্নতা স্বীকার করে নিয়ে হিন্দুধর্ম রফানিষ্পত্তিসূত্রে কত বিপরীত রকম রাজিনামা লিখে দিয়েছে তার ঠিকানা নেই। ভেদ নষ্ট করে ফেলে হিন্দুধর্ম ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা করে নি, ভেদ রক্ষা করেও সে একটা ঐক্য আনতে চেয়েছে।

কিন্তু, এমন ঐক্য সহজ নয় বলেই এর মধ্যে দৃঢ় ঐক্যের শক্তি থাকে না। বিভিন্ন বহুকে এক বলে স্বীকার করেও তার মাঝে মাঝে অলঙ্ঘনীয় দেয়াল তুলে দিতে হয়। একে অবিচ্ছিন্ন এক বলা যায় না, একে বলতে হয় বিভক্ত এক। ঐক্য এতে ভারগ্রস্ত হয়, ঐক্য এতে শক্তিমান হয় না। আমাদের দেশের স্বধর্মানুরাগী অনেকেই বালিদ্বীপের অধিবাসীদের আপন বলে স্বীকার করে নিতে উৎসুক হবেন, কিন্তু সেই মুহূর্তেই নিজের সমাজ থেকে ওদের দূরে ঠেকিয়ে রাখবেন। এইখানে প্রতিযোগিতায় মুসলমানের সঙ্গে আমাদের হারতেই হয়। মুসমলমানে মুসলমানে এক মুহূর্তেই সম্পূর্ণ জোড় লেগে যায়, হিন্দুতে হিন্দুতে তা লাগে না। এই জন্যেই হিন্দুর ঐক্য আপন বিপুল অংশ-প্রত্যংশ নিয়ে কেবলই নড়্‌নড়্‌ করছে। মুসলমান যেখানে আসে সেখানে সে-যে-কেবল মাত্র আপন বল দেখিয়ে বা যুক্তি দেখিয়ে বা চরিত্র দেখিয়ে সেখানকার লোককে আপন সম্প্রদায়ভুক্ত করে তা নয়, সে আপন সন্ততিবিস্তার দ্বারা সজীব ও ধারাবাহিক ভাবে আপন ধর্মের বিস্তার করে। স্বজাতির, এমন-কি, পরজাতির লোকের সঙ্গে বিবাহে তার কোনো বাধা নেই। এই অবাধ বিবাহের দ্বারা সে আপন সামাজিক অধিকার সর্বত্র প্রসারিত করতে পারে। কেবলমাত্র রক্তপাতের রাস্তা দিয়ে নয়, রক্তমিশ্রণের রাস্তা দিয়ে সে দূরে দূরান্তরে প্রবেশ করতে পেরেছে। হিন্দু যদি তা পারত তা হলে বালিদ্বীপে হিন্দুধর্ম স্থায়ী বিশুদ্ধ ও পরিব্যাপ্ত হতে দেরি হত না।

গিয়ানয়ার

১ আগস্ট ১৯২৭[১]

১ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত।

৮

গোলমাল ঘোরাফেরা দেখাশোনা বলাকওয়া নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের ফাঁকে ফাঁকে যখন-তখন দু-চার লাইন করে লিখি, ভাবের স্রোত আটকে আটকে যায়, তার সহজ গতিটা থাকে না। একে চিঠি বলা চলে না। কেননা, এর ভিতরে ভিতরে কর্তব্য-পরায়ণতার ঠেলা চলছে— সেটাতে কাজকে এগিয়ে দেয়, ভাবকে হয়রান করে। পাখি-ওড়ায় আর ঘুড়ি-ওড়ায় তফাত আছে। আমি ওড়াচ্ছি চিঠির ছলে লেখার ঘুড়ি, কর্তব্যের লাঠাইয়ে বাঁধা, কেবলই হেঁচকে হেঁচকে ওড়াতে হয়।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। দিনের মধ্যে দু-তিনরকমের প্রোগ্রাম। নতুন নতুন জায়গায় বক্তৃতা নিমন্ত্রণ ইত্যাদি। গীতার উপদেশ যদি মানতুম, ফললাভের প্রত্যাশা যদি না থাকত, তা হলে পাল-তোলা নৌকার মতো জীবনতরণী তীর থেকে তীরান্তরে নেচে নেচে যেতে পারত। চলেছি উজান বেয়ে, গুন টেনে, লগি ঠেলে, দাঁড় বেয়ে; পদে পদে জিব বেরিয়ে পড়ছে। আমৃত্যুকাল কোনোদিন কোথাও-যে সহজে ভ্রমণ করতে পারব সে আশা বিড়ম্বনা। পথ সুদীর্ঘ, পাথেয় স্বল্প; অর্জন করতে করতে গর্জন করতে করতে, হোটেলে হোটেলে ডলার বর্জন করতে করতে, আমার ভ্রমণ— গলা চালিয়ে আমার পা চালানো। পথে বিপথে যেখানে-সেখানে আচমকা আমাকে বক্তৃতা করতে বলে, আমিও উঠে দাঁড়িয়ে বকে যাই— আমেরিকায় মুড়ি তৈরি করবার কলের মুখ থেকে যেমন মুড়ি বেরোতে থাকে সেইরকম। হাসিও পায় দুঃখও ধরে। পৃথিবীর পনেরো-আনা লোক কবিকে নিয়ে সর্বসমক্ষে এইরকম অপদস্থ করতেই ভালোবাসে; বলে, "মেসেজ দাও।" মেসেজ বলতে কী বুঝায় সেটা ভেবে দেখো। সর্বসাধারণ-নামক নির্বিশেষ পদার্থের উদাসীন কানের কাছে অত্যন্ত নির্বিশেষ ভাবের উপদেশ দেওয়া, যা কোনো বাস্তব মানুষের কোনো বাস্তব কাজেই লাগে না। পরলোকগত বহুসংখ্যক পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে পাইকেরি প্রথায় পিণ্ডি দেওয়ার মতো— যেহেতু সে-পিণ্ড কেউ খায় না সেই জন্যে তাতে না আছে স্বাদ, না আছে শোভা। যেহেতু সেটা রসনাহীন ও ক্ষুধাহীন নামমাত্রের জন্য উৎসর্গ-করা সেই জন্যে সেটাকে যথার্থ খাদ্য করে তোলার জন্যে কারো গরজ নেই। মেসেজ-রচনা সেইরকম রচনা।

আজ বিকেলের গাড়িতে পিনাঙ যেতে হবে। তার আগে, যদি সুসাধ্য হয় তবে নাওয়া আছে, খাওয়া আছে; যদি দুঃসাধ্য হয় তবু একটা মিটিঙে গিয়ে বক্তৃতা আছে; ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই, অবকাশ নেই— তার পরে সুদীর্ঘ রেলযাত্রা, তার পরে

স্টেশনে মাল্যগ্রহণ, অ্যাড্রেস-শ্রবণ, তদুত্তরে বিনতিপ্রকাশ, তার পরে নতুন বাসায় নতুন জনতার মধ্যে জীবনযাত্রার নতুন ব্যবস্থা, তার পরে ষোলোই তারিখে জাহাজে চড়ে জাভায় যাত্রা ; তার পরে নতুন অধ্যায়। ইতি

১৩ আগস্ট ১৯২৭

টাইপিঙ

৯

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, মালয় উপদ্বীপের বিবরণ আমাদের দলের লোকের চিঠিপত্র থেকে নিশ্চয় পেয়েছ। ভালো করে দেখবার মতো, ভাববার মতো, লেখার মতো সময় পাই নি। কেবল ঘুরেছি আর বকেছি। পিনাঙ থেকে জাহাজে চড়ে প্রথমে জাভার রাজধানী বাটাভিয়ায় এসে পৌছনো গেল। আজকাল পৃথিবীর সর্বত্রই বড়ো শহর মাত্রই দেশের শহর নয়, কালের শহর। সবাই আধুনিক। সবাই মুখের চেহারায় একই, কেবল বেশভূষায় কিছু তফাত। অর্থাৎ, কারো-বা পাগড়িটা ঝক্‌ঝকে কিন্তু জামায় বোতাম নেই, ধুতিখানা হাঁটু পর্যন্ত, ছেঁড়া চাদরখানায় ধোপ পড়ে না, যেমন কলকাতা ; কারো-বা আগা-গোড়াই ফিট্‌ফাট্ ধোয়া-মাজা, উজ্জ্বল বসনভূষণ, যেমন বাটাভিয়া। শহরগুলোর মুখের চেহারা একই বলেছি, কথাটা ঠিক নয়। মুখ দেখা যায় না, মুখোস দেখি। সেই মুখোসগুলো এক কারখানায় একই ছাঁচে ঢালাই করা। কেউ-বা সেই মুখোস পরিষ্কার পালিশ করে রাখে, কারো বা হেলায়-ফেলায় মলিন। কলকাতা আর বাটাভিয়া উভয়েই এক আধুনিক কালের কন্যা ; কেবল জামাতারা স্বতন্ত্র, তাই আদরযত্নে অনেক তফাত। শ্রীমতী বাটাভিয়ার সিঁথি থেকে চরণচক্র পর্যন্ত গয়নার অভাব নেই। তার উপরে সাবান দিয়ে গা মাজা-ঘষা ও অঙ্গলেপ দিয়ে ঔজ্জ্বল্যসাধন চলছেই। কলকাতার হাতে নোয়া আছে, কিন্তু বাজুবন্দ দেখি নে। তার পরে যে-জলে তার স্নান সে-জলও যেমন, আর যে-গামছায় গা-মোছা তারও সেই দশা। আমরা চিৎপুরবিভাগের পুরবাসী, বাটাভিয়ায় এসে মনে হয় কৃষ্ণপক্ষ থেকে শুক্লপক্ষে এলুম।

হোটেলের খাঁচায় ছিলেম দিন-তিনেক ; অভ্যর্থনার ত্রুটি হয় নি। সমস্ত বিবরণ বোধ হয় সুনীতি কোনো-একসময়ে লিখবেন। কেননা, সুনীতির যেমন দর্শনশক্তি তেমনি ধারণাশক্তি। যত বড়ো তাঁর আগ্রহ তত বড়োই তাঁর সংগ্রহ। যা-কিছু তাঁর চোখে পড়ে সমস্তই তাঁর মনে জমা হয়। কণামাত্র নষ্ট হয় না। নষ্ট-যে হয় না সে

দু দিক থেকেই, রক্ষণে এবং দানে। তন্নষ্টং যন্নদীয়তে। বুঝতে পারছি, তাঁর হাতে আমাদের ভ্রমণের ইতিবৃত্ত লেশমাত্র ব্যর্থ হবে না, লুপ্ত হবে না।

বাটাভিয়া থেকে জাহাজে করে বালিদ্বীপের দিকে রওনা হলুম। ঘণ্টা কয়েকের জন্যে সুরবায়া শহরে আমাদের নামিয়ে নিলে। এও একটা আধুনিক শহর; জাভার আঙ্গিক নয়, জাভার আনুষঙ্গিক। আলাদিনের প্রদীপের মন্ত্রে শহরটাকে নিউজীলণ্ডে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেও খাপছাড়া হয় না।

পার হয়ে এলেম বালিদ্বীপে; দেখলেম ধরণীর চিরযৌবনা মূর্তি। এখানে প্রাচীন শতাব্দী নবীন হয়ে আছে। এখানে মাটির উপর অন্নপূর্ণার পাদপীঠ শ্যামল আস্তরণে দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তীর্ণ; বনচ্ছায়ার অঙ্কলালিত লোকালয়গুলিতে সচ্ছল অবকাশ। সেই অবকাশ উৎসবে অনুষ্ঠানে নিত্যই পরিপূর্ণ।

এই দ্বীপটুকুতে রেলগাড়ি নেই। রেলগাড়ি আধুনিক কালের বাহন। আধুনিক কালটি অত্যন্ত কৃপণ কাল, কোনো দিকে একটুমাত্র বাহুল্যের বরাদ্দ রাখতে চায় না। এই কালের মানুষ বলে: Time is money। তাই কালের বাজেখরচ বন্ধ করবার জন্যে রেলের এঞ্জিন হাঁফাতে হাঁফাতে, ধোঁয়া ওগরাতে ওগরাতে, মেদিনী কম্পমান করে দেশদেশান্তরে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু, এই বালিদ্বীপে বর্তমান কাল শত শত অতীত শতাব্দী জুড়ে এক হয়ে আছে। এখানে কালসংক্ষেপ করবার কোনো দরকার নেই। এখানে যা-কিছু আছে তা চিরদিনের; যেমন একালের তেমনি সেকালের। ঋতুগুলি যেমন চলেছে নানা রঙের ফুল ফোটাতে ফোটাতে, নানা রসের ফল ফলাতে ফলাতে, এখানকার মানুষ বংশপরম্পরায় তেমনি চলেছে নানা রূপে বর্ণে গীতে নৃত্যে অনুষ্ঠানের ধারা বহন করে।

রেলগাড়ি এখানে নেই কিন্তু আধুনিক কালের ভবঘুরে যারা এখানে আসে তাদের জন্যে আছে মোটরগাড়ি। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাদের দেখাশুনো ভোগ-করা শেষ করা চাই। তারা আঁট-কালের মানুষ এসে পড়েছে অপর্যাপ্ত-কালের দেশে। এখানকার অরণ্য পর্বত লোকালয়ের মাঝখান দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলেছি আর কেবলই মনে হচ্ছে, এখানে পায়ে হেঁটে চলা উচিত। যেখানে পথের দুই ধারে ইমারত সেখানে মোটরের সঙ্গে সঙ্গে দুই চক্ষুকে দৌড় করালে খুব বেশি লোকসান হয় না; কিন্তু পথের দু ধারে যেখানে রূপের মেলা সেখানকার নিমন্ত্রণ সারতে গেলে গরজের মোটরটাকে গারাজেই রেখে আসতে হয়। মনে নেই কি, শিকার করতে দুষ্মন্ত যখন রথ ছুটিয়েছিলেন তখন তার বেগ কত; এই হচ্ছে যাকে বলে প্রোগ্রেস, লক্ষ্যভেদ করবার জন্যে তাড়াহুড়ো। কিন্তু, তপোবনের সামনে এসে তাঁকে রথ ফেলে নামতে হল,

লক্ষ্যসাধনের লোভে নয়, তৃপ্তিসাধনের আশায়। সিদ্ধির পথে চলা দৌড়ে, সুন্দরের পথে চলা ধীরে। আধুনিক কালে সিদ্ধির লোভ প্রকাণ্ড, প্রবল; তাই আধুনিক কালের বাহনের বেগ কেবলই বেড়ে যাচ্ছে। যা-কিছু গভীরভাবে নেবার যোগ্য, দৃষ্টি তাকে গ্রহণ না ক'রে স্পর্শ করেই চলে যায়। এখন হ্যাম্‌লেটের অভিনয় অসম্ভব হল, হ্যাম্‌লেটের সিনেমার হল জিত।

আমাদের মোটর যেখানে এসে থামল সেখানে এক বিপুল উৎসব। জায়গাটার নাম বাংলি। কোনো-এক রাজবংশের কার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এর মধ্যে শোকের চিহ্ন নেই। না থাকবারই কথা— রাজার মৃত্যু হয়েছে অনেকদিন আগে, এতদিনে তাঁর আত্মা, দেবসভায় উত্তীর্ণ, উৎসব তাই নিয়ে। বহু দূর থেকে গ্রামের পথে পথে মেয়ে পুরুষেরা ভারে ভারে বিচিত্ররকমের নৈবেদ্য নিয়ে আসছে; যেন কোন্ পুরাণে-বর্ণিত যুগ হঠাৎ আমাদের চোখের সামনে বেঁচে উঠল; যেন অজন্তার শিল্পকলা চিত্রলোক থেকে প্রাণলোকে সূর্যের আলো ভোগ করতে এসেছে। মেয়েদের বেশভূষা অজন্তার ছবিরই মতো। এখানে আবরণবিরলতার স্বাভাবিক আবরু সুন্দর হয়ে দেখা দিল, সেটা চারি দিকের সঙ্গে সুসংগত; এমন-কি, যে-কয়েকজন আমেরিকান মিশনরি দর্শকরূপে এখানে এসেছে, আশা করি, তারাও এই দৃশ্যের সুশোভন সুরুচি সহজ-মনে অনুভব করতে পেরেছে।

যজ্ঞক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। এই উপলক্ষে সেখানে অনেকগুলি বাঁশের উঁচু মাচা-বাঁধা ঘরে এখানকার ব্রাহ্মণেরা সুসজ্জিত হয়ে, শিখা বেঁধে, ভূরি ভূরি খাদ্যবস্ত্র ফলপুষ্প পত্রের নৈবেদ্যের মধ্যে নানারকম মুদ্রা সহযোগে মন্ত্র পড়ছে; তারা কেউ-বা কতরকম অর্ঘ্য-উপকরণ তৈরি করছে। কোথাও-বা এখানকার বহুযন্ত্রমিলিত সংগীত; একজায়গায় তাঁবুর মধ্যে পৌরাণিক যাত্রার অভিনয়। উৎসবের এত অতিবৃহৎ আনুষ্ঠানিক বৈচিত্র্য আর কোথাও দেখি নি; অথচ কোথাও অসুন্দর বা বিশৃঙ্খল কিছু নেই; বিপুল সমারোহে দৃশ্যরূপটি বস্তুরাশির অসংলগ্নতায় বা জনতার ঠেলাঠেলিতে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায় নি। এতগুলি মানুষের সমাবেশ, অথচ গোলমাল বা নোংরামি বা অব্যবস্থা নেই। উৎসবের অন্তর্নিহিত সুন্দর ঐক্যবন্ধনেই সমস্ত ভিড়ের লোককে আপনিই সংযত করে বেঁধেছে। সমস্ত ব্যাপারটি এত বৃহৎ, এত বিচিত্র, আর আমাদের পক্ষে এত অপূর্ব যে, এর বিস্তারিত বর্ণনা করা অসম্ভব। হিন্দু অনুষ্ঠানবিধির সঙ্গে এ দেশের লোকের চিত্তবৃত্তির মিল হয়ে এই যে সৃষ্টি, এর রূপের প্রাচুর্যটিই বিশেষ করে দেখবার ও ভাববার জিনিস। অপরিমিত উপকরণের দ্বারা নিজেকে অশেষভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টা, সেই প্রকাশ কেবলমাত্র বস্তুকে পুঞ্জিত ক'রে নয়, তাকে নানা নিপুণ রীতিতে সজ্জিত ক'রে।

জাপানের সঙ্গে এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থার মিল আছে। জাপানের মতোই এখানে দ্বীপটি আয়তনে ছোটো, অথচ এখানে প্রকৃতির রূপটি বিচিত্র, এবং তার সৃষ্টি-শক্তি প্রচুরভাবে উর্বরা। পদে পদেই পাহাড় ঝরনা নদী প্রান্তর অরণ্য অগ্নিগিরি সরোবর। অথচ, দেশটি চলাফেরার পক্ষে সুগম, নদীপর্বতের পরিমাণ ছোটো; প্রজাসংখ্যা বেশি, ভূমির পরিমাণ কম, এই জন্যে কৃষির উৎকর্ষ দ্বারা চাষের-যোগ্য সমস্ত জমি সম্পূর্ণরূপে এরা চষে ফেলেছে; খেতে খেতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সেঁচ দেবার ব্যাপক ব্যবস্থা এ দেশে দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত। এখানে দারিদ্র্য নেই, রোগ নেই, জলবায়ু সুখকর। দেবদেবীবহুল, কাহিনীবহুল, অনুষ্ঠানবহুল পৌরাণিক হিন্দু-ধর্ম এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সংগত; সেই প্রকৃতি এখানকার শিল্পকলায়, সামাজিক অনুষ্ঠানে, বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের প্রবর্তনা করেছে।

জাপানের সঙ্গে এর মস্ত একটা তফাত। জাপান শীতের দেশ; জাভা বালি গরমের দেশ। জাপান অন্য শীতের দেশের লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনাকে রক্ষা করতে পারলে, জাভা বালি তা পারে নি। আত্মরক্ষার জন্যে যে দৃঢ়নিষ্ঠ অধ্যবসায় দরকার এদের তা ছিল না। গরম হাওয়া প্রাণের প্রকাশকে যেমন তাড়াতাড়ি পরিণত করে তেমনি তাড়াতাড়ি ক্ষয় করতে থাকে। মুহূর্তে মুহূর্তে শক্তিকে সে শিথিল করে, জীবনের অধ্যবসায়কে ক্লান্ত করে দেয়। বাটাভিয়া শহরটি-যে এমন নিখুঁত ভাবে পরিপাটি পরিচ্ছন্ন তার কারণ, শীতের দেশের মানুষ এর ভার নিয়েছে; তাদের শীতের দেশের দেহে শক্তি অনেক কাল থেকে বংশানুক্রমে অস্থিতে মজ্জাতে পেশীতে স্নায়ুতে পুঞ্জীভূত; তাই তাদের অক্লান্ত মন সর্বত্র ও প্রতি মুহূর্তে আপনাকে প্রয়োগ করতে পারে। আমরা কেবলই বলি, "যথেষ্ট হয়েছে, তুমিও যেমন, চলে যাবে।" যত্ন জিনিসটা কেবল হৃদয়ের জিনিস নয়, শক্তির জিনিস। অনুরাগের আগুনকে জ্বালিয়ে রাখতে শক্তির প্রাচুর্য চাই। শক্তিসঞ্চয় যেখানে অল্প সেখানে আপনিই বৈরাগ্য এসে পড়ে। বৈরাগ্য নিজের উপর থেকে সমস্ত দাবি কমিয়ে দেয়। বাইরের অসুবিধা, অস্বাস্থ্য, অব্যবস্থা, সমস্তই মেনে নেয়। নিজেকে ভোলাবার জন্যে বলতে চেষ্টা করে যে, ওগুলো সহ্য করার মধ্যে যেন মহত্ত্ব আছে। যার শক্তি অজস্র সে সমস্ত দাবি মেনে নিতে আনন্দ পায়; এই জন্যেই সে জোরের সঙ্গে বেঁচে থাকে, ধ্বংসের কাছে সহজে ধরা দিতে চায় না। য়ুরোপে গেলে সব চেয়ে আমার চোখে পড়ে মানুষের এই সদাজাগ্রত যত্ন। যাকে বলি বিজ্ঞান, সায়ান্স, তার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে জ্ঞানের জন্যে অপরাজিত যত্ন। কোথাও আন্দাজ খাটবে না, খেয়ালকে মানবে না, বলবে না "ধরে নেওয়া যাক", বলবে না "সর্বজ্ঞ ঋষি এই কথা বলে গেছেন"। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, নীতির ক্ষেত্রে, যখন আত্মশক্তির

ক্লান্তি আসে তখন বৈরাগ্য দেখা দেয়; সেই বৈরাগ্যের অযত্নের ক্ষেত্রেই ঋষিবাক্য, বেদবাক্য, গুরুবাক্য, মহাত্মাদের অনুশাসন, আগাছার জঙ্গলের মতো জেগে ওঠে—নিত্যপ্রয়াসসাধ্য জ্ঞানসাধনার পথ রুদ্ধ করে ফেলে। বৈরাগ্যের অযত্নে দিনে দিনে চারি দিকে যে প্রভূত আবর্জনার অবরোধ জমে ওঠে তাতেই মানুষের পরাভব ঘটায়। বৈরাগ্যের দেশে শিল্পকলাতেও মানুষ অন্ধ পুনরাবৃত্তির প্রদক্ষিণপথে চলে, এগোয় না, কেবলই ঘোরে। মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠী পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ করে, হাজার বছর আগে যে-মন্দির তৈরি হয়েছে ঠিক তারই নকল করবার জন্যে। তার বেশি তার সাহস নেই, ক্লান্ত মনের শক্তি নেই; পাখির অসাড় ডানা খাঁচার বাইরে নিজেকে মেলে দিতে আনন্দ পায় না। খাঁচার কাছে হার মেনে যে-পাখি চিরকালের মতো ধরা দিয়েছে সমস্ত বিশ্বের কাছে তাকে হার মানতে হল।

এ দেশে এসে প্রথমে আনন্দ হয় এখানকার সব অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যে ও সৌন্দর্যে। তার পরে ক্রমে মনে সন্দেহ হতে থাকে, এ হয়তো খাঁচার সৌন্দর্য, নীড়ের সৌন্দর্য নয়—এর মধ্যে হয়তো চিত্তের স্বাধীনতা নেই। অভ্যাসের যন্ত্রে নিখুঁত নকল শত শত বৎসর ধরে ধারাবাহিক ভাবে চলেছে। আমরা যারা এখানে বাহির থেকে এসেছি আমাদের একটা দুর্লভ সুবিধা ঘটেছে এই যে, আমরা অতীত কালকে বর্তমানভাবে দেখতে পাচ্ছি। সেই অতীত মহৎ, সেই অতীতের ছিল প্রতিভা, যাকে বলে নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি; তার প্রাণশক্তির বিপুল উদ্যম আপন শিল্পসৃষ্টির মধ্যে প্রচুরভাবে আপন পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তবুও সে অতীত, তার উচিত ছিল বর্তমানের পিছনে পড়া; সামনে এসে দাঁড়িয়ে বর্তমানকে সে ঠেকিয়ে রাখল কেন। বর্তমান সেই অতীতের বাহনমাত্র হয়ে বলছে, "আমি হার মানলুম।" সে দীনভাবে বলছে, "এই অতীতকে প্রকাশ করে রাখাই আমার কাজ, নিজেকে লুপ্ত করে দিয়ে।" নিজের 'পরে বিশ্বাস করবার সাহস নেই। এই হচ্ছে নিজের শক্তি সম্বন্ধে বৈরাগ্য, নিজের 'পরে দাবি যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া। দাবি স্বীকার করায় দুঃখ আছে, বিপদ আছে, অতএব—বৈরাগ্যমেবাভয়ম্, অর্থাৎ, বৈনাশ্যমেবাভয়ম্।

সেদিন বাংলিতে আমরা যে অনুষ্ঠান দেখেছি সেটা প্রেতাত্মার স্বর্গারোহণপর্ব। মৃত্যু হয়েছে বহু পূর্বে; এতদিনে আত্মা দেবসভায় স্থান পেয়েছে বলে এই বিশেষ উৎসব। সুখবতী-নামক জেলায় উবুদ-নামক শহরে হবে দাহক্রিয়া, আগামী পাঁচই সেপ্টেম্বরে। ব্যাপারটার মধ্যে আরো অনেক বেশি সমারোহ থাকবে— কিন্তু তবু সেই মাদ্রাজি চেটির পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার মন্দির। এ বহু বহু শতাব্দীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, সেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াই চলেছে, এর আর অন্ত নেই। এখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এত অসম্ভব-

রকম ব্যয় হয় যে সুদীর্ঘকাল লাগে তার আয়োজনে— যম আপন কাজ সংক্ষেপে ও সস্তায় সারেন কিন্তু নিয়ম চলে অতি লম্বা ও দুর্মূল্য চালে। এখানে অতীত কালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলেছে বহুকাল ধরে, বর্তমানকালকে আপন সর্বস্ব দিতে হচ্ছে তার ব্যয় বহন করবার জন্যে।

এখানে এসে বারবার আমার এই কথা মনে হয়েছে যে, অতীতকাল যত বড়ো কালই হোক, নিজের সম্বন্ধে বর্তমানকালের একটা স্পর্ধা থাকা উচিত; মনে থাকা উচিত, তার মধ্যে জয় করবার শক্তি আছে। এই ভাবটাকে আমি একটি ছোটো কবিতায় লিখেছি, সেটা এইখানে তুলে দিয়ে এই দীর্ঘ পত্র শেষ করি।

নন্দগোপাল বুক ফুলিয়ে এসে
বললে আমায় হেসে,
"আমার সঙ্গে লড়াই করে কখ্‌খনো কি পার।
বারে বরেই হার।"
আমি বললেম, "তাই বই কি! মিথ্যে তোমার বড়াই,
হোক দেখি তো লড়াই।"
"আচ্ছা, তবে দেখাই তোমায়" এই বলে সে যেমনি টানলে হাত
দাদামশায় তখ্‌খনি চিৎপাত।
সবাইকে সে আনলে ডেকে, চেঁচিয়ে নন্দ করলে বাড়ি মাত॥

বারে বারে শুধায় আমায়, "বলো তোমার হার হয়েছে না কি।"
আমি কইলেম, "বলতে হবে তা কি।
ধুলোর যখন নিলেম শরণ প্রমাণ তখন রইল কি আর বাকি।
এই কথা কি জান—
আমার কাছে, নন্দগোপাল, যখনই হার মান,
আমারই সেই হার,
লজ্জা সে আমার।
ধুলোয় যেদিন পড়ব, যেন এই জানি নিশ্চিত,
তোমারই শেষ জিত।

ইতি ৩০শে আগস্ট ১৯২৭
কারেম আসন। বালি[১]

১ শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত।

১০

কল্যাণীয়াসু

মীরা, যেখানে বসে লিখছি এ একটা ডাকবাঙলা, পাহাড়ের উপরে। সকালবেলা শীতের বাতাস দিচ্ছে। আকাশে মেঘগুলো দল বেঁধে আনাগোনা করছে, সূর্যকে একবার দিচ্ছে ঢাকা, একবার দিচ্ছে খুলে। পাহাড় বললে যে-ছবি মনে জাগে এ একেবারেই সেরকম নয়। শৈলশিখরশ্রেণী কোথাও দেখা যাচ্ছে না— বারান্দা থেকে অনতিদূরেই সামনে ঢালু উপত্যকা নেমে গিয়েছে, তলায় একটি ক্ষীণ জলের ধারা এঁকে বেঁকে চলেছে; সামনে অন্য পারের পাড়ি অর্ধচন্দ্রের মতো, তার উপরে নারকেলবন আকাশের গায়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে।

উপর থেকে নীচে পর্যন্ত থাকে থাকে শস্যের খেত। পাহাড়ের বুক বেয়ে একটা ভাঙাচোরা পথ পরপারের গ্রামের থেকে জল পর্যন্ত নেমে গেছে। জলধারার কাছেই একটা উৎস। এই উৎসকে এ দেশের লোকে পবিত্র বলে জানে; সমস্ত দিন দেখি, মেয়েরা স্নান করে, জল তুলে নিয়ে যায়। এরা বলে, এই জলে স্নান করলে সর্ব পাপ মোচন হয়। বিশেষ বিশেষ পার্বণ আছে যখন বিস্তর লোক এখানে পুণ্যস্নান করতে আসে। এই জায়গাটার নাম 'তীর্ত আম্পুল'। তীর্ত অর্থাৎ তীর্থ, আম্পুল মানে উৎস— উৎসতীর্থ।

এই উৎস সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। বহুকাল পূর্বে এক রাজার এক সুন্দরী মেয়ে ছিল। সেই মেয়েটি রাজার এক পারিষদকে ভালোবেসেছিল। পারিষদের মনেও যে ভালোবাসা ছিল না তা নয়, কিন্তু রাজকন্যাকে বিয়ে করবার যোগ্য তার জাতিমর্যাদা নয় জেনে রাজার সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করে রাজকন্যার ভালোবাসা কর্তব্যবোধে প্রত্যাখ্যান করে। রাজকন্যা রাগ করে তার পানীয় দ্রব্যে বিষ মিশিয়ে দেয়। যুবক একটুখানি পান করেই ব্যাপারখানা বুঝতে পারে, কিন্তু পাছে রাজকন্যার নামে অপবাদ আসে তাই পালিয়ে এই জায়গাকার বনে এসে গোপনে মরবার জন্যে প্রস্তুত হয়। দেবতারা দয়া করে এই পুণ্য উৎসের জল খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে দেন।

হিন্দু ভাবের ও রীতির সঙ্গে এদের জীবন কিরকম জড়িয়ে গেছে ক্ষণে ক্ষণে তার পরিচয় পেয়ে বিস্ময় বোধ হয়। অথচ হিন্দুধর্ম এখানে কোথাও অমিশ্র ভাবে নেই; এখানকার লোকের প্রকৃতির সঙ্গে মিলে গিয়ে সে একটা বিশেষ রূপ ধরেছে; তার ভঙ্গীটা হিন্দু, অঙ্গটা এদের। প্রথম দিন এসেই এক জায়গায় কোন্‌-এক রাজার অন্ত্যেষ্টিসৎকার দেখতে গিয়েছিলুম। সাজসজ্জা-আয়োজনের উপকরণ আমাদের সঙ্গে মেলে না; উৎসবের ভাবটা ঠিক আমাদের শ্রাদ্ধের ভাব নয়; সমারোহের বাহ্য দৃশ্যটা ভারতবর্ষের কোনো-কিছুর অনুরূপ নয়; তবুও এর রকমটা

আমাদের মতোই; মাচার উপরে এখানকার চূড়া-বাঁধা ব্রাহ্মণেরা ঘণ্টা নেড়ে ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে হাতের আঙুলে মুদ্রার ভঙ্গী করে বিড়্‌বিড়্‌ শব্দে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে। আবৃত্তিতে ও অনুষ্ঠানে কিছুমাত্র স্খলন হলেই সমস্ত অশুদ্ধ ও ব্যর্থ হয়ে যায়। ব্রাহ্মণের গলায় পৈতে নেই। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, এরা 'গায়ত্রী' শব্দটা জানে কিন্তু মন্ত্রটা ঠিক জানে না। কেউ বা কিছু কিছু টুকরো জানে। মনে হয়, এক সময়ে এরা সর্বাঙ্গীণ হিন্দুধর্ম পেয়েছিল, তার দেবদেবী রীতিনীতি উৎসব-অনুষ্ঠান পুরাণস্মৃতি সমস্তই ছিল। তার পরে মূলের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, ভারতবর্ষ চলে গেল দূরে— হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা হল নিষিদ্ধ, হিন্দু আপন গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে কষে বাঁধলে, ঘরের বাইরে তার যে এক প্রশস্ত আঙিনা ছিল এ কথা সে ভুললে। কিন্তু, সমুদ্রপারের আত্মীয়-বাড়িতে তার অনেক বাণী, অনেক মূর্তি, অনেক চিহ্ন, অনেক উপকরণ, পড়ে আছে বলে সেই আত্মীয় তাকে সম্পূর্ণ ভুলতে পারলে না। পথে ঘাটে পদে পদে মিলনের নানা অভিজ্ঞান চোখে পড়ে। কিন্তু সেগুলির সংস্কার হতে পায় নি বলে কালের হাতে সেই-সব অভিজ্ঞান কিছু গেছে ক্ষয়ে, কিছু বেঁকেচুরে, কিছু গেছে লুপ্ত হয়ে।

সেই-সব অভিজ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন সংগতি আর পাওয়া যায় না। তার অর্থ কিছু গেছে ঝাপসা হয়ে, কিছু গেছে টুকরো হয়ে। তার ফল হয়েছে এই, যেখানে-যেখানে ফাঁক পড়েছে সেই ফাঁকটা এখানকার মানুষের মন আপন সৃষ্টি দিয়ে ভরিয়েছে। হিন্দু-ধর্মের ভাঙাচোরা কাঠামো নিয়ে এখানকার মানুষ আপনার একটা ধর্ম, একটা সমাজ, গড়ে তুলেছে। এখানকার এক সময়ের শিল্পকলায় দেখা যায় পুরোপুরি হিন্দুর প্রভাব; তার পরে দেখা যায় সে-প্রভাব ক্ষীণ ও বিচ্ছিন্ন। তবু যে-ক্ষেত্রকে হিন্দু উর্বর করে দিয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে এখানকার স্বস্থানীয় প্রতিভা প্রচুরভাবে আপনার ফসল ফলিয়েছে। এখানে একটা বহুছিদ্র পুরোনো ইতিহাসের ভূমিকা দেখি; সেই আধ-ভোলা ইতিহাসের ছেদগুলো দিয়ে এদেশের স্বকীয় চিত্ত নিজেকে প্রকাশ করছে।

বালিতে সব-প্রথমে কারেম-আসন বলে একজায়গার রাজবাড়িতে আমার থাকবার কথা। সেখানকার রাজা ছিলেন বাংলির শ্রাদ্ধ-উৎসবে। পারিষদসহ বালির ওলন্দাজ গবর্নর সেখানে মধ্যাহ্নভোজন করলেন, সেই ভোজে আমরাও ছিলেম। ভোজ শেষ করে যখন উঠলেম তখন বেলা তিনটে। সকালে সাড়ে ছটার সময় জাহাজ থেকে নেমেছি; ঘাটের থেকে মোটরে আড়াই ঘণ্টা ঝাঁকানি ও ধুলো খেয়ে যজ্ঞস্থলে আগমন। এখানে ঘোরাঘুরি দেখাশুনা সেরে বিনা স্নানেই অত্যন্ত ক্লান্ত ও ধূলিম্লান অবস্থায় নিতান্ত বিতৃষ্ণার সঙ্গে খেতে বসেছি; দীর্ঘকালপ্রসারিত সেই ভোজে আহার ও আলাপ-

আপ্যায়ন সেরে আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা রাজার সঙ্গে তাঁর মোটরগাড়িতে চড়ে আবার সুদীর্ঘপথ ভেঙে চললুম তাঁর প্রাসাদে। প্রাসাদকে এরা পুরী বলে। রাজার ভাষা আমি জানি নে, আমার ভাষা রাজা বোঝেন না— বোঝবার লোকও কেউ সঙ্গে নেই। চুপ করে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলুম।

মস্ত সুবিধে এই, এখানকার প্রকৃতি বালিনি ভাষায় কথা কয় না; সেই শ্যামার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি আর অরসিক মোটরগাড়িটাকে মনে মনে অভিশাপ দিই। মনে পড়ল, কখনো কখনো শুষ্কচিত্ত গাইয়ের মুখে গান শুনেছি; রাগিণীর যেটা বিশেষ দরদের জায়গা, যেখানে মন প্রত্যাশা করছে, গাইয়ের কণ্ঠ অত্যুচ্চ আকাশের চিলের মতো পাখাটা ছড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ স্থির থাকবে কিম্বা দুই-একটা মাত্র মীড়ের ঝাপটা দেবে, গানের সেই মর্মস্থানের উপর দিয়ে যখন সেই সংগীতের পালোয়ান তার তানগুলোকে লোটন-পায়রার মতো পালটিয়ে পালটিয়ে উড়িয়ে চলেছে, তখন কিরকম বিরক্ত হয়েছি। পথের দুই ধারে গিরি অরণ্য সমুদ্র, আর সুন্দর সব ছায়াবেষ্টিত লোকালয়, কিন্তু মোটরগাড়িটা দুন-চৌদুন মাত্রায় চাকা চালিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলেছে, কোনো-কিছুর 'পরে তার কিছুমাত্র দরদ নেই; মনটা ক্ষণে ক্ষণে বলে উঠছে, "আরে, রোসো রোসো, দেখে নিই।" কিন্তু, এই কল-দৈত্য মনটাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়; তার একমাত্র ধুয়ো, "সময় নেই, সময় নেই।" এক জায়গায় যেখানে বনের ফাঁকের ভিতর দিয়ে নীল সমুদ্র দেখা গেল রাজা আমাদের ভাষাতেই বলে উঠলেন "সমুদ্র"; আমাকে বিস্মিত ও আনন্দিত হতে দেখে আউড়ে গেলেন, "সমুদ্র, সাগর, অব্ধি, জলাঢ্য।" তার পরে বললেন, "সপ্তসমুদ্র, সপ্তপর্বত, সপ্তবন, সপ্তআকাশ।" তার পরে পর্বতের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন "অদ্রি"; তার পরে বলে গেলেন, "সুমেরু, হিমালয়, বিন্ধ্য, মলয়, ঋষ্যমূক।" এক জায়গায় পাহাড়ের তলায় ছোটো নদী বয়ে যাচ্ছিল, রাজা আউড়িয়ে গেলেন, "গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরী, সরস্বতী।" আমাদের ইতিহাসে একদিন ভারতবর্ষ আপন ভৌগোলিক সত্তাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিল; তখন সে আপনার নদীপর্বতের ধ্যানের দ্বারা আপন ভূমূর্তিকে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। তার তীর্থগুলি এমন করে বাঁধা হয়েছে— দক্ষিণে কন্যাকুমারী, উত্তরে মানসসরোবর, পশ্চিমসমুদ্রতীরে দ্বারকা, পূর্ব-সমুদ্রে গঙ্গাসংগম— যাতে করে তীর্থভ্রমণের দ্বারা ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ রূপটিকে ভক্তির সঙ্গে মনের মধ্যে গভীরভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। ভারতবর্ষকে চেনবার এমন উপায় আর কিছু হতে পারে না। তখন পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করতে হত সুতরাং তীর্থভ্রমণের দ্বারা কেবল যে ভারতবর্ষের ভূগোল জানা যেত তা নয়, তার নানাজাতীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আপনিই হত; সেদিন ভারতবর্ষের আত্মোপলব্ধি

একটা সত্যসাধনা ছিল বলেই তার আত্মপরিচয়ের পদ্ধতিও আপনিই এমন সত্য হয়ে উঠেছিল। যথার্থ শ্রদ্ধা কখনো ফাঁকি দিয়ে কাজ সারতে চায় না। অর্থাৎ রাষ্ট্রসভার রঙ্গমঞ্চের উপর ক্ষণিক মিলনের অভিনয়কেই সে মিলন বলে নিজেকে ভোলাতে চায় না। সেদিন মিলনের সাধনা ছিল অকৃত্রিম নিষ্ঠার সাধনা।

সেদিনকার ভারতবর্ষের সেই আত্মমূর্তিধ্যান সমুদ্র পার হয়ে পূর্বমহাসাগরের এই সুদূর দ্বীপপ্রান্তে এমন করে স্থান পেয়েছিল যে, আজ হাজার বছর পরেও সেই ধ্যান-মন্ত্রের আবৃত্তি এই রাজার মুখে ভক্তির সুরে বেজে উঠল, এতে আমার মনে ভারি বিস্ময় লাগল। এই-সব ভৌগোলিক নামমালা এদের মনে আছে বলে নয়, কিন্তু যে-প্রাচীন যুগে এই নামমালা এখানে উচ্চারিত হয়েছিল সেই যুগে এই উচ্চারণের কী গভীর অর্থ ছিল সেই কথা মনে ক'রে। সেদিনকার ভারতবর্ষ আপনার ঐক্যটিকে কত বড়ো আগ্রহের সঙ্গে জানছিল আর সেই জানাটিকে স্থায়ী করবার জন্যে, ব্যাপ্ত করবার জন্যে, কিরকম সহজ উপায় উদ্ভাবন করেছিল তা স্পষ্ট বোঝা গেল আজ এই দূর দ্বীপে এসে— যে-দ্বীপকে ভারতবর্ষ ভুলে গিয়েছে।

রাজা কিরকম উৎসাহের সঙ্গে হিমালয় বিন্ধ্যাচল গঙ্গা যমুনার নাম করলেন, তাতে কিরকম তাঁর গর্ব বোধ হল! অথচ, এ ভূগোল বস্তুত তাঁদের নয়; রাজা য়ুরোপীয় ভাষা জানেন না, ইনি আধুনিক স্কুলে-পড়া মানুষ নন, সুতরাং পৃথিবীতে ভারতবর্ষ জায়গাটি-যে কোথায় এবং কিরকম, সে-সম্বন্ধে সম্ভবত তাঁর অস্পষ্ট ধারণা, অন্তত বাহ্যত এ ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁদের কোনো ব্যবহারই নেই; তবুও হাজার বছর আগে এই নামগুলির সঙ্গে যে-সুর মনে বাঁধা হয়েছিল সেই সুর আজও এ দেশের মনে বাজছে। সেই সুরটি কত বড়ো খাঁটি সুর ছিল তাই আমি ভাবছি। আমি কয়েক বছর আগে ভারতবিধাতার যে-জয়গান রচনা করেছি তাতে ভারতের প্রদেশগুলির নাম গেঁথেছি— বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গার নামও আছে। কিন্তু, আজ আমার মনে হচ্ছে, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের ও সমুদ্রপর্বতের নামগুলি ছন্দে গেঁথে কেবলমাত্র একটি দেশপরিচয় গান আমাদের লোকের মনে গেঁথে দেওয়া ভালো। দেশাত্মবোধ বলে একটা শব্দ আজকাল আমরা কথায় কথায় ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু দেশাত্মজ্ঞান নেই যার তার দেশাত্মবোধ হবে কেমন করে।

তার পরে রাজা আউড়ে গেলেন সপ্তসমুদ্র, সপ্তপর্বত, সপ্তবন, সপ্তআকাশ— অর্থাৎ, তখনকার দিনে ভারতবর্ষ বিশ্বভূবৃত্তান্ত যে-রকম কল্পনা করেছিল তারই স্মৃতি। আজ নূতন জ্ঞানের প্রভাবে সেই স্মৃতি নির্বাসিত, কেবল তা পুরাণের জীর্ণ পাতায় আটকে রয়েছে, কিন্তু এখানকার কণ্ঠে এখনো তা শ্রদ্ধার সঙ্গে ধ্বনিত। তার পরে রাজা চার

বেদের নাম, যম বরুণ প্রভৃতি চার লোকপালের নাম, মহাদেবের নামাষ্টক বলে গেলেন ; ভেবে ভেবে মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের নাম বলতে লাগলেন, সবগুলি মনে এল না।

রাজপুরীতে প্রবেশ করেই দেখি, প্রাঙ্গণে একটি বেদীর উপর বিচিত্র উপকরণ সাজানো ; এখানকার চারজন ব্রাহ্মণ— একজন বুদ্ধের, একজন শিবের, একজন ব্রহ্মার, একজন বিষ্ণুর পূজারি ; মাথায় মস্ত উঁচু কারুখচিত টুপি, টুপির উপরিভাগে কাঁচের তৈরি এক-একটা চূড়া। এঁরা চারজন পাশাপাশি বসে আপন-আপন দেবতার স্তবমন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন। একজন প্রাচীনা এবং একজন বালিকা অর্ঘ্যের থালি হাতে করে দাঁড়িয়ে। সবসুদ্ধ সাজসজ্জা খুব বিচিত্র ও সমারোহবিশিষ্ট। পরে শোনা গেল, এই মাঙ্গল্যমন্ত্রপাঠ চলছিল রাজবাড়িতে আমারই আগমন উপলক্ষে। রাজা বললেন, আমার আগমনের পুণ্যে প্রজাদের মঙ্গল হবে, ভূমি সফলা হবে, এই কামনায় স্তবমন্ত্রের আবৃত্তি। রাজা বিষ্ণুবংশীয় বলে নিজের পরিচয় দিলেন।

বেলা সাড়ে চারটের সময় স্নান করে নিয়ে বারান্দায় এসে বসলুম। কারো মুখে কথা নেই। ঘণ্টা-দুয়েক এই ভাবে যখন গেল তখন রাজা স্থানীয় বাজার থেকে বোম্বাই প্রদেশের এক খোজা মুসলমান দোকানদারকে তলব দিয়ে আনালেন। কী আমার প্রয়োজন কিরকম আহারাদির ব্যবস্থা আমার জন্যে করতে হবে ইত্যাদি প্রশ্ন। আমি রাজাকে জানাতে বললুম, তিনি যদি আমাকে ত্যাগ করে বিশ্রাম করতে যান তাহলেই আমি সব চেয়ে খুশি হব।

তার পরদিনে রাজবাড়ির কয়েকজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত তালপাতার পুঁথিপত্র নিয়ে উপস্থিত। একটি পুঁথি মহাভারতের ভীষ্মপর্ব। এইখানকার অক্ষরেই লেখা ; উপরের পংক্তি সংস্কৃত ভাষায়, নীচের পংক্তিতে দেশী ভাষায় তারই অর্থব্যাখ্যা। কাগজের একটি পুঁথিতে সংস্কৃত শ্লোক লেখা। সেই শ্লোক রাজা পড়ে যেতে লাগলেন ; উচ্চারণের বিকৃতি থেকে বহু কষ্টে তাদের উদ্ধার করবার চেষ্টা করা গেল। সমস্তটা যোগতত্ত্বের উপদেশ। চিত্তবুদ্ধি, ত্রি-অক্ষরাত্মক ওঁ, চন্দ্রবিন্দু এবং অন্য সমস্ত শব্দ ও ভাবনা বর্জন করে শুদ্ধ চৈতন্যযোগে সুখমাপ্নুয়াৎ— এই হচ্ছে সাধনা। আমি রাজাকে আশ্বাস দিলেম যে, আমরা এখানে যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পাঠিয়ে দেব, তিনি এখানকার গ্রন্থগুলি থেকে বিকৃত ও বিস্মৃত পাঠ উদ্ধার করে তার অর্থব্যাখ্যা করে দিতে পারবেন।

এদিকে আমার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হতে চলল। প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারলুম, আমার শক্তিতে কুলোবে না। সৌভাগ্যক্রমে সুনীতি আমাদের সঙ্গে আছেন ; তাঁর অশ্রান্ত উদ্যম, অদম্য উৎসাহ। তিনি ধুতি প'রে, কোমরে পট্টবস্ত্র জড়িয়ে, 'পেদণ্ড'

অর্থাৎ এখানকার ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বসে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের দেশের পূজোপকরণ ছিল; পূজাপদ্ধতি তাদের দেখিয়ে দিলেন। আলাপ-আলোচনায় সকলকেই তিনি আগ্রহান্বিত করে তুলেছেন।

যখন দেখা গেল, আমার শরীর আর সইতে পারছে না, তখন আমি রাজপুরী থেকে পালিয়ে এই আম্পুল-তীর্থাশ্রমেষু নির্বাসন গ্রহণ করলুম। এখানে লোকের ভিড় নেই, অভ্যর্থনা-পরিচর্যার উপদ্রব নেই। চার দিকে সুন্দর গিরিব্রজ, শস্যশ্যামলা উপত্যকা, জনপদবধূদের স্নানসেবায় চঞ্চল উৎসজলসঞ্চয়ের অবিরত কলপ্রবাহ, শৈলতটে নির্মল নীলাকাশে নারিকেলশাখার নিত্য আন্দোলন; আমি ব'সে আছি বারান্দায়, কখনো লিখছি, কখনো সামনে চেয়ে দেখছি। এমন সময়ে হঠাৎ এসে থামল এক মোটর-গাড়ি। গিয়ানয়ারের রাজা ও এই প্রদেশের একজন ওলন্দাজ রাজপুরুষ নেমে এলেন এঁর বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ। অন্তত এক রাত্রি যাপন করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে আপনিই মহাভারতের কথা উঠল। মহাভারতের যে-কয়টা পর্ব এখনো এখানে পাওয়া যায় তাই তিনি অনেক ভেবে ভেবে আওড়িয়ে গেলেন। বাকি পর্ব কী তাই তিনি জানতে চান। এখানে কেবল আছে, আদিপর্ব, বিরাটপর্ব, উদ্যোগপর্ব ভীষ্মপর্ব, আশ্রমবাসপর্ব, মুষলপর্ব, প্রস্থানিকপর্ব, স্বর্গারোহণপর্ব।

মহাভারতের কাহিনীগুলির উপরে এ দেশের লোকের চিত্ত বাসা বেঁধে আছে। তাদের আমোদে আহ্লাদে কাব্যে গানে অভিনয়ে জীবনযাত্রায় মহাভারতের সমস্ত চরিত্রগুলি বিচিত্রভাবে বর্তমান। অর্জুন এদের আদর্শ পুরুষ। এখানে মহাভারতের গল্পগুলি কিরকম বদলে গেছে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। সংস্কৃত মহাভারতের শিখণ্ডী এখানে শ্রীকান্তি নাম ধরেছে। শ্রীকান্তি অর্জুনের স্ত্রী। তিনি যুদ্ধের রথে অর্জুনের সামনে থেকে ভীষ্মবধে সহায়তা করেছিলেন। এই শ্রীকান্তি এখানে সতী স্ত্রীর আদর্শ।

গিয়ানয়ারের রাজা আমাকে অনুরোধ করে গেলেন, আজ রাত্রে মহাভারতের হারানো পর্ব প্রভৃতি পৌরাণিক বিষয় নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান। আমি তাঁকে সুনীতির কথা বলেছি; সুনীতি তাঁকে শাস্ত্র বিষয়ে যথাজ্ঞান সংবাদ দিতে পারবেন।

ভারতের ভূগোলস্মৃতি সম্বন্ধে একটা কথা আমার মনে আন্দোলিত হচ্ছে। নদীর নামমালার মধ্যে সিন্ধু ও শতদ্রু প্রভৃতি পঞ্চনদের নাম নেই, ব্রহ্মপুত্রের নামও বাদ পড়েছে। অথচ, দক্ষিণের প্রধান নদীগুলির নাম দেখছি। এর থেকে বোঝা যায়, সেই যুগে পাঞ্জাবপ্রদেশ শক হূন যবন পারসিকদের দ্বারা বারবার বিধ্বস্ত ও অধিকৃত হয়ে ভারতবর্ষ থেকে যেন বিদ্যায় সভ্যতায় স্খলিত হয়ে পড়েছিল; অপর পক্ষে

ব্রহ্মপুত্র নদের দ্বারা অভিষিক্ত ভারতের পূর্বতম দেশ তখনো যথার্থরূপে হিন্দুভারতের অঙ্গীভূত হয় নি।

এই তো গেল এখানকার বিবরণ। আমার নিজের অবস্থাটা যে-রকম দেখছি তাতে এখানে আমার ভ্রমণ সংক্ষেপ করতে হবে।

৩১ আগস্ট ১৯২৭

কারেম আসন। বালি[১]

১১

কল্যাণীয়েষু,

রথী, বালিদ্বীপটি ছোটো, সেই জন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সুসজ্জিত সম্পূর্ণতা। গাছে-পালায় পাহাড়ে-ঝরনায় মন্দিরে-মূর্তিতে কুটীরে-ধানখেতে হাটে-বাজারে সমস্তটা মিলিয়ে যেন এক। বেখাপ কিছু চোখে ঠেকে না। ওলন্দাজ গবর্মেণ্ট বাইরে থেকে কারখানা-ওয়ালাদের এই দ্বীপে আসতে বাধা দিয়েছে; মিশনরিদেরও এখানে আনাগোনা নেই। এখানে বিদেশীদের জমি কেনা সহজ নয়, এমন-কি, চাষবাসের জন্যেও কিনতে পারে না। আরবি মুসলমান, গুজরাটের খোজা মুসলমান, চীনদেশের ব্যাপারীরা এখানে কেনা-বেচা করে— চার দিকের সঙ্গে সেটা বেমিল হয় না। গঙ্গার ধার জুড়ে দ্বাদশ দেউলগুলিকে লজ্জিত করে বাংলাদেশের বুকের উপর জুটমিল যে নিদারুণ অমিল ঘটিয়েছে এ সেরকম নয়। গ্রামের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ গ্রামের লোকেরই হাতে। এখানে খেতে জলসেকের আর চাষবাসের যে-রীতিপদ্ধতি সে খুব উৎকৃষ্ট। এরা ফসল যা ফলায় পরিমাণে তা অন্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি।

কাপড় বোনে নানা রঙচঙ ও কারুকৌশলে। অর্থাৎ, এরা কোনো মতে ময়লা ট্যানা কোমরে জড়িয়ে শরীরটাকে অনাদৃত করে রাখে না। তাই, যেখানে কোনো কারণে ভিড় জমে, বর্ণচ্ছটার সমাবেশে সেখানটা মনোরম হয়ে ওঠে। মেয়েদের উত্তর অঙ্গ অনাবৃত। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলে তারা বলে, "আমরা কি নষ্ট মেয়ে যে, বুক ঢাকব।" শোনা গেল, বালিতে বেশ্যারাই বুকে কাপড় দেয়। মোটের উপর এখানকার মেয়ে-পুরুষের দেহসৌষ্ঠব ও মুখের চেহারা ভালোই। বেঢপ মোটা বা রোগা আমি তো এ-পর্যন্ত দেখি নি। এখানকার পরিপুষ্ট শ্যামল প্রকৃতির সঙ্গে এখানকার পাটল রঙের নধরদেহ গোরু, এখানকার সুস্থ সবল পরিতৃপ্ত প্রসন্ন ভাবের মানুষগুলি, মিলে গেছে। ছবির দিক থেকে দেখতে গেলে এমন জায়গা পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

১ শ্রীমতী মীরা দেবীকে লিখিত।

নন্দলাল এখানে এলেন না ব'লে আমার মনে অত্যন্ত আক্ষেপ বোধ হয়; এমন সুযোগ তিনি আর-কোথাও কখনো পাবেন না; মনে আছে, কয়েকবৎসর আগে একজন নামজাদা আমেরিকান আর্টিস্ট আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, এমন দেশ তিনি আর-কোথাও দেখেন নি। আর্টিস্টের চোখে পড়বার মতো জিনিস এখানে চার দিকেই। অন্নসচ্ছলতা আছে ব'লেই স্বভাবত গ্রামের লোকের পক্ষে ঘরদুয়ার আচার-অনুষ্ঠান আসবাবপত্রকে শিল্পকলায় সজ্জিত করবার চেষ্টা সফল হতে পেরেছে। কোথাও হেলা-ফেলার দৃশ্য দেখা গেল না। গ্রামে গ্রামে সর্বত্র চলছে নাচ, গান, অভিনয়; অভিনয়ের বিষয় প্রায়ই মহাভারত থেকে। এর থেকে বোঝা যাবে, গ্রামের লোকের পেটের খাদ্য ও মনের খাদ্যের বরাদ্দ অপর্যাপ্ত। পথে আশে-পাশে প্রায়ই নানাপ্রকার মূর্তি ও মন্দির। দারিদ্র্যের চিহ্ন নেই, ভিক্ষুক এ-পর্যন্ত চোখে পড়ল না। এখানকার গ্রামগুলি দেখে মনে হল, এই তো যথার্থ শ্রীনিকেতন। গ্রামের সমগ্র প্রাণটি সকল দিকে পরিপূর্ণ।

এ দেশে উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ। এখানকার নারকেলবন যেমন সমুদ্র-হাওয়ায় দুলছে তেমনি এখানকার সমস্ত দেশের মেয়ে পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত। এক-একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক-একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলাদেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তনগানে সে আপন আবেগসঞ্চারের পথ পেয়েছে; এখনো সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি। এখানে এদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায় তখন সে নাচিয়ে তোলে। মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে। এখানকার যাত্রা অভিনয় দেখেছি, তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলায়-ফেরায়, যুদ্ধে-বিগ্রহে, ভালোবাসার প্রকাশে, এমন-কি ভাঁড়ামিতে, সমস্তটাই নাচ। সেই নাচের ভাষা যারা ঠিকমতো জানে তারা বোধ হয় গল্পের ধারাটা ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারে। সেদিন এখানকার এক রাজবাড়িতে আমরা নাচ দেখছিলুম। খানিক বাদে শোনা গেল, এই নাচ-অভিনয়ের বিষয়টা হচ্ছে শাল্ব-সত্যবতীর আখ্যান। এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা-বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গড়ে তোলে। মানুষের সকল ঘটনারই বাহ্যরূপ চলা-ফেরায়। কোনো একটা অসামান্য ঘটনাকে পরিদৃশ্যমান করতে চাইলে তার চলা-ফেরাকে ছন্দের সুষমাযোগে রূপের সম্পূর্ণতা দেওয়া সংগত। বাণীর দিকটাকে বাদ দিয়ে কিম্বা খাটো করে কেবলমাত্র গতিরূপটিকে ছন্দের উৎকর্ষ দেওয়া এখানকার নাচ। পৌরাণিক যে-আখ্যায়িকা কাব্যে কেবলমাত্র কানে শোনার বিষয়, এরা সেইটেকেই কেবলমাত্র চোখে দেখার বিষয় করে নিয়েছে। কাব্যের বাহন বাক্য, সেই বাক্যের ছন্দ-অংশ সংগীতের বিশ্বজনীন নিয়মে চালিত; কিন্তু তার অর্থ-অংশ কৃত্রিম, সেটা

সমাজে পরস্পরের আপসে তৈরি-করা সংকেতমাত্র। দুইয়ের যোগে কাব্য। গাছ শব্দটা শুনলে গাছ তারাই দেখে যাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটা আপসে বোঝাপড়া আছে। তেমনি এদের নাচের মধ্যে শুধু ছন্দ থাকলে তাতে আখ্যানবর্ণনা চলে না, সংকেতও আছে; এই দুইয়ের যোগে এদের নাচ। এই নাচে রসনা বন্ধ করে এরা সমস্ত দেহ দিয়ে কথা কইছে ইঙ্গিতে এবং ভঙ্গীসংগীতে। এদের নাচে যুদ্ধের যে-রূপ দেখি কোনো রণক্ষেত্রে সেরকম যুদ্ধ দূরতঃও সম্ভব নয়। কিন্তু যদি কোনো স্বর্গে এমন বিধি থাকে যে, ছন্দে যুদ্ধ করতে হবে, এমন যুদ্ধ যাতে ছন্দ-ভঙ্গ হলে সেটা পরাভবেরই সামিল হয়, তবে সেটা এইরকম যুদ্ধই হত। বাস্তবের সঙ্গে এই অনৈক্য নিয়ে যাদের মনে অশ্রদ্ধা বা কৌতুক জন্মায় শেক্‌স্‌পিয়রের নাটক পড়েও তাদের হাসা উচিত— কেননা, তাতে লড়তে লড়তেও ছন্দ, মরতে মরতেও তাই। সিনেমাতে আছে রূপের সঙ্গে গতি, সেই সুযোগটিকে যথার্থ আর্টে পরিণত করতে গেলে আখ্যানকে নাচে দাঁড়-করানো চলে। বলা বাহুল্য, বাইনাচ প্রভৃতি যে-সব পদার্থকে আমরা নাচ বলি তার আদর্শ এ নাচের নয়। জাপানে কিয়োটোতে ঐতিহাসিক নাট্যের অভিনয় দেখেছি; তাতে কথা আছে বটে; কিন্তু তার ভাবভঙ্গী চলাফেরা সমস্ত নাচের ধরনে; বড়ো আশ্চর্য তার শক্তি। নাটকে আমরা যখন ছন্দোময় বাক্য ব্যবহার করি তখন সেই সঙ্গে চলাফেরা হাবভাব যদি সহজ রকমেরই রেখে দেওয়া হয় তা হলে সেটা অসংগত হয়ে ওঠে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নামেতেই প্রকাশ পায়, আমাদের দেশে একদিন নাট্য অভিনয়ে সর্বপ্রধান অঙ্গই ছিল নাচ। নাটক দেখতে যারা আসে, পশ্চিম মহাদেশে তাদের বলে অডিয়েন্‌স্‌, অর্থাৎ শ্রোতা। কিন্তু, ভারতবর্ষে নাটককে বলেছে দৃশ্যকাব্য; অর্থাৎ তাতে কাব্যকে আশ্রয় করে চোখে দেখার রস দেবার জন্যেই অভিনয়।

এই তো গেল নাচের দ্বারা অভিনয়। কিন্তু বিশুদ্ধ নাচও আছে। পরশু রাত্রে সেটা গিয়ানয়ারের রাজবাড়িতে দেখা গেল। সুন্দর-সাজ-করা দুটি ছোটো মেয়ে— মাথায় মুকুটের উপর ফুলের দণ্ডগুলি একটু নড়াতেই দুলে ওঠে। গামেলান বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে দুজনে মিলে নাচতে লাগল। এই বাদ্যসংগীত আমাদের সঙ্গে ঠিক মেলে না। আমাদের দেশের জলতরঙ্গ বাজনা আমার কাছে সংগীতের ছেলেখেলা বলে ঠেকে। কিন্তু, সেই জিনিসটিকে গম্ভীর, প্রশস্ত, সুনিপুণ বহুযন্ত্রমিশ্রিত বিচিত্র আকারে এদের বাদ্যসংগীতে যেন পাওয়া যায়। রাগরাগিণীতে আমাদের সঙ্গে কিছুই মেলে না; যে-অংশে মেলে সে হচ্ছে এদের মৃদঙ্গের ধ্বনি, সঙ্গে করতালও আছে। ছোটো বড়ো ঘণ্টা এদের এই সংগীতের প্রধান অংশ। আমাদের দেশের নাট্যশালায় কন্সর্ট বাজনায়

যে নূতন রীতি হয়েছে এ সেরকম নয় ; অথচ, য়ুরোপীয় সংগীতে বহুযন্ত্রের যে-হার্মনি এ তাও নয়। ঘণ্টার মতো শব্দে একটা মূল স্বরসমাবেশ কানে আসছে ; তার সঙ্গে নানাপ্রকার যন্ত্রের নানারকম আওয়াজ যেন একটা কারুশিল্পে গাঁথা হয়ে উঠছে। সমস্তটাই যদিও আমাদের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র, তবু শুনতে ভারি মিষ্টি লাগে। এই সংগীত পছন্দ করতে য়ুরোপীয়দেরও বাধে না।

গামেলান বাজনার সঙ্গে ছোটো মেয়ে দুটি নাচলে ; তার শ্রী অত্যন্ত মনোহর। অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে সমস্ত শরীরে ছন্দের যে-আলোড়ন তার কী চারুতা, কী বৈচিত্র্য, কী সৌকুমার্য, কী সহজ লীলা। অন্য নাচে দেখা যায়, নটী তার দেহকে চালনা করছে ; এদের দেখে মনে হতে লাগল, দুটি দেহ যেন স্বত-উৎসারিত নাচের ফোয়ারা। বারো বছরের পরে এই মেয়েদের আর নাচতে দেওয়া হয় না ; বারো বছরের পরে শরীরের এমন সহজ সুকুমার হিল্লোল থাকা সম্ভব নয়।

সেই সন্ধ্যাবেলাতেই রাজবাড়িতে আর একটি ব্যাপার দেখলুম, মুখোসপরা নটেদের অভিনয়। আমরা জাপান থেকে যে-সব মুখোস এনেছিলুম তার থেকে বেশ বোঝা যায় মুখোসতৈরি এক প্রকারের বিশেষ কলাবিদ্যা। এতে যথেষ্ট গুণপনা চাই। আমাদের সকলেরই মুখে যেমন ব্যক্তিগত তেমনি শ্রেণীগত বিশেষত্ব আছে। বিশেষ ছাঁচ ও ভাব-প্রকাশ অনুসারে আমাদের মুখের ছাঁদ এক-একরকম শ্রেণী নির্দেশ করে। মুখোসতৈরি যে-গুণী করে সে সেই শ্রেণীপ্রকৃতিকে মুখোসে বেঁধে দেয়। সেই বিশেষ-শ্রেণীর মুখের ভাববৈচিত্র্যকে একটি বিশেষ ছাঁদে সে সংহত করে। নট সেই মুখোস প'রে এলে আমরা তখনই দেখতে পাই, একটা বিশেষ মানুষকে কেবল নয়, বিশেষ ভাবের এক শ্রেণীর মানুষকে। সাধারণত, অভিনেতা ভাব অনুসারে অঙ্গভঙ্গী করে। কিন্তু, মুখোসে মুখের ভঙ্গী স্থির করে বেঁধে দিয়েছে। এইজন্যে অভিনেতার কাজ হচ্ছে মুখোসেরই সামঞ্জস্য রেখে অঙ্গভঙ্গী করা। মূল ধুয়োটা তার বাঁধা ; এমন করে তান দিতে হবে যাতে প্রত্যেক সুরে সেই ধুয়োটার ব্যাখ্যা হয়, কিছু অসংগত না হয়। এই অভিনয়ে তাই দেখলুম।

অভিনয়ের সঙ্গে এদের কণ্ঠসংগীত যা শুনেছি তাকে সংগীত বলাই চলে না। আমাদের কানে অত্যন্ত বেসুরো এবং উৎকট ঠেকে। এখানে আমরা তো গ্রামের কাছেই আছি ; এরা কেউ একলা কিম্বা দল বেঁধে গান গাচ্ছে, এ তো শুনি নি। আমাদের পাড়াগাঁয়ে চাঁদ উঠেছে অথচ কোথাও গান ওঠে নি, এ সম্ভব হয় না। এখানে সন্ধ্যার আকাশে নারকেলগাছগুলির মাথার উপর শুক্লপক্ষের চাঁদ দেখা দিচ্ছে, গ্রামে কুঁকড়ো ডাকছে, কুকুর ডাকছে, কিন্তু কোথাও মানুষের গান নেই।

এখানকার একটা জিনিস বার বার লক্ষ্য করে দেখেছি, ভিড়ের লোকের আত্মসংযম। সেদিন গিয়ানয়ারের রাজবাড়িতে যখন অভিনয় হচ্ছিল চার দিকে অবারিত লোকের সমাগম। সুনীতিকে ডেকে বললুম, মেয়েদের কোলে শিশুদের আর্তরব শুনি নে কেন। নারীকণ্ঠই বা এমন সম্পূর্ণ নীরব থাকে কোন্ আশ্চর্য শাসনে। মনে পড়ে, কলকাতার থিয়েটারে মেয়েদের কলালাপ ও শিশুদের কান্না বন্যার মতো কমেডি ও ট্র্যাজেডি ছাপিয়ে দিয়ে কিরকম অসংযত অসভ্যতার হিল্লোল তোলে। সেদিন এখানে দুই-একটি মেয়ের কোলে শিশুও দেখেছি কিন্তু তারা কাঁদল না কেন।

একটা জিনিস এখানে দেখা গেল যা আর কোথাও দেখি নি। এখানকার মেয়েদের গায়ে গহনা নেই। কখনো কখনো কারো এক হাতে একটা চুড়ি দেখেছি, সেও সোনার নয়। কানে ছিদ্র করে শুকনো তালপাতার একটি গুটি পরেছে। বোধ হচ্ছে, যেন অজন্তার ছবিতেও এরকম কর্ণভূষণ দেখেছি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এদের আর-সকল কাজেই অলংকারের বাহুল্য ছাড়া বিরলতা নেই। যেখানে সেখানে পাথরে কাঠে কাপড়ে নানা ধাতুদ্রব্যে এরা বিচিত্র অলংকার সমস্ত দেশে ছড়িয়ে রেখেছে, কেবল এদের মেয়েদের গায়েই অলংকার নেই।

আমাদের দেশে সাধারণত দেখা যায়, অলংকৃত জিনিসের প্রধান রচনাস্থান পুরোনো শহরগুলি যেখানে মুসলমান বা হিন্দু প্রভাব সংহত ছিল, যেমন দিল্লি, আগ্রা, ঢাকা, কাশী, মাদুরা প্রভৃতি জায়গা। এখানে সেরকম বোধ হল না। এখানে শিল্পকাজ কম-বেশি সর্বত্র ও সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়ানো। তার মানে, এখানকার লোক ধনীর ফরমাশে নয়, নিজের আনন্দেই নিজের চার দিককে সজ্জিত করে। কতকটা জাপানের মতো। তার কারণ, অল্প-পরিসর দ্বীপের মধ্যে আইডিয়া এবং বিদ্যা ছড়িয়ে যেতে বিলম্ব হয় না। তা ছাড়া এদের মধ্যে জাতিগত ঐক্য। সেই সমজাতীয় মনোবৃত্তিতে শক্তির সাম্য দেখা যায়। দ্বীপ মাত্রের একটি স্বাভাবিক বিশেষত্ব এই যে, সেখানকার মানুষ সমুদ্র-বেষ্টিত হয়ে বহুকাল নিজের বিশেষ নৈপুণ্যকে অব্যাঘাতে ঘনীভূত করতে ও তাকে রক্ষা করতে পারে। আমাদের অতিবিস্তৃত ভারতবর্ষে এক কালে যা প্রচুর হয়ে উৎপন্ন হয় অন্য কালে তা ছড়িয়ে নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমাদের দেশে অজন্তা আছে অজন্তার কালকেই আঁকড়ে; কনারক আছে কনারকেরই যুগে; তারা আর একাল পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারলে না। শুধু তাই নয়, তত্ত্বজ্ঞান ভারতীয় মনের প্রধান সম্পদ, কিন্তু বহু দূরে দূরে উপনিষদের বা শঙ্করাচার্যের কালে তা ভাগে ভাগে লগ্ন হয়ে রইল। একালে আমরা শুধু তাই নিয়ে আবৃত্তি করি কিন্তু তার সৃষ্টিধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়েও এত শতাব্দী পরেও ভারতবর্ষের এত জিনিস যে এখানে এখনো

এমন করে আছে, তার কারণ, এটা দ্বীপ ; এখানে সহজে কোনো জিনিস ভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে না। অর্থ নষ্ট হতে পারে, একটার দ্বারা আর-একটা চাপা পড়তে পারে, কিন্তু বস্তুটা তবু থেকে যায়। এই কারণেই প্রাচীন ভারতের অনেক জিনিসই এখানে আমরা বিশুদ্ধভাবে পাব বলে আশা করি। হয়তো এখানকার নাচ এবং নৃত্যমূলক অভিনয়টা সেই জাতের হতেও পারে। এখানকার রাজাদের বলে 'আর্য'। আমার বিশ্বাস, তার অর্থ, রাজবংশ নিজেদের আর্যবংশীয় বলেই জানে, তারা স্থানীয় অধিবাসীদের স্বজাতীয় ছিল না। তাই, এখানকার রাজাদের ঘরে যে-সকল কলা ও অনুষ্ঠান আজও চলে আসছে সেগুলি সন্ধান করলে এমন অনেক জিনিস পাওয়া যাবে যা আমাদের দেশে লুপ্ত ও বিস্মৃত।

এই ছোটো দ্বীপে এককালে অনেক রাজা ছিল, তাদের কেউ-কেউ ওলন্দাজ-আক্রমণে আসন্নপরাভবের আশঙ্কায় দলে দলে হাজার হাজার লোক নিঃশেষে আত্মহত্যা করে মরেছে। এখনো রাজোপাধিধারী যে কয়েকজন আছে তারা পুরোনো দামি শামাদানের মতো, যাতে বাতি আর জ্বলে না। তাদের প্রাসাদ ও সাজসজ্জা আছে, তা ছাড়া তারা যেখানে আছে তাকে নগর বলা চলে। কিন্তু, এই নগরে আর গ্রামে যে-পার্থক্য সে যেন ভাইবোনের পার্থক্যের মতো— তারা এক বাড়িতেই থাকে, তাদের মাঝে প্রাচীর নেই। আধুনিক ভারতে শিল্পচর্চা প্রভৃতি নানা বিষয়ে নগরে গ্রামে ছাড়াছাড়ি। শহরগুলি যে দীপ জ্বালে তার আলো গ্রামে গিয়ে পড়েই না। দেশের সম্পত্তি যেন ভাগ হয়ে গেছে, গ্রামের অংশে যেটুকু পড়েছে তাতে আচার অনুষ্ঠান বজায় রাখা সম্ভব নয়। এই কারণে সমস্ত দেশ এক হয়ে কোনো শিল্প, কোনো বিদ্যাকে, রক্ষণ ও পোষণ করতে পারে না। তাই শহরের লোক যখন দেশের কথা ভাবে তখন শহরকেই দেশ বলে জানে ; গ্রামের লোক দেশের কথা ভাবতেই জানে না। এই বালিতে আমরা মোটরে মোটরে দূরে দূরান্তরে যতই ভ্রমণ করি— নদী, গিরি, বন, শস্যক্ষেত্র ও পল্লীতে-শহরে মিলে খুব একটা ঘনিষ্ঠতা দেখতে পাই ; এখানকার সকল মানুষের মধ্যেই যেন এদের সকল সম্পদ ছড়ানো।

গামেলান-সংগীতের কথা পূর্বেই বলেছি। ইতিমধ্যে এ সম্বন্ধে আমাকে চিন্তা করতে হয়েছে। এরা-যে আপনমনে সহজ আনন্দে গান গায় না, তার কারণ এদের কণ্ঠসংগীতের অভাব। এরা টিং টিং টুং টাং করে যে-বাজনা বাজায় বস্তুত তাতে গান নেই, আছে তাল। নানা যন্ত্রে এরা তালেরই বোল দিয়ে চলে। এই বোল দেবার কোনো কোনো যন্ত্র ঢাক-ঢোলের মতোই, তাতে স্বর অল্প, শব্দই বেশি ; কোনো কোনো যন্ত্র ধাতুতে তৈরি, সেগুলি স্বরবান। এই ধাতুযন্ত্রে টানা সুর থাকা সম্ভব নয়, থাকবার

দরকার নেই, কেননা টানা সুর গানেরই জন্যে, বিচ্ছিন্ন সুরগুলিতে তালেরই বোল দেয়। আসলে এরা গান গায় গলা দিয়ে নয়, সর্বাঙ্গ দিয়ে; এদের নাচই যেন পদে পদে টানা সুরের মিড় দেওয়া— বিলিতি নাচের মতো ঝম্পবহুল নয়। অর্থাৎ এদের নাচ বর্ষার ঝমাঝম জলবিন্দুবৃষ্টির মতো নয়, ঝরনার তরঙ্গিত ধারার মতো। তাল যে-ঐক্যকে দেখায় সে হচ্ছে কালের অংশগুলিকে যোজনা ক'রে, গান যে-ঐক্যকে দেখায় সে হচ্ছে রসের অখণ্ডতাকে সম্পূর্ণ ক'রে। তাই বলছি, এদের সংগীতই তাল, এদের নৃত্যই গান। আমাদের দেশে এবং য়ুরোপে গীতাভিনয় আছে, এদের দেশে নৃত্যাভিনয়।

ইতিমধ্যে এখানকার ওলন্দাজ রাজপুরুষ অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এদের একটা বিশেষত্ব আমার চোখে লাগল। অধীনস্থ জাতের উপর এদের প্রভুত্ব যথেষ্ট নেই, তা নয়, কিন্তু এদের ব্যক্তিগত ব্যবহারে কর্তৃত্বের ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করি নি। এখান-কার লোকদের সঙ্গে এরা সহজে মেলামেশা করতে পারে। দুই জাতির পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সর্বদাই হয় এবং সেই বিবাহের সন্তানেরা পিতৃকুল থেকে ভ্রষ্ট হয় না। এখানে অনেক উচ্চপদের ওলন্দাজ আছে যারা সংকরবর্ণ; তারা অবজ্ঞাভাজন নয়। এখানকার মানুষকে মানুষ জ্ঞান ক'রে এমন সহজ ব্যবহার কেমন করে সম্ভব হল, এই প্রশ্ন করাতে একজন ওলন্দাজ আমাকে বলেছিলেন, "যাদের অনেক সৈন্য, অনেক যুদ্ধজাহাজ, অনেক সম্পদ, অনেক সাম্রাজ্য, ভিতরে ভিতরে সর্বদাই তাদের মনে থাকে যে তারা একটা মস্ত-কিছু; এইজন্য ছোটো দরজা দিয়ে ঢুকতে তাদের অত্যন্ত বেশি সংকুচিত হতে হয়। নিজেদের সর্বদা তত প্রকাণ্ড বড়ো বলে জানবার অবসর আমাদের হয় নি। এই জন্যে সহজে সর্বত্র আমরা ঢুকতে পারি; এই জন্যে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করা আমাদের পক্ষে সহজ।" ইতি ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭[১]

১২

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, আজ বালিদ্বীপে আমাদের শেষ দিন। মুণ্ডুক বলে একটি পাহাড়ের উপর ডাকবাঙলায় আশ্রয় নিয়েছি। এতদিন বালির যে-অংশে ঘুরেছি সমস্তই চাষ-করা বাস-করা জায়গা; লোকালয়গুলি নারকেল, সুপারি, আম, তেঁতুল, সজনে

১ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত।

গাছের ঘনশ্যামল বেষ্টনে ছায়াবিষ্ট। এখানে এসে পাহাড়ের গা জুড়ে প্রাচীন অরণ্য দেখা গেল। কতকটা শিলঙ পাহাড়ের মতো। নীচে স্তরবিন্যস্ত ধানের খেত; পাহাড়ের একটা ফাঁকের ভিতর দিয়ে দূরে সমুদ্রের আভাস পাওয়া যায়। এখানে দূরের দৃশ্যগুলি প্রায়ই বাষ্পে অবগুণ্ঠিত। আকাশে অল্প একটু অস্পষ্টতার আবরণ, এখানকার পুরানো ইতিহাসের মতো। এখন শুক্লপক্ষের রাত্রি, কিন্তু এমন রাত্রে আমাদের দেশের চাঁদ দিগঙ্গনাদের কাছে যেমন সম্পূর্ণ ধরা দেয় এখানে তা নয়; যে-ভাষা খুব ভালো করে জানি নে যেন সেইরকম তার জ্যোৎস্নাটি।

এতদিন এ দেশটা একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। আহূত রবাহূত বহু লোকের ভিড়। কত ফোটোগ্রাফওয়ালা, সিনেমাওয়ালা, কত ক্ষণিক-পরিব্রাজকের দল। পান্থশালা নিঃশেষে পরিপূর্ণ। মোটরের ধুলোয় এবং ধমকে আকাশ ম্লান। খেয়া-জাহাজ কাল জাভা অভিমুখে ফিরবে, তাই প্রতিবর্তী যাত্রীর দল আজ নানা পথ বিপথ দিয়ে চঞ্চল হয়ে ধাবমান। এত সমারোহ কেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারো।

বালির লোকেরা যারা হিন্দু, যারা নিজের ধর্মকে আগম বলে, শ্রাদ্ধক্রিয়া তাদের কাছে একটা খুব বড়ো উৎসব। কেননা, যথানিয়মে মৃতের সংকার হলে তার আত্মা কুয়াশা হয়ে পৃথিবীতে এসে পুনর্জন্ম নেয়; তার পর বারে বারে সংস্কার পেতে পেতে শেষকালে শিবলোকে চরম মোক্ষে তার উদ্ধার।

এবারে আমরা যাঁদের শ্রাদ্ধে এসেছি তাঁরা দেবত্ব পেয়েছেন বলে আত্মীয়েরা স্থির করেছে, তাই এত বেশি ঘটা। এত ঘটা অনেক বৎসর হয় নি, আর কখনো হবে কি না সকলে সন্দেহ করছে। কেননা, আধুনিক কাল তার কাটারি হাতে পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে অনুষ্ঠানের বাহুল্যকে খর্ব করবার জন্যে; তার একমাত্র উৎসাহ উপকরণ-বাহুল্যের দিকে।

এখানকার লোকে বলছে, সমারোহে খরচ হবে এখানকার টাকায় প্রায় চল্লিশ হাজার, আমাদের টাকায় পঞ্চাশ হাজার। ব্যয়ের এই পরিমাণটা সকলেরই কাছে অত্যন্ত বেশি বলেই ঠেকছে। আমাদের দেশের বড়ো লোকের শ্রাদ্ধে পঞ্চাশ হাজার টাকা বেশি কিছুই নয়। কিন্তু প্রভেদ হচ্ছে, আমাদের শ্রাদ্ধের খরচ ঘটা করবার জন্যে তেমন নয় যেমন পুণ্য করবার জন্যে। তার প্রধান অঙ্গই দান, পরলোকগত আত্মার কল্যাণকামনায়। এখানকার শ্রাদ্ধেও স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে অর্ঘ্য ও আহার্য দান যে নেই তা নয়, কিন্তু এর সব চেয়ে ব্যয়সাধ্য অংশ সাজসজ্জা। সে-সমস্তই চিতায় পুড়ে ছাই হয়। এই দেহকে নষ্ট করে ফেলতে এদের আন্তরিক অনুমোদন নেই, সেটা সেদিনকার

অনুষ্ঠানের একটা ব্যাপারে বোঝা যায়। কালো গোরুর মূর্তি, তার পেটের মধ্যে মৃতদেহ, রাস্তা দিয়ে এটাকে যখন বহন করে নিয়ে যায় তখন শোভাযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে যায়। যেন ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা, যেন অনিচ্ছা। বাহকেরা তাড়া খায়, ঘুরপাক দেয়। এইখানেই আগম অর্থাৎ যে-ধর্ম বাইরে থেকে এসেছে তার সঙ্গে এদের নিজের হৃদয়বৃত্তির বিরোধ। আগমেরই হল জিত, দেহ হল ছাই।

উবুদ বলে জায়গার রাজার ঘরে এই অনুষ্ঠান। তিনি যখন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলে সুনীতির পরিচয় পেলেন সুনীতিকে জানালেন, শ্রাদ্ধক্রিয়া এমন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে এ দেশে পুনর্বার হবার সম্ভাবনা খুব বিরল ; অতএব, এই অনুষ্ঠানে সুনীতি যদি যথারীতি শ্রাদ্ধের বেদমন্ত্র পাঠ করেন তবে তিনি তৃপ্ত হবেন। সুনীতি ব্রাহ্মণসজ্জায় ধূপধুনো জ্বালিয়ে "মধুবাতা ঋতায়তে" এবং কঠোপনিষদের শ্লোক প্রভৃতি উচ্চারণ করে শুভকর্ম সম্পন্ন করেন। বহুশত বৎসর পূর্বে একদিন বেদমন্ত্রগানের সঙ্গে এই দ্বীপে শ্রাদ্ধক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল, বহুশত বৎসর পরে এখানকার শ্রাদ্ধে সেই মন্ত্র হয়তো বা শেষবার ধ্বনিত হল। মাঝখানে কত বিস্মৃতি, কত বিকৃতি। রাজা সুনীতিকে পৌরোহিত্যের সম্মানের জন্যে কী দিতে হবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সুনীতি বলেছিলেন, এই কাজের জন্যে অর্থগ্রহণ তাঁর ব্রাহ্মণবংশের রীতিবিরুদ্ধ। রাজা তাঁকে কর্ম-অন্তে বালির তৈরি মহার্ঘ বস্ত্র ও আসন দান করেছিলেন।

এখানে একটা নিয়ম আছে যে, গৃহস্থের ঘরে এমন কারো যদি মৃত্যু হয় যার জ্যেষ্ঠরা বর্তমান তা হলে সেই গুরুজনদের মৃত্যু না হলে এর আর সৎকার হবার জো নেই। এই জন্যে বড়োদের মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত মৃতদেহকে রেখে দিতে হয়। তাই অনেকগুলি দেহের দাহক্রিয়া এখানে একসঙ্গে ঘটে। মৃতকে বহুকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

সৎকারের দীর্ঘকাল অপেক্ষার আরো একটা কারণ, সৎকারের উপকরণ ও ব্যয়-বাহুল্য। তার জন্যে প্রস্তুত হতে দেরি হয়ে যায়। তাই শুনেছি, এখানে কয়েক বৎসর অন্তর বিশেষ বৎসর আসে, তখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়।

শবাধার বহন করে নিয়ে যাবার জন্যে রথের মতো যে একটা মস্ত উঁচু যান তৈরি হয়, অনেকসংখ্যক বাহকে মিলে সেটাকে চিতার কাছে নিয়ে যায়। এই বাহনকে বলে ওয়াদা। আমাদের দেশে ময়ূরপংখি যেমন ময়ূরের মূর্তি দিয়ে সজ্জিত, তেমনি এদের এই ওয়াদার গায়ে প্রকাণ্ড বড়ো একটি গরুড়ের মুখ ; তার দুই-ধারে বিস্তীর্ণ মস্ত দুই পাখা, সুন্দর করে তৈরি। শিল্পনৈপুণ্যে বিস্মিত হতে হয়। শ্রাদ্ধের এই নানাবিধ উপকরণের আয়োজন মনের ভিতরে সবটা গ্রহণ করা বড়ো কঠিন ; যেটা সব চেয়ে

দৃষ্টি ও মনকে আকর্ষণ করে সে হচ্ছে জনতার অবিশ্রাম ধারা। বহু দূর ও নানা দিক থেকে মেয়েরা মাথায় কতরকমের অর্ঘ্য বহন করে সার বেঁধে রাস্তা দিয়ে চলেছে। দূরে দূরে, গ্রামে গ্রামে, যেখানে অর্ঘ্য-মাথায় বাহকেরা যাত্রা করতে প্রস্তুত, সেখানে গ্রামের তরুচ্ছায়ায় গামেলান বাজিয়ে এক-একটি স্বতন্ত্র উৎসব চলছে। সর্বসাধারণে মিলে দলে দলে এই অনুষ্ঠানের জন্তে আপন আপন উপহার নিয়ে এসে যজ্ঞক্ষেত্রে জমা করে দিচ্ছে। অর্ঘ্যগুলি যেমন-তেমন করে আনা নয়, সমস্ত বহু যত্নে সুসজ্জিত। সেদিন দেখলুম, ইয়াং-ইয়াং বলে এক শহরের রাজা বহু বাহনের মাথায় তাঁর উপহার পাঠালেন। সকলের পিছনে এলেন তাঁর প্রাসাদের পুরনারীরা। কী শোভা, কী সজ্জা, কী আভিজাত্যের বিনয়সৌন্দর্য! এমনি করে নানা পথ বেয়ে বেয়ে বহুবর্ণ-বিচিত্র তরঙ্গিত উৎসবের অবিরাম প্রবাহ। দেখে দেখে চোখের তৃপ্তির শেষ হয় না।

সব চেয়ে এই কথাটি মনে হয়, এইরকম বহুদূরব্যাপী উৎসবের টানে বহু মানুষের আনন্দমিলনটি কী কল্যাণময়। এই মিলন কেবলমাত্র একটা মেলা বসিয়ে বহু লোক জড়ো হওয়া নয়। এই মিলনটির বিচিত্র সুন্দর অবয়ব। নানা গ্রামে, নানা ঘরে, এই উৎসবমূর্তিকে অনেক দিন থেকে নানা মানুষে বসে বসে নিজের হাতে সুসম্পূর্ণ করে তুলেছে। এ হচ্ছে বহুজনের তেমনি সম্মিলিত সৃষ্টি যেমন ক'রে এরা নানা লোক ব'সে, নানা যন্ত্রে তাল মিলিয়ে, সুর মিলিয়ে, একটা সচল ধ্বনিমূর্তি তৈরি করে তুলতে থাকে। কোথাও অনাদর নেই, কুশ্রীতা নেই। এত নিবিড় লোকের ভিড়, কোথাও একটুও কলহের আভাস মাত্র দেখা গেল না। জনতার মধ্যে মেয়েদের সমাবেশ খুবই বেশি, তাতে একটুও আপদের সৃষ্টি হয় নি। বহুলোকের মিলন যেখানে গ্লানিহীন সৌন্দর্যে বিকশিত, যথার্থ সভ্যতার লক্ষ্মীকে সেইখানেই তো আসীন দেখি; যেখানে বিরোধ ঠেকাবার জন্তে পুলিসবিভাগের লাল পাগড়ি সেখানে নয়; যেখানে অন্তরের আনন্দে মানুষের মিলন কেবল-যে নিরাময় নিরাপদ তা নয়, আপনা-আপনি ভিতরের থেকে সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, সেইখানেই সভ্যতার উৎকর্ষ। এই জিনিসটিকে এমনই সুসম্পূর্ণভাবে ইচ্ছা করি নিজের দেশে। কিন্তু, এই ছোটো দ্বীপের রাস্তার ধারে যে-ব্যাপারটিকে দেখা গেল সে কি সহজ কথা। কত কালের সাধনায়, ভিতরের কত গ্রন্থি মোচন ক'রে তবে এইটুকু জিনিস সহজ হয়। জড়ো হওয়া শক্ত নয়, এক হওয়াই শক্ত। সেই ঐক্যকে সকলের সৃষ্টিশক্তি দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, সুন্দর করে তোলা কতই শক্তিসাধ্য। আমাদের মিলিত কাজকে সকলে এক হয়ে উৎসবের রূপ দেওয়া আবশ্যক। আনন্দকে সুন্দরকে নানা মূর্তিতে নানা উপলক্ষে প্রকাশ করা চাই। সেই প্রকাশে সকলেই আপন-আপন ইচ্ছার, আপন-আপন শক্তির, যোগদান করতে থাকলে তবেই আমাদের ভিতরকার খোঁচাগুলো

ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হয়ে যায়, ঝরনার জল ক্রমাগত বইতে থাকলে তলার নুড়িগুলি যেমন সুডোল হয়ে আসে। আমাদের অনেক তপস্বী মনে করেন, সাধনায় জ্ঞান ও কর্মই যথেষ্ট। কিন্তু, বিধাতার রচনায় তিনি দেখিয়েছেন শুধু স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া নয়, রসেই সৃষ্টির চরম সম্পূর্ণতা। মরুর মধ্যে যা-কিছু শক্তি সমস্তই বিরোধের শক্তি, বিনাশের শক্তি। রস যখন সেখানে আসে তখনই প্রাণ আসে; তখন সব শক্তি সেই রসের টানে ফুল ফোটায়, ফল ধরায়; সৌন্দর্যে কল্যাণে সে উৎসবের রূপ ধারণ করে।

বেলা আটটা বাজল। বারান্দার সামনে গোটা-দুইতিন মোটরগাড়ি জমা হয়েছে। সুরেনে সুনীতিতে মিলে নানা আয়তনের বাক্সে ব্যাগে ঝুলিতে থলিতে গাড়ি বোঝাই করছেন। তাঁরা একদল আগে থাকতেই খেয়াঘাটের দিকে রওনা হবার অভিমুখী। নিকটের পাহাড়ের ঘনসবুজ অরণ্যের 'পরে রৌদ্র পড়েছে; দূরের পাহাড় নীলাভ বাষ্পে আবৃত। দক্ষিণ শৈলতটের সমুদ্রখণ্ডটি নিশ্বাসের-ভাপ-লাগা আয়নার মতো ম্লান। ওই কাছেই গিরিবক্ষসংলগ্ন পল্লীটির বনবেষ্টনের মধ্যে সুপুরি গাছের শাখাগুলি শীতের বাতাসে দুলছে। ঝরনা থেকে মেয়েরা জলপাত্রে জল বয়ে আনছে। নীচে উপত্যকায় শস্যক্ষেত্রের ওপারে, সামনের পাহাড়ের গায়ে ঘন গাছের অবকাশে লোকালয়ের আভাস দেখা যায়। নারকেলগাছগুলি মেঘমুক্ত আকাশের দিকে পাতার অঞ্জলি তুলে ধরে সূর্যালোক পান করছে।

এখান থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে মনে মনে ভাবছি, দ্বীপটি সুন্দর, এখানকার লোকগুলিও ভালো, তবুও মন এখানে বাসা বাঁধতে চায় না। সাগর পার হয়ে ভারতবর্ষের আহ্বান মনে এসে পৌঁচচ্ছে। শিশুকাল থেকে ভারতবর্ষের ভিতর দিয়েই বিশ্বের পরিচয় পেয়েছি বলেই যে এমন হয় তা নয়; ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে আলোতে, নদীতে প্রান্তরে, প্রকৃতির একটি উদারতা দেখেছি; চিরদিনের মতো আমার মন তাতে ভুলেছে। সেখানে বেদনা অনেক পাই, লোকালয়ে দুর্গতির মূর্তি চারি দিকে; তবুও সমস্তকে অতিক্রম করে সেখানকার আকাশে অনাদি কালের যে-কণ্ঠধ্বনি শুনতে পাই তাতে একটি বৃহৎ মুক্তির আস্বাদ আছে। ভারতবর্ষের নীচের দিকে ক্ষুদ্রতার বন্ধন, তুচ্ছতার কোলাহল, হীনতার বিড়ম্বনা, যত বেশি এমন আর কোথাও দেখি নি; তেমনি উপরের দিকে সেখানে বিরাটের আসনবেদীর, অপরিসীমের অবারিত আমন্ত্রণ। অতি দূরকালের তপোবনের ওঙ্কারধ্বনি এখনো সেখানকার আকাশে যেন নিত্য-নিশ্বসিত। তাই, আমার মনের কাছে আজকের এই প্রশান্ত প্রভাত সেই দিকেই তার আলোকের ইঙ্গিত প্রসারিত করে রয়েছে। ইতি

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭

পুনশ্চ : দ্রুত চলতে চলতে উপরে উপরে যে-ছবি চোখে জাগল, যে-ভাব মনের উপর দিয়ে ভেসে গেল, তাই লিখে দিয়েছি, কিন্তু তাই বলে এটাকে বালির প্রকৃত বিবরণ বলে গণ্য করা চলবে না। এই ছবিটিকে হয়তো উপরকার আবরণের জরি বলাও চলে। কিন্তু উপরের আবরণে ভিতরের ভাবের ছাপ নিত্যই পড়ে তো। অতএব, আবরণটিকে মানুষের পরিচয় নয় বলে উপেক্ষা করা যায় না। যে-আবরণ কৃত্রিম ছদ্মবেশের মতো সত্যকে উপর থেকে চাপা দেয় সেইটেতেই প্রতারণা করে, কিন্তু যে-আবরণ চঞ্চল জীবনের প্রতি মুহূর্তের ওঠায়-পড়ায়, বাঁকায়-চোরায়, দোলায়-কাঁপনে, আপনা-আপনি একটা চেহারা পায় মোটের উপর তাকে বিশ্বাস করা চলে। এখানকার ঘরে মন্দিরে, বেশে ভূষায়, উৎসবে অনুষ্ঠানে, সব-প্রথমেই যেটা খুব করে মনে আসে সেটা হচ্ছে সমস্ত জাতটার মনে শিল্পরচনায় স্বাভাবিক উদ্যম। একজন পাশ্চাত্য আর্টিস্ট এখানে তিন বৎসর আছেন ; তিনি বলেন, এদের শিল্পকলা থেমে নেই, সে আপন বেগে আপন পথ করে নিয়ে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু শিল্পী স্বয়ং সে-সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত। তিনি বলেন, কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত এখানে চীনেদের প্রভাব ছিল, দেখতে দেখতে সেটা আপনি ক্ষয়ে আসছে, বালির চিত্ত আপন ভাষাতেই আত্মপ্রকাশ করতে বসেছে। তার কাজে এমন অনায়াস প্রতিভা আছে যে, আধুনিক যে দুই-একটি মূর্তি তিনি দেখেছেন সেগুলি য়ুরোপের শিল্পপ্রদর্শনীতে পাঠালে সেখানকার লোক চমকে উঠবে এই তাঁর বিশ্বাস। এই তো গেল রূপ-উদ্ভাবন করবার এদের স্বাভাবিক শক্তি। তার পরে, এই শক্তিটিই এদের সমাজকে মূর্তি দিচ্ছে। এরা উৎসবে অনুষ্ঠানে নানা প্রণালীতে সেই রূপ সৃষ্টি করবার ইচ্ছাকেই সুন্দর করে প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত। যেখানে এই সৃষ্টির উদ্যম নিয়ত সচেষ্ট সেখানে সমস্ত দেশের মুখে একটি শ্রী ও আনন্দ ব্যক্ত হয়। অথচ, জীবনযাত্রার সকল অংশই যে শোভন তা বলা যায় না। এর মধ্যে অনেক জিনিস আছে যা আনন্দকে মারে, অন্ধ সংস্কারের কত কদাচার, কত নিষ্ঠুরতা। যে-মেয়ে বন্ধ্যা প্রেতলোকে গলায় দড়ি বেঁধে তাকে অফলা গাছের ডালে চিরদিনের মতো ঝুলিয়ে রাখা হয়, এখানকার লোকের এই বিশ্বাস। কোনো মেয়ে যদি যমজ সন্তান প্রসব করে,এক পুত্র, এক কন্যা, তা হলে প্রসবের পরেই বিছানা নিজে বহন করে সে শ্মশানে যায় ; পরিবারের লোক যমজ সন্তান তার পিছন-পিছন বহন করে নিয়ে চলে। সেখানে ডালপালা দিয়ে কোনোরকম করে একটা কুঁড়ে বেঁধে তিন চান্দ্রমাস তাকে কাটাতে হয়। দুই মাস ধরে গ্রামের মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়, পাপক্ষালনের উদ্দেশে নানাবিধ পূজার্চনা চলে। প্রসূতিকে মাঝে মাঝে কেবল খাবার পাঠানো হয়, সেই কয়দিন তার সঙ্গে সকলরকম ব্যবহার বন্ধ। এই

সুন্দর দ্বীপের চিরবসন্ত ও নিত্য উৎসবের ভিতরে ভিতরে অন্ধ বুদ্ধির মায়া সহস্র বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে, যেমন সে ভারতবর্ষেও ঘরে ঘরে করে থাকে। এর ভয় ও নিষ্ঠুরতা থেকে যে মোহমুক্ত জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে বাঁচায় যেখানে তার চর্চা নেই, তার প্রতি বিশ্বাস নেই, সেখানে মানুষের আত্মাবমাননা আত্মপীড়ন থেকে তাকে কে বাঁচাবে। তবুও এইগুলোকেই প্রধান করে দেখবার নয়। জ্যোতির্বিদের কাছে সূর্যের কলঙ্ক ঢাকা পড়ে না, তবু সাধারণ লোকের কাছে তার আলোটাই যথেষ্ট। সূর্যকে কলঙ্কী বললে মিথ্যা বলা হয় না, তবুও সূর্যকে জ্যোতির্ময় বললেই সত্য বলা হয়। তথ্যের ফর্দ লম্বা করা যে-সব বৈজ্ঞানিকের কাজ তাঁরা পশুসংসারে হিংস্র দাঁতনখের ভীষণতার উপর কলমের ঝোঁক দেবামাত্র কল্পনায় মনে হয়, পশুদের জীবনযাত্রা কেবল ভয়েরই বাহন। কিন্তু, এই-সব অত্যাচারের চেয়ে বড়ো হচ্ছে সেই প্রাণ যা আপনার সদাসক্রিয় উদ্যমে আপনাতেই আনন্দিত, এমন-কি, শ্বাপদের হাত থেকে আত্মরক্ষার কৌশল ও চেষ্টা সেও এই আনন্দিত প্রাণক্রিয়ারই অংশ। ইন্টার্-ওসেন্ নামক যে-মাসিকপত্রে একজন লেখকের বর্ণনা থেকে বালির মেয়েদের দুঃখের বৃত্তান্ত পাওয়া গেল, সেই কাগজেই আর-একজন লেখক সেখানকার শিল্পকুশল উৎসববিলাসী সৌন্দর্যপ্রিয়তাকে আনন্দের সঙ্গে দেখেছেন। তাঁর সেই দেখার আলোতে বোঝা যায়, গ্লানির কলঙ্কটা অসত্য না হলেও সত্যও নয়। এই দ্বীপে আমরা অনেক ঘুরেছি; গ্রামে পথে বাজারে শস্যক্ষেত্রে মন্দিরদ্বারে উৎসবভূমিতে ঝরনাতলায় বালির মেয়েদের অনেক দেখেছি; সব জায়গাতেই তাদের দেখলুম সুস্থ, সুপরিপুষ্ট, সুবিনীত, সুপ্রসন্ন— তাদের মধ্যে পীড়া অপমান অত্যাচারের কোনো চেহারা তো দেখলুম না। খুঁটিয়ে খবর নিলে নিশ্চয় কলঙ্কের কথা অনেক পাওয়া যাবে; কিন্তু খুঁটিয়ে-পাওয়া ময়লা কথাগুলো সুতো দিয়ে এক সঙ্গে গাঁথলেই সত্যকে স্পষ্ট করা হবে, এ কথা বিশ্বাস করবার নয়। ইতি

৯ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭

সুরবায়া। জাভা[১]

১৩

সুরকর্তা। জাভা

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, বালি থেকে পার হয়ে জাভা দ্বীপে সুরবায়া শহরে এসে নামা গেল। এই জায়গাটা হচ্ছে বিদেশী সওদাগরদের প্রধান আখড়া। জাভার সব চেয়ে বড়ো উৎপন্ন

১ শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত

জিনিস চিনি, এই ছোটো দ্বীপটি থেকে দেশবিদেশে চালান যাচ্ছে। এমন এক কাল ছিল, পৃথিবীতে চিনি বিতরণের ভার ছিল ভারতবর্ষের। আজ এই জাভার হাট থেকে চিনি কিনে বৌবাজারের ভীমচন্দ্র নাগের সন্দেশ তৈরি হয়। ধরণী স্বভাবত কী দান করেন আজকাল তারই উপরে ভরসা রাখতে গেলে ঠকতে হয়, মানুষ কী আদায় ক'রে নিতে পারে এইটেই হল আসল কথা। গোরু আপনা-আপনি যে-দুধটুকু দেয় তাতে যজ্ঞের আয়োজন চলে না, গৃহস্থের শিশুদের পেট ভরিয়ে বৌবাজারের দোকানে গিয়ে পৌঁছবার পূর্বেই কেঁড়ে শূন্য হয়ে যায়। যারা ওস্তাদ গোয়ালা তারা জানে কিরকম খোরাকি ও প্রজননবিধির দ্বারা গোরুর দুধ বাড়ানো চলে। এই শ্যামল দ্বীপটি ওলন্দাজদের পক্ষে ধরণী-কামধেনুর দুধভরা বাঁটের মতো। তারা জানে, কোন্ প্রণালীতে এই বাঁট কোনোদিন একফোঁটা শুকিয়ে না যায়, নিয়ত দুধে ভরে থাকে; সম্পূর্ণ দুইয়ে-নেবার কৌশলটাও তাদের আয়ত্ত। আমাদের কর্তৃপক্ষও তাঁদের গোয়ালবাড়ি ভারতবর্ষে বসিয়েছেন, চা আর পাট নিয়ে এতকাল তাঁদের হাট গুলজার হল; কিন্তু, এদিকে আমাদের চাষের খেত নির্জীব হয়ে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে জিব বেরিয়ে পড়ল চাষিদের। এতকাল পরে আজ হঠাৎ তাঁদের নজর পড়েছে আমাদের ফসলহীন দুর্ভাগ্যের প্রতি। কমিশন বসেছে, তার রিপোর্টও বেরোবে। দরিদ্রের চাকাভাঙা মনোরথ রিপোর্টের টানে নড়ে উঠবে কি না জানি নে, কিন্তু রাস্তা বানাবার কাজে যে-সব রাজমজুর লাগবে মজুরি মিলতে তাদের অসুবিধে হবে না। মোট কথা, ওলন্দাজরা এখানে কৃষিক্ষেত্রে খুব ওস্তাদি দেখিয়েছে; তাতে এখানকার লোকের অন্নের সংস্থান হয়েছে, কর্তৃপক্ষেরও ব্যাবসা চলছে ভালো। এর মধ্যে তত্ত্বটা হচ্ছে এই যে, দেশের প্রতি প্রেম জানাবার জন্যে দেশের জিনিস ব্যবহার করব, এটা ভালো কথা; কিন্তু দেশের প্রতি প্রেম জানাবার জন্যে দেশের জিনিস-উৎপাদনের শক্তি বাড়াতে হবে, এটা হল পাকা কথা। এইখানে বিদ্যার দরকার; সেই বিদ্যা বিদেশ থেকে এলেও তাকে গ্রহণ করলে আমাদের জাত যাবে না, পরন্তু জান্ রক্ষা হবে।

সুরবায়াতে তিন দিন আমরা যাঁর বাড়িতে অতিথি ছিলেম তিনি সুরকর্তার রাজবংশের একজন প্রধান ব্যক্তি, কিন্তু তিনি আপন অধিকার ইচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগ করে এই শহরে এসে বাণিজ্য করছেন। চিনি রপ্তানির কারবার, তাতে তাঁর প্রভূত মুনফা। চমৎকার মানুষটি, প্রাচীন অভিজাতকুলযোগ্য মর্যাদা ও সৌজন্যের অবতার। তাঁর ছেলে আধুনিক কালের শিক্ষা পেয়েছেন; বিনীত, নম্র, প্রিয়দর্শন— তাঁরই উপরে আমাদের অতিথিপরিচর্যার ভার। বড়ো ভয় ছিল, পাছে অবিশ্রাম অভ্যর্থনার পীড়নে আরাম-অবকাশ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু, সেই অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছিলেম।

তাঁদের প্রাসাদের এক অংশ সম্পূর্ণ আমাদের ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিরালায় ছিলেম, ত্রুটিবিহীন আতিথ্যের পনেরো-আনা অংশ ছিল নেপথ্যে। কেবল আহারের সময়েই আমাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ। মনে হত, আমিই গৃহকর্তা, তাঁরা উপলক্ষ মাত্র। সমাদরের অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস ছিল স্বাধীনতা ও অবকাশ।

এখানে একটি কলাসভা আছে। সেটা মুখ্যত য়ুরোপীয়। এখানকার সওদাগরদের ক্লাবের মতো। কলকাতায় যেমন সংগীতসভা এও তেমনি। কলকাতার সভায় সংগীতের অধিকার যতখানি এখানে কলাবিদ্যার অধিকার তার চেয়ে বেশি নয়। এই-খানে আর্ট সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে আমার প্রতি অনুরোধ ছিল; যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলেছি। একদিন আমাদের গৃহকর্তার বাড়িতে অনেকগুলি এদেশীয় প্রধান ব্যক্তির সমাগম হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছিল আমার কাজ। সুনীতিও একদিন তাঁদের সভায় বক্তৃতা করে এসেছেন; সকলের ভালো লেগেছে।

এখানকার ভারতীয়েরাও একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাকে অভ্যর্থনা উপলক্ষে এখানকার রাজপুরুষ ও অন্য অনেককে নিমন্ত্রণ ক'রে চা খাইয়েছিলেন। সেদিন আমি কিছু দক্ষিণাও পেয়েছি। এইভাবে এখানে কেটে গেল, একেবারে এঁদের বাড়ির ভিতরেই। আঙিনায় অনেকগুলি গাছ ও লতাবিতান। আমগাছ, সপেটা, আতা। যে-জাতের আম তাকে এরা বলে মধু, এদের মতে বিশেষভাবে স্বাদু। এবার যথেষ্ট বৃষ্টি হয় নি বলে আমগুলো কাঁচা অবস্থাতেই ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে। এখানে ভোজন-কালে যে-আম খেতে পেয়েছি দেশে থাকলে সে-আম কেনার পয়সাকে অপব্যয় আর কেটে খাওয়ার পরিশ্রমটাকে বৃথা ক্লান্তিকর বলে স্থির করতুম, কিন্তু এখানে তার আদরের ত্রুটি হয় নি।

এই আঙিনায় লতামণ্ডপের ছায়ায় আমাদের গৃহকর্ত্রী প্রায়ই বেলা কাটান। চার দিকে শিশুরা গোলমাল করছে, খেলা করছে— সঙ্গে তাদের বুড়ি ধাত্রীরা। মেয়েরা যেখানে-সেখানে বসে কাপড়ের উপর এদেশে-প্রচলিত সুন্দর বাতির ছাপ-দেওয়া কাজে নিযুক্ত। গৃহকর্মের নানা প্রবাহ এই ছায়াস্নিগ্ধ নিভৃত প্রাঙ্গণের চার দিকে আবর্তিত।

পরশু সুরবায়া থেকে দীর্ঘ রেলপথ ও রৌদ্রতাপক্লিষ্ট অপরাহ্ণের ছ'টি ঘণ্টা কাটিয়ে তিনটের সময় সুরকর্তায় পৌঁচেছি। জাভার সব চেয়ে বড়ো রাজপরিবারের এইখানেই অবস্থান। ওলন্দাজেরা এঁদের রাজপ্রতাপ কেড়ে নিয়েছে কিন্তু প্রতিপত্তি কাড়তে পারে নি। এই বংশেরই একটি পরিবারের বাড়িতে আছি। তাঁদের উপাধি মঙ্কুনগরো; এঁদেরই এক শাখা সুরবায়ায় আশ্রয় নিয়েছে।

প্রাসাদের একটি নিভৃত অংশ আমরাই অধিকার করে আছি। এখানে স্থান প্রচুর, আরামের উপকরণ যথেষ্ট, আতিথ্যের উপদ্রব নেই। রাজবাড়ি বহুবিস্তীর্ণ, বহুবিভক্ত। আমরা যেখানে আছি তার প্রকাণ্ড একটি অলিন্দ, সাদা মার্বল পাথরে বাঁধানো, সারি সারি কাঠের থামের উপরে ঢালু কাঠের ছাদ। এই রাজপরিবারের বর্ণলাঞ্ছন হচ্ছে সবুজ ও হলদে, তাই এই অলিন্দের থাম ও ছাদ সবুজে সোনালিতে চিত্রিত। অলিন্দের এক ধারে গামেলান-সংগীতের যন্ত্র সাজানো। বৈচিত্র্যেও কম নয়, সংখ্যাতেও অনেক। সাত স্বরের ও পাঁচ স্বরের ধাতুফলকের যন্ত্র অনেক রকমের, অনেক আয়তনের, হাতুড়ি দিয়ে বাজাতে হয়। ঢোলের আকার ঠিক আমাদের দেশেরই মতো, বাজাবার বোল ও কায়দা অনেকটা সেই ধরনের। এ ছাড়া বাঁশি, আর ধনু দিয়ে বাজাবার তাঁতের যন্ত্র।

রাজা স্টেশনে গিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করে এনেছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় একত্র আহারের সময় তাঁর সঙ্গে ভালো করে আলাপ হল। অল্প বয়স, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল মুখশ্রী। ডাচ্ ভাষায় আধুনিক কালের শিক্ষা পেয়েছেন ; ইংরেজি অল্প অল্প বলতে ও বুঝতে পারেন। খেতে বসবার আগে বারান্দার প্রান্তে বাজনা বেজে উঠল, সেইসঙ্গে এখানকার গানও শোনা গেল। সে-গানে আমাদের মতো আস্থায়ী-অন্তরার বিভাগ নেই। একই ধুয়ো বারবার আবৃত্তি করা হয়, বৈচিত্র্য যা-কিছু তা যন্ত্র বাজনায়। পূর্বের চিঠিতেই বলেছি, এদের যন্ত্রবাজনাটা তাল দেবার উদ্দেশে। আমাদের দেশে বাঁয়া তবলা প্রভৃতি তালের যন্ত্র যে-সপ্তকে গান ধরা হয় তারই সা স্বরে বাঁধা ; এখানকার তালের যন্ত্রে গানের সব স্বরগুলিই আছে। মনে করো, "তুমি যেয়ো না এখনি, এখনো আছে রজনী" ভৈরবীর এই এক ছত্র মাত্র কেউ যদি ফিরে ফিরে গাইতে থাকে আর নানাবিধ যন্ত্রে ভৈরবীর সুরেই যদি তালের বোল দেওয়া হয়, আর সেই বোল-যোগেই যদি ভৈরবী রাগিণীর ব্যাখ্যা চলে তা হলে যেমন হয় এও সেইরকম। পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যাবে, শুনতে ভালোই লাগে, নানা আওয়াজের ধাতুবাদ্যে সুরের নৃত্যে আসর খুব জমে ওঠে।

খেয়ে এসে আবার আমরা বারান্দায় বসলুম। নাচের তালে দুটি অল্প বয়সের মেয়ে এসে মেজের উপর পাশাপাশি বসল। বড়ো সুন্দর ছবি। সাজে সজ্জায় চমৎকার সুছন্দ। সোনায়-খচিত মুকুট মাথায়, গলায় সোনার হারে অর্ধচন্দ্রাকার হাঁসুলি, মণিবন্ধে সোনার সর্পকুণ্ডলী বালা, বাহুতে একরকম সোনার বাজুবন্দ— তাকে এরা বলে কীলকবাহু। কাঁধ ও দুই বাহু অনাবৃত, বুক থেকে কোমর পর্যন্ত সোনায়-সবুজে-মেলানো আঁট কাঁচলি ; কোমরবন্দ থেকে দুই ধারায় বস্ত্রাঞ্চল কোঁচার মতো সামনে দুলছে। কোমর থেকে পা পর্যন্ত শাড়ির মতোই বস্ত্রবেষ্টনী, সুন্দর বর্তিকশিল্পে

বিচিত্র ; দেখবামাত্রই মনে হয়, অজন্তার ছবিটি। এমনতরো বাহুল্যবর্জিত সুপরিচ্ছন্নতার সামঞ্জস্য আমি কখনো দেখি নি। আমাদের নর্তকী বাইজিদের আঁটপায়জামার উপর অত্যন্ত জবড়জঙ্গ কাপড়ের অসৌষ্ঠবতা চিরদিন আমাকে ভারি কুশ্রী লেগেছে! তাদের প্রচুর গয়না ঘাগরা ওড়না ও অত্যন্ত ভারী দেহ মিলিয়ে প্রথমেই মনে হয়, সাজানো একটা মস্ত বোঝা। তার পরে মাঝে মাঝে বাটা থেকে পান খাওয়া, অনুবর্তীদের সঙ্গে কথা কওয়া, ভুরু ও চোখের নানাপ্রকার ভঙ্গিমা ধিক্কারজনক বলে বোধ হয়— নীতির দিক থেকে নয়, রীতির দিক থেকে। জাপানে ও জাভাতে যে-নাচ দেখলুম তার সৌন্দর্য যেমন তার শালীনতাও তেমনি নিখুঁত। আমরা দেখলুম, এই দুটি বালিকার তনু দেহকে সম্পূর্ণ অধিকার করে অশরীরী নাচেরই আবির্ভাব। বাক্যকে অধিকার করেছে কাব্য, বচনকে পেয়ে বসেছে বচনাতীত।

শুনেছি, অনেক য়ুরোপীয় দর্শক এই নাচের অতিমৃদুতা ও সৌকুমার্য ভালোই বাসে না। তারা উগ্র মাদকতায় অভ্যস্ত বলে এই নাচকে একঘেয়ে মনে করে। আমি তো এ নাচে বৈচিত্র্যের একটু অভাব দেখলুম না ; সেটা অতি প্রকট নয় বলেই যদি চোখে না পড়ে তবে চোখেরই অভ্যাসদোষ। কেবলই আমার এই মনে হচ্ছিল যে, এ হচ্ছে কলাসৌন্দর্যের একটি পরিপূর্ণ সৃষ্টি, উপাদানরূপে মানুষটি তার মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেছে। নাচ হয়ে গেলে এরা যখন বাজিয়েদের মধ্যে এসে বসল তখন তারা নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তখন দেখতে পাওয়া যায়, তারা গায়ে রঙ করেছে, কপালে চিত্র করেছে, শরীরের অতিস্ফূর্তিকে নিরস্ত করে দিয়ে একটি নিবিড় সৌষ্ঠব প্রকাশের জন্যে অত্যন্ত আঁট করে কাপড় পরেছে— সাধারণ মানুষের পক্ষে এ সমস্তই অসংগত, এতে চোখকে পীড়া দেয়। কিন্তু, সাধারণ মানুষের এই রূপান্তর নৃত্যকলায় অপরূপই হয়ে ওঠে।

পরদিন সকালে আমরা প্রাসাদের অন্যান্য বিভাগে ও অন্তঃপুরে আহূত হয়েছিলেম। সেখানে স্তম্ভশ্রেণীবিধৃত অতি বৃহৎ একটি সভামণ্ডপ দেখা গেল ; তার প্রকাণ্ড ব্যাপ্তি অথচ সুপরিমিত বাস্তুকলার সৌন্দর্য দেখে ভারি আনন্দ পেলুম। এ-সমস্তর উপযুক্ত বিবরণ তোমরা নিশ্চয় সুরেন্দ্রের চিঠি ও চিত্র থেকে পাবে। অন্তঃপুরে অপেক্ষাকৃত ছোটো একটি মণ্ডপে গিয়ে দেখি সেখানে আমাদের গৃহকর্তা ও গৃহস্বামিনী বসে আছেন। রানীকে ঠিক যেন একজন সুন্দরী বাঙালী মেয়ের মতো দেখতে ; বড়ো বড়ো চোখ, স্নিগ্ধ হাসি, সংযত সৌষম্যের মর্যাদা ভারি তৃপ্তিকর। মণ্ডপের বাইরে গাছপালা, আর নানারকম খাঁচায় নানা পাখি। মণ্ডপের ভিতরে গানবাজনার, ছায়াভিনয়ের, মুখোশের অভিনয়ের, পুতুলনাচের নানা সরঞ্জাম। একটা টেবিলে বাতিক শিল্পের

অনেকগুলি কাপড় সাজানো। তার মধ্যে থেকে আমাকে তিনটি কাপড় পছন্দ করে নিতে অনুরোধ করলেন। সেইসঙ্গে আমার দলের প্রত্যেককে একটি একটি করে এই মূল্যবান কাপড় দান করলেন। কাপড়ের উপর এইরকম শিল্পকাজ করতে দু-তিন মাস করে লাগে। রাজবাড়ির পরিচারিকারাই এই কাজে সুনিপুণ।

এই রাজবংশীয়দের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পরিবারের যাঁরা, কাল রাত্রে তাঁদের ওখানে নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁর ওখানে রাজকায়দার যতরকমের উপসর্গ। যেমন দুই সারস পাখি পরস্পরকে ঘিরে ঘিরে নানা গম্ভীর ভঙ্গীতে নাচে দেখেছি, এখানকার রেসিডেন্ট্ আর এই রাজা পরস্পরকে নিয়ে সেইরকম রাজকীয় চাল বিস্তার করতে লাগলেন। রাজা কিম্বা রাজপুরুষদের একটা পদোচিত মর্যাদা বাইরের দিক থেকে রক্ষা করে চলতে হয় মানি ; তাতে সেইসব মানুষের সামান্যতা কিছু ঢাকাও পড়ে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করলে তাতে তাদের সাধারণতাকেই হাস্যকরভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়।

কাল রাত্রে যে-নাচ হল সে ন'জন মেয়েতে মিলে। তাতে যেমন নৈপুণ্য তেমনি সৌন্দর্য, কিন্তু দেখে মনে হল, কাল রাত্রের সেই নাচে স্বত-উচ্ছ্বসিত প্রাণের উৎসাহ ছিল না ; যেন এরা ক্লান্ত, কেবল অভ্যাসের জোরে নেচে যাচ্ছে। কালকের নাচে গুণপনা যথেষ্ট ছিল কিন্তু তেমন করে মনকে স্পর্শ করতে পারে নি। রাজার একটি ছেলে পাশে বসে আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন, তাঁকে আমার বড়ো ভালো লাগল। অল্প বয়স, দুই বছর হল্যাণ্ডে শিক্ষা পেয়েছেন, ওলন্দাজ গবর্নমেণ্টের সৈনিকবিভাগে প্রধান পদে নিযুক্ত। তাঁর চেহারায় ও ব্যবহারে স্বাভাবিক আকর্ষণীশক্তি আছে।

কাল রাত্রে আমাদের এখানেও একটা নাচ হয়ে গেল। পূর্বরাত্রে যে-দুজন বালিকা নেচেছিল তাদের মধ্যে একজন আজ পুরুষ-সঙের মুখোশ পরে সঙের নাচ নাচলে। আশ্চর্য ব্যাপারটা হচ্ছে, এর মধ্যে নাচের শ্রী সম্পূর্ণ রক্ষা করেও ভাবে-ভঙ্গীতে গলার আওয়াজে পুরোমাত্রায় বিদূষকতা করে গেল। পুরুষের মুখোশের সঙ্গে তার অভিনয়ের কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য হল না। বেশভূষার সৌন্দর্যেও একটুমাত্র ব্যত্যয় হয় নি। নাচের শোভনতাকে বিকৃত না করেও যে তার মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের রস এমন করে আনা যেতে পারে, এ আমার কাছে আশ্চর্য ঠেকল। এরা প্রধানত নাচের ভিতর দিয়েই সমস্ত হৃদয়ভাব ব্যক্ত করতে চায়, সুতরাং বিদ্রূপের মধ্যেও এরা ছন্দ রাখতে বাধ্য। এরা বিদ্রূপকেও বিরূপ করতে পারে না ; এদের রাক্ষসেরাও নাচে। ইতি

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[১]

১ শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত।

১৪

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, শেষ চিঠিতে তোমাকে এখানকার নাচের কথা লিখেছিলুম, ভেবেছিলুম, নাচ সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হয়ে গেল। এমন সময়ে সেই রাত্রে আর-এক নাচের বৈঠকে ডাক পড়ল। সেই অতিপ্রকাণ্ড মণ্ডপে আসর; বহুবিস্তীর্ণ শ্বেত পাথরের ভিত্তিতলে বিদ্যুদ্দীপের আলো ঝলমল্ করছে। আহারে বসবার আগে নাচের একটা পালা আরম্ভ হল— পুরুষের নাচ, বিষয়টা হচ্ছে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে হনুমানের লড়াই। এখানকার রাজার ভাই ইন্দ্রজিত সেজেছেন; ইনি নৃত্যবিদ্যায় ওস্তাদ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় ইনি নাচ শিখতে আরম্ভ করেছেন। অল্প বয়সে সমস্ত শরীরটা যখন নম্র থাকে, হাড় যখন পাকে নি, সেই সময়ে এই নাচ শিক্ষাকরা দরকার; দেহের প্রত্যেক গ্রন্থি যাতে অতি সহজে সরে, প্রত্যেক মাংসপেশিতে যাতে অনায়াসে জোর পৌঁছয়, এমন অভ্যাস করা চাই। কিন্তু, নাচ সম্বন্ধে রাজার ভাইয়ের স্বাভাবিক প্রতিভা থাকাতে তাঁকে বেশি চেষ্টা করতে হয় নি।

হনুমান বনের জন্তু, ইন্দ্রজিত সুশিক্ষিত রাক্ষস, দুইজনের নাচের ভঙ্গীতে সেই ভাবের পার্থক্যটি বুঝিয়ে দেওয়া চাই, নইলে রসভঙ্গ হয়। প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সে হচ্ছে এদের সাজ। সাধারণত আমাদের যাত্রায় নাটকে হনুমানের হনুমানত্ব খুব বেশি করে ফুটিয়ে তুলে দর্শকদের কৌতুক উদ্রেক করবার চেষ্টা হয়। এখানে হনুমানের আভাসটুকু দেওয়াতে তার মনুষ্যত্ব আরো বেশি উজ্জ্বল হয়েছে। হনুমানের নাচে লম্ফ-ঝম্ফ দ্বারা তার বানরস্বভাব প্রকাশ করা কিছুই কঠিন হত না, আর সেই উপায়ে সমস্ত সভা অনায়াসেই অট্টহাস্যে মুখরিত হয়ে উঠত, কিন্তু কঠিন কাজ হচ্ছে হনুমানকে মহত্ব দেওয়া। বাংলাদেশের অভিনয় প্রভৃতি দেখলে বোঝা যায় যে, হনুমানের বীরত্ব, তার একনিষ্ঠ ভক্তি ও আত্মত্যাগের চেয়ে— তার লেজের দৈর্ঘ্য, তার পোড়ামুখের ভঙ্গিমা, তার বানরত্বই বাঙালির মনকে বেশি করে অধিকার করেছে। আমাদের পশ্চিমাঞ্চলে তার উলটো। এমন-কি, হনুমানপ্রসাদ নাম রাখতে বাপমায়ের দ্বিধা বোধ হয় না। বাংলায় হনুমানচন্দ্র বা হনুমানেন্দ্র আমরা কল্পনা করতে পারি নে। এ দেশের লোকেরাও রামায়ণের হনুমানের বড়ো দিকটাই দেখে। নাচে হনুমানের রূপ দেখলুম— পিঠ বেয়ে মাথা পর্যন্ত লেজ, কিন্তু এমন একটা শোভনভঙ্গী যে দেখে হাসি পাবার জো নেই। আর-সমস্তই মানুষের মতো। মুকুট থেকে পা পর্যন্ত ইন্দ্রজিতের সাজসজ্জা একটি সুন্দর ছবি। তার পরে দুইজনে নাচতে নাচতে লড়াই; সঙ্গে সঙ্গে ঢাকে-ঢোলে কাঁসরে-ঘণ্টায় নানাবিধ যন্ত্রে ও মাঝে মাঝে বহু মানুষের কণ্ঠের গর্জনে সংগীত

খুব গম্ভীর প্রবল ও প্রমত্ত হয়ে উঠছে। অথচ, সে সংগীত শ্রুতিকটু একটুও নয় ; বহুযন্ত্র-সম্মিলনের সুশ্রাব্য নৈপুণ্য তার উদ্দামতার সঙ্গে চমৎকার সম্মিলিত।

নাচ, সে বড়ো আশ্চর্য। তাতে যেমন পৌরুষ সৌন্দর্যও তেমনি। লড়াইয়ের দ্বন্দ্ব-অভিনয়ে নাচের প্রকৃতি একটুমাত্র এলোমেলো হয়ে যায় নি। আমাদের দেশের স্টেজে রাজপুত বীরপুরুষের বীরত্ব যেরকম নিতান্ত খেলো এ তা একেবারেই নয়। প্রত্যেক ভঙ্গীতে ভারি একটা মর্যাদা আছে। গদাযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, মুষলের আঘাত, সমস্তই ত্রুটিমাত্র-বিহীন নাচে ফুটে উঠেছে। সমস্তর মধ্যে অপূর্ব একটি শ্রী অথচ দৃপ্ত পৌরুষের আলোড়ন। এর আগে এখানে মেয়েদের নাচ দেখেছি, দেখে মুগ্ধও হয়েছি, কিন্তু এই পুরুষের নাচের তুলনায় তাকে ক্ষীণ বোধ হল। এর স্বাদ তার চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। যখন ধ্রুপদের নেশায় পেয়ে বসে তখন টপ্পার নিছক মিষ্টতা হালকা বোধ হয়, এও সেইরকম।

আজ সকালে দশটার সময়ে আমাদের এখানেই গৃহকর্তা আর-একটি নাচের ব্যবস্থা করেছিলেন। মেয়ে দুজনে পুরুষের ভূমিকা নিয়েছিল। অর্জুন আর সুবলের যুদ্ধ। গল্পটা হয়তো মহাভারতে আছে কিন্তু আমার তো মনে পড়ল না। ব্যাপারটা হচ্ছে— কোন্-এক বাগানে অর্জুনের অস্ত্র ছিল, সেই অস্ত্র চুরি করেছে সুবল, সে খুঁজে বেড়াচ্ছে অর্জুনকে মারবার জন্যে। অর্জুন ছিল বাগানের মালী-বেশে। খানিকটা কথাবার্তার পরে দুজনের লড়াই। সুবলের কাছে বলরামের লাঙল অস্ত্রটা ছিল। যুদ্ধ করতে করতে অর্জুন সেটা কেড়ে নিয়ে তবে সুবলকে মারতে পারলে।

নটীরা যে মেয়ে সেটা বুঝতে কিছুই বাধে না, অতিরিক্ত যত্নে সেটা লুকোবার চেষ্টাও করে নি। তার কারণ, যারা নাচছে তারা মেয়ে কি পুরুষ সেটা গৌণ, নাচটা কী সেইটেই দেখবার বিষয়। দেহটা মেয়ের কিন্তু লড়াইটা পুরুষের, এর মধ্যে একটা বিরুদ্ধতা আছে বলেই এই অদ্ভুত সমাবেশে বিষয়টা আরো যেন তীব্র হয়ে ওঠে। কমনীয়তার আধারে বীররসের উচ্ছলতা। মনে করো না— বাঘ নয়, সিংহ নয়, জবাফুলে ধুতরাফুলে সাংঘাতিক হানাহানি, ডাঁটায় ডাঁটায় সংঘর্ষ, পাপড়িগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন ; এদিকে বনসভা কাঁপিয়ে বৈশাখী ঝড়ের গামেলান বাজছে, গুরুগুরু মেঘের মৃদঙ্গ, গাছের ডালে ডালে ঠকাঠকি, আর সোঁ সোঁ শব্দে বাতাসের বাঁশি।

সব-শেষে এলেন রাজার ভাই। এবার তিনি একলা নাচলেন। তিনি ঘটোৎকচ। হাস্যরসিক বাঙালি হয়তো ঘটোৎকচকে নিয়ে বরাবর হাসাহাসি করে এসেছে। এখান-কার লোকচিত্তে ঘটোৎকচের খুব আদর। সেইজন্যেই মহাভারতের গল্প এদের হাতে আরো অনেকখানি বেড়ে গেল। এরা ঘটোৎকচের সঙ্গে ভার্গিবা (ভার্গবী) বলে এক

মেয়ের ঘটালে বিয়ে। সে মেয়েটি আবার অর্জুনের কন্যা। বিবাহ্ সম্বন্ধে এদের প্রথা য়ুরোপের কাছাকাছি যায়। খুড়তোত জাঠতোত ভাইবোনে বাধা নেই। ভাগিবার গর্ভে ঘটোৎকচের একটি ছেলেও আছে, তার নাম শশিকিরণ। যা হোক, আজকের নাচের বিষয়টা হচ্ছে, প্রিয়তমাকে স্মরণ করে বিরহী ঘটোৎকচের ঔৎসুক্য। এমন-কি, মাঝে মাঝে মূর্ছার ভাবে সে মাটিতে বসে পড়ছে, কল্পনায় আকাশে তার ছবি দেখে সে ব্যাকুল। অবশেষে আর থাকতে না পেরে প্রেয়সীকে খুঁজতে সে উড়ে চলে গেল। এর মধ্যে একটি ভাববার জিনিস আছে। য়ুরোপীয় শিল্পীর এঞ্জেলদের মতো এরা ঘটোৎকচের পিঠে নকল পাখা বসিয়ে দেয় নি। চাদরখানা নিয়ে নাচের ভঙ্গীতে ওড়ার ভাব দেখিয়েছে। এর থেকে মনে পড়ে গেল শকুন্তলা নাটকে কবির নির্দেশবাক্য—রথবেগং নাটয়তি। বোঝা যাচ্ছে, রথবেগটা নাচের দ্বারাই প্রকাশ হত, রথের দ্বারা নয়।

রামায়ণের মহাভারতের গল্প এ দেশের লোকের মনকে জীবনকে যে কিরকম গভীর-ভাবে অধিকার করেছে তা এই কদিনেই স্পষ্ট বোঝা গেল। ভূগোলের বইয়ে পড়া গেছে, বিদেশ থেকে অনুকূল ক্ষেত্রে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের নতুন আমদানি হবার অনতি-কাল পরেই দেখতে দেখতে তারা সমস্ত দেশকে ছেয়ে ফেলেছে; এমন-কি, যেখান থেকে তাদের আনা হয়েছে সেখানেও তাদের এমন অপরিমিত প্রভাব নেই। রামায়ণ-মহাভারতের গল্প এদের চিত্তক্ষেত্রে তেমনি করে এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। চিত্তের এমন প্রবল উদ্‌বোধন কলারচনায় নিজেকে প্রকাশ না করে থাকতে পারে না। সেই প্রকাশের অপর্যাপ্ত আনন্দ দেখা দিয়েছিল বরোবুদরের মূর্তিকল্পনায়। আজ এখানকার মেয়েপুরুষ নিজেদের দেহের মধ্যেই যেন মহাকাব্যের পাত্রদের চরিতকথাকে নৃত্যমূর্তিতে প্রকাশ করছে; ছন্দে ছন্দে এদের রক্তপ্রবাহে সেই সকল কাহিনী ভাবের বেগে আন্দোলিত।

এ ছাড়া কত রকম-বেরকমের অভিনয়, তার অধিকাংশই এই-সকল বিষয় নিয়ে। বাইরের দিকে ভারতবর্ষের থেকে এরা বহু শতাব্দী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; তবু এতকাল এই রামায়ণ মহাভারত নিবিড়ভাবে ভারতবর্ষের মধ্যেই এদের রক্ষা করে এসেছে। ওলন্দাজরা এই দ্বীপগুলিকে বলে 'ডাচ ইণ্ডীস,' বস্তুত এদের বলা যেতে পারে 'ব্যাস ইণ্ডীস'।

পূর্বেই বলেছি, এরা ঘটোৎকচের ছেলের নাম রেখেছে শশিকিরণ। সংস্কৃত ভাষা থেকে নাম রচনা এদের আজও চলেছে। মাঝে মাঝে নামকরণ অদ্ভুতরকম হয়। এখানকার রাজবৈদ্যের উপাধি ক্রীড়নির্মল। আমরা যাকে নিরাময় বা নীরোগ বলে

থাকি এরা নির্মল শব্দকে সেই অর্থ দিয়েছে। এদিকে ক্রীড় শব্দ আমাদের অভিধানে খেলা, কিন্তু ক্রীড় বলতে এখানে বোঝাচ্ছে উদ্যোগ। রোগ দূর করাতেই যার উদ্যোগ সেই হল ক্রীড়নির্মল। ফসলের খেতে যে সেঁচ দেওয়া হয় তাকে এরা বলে সিন্ধু-অমৃত। এখানে জল অর্থেই সিন্ধু কথার ব্যবহার, ক্ষেত্রকে যে-জলসেঁচ মৃত্যু থেকে বাঁচায় সেই হল সিন্ধু-অমৃত। আমাদের গৃহস্বামীর একটি ছেলের নাম সরোষ, আর-একটির নাম সন্তোষ। বলা বাহুল্য, সরোষ বলতে এখানে রাগী মেজাজের লোক বোঝায় না, বুঝতে হবে সতেজ। রাজার মেয়েটির নাম কুসুমবর্ধিনী। অনন্তকুসুম, জাতিকুসুম, কুসুমায়ুধ, কুসুমব্রত, এমন সব নামও শোনা যায়। এদের নামে যেমন বিশুদ্ধ ও সুগম্ভীর সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার এমনতরো আমাদের দেশে দেখা যায় না। যেমন আত্মসুবিজ্ঞ, শাস্ত্রাত্ম, বীরপুস্তক, বীর্যসুশাস্ত্র, সহস্রপ্রবীর, বীর্যসুব্রত, পদ্মসুশাস্ত্র, কৃতাধিরাজ, সহস্রসুগন্ধ, পূর্ণপ্রণত, যশোবিদগ্ধ, চক্রাধিরাজ, মৃতসঞ্জয়, আর্যসুতীর্থ, কৃতস্মর, চক্রাধিব্রত, সূর্যপ্রণত, কৃতবিভব।

সেদিন যে-রাজার বাড়িতে গিয়েছিলেম তাঁর নাম সুসুহুনন পাকু-ভুবন। তাঁরই এক ছেলের বাড়িতে কাল আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল, তাঁর নাম অভিমন্যু। এঁদের সকলেরই সৌজন্য স্বাভাবিক, নম্রতা সুন্দর। সেখানে মহাভারতের বিরাটপর্ব থেকে ছায়াভিনয়ের পালা চলছিল। ছায়াভিনয় এ দেশ ছাড়া আর কোথাও দেখি নি, অতএব বুঝিয়ে বলা দরকার। একটা সাদা কাপড়ের পট টাঙানো, তার সামনে একটা মস্ত প্রদীপ উজ্জ্বল শিখা নিয়ে জ্বলছে ; তার দুই ধারে পাতলা চামড়ায় আঁকা মহাভারতের নানা চরিত্রের ছবি সাজানো, তাদের হাতপাগুলো দড়ির টানে নড়ানো যায় এমনভাবে গাঁথা। এই ছবিগুলি এক-একটা লম্বা কাঠিতে বাঁধা। একজন সুর করে গল্পটা আউড়ে যায়, আর সেই গল্প-অনুসারে ছবিগুলিকে পটের উপরে নানা ভঙ্গীতে নাড়াতে দোলাতে চালাতে থাকে। ভাবের সঙ্গে সংগতি রেখে গামেলান বাজে। এ যেন মহাভারত-শিক্ষার একটা ক্লাসে পাঠের সঙ্গে ছবির অভিনয়-যোগে বিষয়টা মনে মুদ্রিত করে দেওয়া। মনে করো, এমনি করে যদি স্কুলে ইতিহাস শেখানো যায়, মাস্টারমশায় গল্পটা বলে যান আর একজন পুতুল-খেলাওয়ালা প্রধান প্রধান ব্যাপারগুলো পুতুলের অভিনয় দিয়ে দেখিয়ে যেতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাব-অনুসারে নানা সুরে তালে বাজনা বাজে, ইতিহাস শেখাবার এমন সুন্দর উপায় কি আর হতে পারে।

মানুষের জীবন বিপদসম্পদ-সুখদুঃখের আবেগে নানাপ্রকার রূপে ধ্বনিতে স্পর্শে লীলায়িত হয়ে চলছে ; তার সমস্তটা যদি কেবল ধ্বনিতে প্রকাশ করতে হয় তা হলে সে একটা বিচিত্র সংগীত হয়ে ওঠে ; তেমনি আর-সমস্ত ছেড়ে দিয়ে সেটাকে কেবল-

মাত্র যদি গতি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় তা হলে সেটা হয় নাচ। ছন্দোময় সুরই হোক আর নৃত্যই হোক, তার একটা গতিবেগ আছে, সেই বেগ আমাদের চৈতন্যে রসচাঞ্চল্য সঞ্চার করে তাকে প্রবলভাবে জাগিয়ে রাখে। কোনো ব্যাপারকে নিবিড় করে উপলব্ধি করাতে হলে আমাদের চৈতন্যকে এইরকম বেগবান করে তুলতে হয়। এই দেশের লোক ক্রমাগতই সুর ও নাচের সাহায্যে রামায়ণ-মহাভারতের গল্পগুলিকে নিজের চৈতন্যের মধ্যে সর্বদাই দোলায়িত করে রেখেছে। এই কাহিনীগুলি রসের ঝরনাধারায় কেবলই এদের জীবনের উপর দিয়ে প্রবাহিত। রামায়ণ-মহাভারতকে এমনি নানাবিধ প্রাণবান উপায়ে সর্বতোভাবে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা। শিক্ষার বিষয়কে একান্ত করে গ্রহণ ও ধারণ করবার প্রকৃষ্ট প্রণালী কী তা যেন সমস্ত দেশের লোকে মিলে উদ্ভাবন করেছে; রামায়ণ-মহাভারতকে গভীর করে পাবার আগ্রহে ও আনন্দেই এই উদ্ভাবনা স্বাভাবিক হল।

কাল যে ছবির অভিনয় দেখা গেল তাও প্রধানতই নাচ, অর্থাৎ ছন্দোময় গতির ভাষা দিয়ে গল্প-বলা। এর থেকে একটা কথা বোঝা যাবে এ দেশে নাচের মনোহারিতা ভোগ করবার জন্যেই নাচ নয়; নাচটা এদের ভাষা। এদের পুরাণ ইতিহাস নাচের ভাষাতেই কথা কইতে থাকে। এদের গামেলানের সংগীতটাও সুরের নাচ। কখনো দ্রুত, কখনো বিলম্বিত, কখনো প্রবল, কখনো মৃদু, এই সংগীতটাও সংগীতের জন্যে নয়, কোনো একটা কাহিনীকে নৃত্যচ্ছন্দের অনুষঙ্গ দেবার জন্যে।

দীপালোকিত সভায় এসে যখন প্রথম বসলুম তখন ব্যাপারখানা দেখে কিছুই বুঝতে পারা গেল না। বিরক্ত বোধ হতে লাগল। খানিক বাদে আমাকে পটের পশ্চাৎভাগে নিয়ে গেল। সেদিকে আলো নেই, সেই অন্ধকার ঘরে মেয়েরা বসে দেখছে। এদিকটাতে ছবিগুলি অদৃশ্য, ছবিগুলিকে যে-মানুষ নাচাচ্ছে তাকেও দেখা যায় না, কেবল আলোকিত পটের উপর অন্য পিঠের ছবির ছায়াগুলি নেচে বেড়াচ্ছে। যেন উত্তানশায়ী শিবের বুকের উপরে মহামায়ার নাচ। জ্যোতির্লোকে যে-সৃষ্টিকর্তা আছেন তিনি যখন নিজের সৃষ্টিপটের আড়ালে নিজেকে গোপন রাখেন তখন আমরা সৃষ্টিকে দেখতে পাই। সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সৃষ্টির অবিশ্রাম যোগ আছে বলে যে জানে সে-ই তাকে সত্য বলে জানে। সেই যোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে এই চঞ্চল ছায়াগুলোকে নিতান্তই মায়া বলে বোধ হয়। কোনো কোনো সাধক পটটাকে ছিঁড়ে ফেলে ওপারে গিয়ে দেখতে চায়, অর্থাৎ, সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে দেখবার চেষ্টা— কিন্তু তার মতো মায়া আর কিছুই হতে পারে না। ছায়ার খেলা দেখতে দেখতে এই কথাটাই কেবল আমার মনে হচ্ছিল।

আমি যখন চলে আসছি আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা আমাকে খুব একটি মূল্যবান উপহার দিলেন। বড়ো একটি বাটিক শিল্পের কাপড়। বললেন, এইরকমের বিশেষ কাপড় রাজবংশের ছেলেরা ছাড়া কেউ পরতে পায় না। সুতরাং, এ জাতের কাপড় আমি কোথাও কিনতে পেতুম না।

আমাদের এখানকার পালা আজ শেষ হল। কাল যাব যোগ্যকর্তায়। সেখানকার রাজবাড়িতেও নাচগান প্রভৃতির রীতিপদ্ধতি বিশুদ্ধ প্রাচীনকালের, অথচ এখানকার সঙ্গে পার্থক্য আছে। যোগ্যকর্তা থেকে বোরোবুদুর কাছেই; মোটরে ঘণ্টাখানেকের পথ। আরো দিন পাঁচ-ছয় লাগবে এই সমস্ত দেখে শুনে নিতে, তার পরে ছুটি। ইতি ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[১]

১৫

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, এখানকার দেখাশুনো প্রায় শেষ হয়ে এল। ভারতবর্ষের সঙ্গে জোড়াতাড়া-দেওয়া এদের লোকযাত্রা দেখে পদে পদে বিস্ময় বোধ হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারত এখানকার লোকের প্রাণের মধ্যে যে কিরকম প্রাণবান হয়ে রয়েছে সে-কথা পূর্বেই লিখেছি। প্রাণবান বলেই এ জিনিসটা কোনো লিখিত সাহিত্যের সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি নয়। এখানকার মানুষের বহুকালের ভাবনা ও কল্পনার ভিতর দিয়ে তার অনেক বদল হয়ে গেছে। তার প্রধান কারণ, মহাভারতকে এরা নিজেদের জীবনযাত্রার প্রয়োজনে প্রতিদিন ব্যবহার করেছে। সংসারের কর্তব্যনীতিকে এরা কোনো শাস্ত্রগত উপদেশের মধ্যে সঞ্চিত পায় নি, এই দুই মহাকাব্যের নানা চরিত্রের মধ্যে তারা যেন মূর্তিমান। ভালোমন্দ নানা শ্রেণীর মানুষকে বিচার করবার মাপকাঠি এই-সব চরিত্রে। এইজন্তেই জীবনের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই জীবনের সামগ্রীর অনেকরকম বদল হয়েছে। কালে কালে বাঙালি গায়কের মুখে মুখে বিদ্যাপতি-চণ্ডিদাসের পদগুলি যেমন রূপান্তরিত হয়েছে এও তেমনি। কাল আমরা যে-ছায়াভিনয় দেখতে গিয়েছিলেম তার গল্পাংশটাকে টাইপ করে আমাদের হাতে দিয়েছিল। সেটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, পড়ে দেখো। মূল মহাভারতের সঙ্গে মিলিয়ে এটা বাংলায় তর্জমা করে নিয়ো। এ গল্পের বিশেষত্ব এই যে, এর মধ্যে দ্রৌপদী নেই। মূল মহাভারতের ক্লীব বৃহন্নলা এই গল্পে নারীরূপে 'কেন-বর্দি' নাম গ্রহণ করেছে। কীচক একে দেখেই মুগ্ধ হয় ও ভীমের

১ শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত।

হাতে মারা পড়ে। এই কীচক জাভানি মহাভারতে মৎস্যপতির শত্রু, পাণ্ডবেরা একে বধ করে বিরাটের রাজার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিল।

আমি মঙ্কুনগরো-উপাধিধারী যে-রাজার বাড়ির অলিন্দে বসে লিখছি চারি দিকে তার ভিত্তিগাত্রে রামায়ণের চিত্র রেশমের কাপড়ের উপর অতি সুন্দর করে অঙ্কিত। অথচ ধর্মে এঁরা মুসলমান। কিন্তু, হিন্দুশাস্ত্রের দেবদেবীদের বিবরণ এঁরা তন্ন তন্ন করে জানেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূ-বিবরণের গিরিনদীকে এঁরা নিজেদের দেশের মধ্যেই গ্রহণ করেছেন। বস্তুত, সেটাতে কোনো অপরাধ নেই, কেননা রামায়ণ-মহাভারতের নরনারীরা ভাবমূর্তিতে এঁদের দেশেই বিচরণ করছেন; আমাদের দেশে তাঁদের এমন সর্বজনব্যাপী পরিচয় নেই, সেখানে ক্রিয়াকর্মে উৎসবে আমোদে ঘরে ঘরে তাঁরা এমন করে বিরাজ করেন না।

আজ রাত্রে রাজসভায় জাভানি শ্রোতাদের কাছে আমার 'কথা ও কাহিনী' থেকে কয়েকটি কথা আবৃত্তি করে শোনাব। একজন জাভানি সেগুলি নিজের ভাষায় তর্জমা করে ব্যাখ্যা করবেন। কাল সুনীতি ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে দীপচিত্র সহযোগে বক্তৃতা করেছিলেন। আজ আবার তাঁকে সেইটে বলতে রাজা অনুরোধ করেছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সব কথা জানতে এঁদের বিশেষ আগ্রহ। ইতি ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[১]

১৬

কল্যাণীয়েষু

রথী, শূরকর্তার মঙ্কুনগরোর ওখান থেকে বিদায় নিয়ে যোগ্যকর্তায় পাকোয়ালাম-উপাধিধারী রাজার প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছি। শূরকর্তা শহরে একটি নতুন সাঁকো ও রাস্তা তৈরি শেষ হয়েছে, সেই রাস্তা পথিকদের ব্যবহারের জন্যে মুক্ত করে দেবার ভার আমার উপরে ছিল। সাঁকোর সামনে রাস্তা আটকে একটা কাগজের ফিতে টাঙানো ছিল, কাঁচি দিয়ে সেটা কেটে দিয়ে পথ খোলসা করা গেল। কাজটা আমার লাগল ভালো; মনে হল, পথের বাধা দূর করাই আমার ব্রত। আমার নামে এই রাস্তার নামকরণ হয়েছে।

পথে আসতে পেরাম্বান বলে এক জায়গায় পুরোনো ভাঙা মন্দির দেখতে নামলুম। এ জায়গাটা ভুবনেশ্বরের মতো, মন্দিরের ভগ্নস্তূপে পরিকীর্ণ। ভাঙা পাথরগুলি জোড়া দিয়ে দিয়ে ওলন্দাজ গবর্মেণ্ট মন্দিরগুলিকে তার সাবেক মূর্তিতে গড়ে তুলছেন। কাজটা খুব কঠিন, অল্প অল্প করে এগোচ্ছে; দুই-একজন বিচক্ষণ য়ুরোপীয় পণ্ডিত এই কাজে

১ শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত।

নিযুক্ত। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে বিশেষ আনন্দ পেলুম। এই কাজ সুসম্পূর্ণ করবার জন্যে আমাদের পুরাণগুলি নিয়ে এঁরা যথেষ্ট আলোচনা করছেন। অনেক জিনিস মেলে না, অথচ সেগুলি যে জাভানি লোকের স্মৃতিবিকার থেকে ঘটেছে তা নয়, তখনকার কালের ভারতবর্ষের লোকব্যবহারের মধ্যে এর ইতিহাস নিহিত। শিব-মন্দিরই এখানে প্রধান। শিবের নানাবিধ নাট্যমুদ্রা এখানকার মূর্তিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে তার বিস্তারিত সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। একটা জিনিস ভেবে দেখবার বিষয়। শিবকে এ দেশে গুরু, মহাগুরু বলে অভিহিত করেছে। আমার বিশ্বাস, বুদ্ধের গুরুপদ শিব অধিকার করেছিলেন; মানুষকে তিনি মুক্তির শিক্ষা দেন। এখানকার শিব নটরাজ, তিনি মহাকাল অর্থাৎ সংসারে যে চলার প্রবাহ, জন্মমৃত্যুর যে ওঠাপড়া, সে তাঁরই নাচের ছন্দে; তিনি ভৈরব, কেননা, তাঁর লীলার অঙ্গই হচ্ছে মৃত্যু। আমাদের দেশে এক সময়ে শিবকে দুই ভাগ করে দেখেছিল। এক দিকে তিনি অনন্ত, তিনি সম্পূর্ণ, সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি প্রশান্ত; আর-এক দিকে তাঁরই মধ্যে কালের ধারা তার পরিবর্তন-পরম্পরা নিয়ে চলেছে, কিছুই চিরদিন থাকছে না, এইখানে মহাদেবের তাণ্ডবলীলা কালীর মধ্যে রূপ নিয়েছে। কিন্তু, জাভায় কালীর কোনো পরিচয় নেই। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলারও কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। পূতনাবধ প্রভৃতি অংশ আছে কিন্তু গোপীদের দেখতে পাই নে। এর থেকে সেই সময়কার ভারতের ইতিহাসের কিছু ছবি পাওয়া যায়। এখানে রামায়ণ-মহাভারতের নানাবিধ গল্প আছে যা অন্তত সংস্কৃত মহাকাব্যে ও বাংলাদেশে অপ্রচলিত। এখানকার পণ্ডিতদের মত এই যে, জাভানিরা ভারতবর্ষে গিয়ে অথবা জাভায় সমাগত ভারতীয়দের কাছ থেকে লোকমুখে-প্রচলিত নানা গল্প শুনেছিল, সেইগুলোই এখানে রয়ে গেছে। অর্থাৎ, সে সময়ে ভারতবর্ষেই নানা স্থানে নানা গল্পের বৈচিত্র্য ছিল। আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোনো পণ্ডিতই রামায়ণ-মহাভারতের তুলনামূলক আলোচনা করেন নি। করতে গেলে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে স্থানীয় ভাষায় যে-সব কাব্য আছে মূলের সঙ্গে সেইগুলি মিলিয়ে দেখা দরকার হয়। কোনো-এক সময়ে কোনো এক জার্মান পণ্ডিত এই কাজ করবেন বলে অপেক্ষা করে আছি। তার পরে তাঁর লেখার কিছু প্রতিবাদ কিছু সমর্থন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ডাক্তার উপাধি পাব।

এখানে পাকোয়ালাম লোকটিকে বড়ো ভালো লাগল। শান্ত, গম্ভীর, শিক্ষিত, চিন্তাশীল। জাভার প্রাচীন কলাবিদ্যা প্রভৃতিকে রক্ষা করবার জন্যে উৎসুক। যোগ্যকর্তার প্রধান ব্যক্তি হচ্ছেন এখানকার সুলতান। তাঁর বাড়িতে রাত্রে নাচ দেখবার নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে একজন ওলন্দাজ পণ্ডিতের কাছে শোনা গেল যে, এই

জায়গাটির নাম ছিল অযোধ্যা ; ক্রমে তারই অপভ্রংশ হয়ে এখন যোগ্যা নামে এসে ঠেকেছে।

এখানে যে নাচ দেখলুম সে চারজন মেয়ের নাচ। রাজবংশের মেয়েরাই নাচেন। চারজনের মধ্যে দুজন ছিলেন সুলতানেরই মেয়ে। এখানে এসে যত নাচ দেখেছি সব চেয়ে এইটেই সুন্দর লেগেছে। বর্ণনা-দ্বারা এ বোঝানো অসম্ভব। এমন অনিন্দ্যসম্পূর্ণ রূপসৃষ্টি দেখা যায় না। এই-সব নাচের একটা দিক আছে যেটা এর বাইরের সৌন্দর্য, আর-একটা হচ্ছে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর বিশেষ অর্থ আছে। যারা সেগুলি জানে তারাই এর শোভার সঙ্গে এর ভাষাকে মিলিয়ে সম্পূর্ণ আনন্দ পেতে পারে। এখানে নাচ-শিক্ষার বিদ্যালয় আছে, সেখানে নিমন্ত্রণ পাওয়া গেছে। সেখানে গেলে এদের নাচের তত্ত্ব আরো কিছু বুঝতে পারব আশা করছি।

আজ রাত্রে রামায়ণ থেকে যে অভিনয় হবে তার একটি সূচীপত্র পাঠাই। এটা পড়লে বোঝা যায়, এখানকার রামায়ণকথার ভাবখানা কী।

বৌমা পয়লা অগস্টে যে-চিঠি পাঠিয়েছিলেন আজ দেড় মাস পরে সেটি আমার হাতে এল। আমার চিঠির কোন্‌গুলো তোমাদের কাছে পৌঁছল কোন্‌গুলো পৌঁছল না, তা কেমন করে জানব। ইতি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[১]

১৭

যোগ্যকর্তা
জাভা

কল্যাণীয়াসু

রানী, এখানকার পালা শেষ হয়ে এল, শরীরটাও ক্লান্ত। এখানে যে-রাজার বাড়িতে আছি কাল রাত্রে তিনি ছায়াভিনয়ের একটি পালা দেখাবেন ; তার পরে আমরা যাব বরোবুদরে। সেখানে দুদিন কাটিয়ে ফেরবার পথে বাটাভিয়াতে গিয়ে জাহাজে চড়ে বসব।

কাল রাত্রে এক জায়গায় গিয়েছিলুম জটায়ুবধের অভিনয় দেখতে। দেখে এ দেশের লোকের মনের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যাকে অভিনয় বলি তার প্রধান অংশ কথা, বাকি অংশ হচ্ছে নানাপ্রকার হৃদয়ভাবের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলীর প্রতিরূপ দেখানো। এখানে তা নয়। এখানে প্রধান জিনিস হচ্ছে ছবি এবং গতিচ্ছন্দ।

১ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত।

কিন্তু, সেই ছবি বলতে প্রতিরূপ নয়, মনোহর রূপ। আমরা সংসারে যে দৃশ্য সর্বদা দেখি তার সঙ্গে খুব বেশি অনৈক্য হলেও এদের বাধে না। পৃথিবীতে মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে চলাফেরা করে থাকে। এই অভিনয়ে সবাইকে বসে বসে চলতে ফিরতে হয়। সেও সহজ চলাফেরা নয়, প্রত্যেক নড়াচড়া নাচের ভঙ্গীতে। মনে মনে এরা এমন একটা কল্পলোক সৃষ্টি করেছে যেখানে সবাই বসার অবস্থায় নেচে বেড়ায়। এই পঙ্গু মানুষের দেশ যদি প্রহসনের দেশ হত তা হলেও বুঝতুম। একেবারেই তা নয়, এ মহাকাব্যের দেশ। এরা স্বভাবকে খাতির করতে চায় না। স্বভাব তার প্রতিশোধস্বরূপে যে এদের বিদ্রূপ করবে, এদের হাস্যকর করে তুলবে, তাও ঘটল না। স্বভাবের বিকারকেও এরা সুদৃশ্য করবে, এই এদের পণ। ছবিটাই এদের লক্ষ্য, স্বভাবের অনুকরণ এদের লক্ষ্য নয়, এই কথাটা এরা যেন স্পর্ধার সঙ্গে বলতে চায়। মনে করো-না কেন, প্রথম দৃশ্যটা রাজসভায় দশরথ ও তাঁর অমাত্যবর্গ। রঙ্গভূমিতে এরা সবাই গুঁড়ি মেরে প্রবেশ করল। মনে হয়, এর চেয়ে অদ্ভুত কিছুই হতে পারে না। ব্যাপারটাকে হাস্যকরতা থেকে বাঁচানো কত কঠিন ভেবে দেখো। কিন্তু, এতে আমরা বিরূপ কিছুই দেখলুম না, এরা দশরথ কিম্বা রাজামাত্য সে কথাটা সম্পূর্ণ গৌণ হয়ে গেল। পরের দৃশ্যে কৈকেয়ী প্রভৃতি রানী আর সখীরা তেমনি করেই বসা-অবস্থায় হেলে দুলে নেচে নেচে প্রবেশ করলে। আট-নয় বছরের ছেলেরা সব কৌশল্যা প্রভৃতি রানী সেজেছে। এদিকে কৌশল্যার ছেলে রাম যে সেজেছে তার বয়স অন্তত পঁচিশ হবে; এটা যে কত বড়ো অসংগত সে প্রশ্ন কারো মনেই আসে না, কেননা, এরা দেখছে ছবির নাচ। যতক্ষণ সেটাতে কোনো দোষ ঘটছে না ততক্ষণ নালিশ করবার কোনো হেতু নেই। অন্য দেশের লোকেরা যখন জিজ্ঞাসা করে, এর মানে কী হলো, এরা বলে, "তা আমরা জানি নে, কিন্তু আমাদের 'রসম্‌' তৃপ্ত হচ্ছে।" অর্থাৎ, মানে না পাই রস পাচ্ছি। আমাকে একজন ওলন্দাজ পণ্ডিত বলছিলেন, বালির লোকেরা অভ্যাসমতো যে-সব পূজানুষ্ঠান করে তার মানে তারা কিছুই বোঝে না কিন্তু তারাও 'রসম্‌'-তৃপ্তির দোহাই দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, সৌন্দর্যের, সম্পূর্ণতার একটা আইডিয়া তাদের মনের ভিতরে আছে, অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সেইটিতে যখন সাড়া পায় তখন তাদের যে আনন্দ তাকে তো আধ্যাত্মিক বলা যেতে পারে।

কাল রাত্রে এই রঙ্গক্ষেত্রের বহিরঙ্গনে কত যে লোক জমেছে তার সংখ্যা নেই। নিঃশব্দে তারা দেখছে; শুধু কেবল দেখারই সুখ। তাদের মনের মধ্যে রামায়ণের গল্প আছে, সেই গল্পের ধারার সঙ্গে ছবির ধারা মিলে কল্পনা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এর মধ্যে আশ্চর্যের বিষয়টা হচ্ছে এই যে, যে-ছবিটা দেখছে সেটাতে গল্পকে ফুটিয়ে তোলবার

কোনো চেষ্টা নেই। রামের যৌবরাজ্যে কৈকেয়ী রাগ করেছে; কিন্তু যেরকম ভাবভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরে আমাদের চোখে কানে রাগের ভাবটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই ছবির মধ্যে তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। আট-দশ বছরের ছেলে স্ত্রীবেশে কৈকেয়ী সাজলে তার মধ্যে কৈকেয়ীত্ব লেশমাত্র থাকা অসম্ভব। তবু এরা তাতে কোনো অভাব বোধ করে না। জিনিসটা যদি আগাগোড়া ছেলেমাহুষি ও গ্রাম্য বর্বর-গোছের কিছু হত তা হলে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই থাকত না— কিন্তু, যেখানে নৈপুণ্য ও সৌষম্যের সীমা নেই, অতি সামান্য ভঙ্গীটুকুমাত্র যেখানে নিরর্থক নয়, বহু যত্ন ও বহু শক্তির দ্বারা যেখানে এই ললিতকলাটি একেবারে সুপরিণত হয়ে উঠেছে, সেখানে একে অবজ্ঞা করা চলে না। এই কথাই বলতে হয় যে, রূপের ও গতির ছন্দবোধ এদের মনে অত্যন্ত বেশি প্রবল; সেই রূপের ও গতির ভাষা এদের মনে যতখানি কথা কয় আমাদের মনে ততখানি কয় না। এদের গামেলান-সংগীতেও সেটা দেখতে পাই। প্রথমত যন্ত্রগুলি বহুসংখ্যক, বহু যত্নে সুশোভিত, এবং তাদের সমাবেশ সুসজ্জিত, যারা বাজাচ্ছে তাদের মধ্যে সংযত শোভনতা। এই রম্যদর্শন এদের কাছে অত্যাবশ্যক। চোখের দেখার সুখটুকু রক্ষা করে এদের যে সংগীতের আলোচনা সে হচ্ছে সুরের নাচ। ছন্দের লীলা এদের কাছে গীতের ধারার চেয়ে বেশি। কিন্তু, ছন্দের লীলা আমাদের দেশের ভোজপুরিয়াদের খচ্‌মচ্‌ বাদ্যের দুঃসহ অত্যাচার নয়। এদের নাচ যেমন সুন্দর সজ্জিত অঙ্গের নাচ, এদের সংগীতে যে ছন্দের নাচ সেও খোল করতাল মৃদঙ্গের কোলাহল নয়— সুশ্রাব্য সুর দিয়ে সেই নাচ মণ্ডিত। এদের সংগীতকে বলা যেতে পারে স্বরনৃত্য, এদের অভিনয়কে বলা যায় রূপনাট্য। ভারতবর্ষ থেকে নটরাজ এসে একদিন এখানে মন্দিরে পূজা পেয়েছিলেন, তিনি এদের যে-বর দিয়েছেন সে হচ্ছে তাঁর নাচটি— আর, আমাদের জন্যে কি কেবল তাঁর শ্মশানভস্মই রইল। ইতি

২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[১]

১৮

ডাগো

বাণ্ডঙ। যবদ্বীপ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমরা একটি সুন্দর জায়গায় এসেছি। পাহাড়ের উপরে— শোনা গেল পাঁচ হাজার ফুট উঁচু। হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা। কিন্তু, হিমালয়ের এতটা উঁচু কোনো

১ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত

পাহাড়ে যতটা শীত এখানে তার কাছ দিয়েও যায় না। আমরা আছি ভীমনৃট বলে এক ভদ্রলোকের আতিথ্যে। এঁর স্ত্রী অষ্ট্রিয়, ভিয়েনার মেয়ে। বাগান দিয়ে বেষ্টিত সুন্দর বাড়িটি পাহাড়ের উপর। এখান থেকে ঠিক সামনেই দেখতে পাই নীল গিরিমণ্ডলীর কোলে বাণ্ডুঙ শহর। পাহাড়ের যে অঞ্জলির মধ্যে এই শহর, অনতিকাল আগে সেখানে সরোবর ছিল। কখন একসময় পাড়ি খসে গিয়ে তার সমস্ত জল বেরিয়ে চলে গেছে। এতদিন ঘোরাঘুরির পরে এই সুন্দর নির্জন জায়গায় নিভৃত বাড়িতে এসে বড়ো আরাম বোধ হচ্ছে।

জাভাতে নামার পর থেকেই যিনি সমস্তক্ষণ অশ্রান্ত যত্নে আমাদের সাহচর্য করে আসছেন তাঁর নাম সামুয়েল কোপেরবরগ্‌। নামের মূল অর্থ হচ্ছে তামার পাহাড়। সুনীতি সেই মানেটা নিয়ে তাঁর নামের সংস্কৃত অনুবাদ করে দিয়েছেন তাম্রচূড়। আমাদের মহলে তাঁর এই নামটিই চলে গিয়েছে, তিনি এতে আনন্দিত। লোকটির নাম বদলে তাঁকে স্বর্ণচূড় বলতে ইচ্ছে করে। কিসে আমাদের লেশমাত্র আরাম সুবিধা বা দাবি পূর্ণ হতে পারে সেজন্যে তিনি অসাধারণ চিন্তা ও পরিশ্রম করেছেন। অকৃত্রিম সৌহার্দ্য তাঁর। দৈহিক পরিমাণে মানুষটি সংকীর্ণ, কিন্তু হৃদয়ের পরিমাণে খুব প্রশস্ত। এতকাল আমরা তাঁকে নানা সময়ে নানা উপলক্ষে দিনরাত ধরে দেখেছি— কখনো তাঁর মধ্যে ঔদ্ধত্য বা ক্ষুদ্রতা বা অহমিকা দেখি নি। সব সময়েই দেখেছি, নিজেকে তিনি সকলের শেষে রেখেছেন। তাঁর শরীর রুগ্ন ও দুর্বল, অথচ সেই রুগ্ন শরীরের জন্যে কোনোদিন কোনো বিশেষ সুবিধা দাবি করেন নি। সকলের সব হয়ে গিয়ে যেটুকু উদ্‌বৃত্ত সেইটুকুতেই তাঁর অধিকার। অনেকের কাছে তিনি তর্জন সহ্য করেছেন কিন্তু তা নিয়ে কোনোদিন তাঁর কাছ থেকে নালিশ বা কারো নিন্দে শুনি নি। ইংরিজি ভালো বলতে পারেন না, বুঝতেও বাধে। কিন্তু, কথায় যা না কুলোয় কাজে তার চতুর্গুণ পুষিয়ে দেন। কোথাও যাতায়াতের সময় মোটরগাড়িতে প্রথম প্রথম তিনি আমাদের সঙ্গ নিতেন, কিন্তু যেই দেখলেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আমাদের পক্ষে কঠিন, অমনি অকুণ্ঠিত মনে নিজেকে সরিয়ে দিয়ে ইংরেজি-জানা সঙ্গীদের জন্যে স্থান করে দিলেন। কিন্তু, এখন এমন হয়েছে, তিনি সঙ্গে না থাকলে কেবল যে অসুবিধা হয় তা নয়, আমার তো ভালোই লাগে না। আমাদের মানসম্মান-সুখ-স্বচ্ছন্দতার চিন্তায় তিনি নিজেকে এমন সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছেন যে, তিনি একটু সরে গেলেই আমাদের বড়ো বেশি ফাঁক পড়ে। তাঁর স্নিগ্ধ হৃদয়ের একটি লক্ষণ দেখে আমার ভারি ভালো লাগে— সর্বত্রই দেখি, শিশুদের তিনি বন্ধু। তারা ওঁকে নিজেদের সমবয়সী বলেই জানে। তাঁর হৃদয়ের আর-একটি প্রমাণ, জাভার লোকদের তিনি

সম্পূর্ণ আপন করে নিয়েছেন। জাভানিদের নাচ গান শিল্প ইতিহাস প্রভৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তাঁর একান্ত যত্ন। এই সমস্ত আলোচনার জন্যে 'জাভা সোসাইটি' বলে একটি সভা স্থাপিত হয়েছে, তারই পরিচালনার জন্যে এঁর সমস্ত সময় ও চেষ্টা নিযুক্ত। আমার বর্ণনা থেকে বুঝবে, এই সরল আত্মত্যাগী মানুষটিকে আমরা ভালোবেসেছি।

বোরোবুদুরের উদ্দেশে যে কবিতা[১] লিখেছি সেটি অন্য পাতায় তোমাদের জন্যে কপি করে পাঠানো গেল। ইতি ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[২]

১৯

বাণ্ডুঙ। জাভা

কল্যাণীয়াসু

মীরা, এখানকার যা-কিছু দেখবার তা শেষ করেছি। যোগ্য থেকে গিয়েছিলুম বোরোবুদুরে; সেখানে একরাত্রি কাটিয়ে এলুম।

প্রথমে দেখলুম, মুণ্ডুঙ বলে এক জায়গায় একটি ছোটো মন্দির। ভেঙেচুরে পড়ছিল, সেটাকে এখানকার গবর্মেণ্ট সারিয়ে নিয়েছে। গড়নটি বেশ লাগল দেখতে। ভিতরে বুদ্ধের তিন ভাবের তিন বিরাট মূর্তি। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেম। মনের ভিতরে কেমন একটা বেদনা বোধ হয়। একদিন অনেক মানুষে মিলে এই মন্দির, এই মূর্তি, তৈরি করে তুলছিল। সে কত কোলাহল, কত আয়োজন, তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল মানুষের প্রাণ। এই প্রকাণ্ড পাথরের প্রতিমা যেদিন পাহাড়ের উপর তোলা হচ্ছিল সেদিন এই গাছপালার মধ্যে এই সূর্যালোকে উজ্জ্বল আকাশের নীচে মানুষের বিপুল একটা প্রয়াস সজীবভাবে এইখানে তরঙ্গিত। পৃথিবীতে সেদিন খবর-চালাচালি ছিল না; এই ছোটো দ্বীপটির মধ্যে যে প্রবল ইচ্ছা আপন কীর্তিরচনায় প্রবৃত্ত, সমুদ্র পার হয়ে তার সংবাদ আর কোথাও পৌঁছয় নি। কলকাতার ময়দানের ধারে যখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরি হচ্ছিল তার কোলাহল পৃথিবীর সকল সমুদ্রের কূলে কূলে বিস্তীর্ণ হয়েছিল।

নিশ্চয় দীর্ঘকাল লেগেছিল এই মন্দির তৈরি হতে; কোনো-একজন মানুষের আয়ুর মধ্যে এর সৃষ্টির সীমা ছিল না। এই মন্দিরকে তৈরি করে তোলবার জন্যে

১ বোরোবুদুর। পরিশেষ কাব্যে সংকলিত। ১৫শ খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্রষ্টব্য।

২ শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত।

যে প্রবল শ্রদ্ধা সেটা তখনকার সমস্ত কাল জুড়ে সত্য ছিল। এই মন্দির নির্মাণ নিয়ে কত বিস্ময়, কত বিতর্ক, সত্যমিথ্যা কত কাহিনী তখনকার এই দ্বীপের সুখদুঃখবিক্ষুব্ধ প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত হয়েছে। একদিন মন্দির তৈরি শেষ হল; তার পরে দিনের পর দিন এখানে পূজার দীপ জ্বলেছে, দলে দলে পূজার অর্ঘ্য এনেছে, বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে পার্বণ হয়েছে, এর প্রাঙ্গণে তীর্থযাত্রী মেয়ে পুরুষ এসে ভিড় করেছে।

তার পরে সেদিনের ভাষার উপর, ভাবের উপর, ধুলো চাপা পড়ল; সেদিন যা অত্যন্ত সত্য ছিল তার অর্থ গেল হারিয়ে। ঝরনা শুকিয়ে গেলে যেমন কেবল পাথরগুলো বেরিয়ে পড়ে, এই-সব মন্দির আজ তেমনি। একে ঘিরে যে প্রাণের ধারা নিরন্তর বয়ে যেত সে যেমনি দূরে সরে গেল, অমনি এর পাথর আর কথা কয় না, এর উপরে সেদিনের প্রাণস্রোতের কেবল চিহ্নগুলি আছে, কিন্তু তার গতি নেই, তার বাণী নেই। মোটরগাড়ি চড়ে আমরা একদল এলুম দেখতে, কিন্তু দেখবার আলো কোথায়। মানুষের এই কীর্তি আপন প্রকাশের জন্যে মানুষের যে-দৃষ্টির অপেক্ষা করে, কতকাল হল, সে লুপ্ত হয়ে গেছে।

এর আগে বোরোবুদুরের ছবি অনেকবার দেখেছি। তার গড়ন আমার চোখে কখনোই ভালো লাগে নি। আশা করেছিলুম হয়তো প্রত্যক্ষ দেখলে এর রস পাওয়া যাবে। কিন্তু, মন প্রসন্ন হল না। থাকে-থাকে একে এমন ভাগ করেছে, এর মাথার উপরকার চূড়াটুকু এর আয়তনের পক্ষে এমন ছোটো যে, যত বড়োই এর আকার হোক এর মহিমা নেই। মনে হয়, যেন পাহাড়ের মাথার উপরে একটা পাথরের ঢাকনা চাপা দিয়েছে। এটা যেন কেবলমাত্র একটা আধারের মতো, বহুশত বুদ্ধমূর্তি ও বুদ্ধের জাতককথার ছবিগুলি বহন করবার জন্যে মস্ত একটি ডালি। সেই ডালি থেকে তুলে তুলে দেখলে অনেক ভালো জিনিস পাওয়া যায়। পাথরে-খোদা জাতকমূর্তিগুলি আমার ভারি ভালো লাগল—প্রতিদিনের প্রাণলীলার অজস্র প্রতিরূপ, অথচ তার মধ্যে ইতর অশোভন বা অশ্লীল কিছুমাত্র নেই। অন্য মন্দিরে দেখেছি সব দেবদেবীর মূর্তি, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীও খোদাই হয়েছে। এই মন্দিরে দেখতে পাই সর্বজনকে রাজা থেকে আরম্ভ করে ভিখারি পর্যন্ত। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে; এর মধ্যে শুধু মানুষের নয়, অন্য জীবেরও, যথেষ্ট স্থান আছে। জাতককাহিনীর মধ্যে খুব একটা মস্ত কথা আছে, তাতে বলেছে, যুগ যুগ ধরে বুদ্ধ সর্বসাধারণের মধ্য দিয়েই ক্রমশ প্রকাশিত। প্রাণীজগতে নিত্যকাল ভালোমন্দর যে দ্বন্দ্ব চলেছে সেই দ্বন্দ্বের

প্রবাহ ধরেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধের মধ্যে অভিব্যক্ত। অতি সামান্য জন্তুর ভিতরেও অতি সামান্য রূপেই এই ভালোর শক্তি মন্দর ভিতর দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুলছে; তার চরম বিকাশ হচ্ছে অপরিমেয় মৈত্রীর শক্তিতে আত্মত্যাগ। জীবে জীবে লোকে লোকে সেই অসীম মৈত্রী অল্প অল্প করে নানা দিক থেকে আপন গ্রন্থি মোচন করছে, সেই দিকেই মোক্ষের গতি। জীব মুক্ত নয় কেননা, আপনার দিকেই তার টান; সমস্ত প্রাণীকে নিয়ে ধর্মের যে অভিব্যক্তি তার প্রণালীপরম্পরায় সেই আপনার দিকে টানের 'পরে আঘাত লাগছে। সেই আঘাত যে-পরিমাণে যেখানেই দেখা যায় সেই পরিমাণে সেখানেই বুদ্ধের প্রকাশ। মনে আছে, ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, দড়িতে বাঁধা ধোপার বাড়ির গাধার কাছে এসে একটি গাভী স্নিগ্ধচক্ষে তার গা চেটে দিচ্ছে; দেখে আমার বড়ো বিস্ময় লেগেছিল। বুদ্ধই-যে তাঁর কোনো এক জন্মে সেই গাভী হতে পারেন, এ কথা বলতে জাতককথা-লেখকের একটুও বাধত না কেননা, গাভীর এই স্নেহেরই শেষ গিয়ে পৌঁচেছে মুক্তির মধ্যে। জাতককথায় অসংখ্য সামান্যের মধ্যে দিয়েই চরম অসামান্যকে স্বীকার করেছে। এতেই সামান্য এত বড়ো হয়ে উঠল। সেই জন্যেই এতবড়ো মন্দিরভিত্তির গায়ে গায়ে তুচ্ছ জীবনের বিবরণ এমন সরল ও নির্মল শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত। ধর্মেরই প্রকাশচেষ্টার আলোতে সমস্ত প্রাণীর ইতিহাস বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে মহিমান্বিত।

দুজন ওলন্দাজ পণ্ডিত সমস্ত ভালো করে ব্যাখ্যা করবার জন্যে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের চরিত্রে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সরল হৃদ্যতার সম্মিলন আমার কাছে বড়ো ভালো লাগল। সব চেয়ে শ্রদ্ধা হয় এঁদের নিষ্ঠা দেখে। বোবা পাথরগুলোর মুখ থেকে কথা বের করবার জন্যে সমস্ত আয়ু দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে পাণ্ডিত্যের কৃপণতা লেশমাত্র নেই— অজস্র দাক্ষিণ্য। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ করে জেনে নেবার জন্যে এঁদেরই গুরু বলে মেনে নিতে হবে। জ্ঞানের প্রতি বিশুদ্ধ নিষ্ঠা থেকেই এঁদের এই অধ্যবসায়। ভারতের বিদ্যা, ভারতের ইতিহাস, এঁদের নিকটের জিনিস নয়, অথচ এইটেই এঁদের সমস্ত জীবনের সাধনার জিনিস। আরো কয়েকজন পণ্ডিতকে দেখেছি; তাঁদের মধ্যেও সহজ নম্রতা দেখে আমার মন আকৃষ্ট হয়েছে। ইতি

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[১]

১ শ্রীমতী মীরা দেবীকে লিখিত।

২০

বিলিটন

কল্যাণীয়াসু

রানী, জাভার পালা সাঙ্গ করে যখন বাটাভিয়াতে এসে পৌঁছলুম, মনে হল খেয়া-ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছি এবার পাড়ি দিলেই ওপারে গিয়ে পৌঁছব নিজের দেশে। মনটা যখন ঠিক সেই ভাবে ডানা মেলেছে এমন সময় ব্যাংকক্‌ থেকে আরিয়ামের টেলিগ্রাম এল যে, সেখানে আমার ডাক পড়েছে, আমার জন্যে অভ্যর্থনা প্রস্তুত। আবার হাল ফেরাতে হল। সারাদিন খাটুনির পর আস্তাবলের রাস্তায় এসে গাড়োয়ান যখন নতুন আরোহীর ফরমাশে ঘোড়াটাকে অন্য রাস্তায় বাঁক ফেরায় তখন তার অন্তঃকরণে যে-ভাবের উদয় হয় আমার ঠিক সেইরকম হল। ক্লান্ত হয়েছি, এ কথা মানতেই হবে। এমন লোক দেখেছি (নাম করতে চাই নে) ভাগ্য অনুকূল হলে যারা টুরিস্ট্‌-ব্রত গ্রহণ করে চিরজীবন অসাধ্য সাধন করতে পারত, কিন্তু তারা হয়তো পটলডাঙার কোন্‌-এক ঠিকানায় ধ্রুব হয়ে গৃহকর্মে নিযুক্ত। আর, আমি দেহটাকে কোণে বেঁধে মনটাকে গগনপথে ওড়াতে পারলে আরাম পাই অথচ সাত ঘাটের জল আমাকে খাওয়াচ্ছে। অতএব, চললুম শ্যামের পথে, ঘরের পথে নয়।

এখানকার যে-সরকারি জাহাজে সিঙাপুরে যাবার কথা সে-জাহাজে অত্যন্ত ভিড়, তাই একটি ছোটো জাহাজে আমি আর সুরেন স্থান করে নিয়েছি। কাল শুক্রবার সকালে রওনা হওয়া গেছে। সুনীতি ও ধীরেন একদিনের জন্য পিছিয়ে রয়ে গেল; কেননা, কাল রাত্রে ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে সুনীতির একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। জাভার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সুনীতি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তার কারণ, তাঁর পাণ্ডিত্যে কোনো ফাঁকি নেই, যা-কিছু বলেন তা তিনি ভালো করেই জানেন।

আমাদের জাহাজ দুটি দ্বীপ ঘুরে যাবে, তাই দুদিনের পথে তিন দিন লাগবে। এই জায়গাটাতে বিশ্বকর্মার মাটির ব্যাগ ছিঁড়ে অনেকগুলো ছোটো ছোটো দ্বীপ সমুদ্রের মধ্যে ছিটকে পড়েছে। সেগুলো ওলন্দাজদের দখলে। এখন যে-দ্বীপে জাহাজ নোঙর ফেলেছে তার নাম বিলিটন। মানুষ বেশি নেই; আছে টিনের খনি, আর আছে সেই-সব খনির ম্যানেজার ও মজুর। আশ্চর্য হয়ে বসে বসে ভাবছি, এরা সমস্ত পৃথিবীটাকে কিরকম দোহন করে নিচ্ছে। একদিন এরা সব ঝাঁকে ঝাঁকে পালের জাহাজে চড়ে অজানা সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েছিল। পৃথিবীটাকে ঘুরে ঘুরে দেখে নিলে, চিনে নিলে, মেপে নিলে। সেই জেনে নেওয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাস কত সাংঘাতিক সংকটে আকীর্ণ। মনে মনে ভাবি, ওদের স্বদেশ থেকে অতি দূর সমুদ্রকূলে এই-সব দ্বীপে যেদিন ওরা প্রথম

এসে পাল নামালে, সে কত আশঙ্কায় অথচ কত প্রত্যাশায় ভরা দিন। গাছপালা জীবজন্তু মানুষজন সেদিন সমস্তই নতুন। আর আজ! সমস্তই সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত, সম্পূর্ণ অধিকৃত।

এদের কাছে আমাদের হার মানতে হয়েছে। কেন, সেই কথা ভাবি। তার প্রধান কারণ, আমরা স্থিতিবান জাত, আর ওরা গতিবান। অন্যোন্যতন্ত্র সমাজবন্ধনে আমরা আবদ্ধ, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যে ওরা বেগবান। সেই জন্যেই এত সহজে ওরা ঘুরতে পারল। ঘুরেছে বলেই জেনেছে আর পেয়েছে। সেই কারণেই জানবার ও পাবার আকাঙ্ক্ষা ওদের এত প্রবল। স্থির হয়ে বসে থেকে আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষাটাই ক্ষীণ হয়ে গেছে। ঘরের কাছেই কে আছে, কী হচ্ছে, ভালো করে তা জানি নে, জানবার ইচ্ছাও হয় না। কেননা, ঘর দিয়ে আমরা অত্যন্ত ঘেরা। জানবার জোর নেই যাদের, পৃথিবীতে বাঁচবার জোর তাদের কম। এই ওলন্দাজরা যে-শক্তিতে জাভাদ্বীপ সকলরকমে অধিকার করে নিয়েছে, সেই শক্তিতেই জাভাদ্বীপের পুরাতত্ত্ব অধিকার করবার জন্যে তাদের এত পণ্ডিতের এত একাগ্রমনে তপস্যা। অথচ, এ পুরাতত্ত্ব অজানা নতুন দ্বীপেরই মতো তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্বন্ধশূন্য। নিকটসম্পর্কীয় জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধেও আমরা উদাসীন, দূরসম্পর্কীয় জ্ঞান সম্বন্ধেও এঁদের আগ্রহের অন্ত নেই। কেবল বাহুবলে নয়, এই জিজ্ঞাসার প্রবলতায় এরা জগৎটাকে অন্তরে বাহিরে জিতে নিচ্ছে। আমরা একান্তভাবে গৃহস্থ। তার মানে, আমরা প্রত্যেকে আপন গার্হস্থ্যের অংশমাত্র, দায়িত্বের হাজার বন্ধনে বাঁধা। জীবিকাগত দায়িত্বের সঙ্গে অনুষ্ঠানগত দায়িত্ব বিজড়িত। ক্রিয়াকর্মের নিরর্থক বোঝা এত অসহ্য বেশি যে, অন্য সকল যথার্থ কর্ম তারই ভারে অচলপ্রায়। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত যে-সমস্ত কৃত্য ইহলোক পরলোক জুড়ে আমাদের স্কন্ধে চেপেছে তাদের নিয়ে নড়াচড়া অসম্ভব, আর তারা আমাদের শক্তিকে কেবলই শোষণ করে নিচ্ছে। এই-সমস্ত ঘরের ছেলেরা পরের হাতে মার খেতে বাধ্য। এ কথাটা আমরা ভিতরে ভিতরে বুঝতে পারছি। এইজন্যে আমাদের নেতারা সন্ন্যাসের দিকে এতটা ঝোঁক দিয়েছেন। অথচ, তাঁরা সনাতনধর্মকেও ধ্রুব সত্য বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু, আমাদের সনাতনধর্ম গার্হস্থ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সস্ত্রীকং ধর্মমাচরেৎ। আমাদের দেশে বিস্ত্রীক ধর্মের কোনো মানে নেই।

যাঁরা সনাতনধর্মের দোহাই দেন না, তাঁরা বলেন, ক্ষতি কী। কিন্তু, বহু যুগের সমাজব্যবস্থার পুরাতন ভিত্তি যদি-বা ভাঙা সহজ হয় তার জায়গায় নতুন ভিত্তি গড়বে কতদিনে। কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে প্রত্যেক সমাজ কতকগুলি নীতিকে সংস্কারগত

করে নিয়েছে। তর্ক ক'রে বিচার ক'রে, অল্প লোক সিধে থাকতে পারে— সংস্কারের জোরেই তারা সংসারের পথে চলে। এক সংস্কারের জায়গায় আর-এক সংস্কার গড়া তো সোজা কথা নয়। আমাদের সমাজের সমস্ত সংস্কারই আমাদের বহুদায়গ্রস্থিল গার্হস্থ্যকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রাখবার জন্যে। য়ুরোপীয়দের কাছ থেকে বিজ্ঞান শেখা সহজ কিন্তু তাদের সমাজের সংস্কারকে আপন করা সহজ নয়।

আমাদের জাহাজে ছিলেন টিনখনির এক কর্তা; বললেন, ষোলো বৎসর এই-খানেই লেগে আছেন। টিন ছাড়া এখানে আর কিছু নেই। তবু এইখানেই তাঁর বাসা বাঁধা। বাটাভিয়াতে সিন্ধি বণিকেরা দোকান করেছেন। দু বছর অন্তর বাড়ি যাবার নিয়ম। জিজ্ঞাসা করলুম, স্ত্রীপুত্র নিয়ে এখানে বাসা বাঁধতে দোষ কী। বললেন, স্ত্রীকে নিয়ে এলে চলবে কেন, স্ত্রী-যে সমস্ত পরিবারের সঙ্গে বাঁধা, তাঁকে সরিয়ে আনতে গেলে সেখানে ভাঙন ধরে। বোধ করি রামায়ণের যুগে এ তর্ক ছিল না। টিনের কর্তা বালককাল কাটিয়েছেন সাশ্রম বিদ্যালয়ে, বয়ঃপ্রাপ্ত হতেই কাজের সন্ধানে ফিরেছেন, বিবাহ করবামাত্র নিজের শক্তির 'পরেই সম্পূর্ণ ভর দিয়ে বসেছেন। বাপের তবিলের উপরে তাগিদ নেই, মা-মাসি-পিসেমশায়ের জন্যেও মন খারাপ হয় না। সেই জন্যেই এই জনবিরল নির্বাসনেও টিনের খনি চলছে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এরা ঘর বাঁধতে পারল তার কারণ, এরা ঘরছাড়া। তার পরে মঙ্গলগ্রহের দিকে দূরবীন তুলে-যে এরা রাতের পর রাত কাটিয়ে দিচ্ছে তারও কারণ, এদের জিজ্ঞাসাবৃত্তি ঘরছাড়া। সনাতন গৃহস্থেরা এদের সঙ্গে কেমন করে পারবে। তাদের প্রচণ্ড গতিবেগে এদের ঘরের খুঁটিগুলো পড়ছে ভেঙে; কিছুতে বাধা দিতে পারছে না। যতক্ষণ চুপ করে আছি ততক্ষণ যত রাজ্যের অহেতুক বোঝা জমে জমে পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠলেও তেমন দুঃখ বোধ হয় না, এমন-কি, ঠেস দিয়ে আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু, ঘাড়ে তুলে নিয়ে চলতে গেলেই মেরুদণ্ড বাঁকে। যারা সচল জাত, বোঝাই সম্বন্ধে তাদের কেবলই সূক্ষ্ম বিচার করতে হয়। কোন্‌টা রাখবার, কোন্‌টা ফেলবার, এ তর্ক তাদের প্রতি মুহূর্তের; এতেই আবর্জনা দূর করবার বুদ্ধি পাকা হয়। কিন্তু, সনাতন গৃহস্থ চণ্ডী-মণ্ডপে আসন পেতে বসে আছেন; তাই তাঁর পঞ্জিকা থেকে তিনশোপঁয়ষট্টি-দিন-ভরা মূঢ়তায় আজ পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়ল না। এই-সমস্ত রাবিশ যাদের অন্তরে বাহিরে কানায় কানায় ভরপুর, হঠাৎ কংগ্রেসের মাচার উপর থেকে তাদের 'পরে হুকুম এল, লঘুভার মানুষের সঙ্গে সমান পা ফেলে চলতে হবে, কেননা, দু-চার দিনের মধ্যেই স্বরাজ চাই। জবাব দেবার ভাষা তাদের মুখে নেই, কিন্তু তাদের পাঁজর-

ভাঙা বুকের ব্যথায় এই মূক মিনতি থেকে যায়, "তাই চলবার চেষ্টা করব, কিন্তু কর্তারা আমাদের বোঝা নামিয়ে দেন।" তখন কর্তারা শিউরে উঠে বলেন, "সর্বনাশ, ও-যে সনাতন বোঝা।" ইতি

মায়র জাহাজ
১ অক্টোবর ১৯২৭[১]

২১

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, অক্টোবর শুরু হল, বোধ হচ্ছে এখন তোমাদের পুজোর ছুটি; আন্দাজ করছি, ছুটি ভোগ করবার জন্যে আশ্রম ত্যাগ করা তুমি প্রয়োজন বোধ কর নি। নিশ্চয়ই তোমার ছুটির জোগান দেবার ভার দিয়েছ শান্তিনিকেতনের প্রফুল্লকাশগুচ্ছ-বীজিত শরৎপ্রকৃতির উপরে। পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে অন্তত এই বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছে যে, ঘুরে বেড়িয়ে বেশি কিছু লাভ নেই, এ যেন চালুনিতে জল আনবার চেষ্টা, পথে-পথেই প্রায় সমস্তটা নিকেশ হয়ে যায়। আধুনিক কালের ভ্রমণ জিনিসটা উঞ্ছবৃত্তির মতো, যা ছড়িয়ে আছে তাকে খুঁটে খুঁটে কুড়িয়ে কুড়িয়ে চলা। নিজের সুদূর ভরা খেতে আঁটিবাঁধা ফসলের স্মৃতিটা মনে কেবলই জেগে ওঠে।

এবারকার যাত্রায় দেশের চিঠিপত্র ও খবরবার্তা প্রায় কিছু পাই নি বলে মনে হচ্ছে যেন জন্মান্তর গ্রহণ করেছি। এ জন্মের প্রত্যেক দিনের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি সাবেক-জন্মের অন্তত সাতদিনের তুল্য। নতুন জায়গা, নতুন মানুষ, নতুন ঘটনার চলমান যুথপ্রবাহ একেবারে ঠাসাঠাসি হয়ে হুহু করে চলেছে। এই চলার মাপেই মন তোমাদেরও সময়ের বিচার করছে। রেলগাড়ির আরোহী যেমন মনে করে, তার গাড়ির বাইরে নদীগিরিবন হঠাৎ কালের তাড়া খেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিয়েছে, তেমনি এই দ্রুত বেগবান সময়ের কাঁধে চড়ে আমারও মনে হচ্ছে, তোমাদের ওখানেও সময়ের বেগ বুঝি এই পরিমাণেই— সেখানে আজ-গুলো বুঝি কাল-গুলোকে ডিঙিয়ে একেবারে পরশুর ঘাড়ে গিয়ে পড়ছে, মুকুলের সঙ্গে ফলের বয়সের ভেদ সেখানে বুঝি ঘুচল। দূরে বসে যখন বোরোবুদুর বালি প্রভৃতির কথা ভেবেছি তখন সেই ভাবনাকে একটা বিস্তৃত কালের উপর মেলে দিয়ে কল্পনা করেছি, নইলে অতখানি পদার্থ ধরাবার জায়গা পাওয়া যায় না। এই কয়দিনেই সে-সমস্ত তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করা গেল; যা স্বপ্নের মধ্যে আকীর্ণ হয়ে ছিল তা প্রত্যক্ষের মধ্যে সংকীর্ণ হয়ে এল। দূরে সময়ের যে-মাপ অস্ফুটতার মধ্যে মস্ত হয়ে ছিল, কাছে সেই সময়টাই ঘন হয়ে উঠল। হিসেব

১ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত।

করে দেখলে, আমার এই কয়দিনের আয়ুতে অল্পকালের মধ্যে অনেকখানি কালকে ঠেসে দেওয়া হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপে মন্দগমনে যার দিন চলে তার বয়সটার অনেকখানি বাদ দিলে তবে খাঁটি আয়ুটুকুর মধ্যে পৌঁছনো যায়; অর্থাৎ কেবলমাত্র কালের পরিমাণে তার আয়ুর দাম দিতে গেলে ঠকতে হয়, অনেক দর-কষাকষি করেও দুধে পৌঁছনো শক্ত হয়ে ওঠে। তাই ব'লে এ কথা বলাও চলে না যে, দ্রুতবেগে দেশবিদেশে অনেক-গুলো ব্যাপার-পরম্পরার মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে চললেই আয়ু সেই অনুসারে কালকে ব্যাপ্ত করে। আমাদের শাস্ত্রীমশায়কে দেখো-না। তিনি কোণেই বসে আছেন। কিন্তু, সেইটুকুর মধ্যে স্থির হয়ে থেকে কালকে তিনি কিরকম ব্যাপকভাবে অধিকার করতে করতে চলেছেন; সাধারণ লোকের বয়সের বাটখারায় মাপলে তাঁর বয়স নব্বই ছাড়িয়ে যায়। এই তো সেদিন এলেন আশ্রমে মিত্রগোষ্ঠীর সম্পাদকপদ থেকে নেমে। এসেই তাঁর মন দৌড় দিল পালিশাস্ত্রের মহারণ্যের মধ্যে। দ্রুতবেগে পার হয়ে চলেছেন— কোথায় তিব্বতি, কোথায় চৈনিক। নাগাল পাবার জো নেই।

তাই বলছি, আমাদের এই ভ্রমণের কালটা ব্যাপ্তির দিকে যেরকম প্রাপ্তির দিকে সেরকম নয়। আমাদের ভ্রমণের তালটা চৌদুন লয়ে। এই লয় তো আমাদের জীবনের অভ্যস্ত লয় নয়, তাই বাইরের দ্রুতগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তরকে চালাতে গিয়ে হয়রান হয়ে পড়তে হয়। যেমন চিবিয়ে না খেলে খাদ্যটাকে খাদ্য বলেই মনে হয় না তেমনি হুড়মুড় করে কাজ করাকে কর্তব্য বলে উপলব্ধি করা যায় না। বিশ্বের উপর দিয়ে ভাসা-ভাসা ভাবে মন বুলিয়ে চলেছি; অভিজ্ঞতার পেয়ালা ধরে ফেনাটাতে মুখ ঠেকাবার জন্যে এক সেকেণ্ড মেয়াদ পাওয়া যায়, পানীয় পর্যন্ত পৌঁছবার সময় নেই। মৌমাছিকে ঝোড়ো হাওয়ার তাড়া খেয়ে কেবল যদি উড়তেই হয়, ফুলের উপর একটু-মাত্র পা ছুঁইয়েই তখনই যদি সে ছিটকে পড়ে, তা হলে তার ঘুরে-বেড়ানোটা যেমন ব্যর্থ হয়, আমার মনও তেমনি ব্যর্থতার দমকা হাওয়ায় ভন্‌ভন্‌ করেই মোলো— তার চলার সঙ্গে পৌঁছনোর যোগ হারিয়ে গেছে। এর থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি, কোনো জন্মে আমেরিকান ছিলুম না। পাওয়া কাকে বলে যে-মানুষ জানে না ছোঁওয়াকেই সে পাওয়া মনে করে। আমার মন স্ন্যাপ্‌শট্‌বিলাসী মন নয়, সে চিত্রবিলাসী।

এই মাত্র সুনীতি এসে তাড়া লাগাচ্ছে— বেরোতে হবে, সময় নেই। যেমন কোল্‌রিজ বলে গেছেন— সমুদ্রে জল সর্বত্রই, কিন্তু এক ফোঁটা জল নেই যে, পান করি। সময়ের সমুদ্রে আছি কিন্তু একমুহূর্ত সময় নেই। ইতি ২ অক্টোবর ১৯২৭[১]

১ শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত।

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও গ্রন্থ-সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্য মুদ্রিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে সংকলিত হইবে।]

বীথিকা

বীথিকা ১৩৪২ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীর পত্রের উত্তরে' লিখিত 'আধুনিকা' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের নির্দেশক্রমে পরবর্তী কালে (১৩৪৫) প্রহাসিনী গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেখানে কবিতাটির মুখবন্ধে লিখিত হইয়াছে, "দ্বারীর অনবধানে এই কবিতাটি 'বীথিকা'য় অনধিকার প্রবেশ করেছিল। সেই পরিহসিতাকে যথাযোগ্য স্থানে ফিরিয়ে আনা গেল।" রচনাবলী-সংস্করণে বীথিকা হইতে 'আধুনিকা' কবিতাটি সেই কারণে বাদ দেওয়া হইল।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে বর্তমান সংস্করণে অনেক কবিতার রচনা-স্থান ও তারিখ সংযোজিত হইল। 'প্রত্যর্পণ' কবিতাটির (পৃষ্ঠা ১৮) তারিখ '১৯৩২ ?' সালের পরিবর্তে '১২ মাঘ, ১৩৪০' হইবে।

'ছায়াছবি' কবিতাটির নিম্নমুদ্রিত আরম্ভাংশটুকু বর্জনচিহ্নিত আকারে পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়।—

ফিরিয়া দেখি জীবনতটে
অতীত পথপানে,
ছায়ারূপীরা দিকে বিদিকে
চলেছে নানাখানে।
কেহ বা চলে নব অরুণালোকে ;
উঠিছে ফুটি নূতন-জাগা চোখে
অপবিচিত প্রত্যাশার
প্রথম উন্মেষ ;

জানা ও নাহি-জানার সেতু
হতেছে পার— বোঝে না হেতু,
রাখে না উদ্দেশ ॥

ভাসিয়া চলে কোনো বা তরী
কোনো কিছু না লক্ষ্য করি
স্বপ্নাবেশে অবশ কার
তরুণ তনু বহি,
রাত্রি যবে নিশ্বসিছে
নীরবে রহি রহি ॥

ফাগুনমাসে শিথিল কেশে
শিহরি দিয়ে হাওয়া,
মেলিয়া দিয়া আঁচল হতে
সোনার আভা, বায়ুর স্রোতে,
অজানা কোন্ অধীরতায়
কারো বা আসা-যাওয়া ॥

জোনাকিদল তিমিরতলে
বিঁধিল আলো-সূচি,
ভোরের যেই লাগিল ছোঁওয়া
সে আলো গেল মুছি।
তেমনি সব চিহ্ন নিয়ে
মিলালো ওরা কত
চৈত্রশেষে মাধবীবন-
সৌরভের মতো ॥

'প্রাণের ডাক' কবিতার নিম্নে মুদ্রিত একটি নূতন স্তবক 'প্রবাসী'তে ও পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়। 'প্রবাসী'তে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১) উহা প্রথম স্তবকরূপে মুদ্রিত হয়।—

এখনো কি ক্লান্তি ঘোচে নাই,
ওঠো তবু ওঠো,

বৃথা হোক তবুও বৃথাই
পথপানে ছোটো।
স্বপ্ন যত ঘিরে ছিল রাতে,
অবসন্ন তারাদের সাথে
মিলালো আলোকে অবগাহি।
আয়ুঃক্ষীণ নিঃস্ব দীপগুলি
নিশীথের স্মৃতি গেছে ভুলি,
অন্ধ আঁখি শূন্যে আছে চাহি।

'গোধূলি' কবিতাটি ১৩৩৯ সালে কার্তিকের 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রে শ্রীনন্দলাল বসুর একটি রঙিন চিত্র-সহ 'প্রাসাদভবনে' নামে প্রথম মুদ্রিত হয়। কবিতার শেষে সম্পাদকীয় মন্তব্যে জানা যায়, "এই কবিতা নন্দলালবাবুর ছবি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন। পঞ্চাশটি নূতন ছবি ও তদ্দৃষ্টে লিখিত কবির পঞ্চাশটি নূতন কবিতা শীঘ্রই 'বিচিত্রিতা' নামে বই আকারে বাহির হইবে।"

১৩৪০ সালে সেই কবিতার একত্রিশটি 'বিচিত্রিতা' গ্রন্থে সংকলিত হয়। বাকি কবিতার অধিকাংশই বীথিকায় চিত্রবিহীন আকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

'জয়ী' কবিতাটি রচনার স্থান-কাল জানা যায় নাই। উহার প্রথম স্তবকটির আদিম পাঠ (ও তাহার ইংরেজিরূপ) পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়াছে, রচনার স্থান-কালের উল্লেখ-সহ নিম্নে মুদ্রিত হইল। কবিতাটি আবা-মারু জাহাজের জাপানি কাপ্তেন ও কর্মচারীদের জন্য স্বাক্ষরলিপি, একটি মরুভূমির ছবির ধারে লেখা।—

রূপহীন, বর্ণহীন, শুষ্কমরু, নাই শব্দসুর—
তৃষ্ণাতুরবারি হাতে আসন মৃত্যুর—
সে মহানৈঃশব্দ-মাঝে বেজে ওঠে মানবের বাণী,
"বাধা নাহি মানি।"

Oct. 25. 1927

Awa-Maru, Bay of Bengal

ইহার একটি রূপান্তরিত পাঠ ১৩৪২ সালে বিবেকানন্দ ইন্স্টিটিউশন্ পত্রিকায় কবির হস্তলিপির প্রতিলিপিতে বাহির হইয়াছিল; তারিখ ছিল: ১৮ চৈত্র ১৩৪১।

উভয় স্থলেই— "বাধা নাহি মানি।"—থাকায় এবং আভ্যন্তরিক প্রমাণে অনুমিত হয় যে, বীথিকা গ্রন্থে মুদ্রিত— বাধা নাহি মানি'— ছাপার ভুল। তদনুযায়ী এই গ্রন্থের ১০৩-১০৪ পৃষ্ঠায় সংশোধন হইবে।

শেষরক্ষা

শেষরক্ষা ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ইহা 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনটির (রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য) পুনর্লিখিত অভিনয়যোগ্য সংস্করণ। ১৩৩৪ সালে আষাঢ় মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়।

গল্পগুচ্ছ

বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত সাতটি গল্প ১৩০১ সালের 'সাধনা' মাসিকপত্রে নিম্ন সূচীক্রমে প্রকাশিত হয়।—

অনধিকার প্রবেশ	শ্রাবণ ১৩০১
মেঘ ও রৌদ্র	আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১
প্রায়শ্চিত্ত	অগ্রহায়ণ ১৩০১
বিচারক	পৌষ ১৩০১
নিশীথে	মাঘ ১৩০১
আপদ	ফাল্গুন ১৩০১
দিদি	চৈত্র ১৩০১

'অনধিকার প্রবেশ' গল্পটি সাধনার উক্ত সংখ্যায় 'বিদেশী অতিথি ও দেশীয় আতিথ্য' প্রবন্ধটির (রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড দ্রষ্টব্য) অব্যবহিত পরেই মুদ্রিত হইয়াছিল।

অনধিকার প্রবেশ 'বিচিত্র গল্প' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৩০১), মেঘ ও রৌদ্র 'কথা-চতুষ্টয়' (১৩০১) গ্রন্থে, এবং বাকি পাঁচটি গল্প 'গল্পদশক' (১৩০২) পুস্তকে প্রথম গ্রন্থান্তর্ভুক্ত হয়।

জাপানযাত্রী

জাপানযাত্রী ১৩২৬ সালের শ্রাবণ মাসে [ইং ১৯১৯] গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। বৈশাখ ১৩২৩ হইতে বৈশাখ ১৩২৪ পর্যন্ত সবুজপত্রের বিভিন্ন সংখ্যায় রচনাগুলি 'জাপানযাত্রীর পত্র', 'জাপানের পত্র' ও 'জাপানের কথা' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়।

উইলিয়ম পিয়ার্সন, সি. এফ. এণ্ড্রুজ ও শ্রীমুকুলচন্দ্র দে -সহ রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে ১ মে ১৯১৬ তারিখে জাপান যাত্রা করেন। সেখান হইতে আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া জাপানের পথে তিনি ১৩ মার্চ ১৯১৬ তারিখে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

১৩৪৩ সালের শ্রাবণ মাসে 'জাপানে-পারস্যে' গ্রন্থ-প্রকাশকালে 'জাপানযাত্রী' উক্ত গ্রন্থের অন্তর্ভূত হইয়াছে।

প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জাপানযাত্রীর চতুর্দশ পরিচ্ছেদের শেষে শিল্পী শিমোমুরার আঁকা অন্ধের সূর্যবন্দনার যে-চিত্রটির বর্ণনা আছে তাহার একটি রঙিন প্রতিলিপি রবীন্দ্রনাথ জাপান হইতে রচনা করাইয়া আনেন। 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'-তে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ তারিখে লেখা দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভে এই চিত্রটির পুনরুল্লেখ রহিয়াছে। চিত্রটি বর্তমানে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে রক্ষিত আছে।

—

জাপানযাত্রী গ্রন্থের শতবর্ষপূর্তি সংস্করণে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯) পরিশিষ্টে ও গ্রন্থপরিচয়ে রবীন্দ্রনাথের জাপানভ্রমণ সংক্রান্ত বহু তথ্য, চিঠিপত্র, ভাষণ ও অন্যান্য রচনা একত্র সংকলন করা হইয়াছে। এই সংস্করণ সচিত্র।

যাত্রী

যাত্রী ১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' অংশ প্রবাসীতে অগ্রহায়ণ ১৩৩১ হইতে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৩৩৩ সালের ফাল্গুনের প্রবাসীতে উক্ত ডায়ারির কিছু নূতন অংশ 'উদ্‌বৃত্ত' নামে বাহির হয় এবং যাত্রীর প্রথম সংস্করণে 'পরিশিষ্ট'রূপে (পৃ. ১৩৫-১৬২) মুদ্রিত হয়। উহার মুখবন্ধস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে যাহা লিখিয়াছিলেন নিম্নে মুদ্রিত হইল :

'গাছতলায় শুকনো পাতার নীচে ঝড়ে-পড়া কাঁচাপাকা ফল কিছু-না কিছু পাওয়া যায়। আমার আবর্জিত ছিন্ন পাতার মধ্য থেকে যে লেখার টুকরোগুলি আমার তরুণ বন্ধু[1] কুড়িয়ে পেয়েছেন, মনে হচ্ছে, সেগুলি সাহিত্যের ভোজে ব্যবহার করার বাধা নেই। তাই তিনি যখন ভাণ্ডারে তোলবার প্রস্তাব করলেন আমি সম্মতি দিলাম।'

যাত্রীর দ্বিতীয় সংস্করণে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২) উক্ত উদ্‌বৃত্ত 'পরিশিষ্ট' অংশগুলিকে তাহাদের রচনার তারিখ অনুসারে ডায়ারির ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল। 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'র বর্তমান মুদ্রণে প্রধানতঃ যাত্রীর প্রথম সংস্করণ অনুসৃত হইল।

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করেন "তাদের শতবার্ষিক উৎসবে যোগ দেবার জন্যে", এবং ১৯২৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি দেশে প্রত্যা-বর্তন করেন। পূরবী কাব্যের 'পথিক' অংশের কবিতাগুলি এই সময়ের রচনা বলিয়া তাহাদের অনেক পরিচয় পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারির নানা স্থানে পাওয়া যায়।

২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর (১৯২৪) এই দুই তারিখের দুইটি ডায়ারি-অংশে 'শুভ-ইচ্ছা'-

১ শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী।

পূর্বে যে-চিঠির উল্লেখ আছে তাহা পূরবীর 'শিলংয়ের চিঠি'[১] কবিতায় উল্লিখিত শ্রীমতী নলিনী দেবী লিখিয়াছিলেন। সে চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র লেখেন এই প্রসঙ্গে ১৩৪৯ আশ্বিনের 'অলকা' মাসিকপত্র হইতে তাহা সম্পূর্ণ উদ্‌ধৃত করা গেল :

কল্যাণীয়াসু,

কলম্বোতে এসে যাত্রার আগের দিনই তোমার সুন্দর চিঠিখানি পেয়ে বড়ো খুশি হয়েছি। আজ সকালে এসে পৌঁছলুম। তখন থেকে আকাশ মেঘে অন্ধকার। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি পড়ছে, আর বাদলা হাওয়া থামকা হা-হুতাশ করে উঠছে। যাত্রার পূর্বে এরকম দুর্যোগে মনের উৎসাহ কমে যায়— সূর্যকিরণ না পেলে মনে হয় যেন আকাশের দৈববাণী থেকে বঞ্চিত হলুম। এমন সময় তোমার চিঠি আমার হাতে এল, মনে হল, বাংলাদেশ যেন একটি বাঙালি মেয়ের কণ্ঠে আমার কাছে জয়ধ্বনি পাঠিয়ে দিলেন। এই বৃষ্টিবাদলের পর্দার ভিতর থেকে বাংলার অন্তঃপুরের শাঁখ বেজে উঠল। যিনি সকল শুভ বিধান করেন তোমার শুভকামনা নিশ্চয় তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছবে, আমার যাত্রা সফল হবে।

এবারে কলকাতা থেকে বেরবার আগে আমার চারি দিকে যেমন ছিল ভিড় তেমনি আমার দেহে মনে ছিল ক্লান্তি। আস নি ভালোই করেছ, কেননা, তোমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলা অসম্ভব হত। তুমি হয়তো ভাবছ আমি ভারি অহংকারী— ছোটো মেয়েদের ছোটো বলে খাতির করি নে। ভারি ভুল, আমি বড়োদের ভয় করি, তাদের সব কথা বিশ্বাস করি নে— আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ছোটোদের দিকে। আমার কেবল ভয় পাছে আমার পাকা দাড়ি দেখে অকস্মাৎ তারা আমাকে নারদঋষির মতো ভক্তিভাজন মনে করে বসে।

কিন্তু যাই বল, আমি ডায়ারি লিখতে পারব না। আমি ভারি কুঁড়ে। চিঠি লেখার, ডায়ারি লেখার, একটা বয়স আছে ; সে বয়স আমার কেটে গেছে। কিন্তু, অল্প বয়সেও আমি ডায়ারি লিখি নি। যে-সব কথা ভুলে যাবার সে-সব কথা জমিয়ে রাখবার চেষ্টাই করি নি ; যে-সব কথা না ভোলবার সে-সব তো মনে আপনিই আঁকা থাকে।

সময় পেলে তোমার সঙ্গে দু ঘণ্টা তিন ঘণ্টা ধরে গল্প করতে রাজি আছি। অবশ্য, তোমাকেই থেকে থেকে তার ধুয়ো ধরিয়ে দিতে হবে।

গল্প বলার চেয়ে গল্প শুনতেই ভালোবাসি, যদি গল্প বলার গলাটি মিষ্ট থাকে। অভি[২] বলে আমার একটি ভাইঝি ছিল, তার গলা ছিল খুব মিষ্টি। একদিন কী একটা

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২ অভিজ্ঞা দেবী, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয়া কন্যা।

কারণে আমার খুব রাগ হয়েছিল, অভি এসে আমার চৌকির পিছনে দাঁড়িয়ে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ঠিক সেই সময়ে যা-তা বকে গেল ; এক মুহূর্তে আমার সমস্ত রাগ জুড়িয়ে গেল। সে আজ অনেক দিনের কথা, কিন্তু আজও মনে আছে। তারই মুখে রূপকথা শুনে আমি 'সোনার তরী'তে বিম্ববতীর গল্প লিখেছিলেম। সে অনেক দিন হল মারা গেছে। এখন আমার কাছে অনেকে তর্ক করতে আসে, গম্ভীর বাজে কথা আলাপ করতে চায়, কিন্তু অনেক দিন তেমন করে গল্প কেউ বলে নি। আমি ফিরে এলে দু ঘণ্টা ধরে গল্প করবে বলেছ, ভয় হয় পাছে ততদিন তুমি বেশি বড়ো হয়ে গম্ভীর হয়ে যাও। লোভ হচ্ছে শিগ্‌গির ফিরে আসতে। কিন্তু ওদিকে তোমার শুভকামনা সব জায়গায় সম্পূর্ণ সফল করতে তো দেরি হবে। এই দ্বিধায় রইলুম। ফিরে এলে দ্বিধা কাটবে, ইতিমধ্যে আমার অন্তরের আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৪

'জাভাযাত্রীর পত্র' অংশের রচনাকাল ১৯২৭ সালের জুলাই হইতে অক্টোবরের মধ্যে। ১৩৩৪-৩৫ সালের মধ্যে সবগুলি রচনা 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত— ২১ সংখ্যক পত্র ছাড়া, সেটি ১৩৩৪ অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে 'কালের আপেক্ষিকতা' শিরোনামে মুদ্রিত।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা প্রমুখ অধ্যাপক ও শিল্পীগণকে সঙ্গে লইয়া ১৯২৭ সালে ১৪ জুলাই মাদ্রাজ হইতে রবীন্দ্রনাথ পূর্বদ্বীপপুঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করেন। জাভা বালি প্রভৃতি দ্বীপ ভ্রমণ করিয়া সিয়াম হইয়া অক্টোবরের শেষে তিনি ফিরিয়া আসেন। নবম পত্রে শ্রীপ্রতিমা দেবীকে তিনি লিখিয়াছেন, "সমস্ত বিবরণ বোধ হয় সুনীতি কোনো-এক সময়ে লিখবেন।…বুঝতে পারছি তাঁর হাতে আমাদের ভ্রমণের ইতিবৃত্ত লেশমাত্র ব্যর্থ হবে না, লুপ্ত হবে না।" ১৩৩৪ সালের ভাদ্র হইতে ১৩৩৮ সালের আশ্বিন পর্যন্ত প্রবাসীর ধারাবাহিক সংখ্যায় শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের এই ভ্রমণের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত 'যবদ্বীপের পথে' ও 'দ্বীপময় ভারত' নামে ক্রমশ প্রকাশ করেন। পরে উহা 'দ্বীপময় ভারত' নামে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

পঞ্চদশ পত্রে উল্লেখ আছে যে, রবীন্দ্রনাথ জাভানি শ্রোতাদের সভায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইবেন। সেই সভানুষ্ঠানের পরে লিখিত এক পত্র রবীন্দ্র-ভবনের সংগ্রহ হইতে প্রাসঙ্গিক বোধে নিম্নে মুদ্রিত হইল :

'আমার কবিতা পাঠ হয়ে গেলে পর এরা আমাকে কতকগুলি গান শুনিয়েছিল, তার মধ্যে একটি গান গদ্যছন্দে তর্জমা করে দিলুম—

হে রমণী, বিশ্বভুবনের ভূষণে তুমি মুক্তা।
অবসন্ন তোমার দাস, বিরহে বিষাদে বিমর্ষ,
তাকে আরোগ্যের অমৃত-ঔষধি দাও।
ওগো আমার কপোতিকা, আমার প্রাণপুত্তলি,
বলো দেখি, আমার দুঃখ কে জানে।
এমন পাষাণ চিত্ত কার, হে নারী,
তোমাকে দেখে যার মন ভালোবাসায় না ব্যথিত হয়।
বৃষ্টির পরে আকাশে-ছড়িয়ে-পড়া তারাগুলি জ্বল জ্বল করে,
মনে হয় ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় ওরা অভিভূত—
আমার উষ্ণীষের ফুলও শিথিল হল সেই পীড়নে।
তোমার কবরীর দিকে তাকিয়ে তারাগুলির এই দশা।'

১৩৩৫ সালে কার্তিকের বিচিত্রায় উপরের কবিতাটি 'প্রেমাস্পদা' নামে প্রকাশিত হয়। প্রথম পংক্তির "তুমি মুক্তা" স্থলে সেখানে "তুমি ভূষিতা" পাঠ মুদ্রিত হয়। অনুবাদটি কবির কোনো কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

শ্রীবিজয়লক্ষ্মী, বোরোবুদুর, সিয়াম— যাত্রীর 'জাভাযাত্রীর পত্র' অংশের এই কয়টি কবিতা পরিশেষ কাব্যে (১৩৩৯) গৃহীত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর পঞ্চদশ খণ্ডে কবিতাগুলি ইতিপূর্বেই মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া যাত্রীর বর্তমান সংস্করণে বর্জিত হইল। কিন্তু, 'রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় উর্ধ্বস্বরে ডাকি' এবং 'নন্দগোপাল বুক ফুলিয়ে এসে' পঞ্চদশ খণ্ডের সংযোজনে সংকলিত হওয়া সত্ত্বেও, বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা-বশত যাত্রীর অন্তর্ভুক্ত রহিল।

—

পরবর্তীকালে, রবীন্দ্র শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে— 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থমালায় যাত্রী গ্রন্থের দুই অংশ দুইটি সচিত্র গ্রন্থের আকারে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত— পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি (শ্রাবণ ১৩৬৮) ও জাভাযাত্রীর পত্র (ফাল্গুন ১৩৬৭)।

—

বর্ণানুক্রমিক সূচী